VOL. 10. No. 1.

APRIL 1920.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY
RAI SHAHEB,
BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,
AND
SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . Rs. 5-8-0
Single Copy . . 0-8-0

REGINUS

(TRIED OVER 30 YEARS.)

Composition-Aswagandha Coco. Munocmica, Damian. Phosphorus, &c.

REGINUS- Universally praised by your physicians as a Brain Food and Tonic.

REGINUS is now prescribed to cure completely Bodily fatigue, Brain Exhaustion, Weakness of every sort, &c., &c.

ASTHMA :—With dry cough, hard breathing periodical fits, palpitation spitting out sticky phlegm Keeping up sleepless nights for fear of Suffocation, &c. Cured radically by our specific remedy. Bottle Rs. 5.

DIABETES and PILES are cured very shortly with our proved Cures. Bottle Rs. 3 each.

Complete list of preparations sent free.

THE RANAGHAT CHEMICAL WORKS.

RANAGHAT. BENGAL.

Edwards Tonic

The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.

Sole Agents:—**B. K. PAUL & CO.,** *7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.*

B. K. PAUL & CO'S,

Gold Sarsaparilla

A SURE AND SAFE AGENT FOR PURIFYING BLOOD. A MARVELLOUS REMEDY FOR ALL SYPHILLITIC AND MERCURIAL DISORDERS.

PRICE-EACH PHIAL RS. 2/8,

BUTTO KRISTO PAUL & Co,

CHEMISTS & DRUGGISTS,

CALCUTTA.

Cytogen — AN IDEAL DIGESTIVE TONIC WINE

Invaluable in CONVALESCENCE *from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c., Extremely Useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,*

INDISPENSABLE AFTER PARTURITION

Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.

B. K. Paul & Co.,

CALCUTTA.

Branch Sovabazar Street

Head office:—7 & 12 Bonfield's Lane Calcutta. The Research Laboratory —18 Sashi Bhuson Sarker's Lane

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি

প্রায় পঞ্চাশ এবং তদূর্দ্ধকাল পূর্ব্বের বাঙ্গলার ধনী মধ্যবিত্ত সমাজের, সাহিত্যের, সঙ্গীতে শিল্পের, ব্যবসায়ের, বাণিজ্যের, রঙ্গমঞ্চের এবং কলাবিদ্যার ইতিহাস; তৎকালীন বিখ্যাত কবি, অভিনে গায়ক, লেখক এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের পরিচয়; তত্ত্ববোধিনী, আদি ব্রাহ্ম সমাজ, নববিধান এ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নানা কথা; প্রায় ৫০। ৬০ খানি বিখ্যাত দেশমান্য প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণে প্রতিকৃতি সহ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনকাহিনীর সহিত গ্রথিত।

এই বিরাট গ্রন্থে বাঙালীর জাহাজ চালনা, বাঙালার নীলের চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাকু বংশে কি করিয়া ইংরাজী সভ্যতা প্রবেশ করিল, তাহার যথাযথ ইতিহাস আছে। কবিগুরু রবী নাথেরও জীবন চরিত, যাহা তাঁহার জীবনস্মৃতিতে নাই, তাহাও কিছু পরিমাণে আছে।

মূল্য দুই টা

বসন্ত বাবুর অন্যান্য গ্রন্থ

মন্দিরা
(কাব্য)
(দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
মূল্য—দশ আনা।

সপ্তস্বরা
(কাব্য)
এই কাব্য খানি বিলাতেও সমাদৃত হইয়াছে।
মূল্য—এক টাকা।

খঞ্জনী
(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা)
শতাধিক নীতি ও ভাব মূ কবিতা।
মূল্য—চারি আনা

গল্পমাল্য
(গল্প গ্রন্থ)
আটটি বিখ্যাত গল্পের একত্র সমাবেশ।

কলিকাতার বিখ্যাত সমস্ত পুস্তকালয়ে এবং গুরুদাস লাইব্রেরী ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শিশি পাব্লিশিং হাউস্ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট এবং চাটার্জ্জী কোং ১৫ কলেজ স্কোয়ারে প্রাপ্তব্য।

পাঠের ও উপহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।

মূক ও বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন প্রণীত

নল-দময়ন্তী

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কয়েকখানি বহুবর্ণের চিত্র ভূষিত। বেগুণি রংএর সাটীন কাপড়ে মনোরম প্যাড্ বাঁধাই—তদুপরি একখানি ভিন্ন রংএর চিত্র পরিশোভিত। বাঙ্গালা ভাষায় উপহার দিবার এমন সরল সুন্দর মধুর পুস্তক আর একখানিও নাই!

মালঞ্চ সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত

এম, এ প্রণীত

ভারতনারী.

সিল্কের কাপড়ে প্যাড্ বাঁধাই মূল্য ১৷৷০

সাটীন কাপড়ের শোভনরাজসংস্করণ—মূল্য ২৲

বহু চিত্রে ভূষিত আদিতি, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সতীলক্ষ্মী আর্য্যনারীগণের চিরপূজ্য আদর্শ কাহিনী।

বাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই নিত্য পাঠ্য।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ সম্পাদিত

(বঙ্গদেশের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক স্কুলসমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত এবং কলিকাতা ইউনিভারসিটী কর্ত্তৃক মহিলাদিগের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট)

কাশীদাসী মহাভারত (সচিত্র) মূল্য ৩৷৷০

কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সচিত্র) মূল্য ২৷৷০

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চিরসমাদৃত—বাঙ্গালী জীবনের চিরমধুময়—চির নবীন রূপ কথা!

ভূতপূর্ব্ব শিশু সম্পাদক শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ঠাকুরমার ঝোলা বা বাঙ্গালীর রূপকথা

যেমন সুন্দর কাগজ—তেমন সুন্দর নির্ভুল ছাপা—তেমনি সুন্দর ঝক্‌ঝকে বাঁধা আবার তেমনি সুন্দর সুন্দর রাশি রাশি ছবিতে ভরা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

Amrita Bazar Patrika says, "AN INIMITABLE PRODUCTION."

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্, এ মহাশয় বলেন—"...ইহাতে আশৈশব পরিচিত সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর কথা, ডাইনী রাক্ষসীর কথা,...পিঠে গাছের কথা ত আছেই আবার পুষ্পকুমার, মধুরাণী প্রভৃতি সুকোমল নামের ও ততোধিক সুকোমল প্রকৃতির নায়কনায়িকার কথা সরল ভাষায়, সুন্দর ভঙ্গীতে, কল্পনার তুলিকায় কবিত্বের উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে......।"

সত্য বাবুর নূতন পুস্তক—অভিনব শিশু উপন্যাস

মূল্য ৸০] **দগোবার্ট** [মূল্য ৸০

ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লিখিত প্রভুভক্ত কর্ম্মবীরের অলৌকিক কাহিনী। এরূপ... পঞ্চাস আর বাহির হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

৬৫নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।

A NEW BOOK—Just published.

A HISTORY OF EDUCATION IN ANCIENT INDIA.

BY

NAGENDRA NATH MAZUMDER, M. A., B. T.

Professor, Dacca Training College

WITH AN INTRODUCTION

BY

E. E. BISS, I. E. S.

Principal, Dacca Training College.

MACMILLAN & Co.

Calcutta.

Price Re. 1-8-

Sir Gooroodass Banerjea writes :—"The book presents in a well-arranged form within a short compass much useful information regarding ancient Hindu culture."

Babu Hirendra Nath Dutta, M. A., P. R. S. says :—"I have gone through it (Education Ancient India) with interest. You have broken new ground and opened up a fruitful interesting field."

Dr. Brajendra Nath Seal, (George V Professor of Philosophy, Calcutta University) writes I have read with great pleasure Mr. Nagendra Nath Majumdar's "History of Educat in Ancient India." As a clear and interesting account of the ideals and practices of Ancient and Mediaeval Hindus in the sphere of Education, it is eminently suited to serve an introduction to the study of the subject.

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শক্তি ঔষধালয়

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড্। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১২নং বিডন ষ্ট্রীট্। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন্ রোড্ (হাওরা পুলের নিকট
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১৩৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্। (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—
৭১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—৭২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত—৪৲ সের।

কামদেব ঘৃত—১২৲ সের।
মধাশক্তি বর্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায়।

ব্রাহ্মীঘৃত—৮৲ সের)

দাদ্মার—৵০ কৌটা।
(এক দিনে দদ্রু নিশ্চয় আরোগ্য)।

দশন সংস্কারচূর্ণ—৵০ কৌটা।
(সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ)।

সারিবিদ্যারিষ্ট ৩৲ সের।
(রক্তদুষ্টি বাত বেদনার মহৌষধ)।

বহরের ননী—॥০ শিশি।
(নালীঘা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ব মহৌষধ)।

অমৃতারিষ্ট—॥০ আনা শিশি।
(ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শক্তি বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ,
হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of:—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Sir Henry Wheeler, K. C. I. E.
" Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M.A.
" Sir N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. Donald, C. I. E., I. C. S.
" Mr. W. W. Hornell, C. I. E., M. A.
" Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. G. Cumming, C. S. I., C. I. E.
" F. C. French, C.S.I., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
D. G. Davies Esq., I. C. S.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
" Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
" Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
" J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon.)
" J. C. Kydd, M. A.
" W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
" T. T. Williams M. A., B. Sc.
" Egerton Smith, M. A.
G. H. Langley, M. A.
" Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.

Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagpor, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.
The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.
The " Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
The Hon'ble Sir Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
" Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S.
" Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
" Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhusan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
" Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
" Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
" Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
" Hemendra Prosad Ghose.
" Akshoy Kumar Moitra.
" Jagadananda Roy.
" Binoy Kumar Sircar.
" Gouranga Nath Banerjee.
" Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law. Principal, Lahore Law College
Khan Bahadur Syed Abdul Latif.

CONTENTS.

Socıal Service—its importance and possibilities in East Bengal	Rev. Harold Bridges, B. D.	1
The fusion of the East and the West in India	The late Pundit Sivanath Sastri	9
The dawn of humanity in India	Prof. Panchanan Mitra, M. A, P. R. S, (Calcutta University)	16
At dusk	Nita H Padwick	20

সূচী।

১। আগুহী	শ্রীযুক্ত শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ	১
২। কপাল কুণ্ডলার নায়ক	অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম্, এ,	২
৩। নববর্ষে	শ্রীযুক্তা ভক্তিসুধা রায়	১২
৪। দক্ষিণাপথ ভ্রমণ	মাননীয়শ্রীযুক্ত সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে·টি এম্, এ, এল, এল, ডি, সি, আই, ই,	১২
৫। খেলা	শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী বি, এ,	১৯
৬। মরণ	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম, এ, বি, এল,	১৯
৭। সাহিত্যিক পত্র		
৮। ছিন্নকমল		
৯। লক্ষ্মণমাণিক্যের বিখ্যাত বিজয়	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১
১০। পাগল (সমালোচনা)	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়	২২
১১। সমর্পণ	শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়	২৬

BANGIYA SAHITYA PARISHAD LIBRARY.

THE DACCA REVIEW.

VOL. X. APRIL, 1920. No.

SOCIAL SERVICE—ITS IMPORTANCE AND POSSIBILITY IN EAST BENGAL.

THE MEANING OF SOCIAL SERVICE.

Social Service is a term capable of of very broad interpretation. In one sense all our activity in life involves social service. The lawyer serves society by helping to preserve justice, the schoolmaster by advancing the cause of education, the cultivator by producing and the merchant by distributing society's food. In an ideal state, such as that sketched for us in Plato's "Republic," the proper allocation of duties within the community and the faithful discharge of his responsibilities by every citizen would be the only form of social service needed. We, however, are not yet living in the ideal state ; society is not perfectly organised nor are men everywhere found to be faithfully carrying out their responsibilities in the ordinary avocations of life. Hence arises the need for a form of voluntary activity such as that implied by the specialised term Social Service. Broadly speaking we mean by it effort put forth to serve our fellows in all matters which concern their social or collective welfare. The word 'social' comes to us from the Latin for 'friend' and Social Service is nothing short of a recognition of our fellow human beings as friends with all the care and solicitude for their welfare that the word implies.

In practice Social Service is to be distinguished from Politics. Strictly speaking politics is interested in men as they constitute nations. Nor is it to be confounded with Religion which classifies human beings according to their beliefs and religious practices. Social Service is directed to men as our fellow human beings and concerns itself with the needs they have in common with their health, wealth, efficiency and happiness, apart from any consideration of race or religion, caste or creed.

All down the ages the subject of Social Service has stimulated the

interest of great thinkers and some of the world's most famous literature has taken it as its theme. For the most part however Manu, Plato, Sir Thomas More and Machiavelli have been regarded as visionaries and not until less than a hundred years ago does the subject with which they so ably dealt in their writings seem to have gripped the popular imagination. A century however has worked mighty changes. The scientific renaissance of the early half of last century revolutionised with astonishing rapidity the world's industrial outlook. It issued in the rise of capitalism which all too often exploited labour for its own selfish ends and established a slavery of the worker to the machine and its owner. At the same time the spirit of enquiry was issuing in the immense extension of educational facilities so that those who were suffering from the ill effects of capitalism very soon came to be capable of articulating their needs not only in private but, in parliament itself. Out of such changed conditions Socialism arose and then there appeared in most European countries Labour Parties bent on improving the lot of the worker and securing for him a fairer share of the gains that accrued to his toil. The spirit of which we are speaking had its birth in separate nations but it has long since transcended nationality. It has come to be Universal and no clearer indication of the strong grip that the spirit of Social Service, in its largest sense, has taken of mankind can be found than in those clauses of the League of Nations recently concluded in Paris in which Nations have solemnly agreed to combine in order to protect the weak, promote health, maintain the interests of the labouring classes and advance the cause of human prosperity throughout the whole world.

DANGERS.

In fairness one must admit that the new social spirit, uncontrolled or unwisely directed, has its dangers. Bolshevism is certainly one of its very bitter fruits. But that again is no indication that the spirit is wrong rather that it needs intelligent and careful application. Whatever be our opinion of it the spirit is with us. Men and women are awaking to the vision of a universal brotherhood and are not only hearing but responding to the call to interest themselves in and help further the interests of their fellows.

We are members of one great human family and nothing human should be alien to us. We owe and ought to recognise that we owe most of our joy in life to social relationship. In a real sense every one of us is his brother's keeper exerting an influence for good or ill upon all with whom we come into contact in the complex web of social affinity. On the merely animal level the doctrine of the survival of the fittest was well enough, but we have risen above that into a moral human

order where an inward monitor tells us that it is our duty and privilege to help the unfit to become fit to survive. But ethics aside, the appeal of Social Service from the economic standpoint is urgent enough. What an infinite waste of wealth and energy there is in purely National politics has been demonstrated beyond question by the recent world war. Millions of human lives, fabulous sums of money and an incredible amount of material produce have been absolutely destroyed and the clock of human progress has been put back many years. Were human energies more bent upon the uplifting of individuals as men than on exalting the nations of which they form units the world would rapidly become richer, happier and more efficient. But even narrowing our vision the vast importance of Social Service to India at the present time can hardly be overestimated. Just now the country is rejoicing, and rightly rejoicing in the inauguration of a new political era, an age in which she will gain a steadily increasing control of her own Government and institutions. If her new opportunities are to be used to full advantage, if the fresh possibilities for good are to be abundantly realised, her first and foremost attention will have to be given to Social Reform. Consider, for example, the social question of Public Health. A nation's efficiency depends upon the strength and vigour of its people. If the inhabitants are diseased and unhealthy national prosperity must inevitably be impaired. Not only will the country lose the services of the man who is ill but it will be deprived of the productive activity of the doctor who prescribes and the nurse who attends to his wants. Similarly political power and privilege is of little use to a nation which is not sufficiently educated to take wise advantage of them. An ignorant people can never become truly great. Education is of immense importance and it is largely dependent for its existence upon Social Service. Another aspect of Social Service without which a nation cannot prosper is the maintenance of morality. History has its lessons for humanity here in the decay and fall of Rome and Spain. Sexual immorality leads inevitably to spiritual, mental and physical disease; it cuts at a nation's vitality. Mere parliamentary legislation cannot, though it has tried repeatedly, keep a people pure but Social Service can do a great deal. Further whereas only a comparatively few people can take an active part in political activity Social Service provides ample scope for all. So multifarious are its calls and opportunities that everyone-men, women and even youths and maidens may take a share. The very fact of doing something practical to help the community will strengthen character and foster self-respect and thereby do much to enrich the nation. The realm of Social Service too may prove an excellent training ground for

the very best politicians. The late Mr. G. K. Gokhale with characteristic farsightedness established the "Servants of India Society" the key note of which was SERVICE in the interest of the people's needs. Each member of the Society has to promise solemnly that "In serving the country I will seek no personal advantage for myself and that I will regard all Indians as brothers and will work for the advancement of all without distinction of caste or creed." That represents the true spirit of social service, the willingness to sacrifice personal interest, if needs be, for the highest good of one's fellows.

POSSIBILITIES IN EAST BENGAL.

Opportunities for Social Service in this country are legion and it will only be possible here to indicate a few of them. Once the spirit of service is engendered, it will speedily find its own outlet in practice. The first and most obvious sphere for Social Service is that of Public Health. Bengal has not a good reputation as a health resort. Few countries probably have such a high rate of mortality and not many are so ravaged by disease. A most cursory glance at the Sanitary Blue book for the province will reveal the fact that Cholera, Smallpox and Malaria carry off a very large proportion indeed of those who die and that the last named disease is responsible for the lowering of the vitality of millions who thereby become a ready prey to any other infectious disease that happens to be prevalent. Now all these terrible scourges are *preventible diseases.* Just as yellow fever has been stamped out of several South American cities, malaria has been exterminated from Ismailia on the Suez Canal and small pox and cholera eradicated from Great Britain, very much indeed could be done by Social Service to rid Bengal of these frightful mena ces to her efficiency and happiness. Another great problem besetting the life of this country is that of excessive Child Mortality. In Great Britain during the first week or two after birth about one child in twenty dies whereas in the Dacca District the appalling figure of one in four is recorded. Such a wastage of life on its very threshold is a serious menace to national existence and it again is largely preventible not merely and not materially by act of Parliament but by the devoted efforts of Social Service.

In the sphere of Education, Bengal holds a proud place in India. She has awakened to the need for instruction more than most provinces but there is still much to be done especially in the matter of primary schools. All children of every caste and creed should have a chance to learn. Many villages are without schools, some do not even want them. Therein lies a glorious possibility for Social Service. I wonder how many people know that Dacca could establish compulsory primary education

to-morrow if opinion were ripe for it. The Municipality has been given the power by act of Government but the power is not likely to be put into execution until Social Service bestirs itself to stimulate the desire.

Then the poverty of which we hear so much and which causes such wide spread suffering and inefficiency may be very largely alleviated by Social Service. Means have been devised such as the bringing to light of new and improved methods of agriculture, the setting up of co-operative credit banks and societies etc., but it is the work of Social Service to make these means popular and to get them adopted by people who are not sufficiently educated to appreciate their value.

Lastly but by no means least emphatically one must mention the great social evils of impurity and intemperance. These seem to be problems which have proved insoluble by legislation but they are sure to yield to the efforts of Social Service. Why should temptation be allowed to flaunt itself in the face of our youths? Why should the stage be the monopoly of prostitutes and the beneficent and necessary recreations of music and amusement be inseparably associated with people of loose character? India has in the past set a most excellent example to other nations of the world in the matter of abstinence from alcoholic beverage and it lies with enthusiasts for Social Service to maintain that tradition. By creating and maintaining a healthy public opinion in favour of purity and temperance they will accomplish more even than the reformers in America who have compelled their fellow countrymen to be sober by an act of prohibition.

Moreover these and similar opportunities for Social Service are rendered the more capable of execution by peculiar features prevailing in the country. In very few lands is there such a clearly marked division into literate and illiterate as in Bengal. The great mass of the people probably about eighty five percent and including almost all the women are unlettered. If the knowledge of modern methods of sanitation, preservation of health, industrial improvements and up to date methods of education which can contribute so largely to their health, happiness and efficiency is ever to reach them, it must do so through the few who are educated enough to understand and appreciate them. Hence it is that the great illiterate masses constitute a unique opportunity for Social Service on the part of those of us who have had the privilege of a school and college education. The writer has been in many villages of East Bengal during the past nine years and has scarcely found one which is never visited by a graduate or undergraduate sometime during every year. Most educated gentlemen go to their village homes every year in their thousands. All this constitutes a positively priceless

possibility for Social Service and those who are in a position to serve society under such circumstances are blameworthy indeed if they fail to grasp the opportunity.

METHODS OF SERVICE.

Turning now to the more practical aspect of our subject let us consider a few methods for giving tangible shape to these immense possibilities for Social Service. The suggestions which follow are largely the result of experience which the writer has been fortunate enough to gather in association with students of the Dacca colleges during the past few years.

The first step in Social Service must of necessity be the acquisition of knowledge, exact information about the conditions amidst which our fellow men and women are living and working. In Bolshevism, with its sanguinary horrors, we have proof enough of an ill-directed movement for social betterment and even apart from such a danger, we cannot afford to waste our time and energies on agitation for the removal of merely fancied wrongs. Of course the ideal is that boys and girls should be taught the essentials of citizenship and social welfare whilst they are still at school. Much is done along such lines in Western lands where practical hygiene, elementary sanitation, care of infants, sick nursing etc. form subjects of the regular school curriculum. But where the majority of the children do not attend school and where the standard of elementary education is very low indeed the imparting of such knowledge must be left to the few who are educated enough to acquire the knowledge and able to pass it on to the people of their homes and villages. Although a little might be done in the way of introducing the subjects in question into high school and college courses, probably the curricula are already too crowded to permit of anything but the slightest attempt being made. Much however may be done outside of college among students and professional men. One most fruitful method is the establishment of study circles in which a number, say from six to twelve people, meet under a leader whom they themselves select to consider social problems. As a rule a programme embodying such subjects as Public Health, Epidemics in villages, Water supply, Village planning and House construction, Village education, Modern methods of Agriculture, the Cooperative movement, Temperance, Purity, Public, recreations, etc., is drawn up. At each meeting a paper is read on the subject chosen for the evening and a general discussion follows. Where possible tours of inspection are arranged in connexion with the subjects discussed; for example to a neighbouring village to consider the defects of planning, house construction or sanitation, to a water-works to see the methods employed for cleansing water, &c. In the

writer's experience many authorities concerned have always proved most obliging and helpful especially those connected with the Municipality and the presidents of local village unions. These study circles serve to supply accurate knowledge of social conditions and also to stimulate enthusiasm both among those who actually attend and others with whom they meet. The circles however are not ends in themselves. Obviously the mere acquisition of knowledge will only produce talkers. The object of the study is action. Here there is ample scope for every member of the study circle. All will of course use their personal influence to further the interests of society by keeping the laws of public health and hygiene in their own households. They will see to it that the members of their families do not obstruct the public drains by flinging their rufuse into them, that the water which is so vital to the general welfare is not wasted and that their own homes are models of chastity and temperance. Then too the person who is genuinely interested in Social Service will always support the authority of the government and municipal officers whose duty it is to look after the public health and safety. This will sometimes involve unpopularity and ostracism as it did when a getleman, in the most kindly manner, advised a woman who was bathing amidst a crowd of others in the River Buriganga with her body literally covered with smallpox eruption, to go home at once to bed; and again when the same enthusiast supported the authority of a municipal sanitary inspector against a whole concourse of people when he was demanding the destruction of some putrid fish which was being sold in the market for food. In villages much may be done to promote health. In one case known to the writer, an epidemic of cholera which had visited a certain village annually for many years was checked simply by a Social Service student investigating and tracing the infection to a certain tank which was polluted and from which the people drew their drinking water. Other students have, by their persistent advocacy of the benefits of vaccination, broken down deeply rooted prejudice and rid their villages of the curse of small pox. In many cases, during college vacations, young men have been able so to improve the sanitation of their homes as to reduce the virulence of malaria and in one or two cases where all the drinking water is taken from wells the people have at the time of cholera epidemic been persuaded to use permanganate of potash as a disinfectant in the water. Then too these youths who in connexion with their Social Service study circles have learnt the elements of sick nursing and first aid to the injured have been able to organise nursing bands in the villages which have done invaluable service in times of sickness or accident and they have also

imparted the knowledge gained to their female relatives thus bringing relief and help to innumerable sufferers.

Nor is the practical aspect of social service cofined to matters of public health. Much may be done to foster Education. Only a little initiative and enthusiasm is needed to start an elementary school in a Bengal village. The immense advantages which accrue from education may be represented to the leading villagers. Then a committee may be formed, sufficient funds raised for the erection of a katcha building, or, as often happens, the use of a house may be obtained from a prosperous *grihasta*. If the people manifest the slightest eagerness and contribute a very small sum towards the teacher's salary, Government and the District Board can usually be called upon for assistance. After that succees breeds success and the smallest 'Pathsala' may develop into a middle or even high school. Such work has actually been done by students of study circles in the Dacca district. Further in the west a great deal is done to supplement ordinary day education by the establishment of night schools. In such schools, boys and men who have to work as bread winners during the day are taught. This kind of education is easily possible in Bengal both in town and rural areas. Its possibility and value have been proved in Dacca. In two instances at least students of Dacca Colleges have conducted night schools for poor children in common-rooms of their hostels. Each evening from about six to nine the children assembled, students volunteering to take turns with the teaching. In a very few days the numbers had exceeded the available accommodation and the poor boys, most of whom had never been able to learn so much as the alphabet, made astonishing progress in reading, writing, and arithmetic. Still in the realm of education much can be done in the direction of establishing Public Libraries. Several students have started them in villages and they are keenly appreciated. A leading inhabitant is usually persuaded to give the use of a small room where books which are collected both as gifts and by public subscription, are stored, and lent out to readers.

The bringing of economic assistance to uneducated country people by means of popularising the use of co-operative credit banks and the spreading of more up to date methods of industry will appeal to all as a useful method of Social Service. In visting a village at a great distance from the nearest railway the writer was once told that the prosperity of the district was due to the fact that a student from a Dacca Social Service study circle had brought to their notice a special kind of paddy seed which had been propagated by the Government Farm and which yielded an unprecedented harvest. The student had heard of this seed during a discussion and this was confirmed by

a subsequent visit to the Dacca farm where its merits had been very kindly shown. Instances might easily be multiplied but perhaps sufficient has been said to indicate the immense possibilities. If no place has been given to Social Service in connexion with such great cosmic disasters as last year's cyclone or floods, famines or earthquakes it is because to the person who has acquired the true spirit of Service they will present most obvious and compelling calls. If time and energy are expended in studying the every-day hardships and disabilities under which our fellow countrymen live there will be not the slightest need to agitate for help in times of exceptional catastrophe; helpers will flock to the task in their thousands.

Social Service is extremely important. East Bengal abounds with possibilities for its practice and above all it is precisely the readers of this article who are in every way singularly fitted to embark upon it. The call serve lies in the gigantic opportunity and the God-given ability to respond. A new day has dawned for India, a day bright with the promise of untold blessing. The realisation of that promise lies not with rulers or governments but in the response of educated men to the call of Social Service.

HAROLD BRIDGES.

THE FUSION OF THE EAST AND THE WEST IN INDIA.

[English translation of an article by the late Pundit Sivanath Sastri, By Prof. Samaddar, B. A. of the Patna University.]

Those who would ponder deeply would be able to feel, that in this age, those whom we have accepted as our leaders in the regeneration of Bengal, have combined in their thoughts and aspirations, the East and West. We shall prove it gradually.

Who is our ideal among the learned Bengalee Pundits? Who is that learned man, to whom the Bengalees give a prominent place? Let us think over it. Even now there are many well-known Pundits in Navadwipa; the famous Chandra Kanta Tarkalankar of Sherpur is still shining in the Metropolis of India; how is it that the educated Bengalis are not hailing them as the future leaders of Bengal? How is it that even those educated ones who are seeking after the Renaissance of Hinduism have not appointed them their leaders? Is it not because these revered Pundits have no new message, have no new ideas for future India? They are fully engrosed in the old-world ideas; they have nothing to add to the new. So we see that even those who want the old, do not want the too old. Sashadhar Tarkachuramani was engaged as the leader of the New Hindus" for the simple reason that he had commenced to put a scientific

interpretation of the Hindu doctrines. That is to say, he tried to pour a bit of western wine into eastern bottles. Those in whose thoughts there is no scent of European culture cannot become the leaders of this great regeneration.

Think of the way in which the newly educated Bengalis revere Iswar Chandra Vidyasagar. Would it be too much to say that the great Vidyasagar is enthroned in the inmost sanctuary of our hearts? I do not think there is exaggeration in it. May I enquire why he is occupying the highest position? Is it because he has no equal so far as erudition goes in sacred shastras and Sanskrit literature? Certainly not. We all know that in the Sanskrit College where he was educated there were Taranath Tarkabachaspati, Jaynarain Tarkapanchanan, Bharat Chandra, Siromani, Premchand Tarkabagish and others who were fit to be his teachers. Either in Sanskrit learning or in the knowledge of Sanskrit shastras, far from being equal, Vidyasagar could not even approach them. Why is Vidyasagar then our guide among the Pundits? It is because he based his Asiatic learning and aspirations on European culture and ideals. This is a single exception of a Pundit who although belonging to the east, so far as knowledge and lore go, in his work and aspirations assumed Europeanised models. It is for this reason that he is adored so much by the educated people and his leadership is sought for the future regeneration of India.

Consider our national literature, whom do we see engaged in the work of a leader? In prose, Bankim, in poetry Rabindranath. How could Bankim rise so high in prose? Is it not because he combined in him eastern sentiments with western thoughts? Those who have carefully read his elucidation of religious doctrines, must have felt that his teachings are nothing but western thoughts in an Indian garb; in his delineation of the character of Krishna we see only Mill's utilitarianism. In thoughts and aspirations he has fused the two—therein lies his chief attraction.

Those who have read the works of Rabindranath, must have noticed that in his poems, western ideas are moulded in eastern ones. His chief attraction, also, is the fusion of the two-east and west.

At one time, the late Keshab Chandra Sen was the leader of the educated community in religious matters. The reason was his assertion that he would graft Europeanised religious ideas on Indian ones and eastern religious ideals on western ones. Here also is the amalgamation of the east and the west. Now, perhaps, the educated people have turned away from Keshabchandra Sen, because of their too much leaning towards eastern religious tendencies.

From the above examples, I want to prove that whoever he may be whether an orator, or a writer, or a religious

reformer, he must assimilate eastern thoughts and aspirations or he would fail to be the leader of the educated community. In the future upbringing of India, we, however, do not find the two parties working at all. These two parties are first—the party of those who assert that whatever there was or is of the old is good and that there is nothing good to see or to accept in anything other than the old; and secondly, the party of those who affirm that everything relating to the west is good; nothing could be omitted from this, nor is there anything to accept from the east. That is to say, the modern educated Bengali hates, on the one hand the Brahmin Pundits with their tufts of hair on their head and on the other hand, the hat and coat-wearing England-returned Bengali Sahibs. To them, to be a missionary of the Hindu religion one must be like Vivekananda, one who wants western aspirations and ideals, firmly based on ancient India and Vedanta.

This reliance is a very big thing. He who always speaks of the west, acts like a westerner, asserts that absolutely nothing can be built upon the ideas of the east. Our forefathers built up a mighty civilisation with all its protruding branches and have they left nothing to build? This way of thinking and acting is the result of wayward culture. As babies in a rich man's family begin to suck at the breast of their foster-mothers and then can think of nothing except these foster-mother's breasts; so is the case here. Even before the passing away of youth these people nurtured on western thoughts and sentiments, think of them and them only. I assert there are many things of this country on which a magnificent super-structure can be built. I shall indicate afterwards.

Let us not forget the main underlying principle. Every one should distinctly understand that those who cannot fuse the east and the west in their thoughts, sentiments and actions, have no concern in the future regeneration of India and they will not be followed as the leaders of the educated people.

Now, the question is, how are the two to be fused together? Externally it appears that every day, every moment, the union is taking place everywhere. You or I may not want it, but all the same it is going on, Through hundred loopholes, western sentiments and ideals are entering into our daily life. We cannot write without a table; at breakfast we require tea cups, saucers and spoons; we want western chops and cutlets: western theatres, western cuts in tailoring: western furniture in furnishing our drawing room. Even in building houses, our plans are being shaped according to western ideals.

This is so far as external circumstances go. Even in our heart of hearts bent on national regeneration, we are feeling these shocks of western thoughts. Our politics are western; our laws and

courts are western ; our conveyances are western ; peons and post offices are western ; mark how western ideals and sentiments are pervading the minds even of illiterate villagers. As the result of all this, the walls of ancient Hindu life are crumbling down. In food and customs, the old caste is breaking down ; the joint family system is fast disappearing ; litigation, falsehood, cheating, forgery are increasing ; kulinism is disappearing ; ancient ties and shackles are rapidly going to pieces. Those who are afraid of these changes and who want to regenerate the old, should remember one thing ; Unless those forces which were in existence for the preservation and control of society are re-established, the old ideals cannot be regenerated. Every one knows that the caste system and the influence of the Brahmins were the two walls which portected the ancient society. The Brahmins by wielding the caste system as a weapon controlled the community. Ancient society was preserved and controlled or governed thereby. May we ask those who want to re-establish thoroughly the old system, whether they will be able to re-establish the old Brahminical supremacy ? If they answer, why not, we would ask on what foundation will it be placed ? In ancient times, kingly power was a help and was friendly to Brahmanical influence. The kings by supporting the Brahmanical power kept it alive. Will the advocates of the old system, be able to make the kingly power support the Brahmanical one ? Then again, another basis of Brahmanical power was learning and devotion to religion. They had the monopoly of both ; no one else had any right to them. These were the main sources of their power. Every one will admit it. Now I ask will the advocates of the the ancient system be able to make learning and devotion again monopolies of the Brahmins ? That does not appear to be feasible. So, however, devoted you may be to the ancient system, it has gone beyond your control, its foundation has given way. Then, what is our duty ? Shall we allow ourselves to be drifted away and ignore every thing of the past ? Why so ? We have a duty to perform. We should believe in the existence of God. It would not be proper to look on life from the point of view of an atheist. You and I are in this world ; we are subject to pleasure and pain and hope and disappointment ; do you think that in this theatre of life, there is nothing else, excepting you and myself ? There is ONE, who is inside and outside of both you and me, who is in every place The English poet Shakespeare has truly observed.

"There is a divinity that shapes our ends
Rough-hew them how we will."

That One is with you as well as with me. In the rise and fall of nations, he is also with them. Nations (blinded by passion) engage themselves in war,

peace, commercial pursuits and the establishment of monarchies, but that Divine one is shaping all these actions towards the fulfilment of a mighty purpose. When the English first came here for commercial purposes they did not know that out of the selfish motives of commercial gain, by a mysterious providence, a new era will commence in this country. The fusion of the East and the West is the one characteristic sign of this mysterious dispensation. We belong to a very ancient race ; our learning is also very ancient ; our speciality lies in our ancient sphere ; indeed, here we are unapproachable. But, that cannot make one say that in these days of struggle for supremacy that will again restore our greatness. We had a speciality which had a defect. Some thing has to be added to it which will again help us to stand properly now. I shall indicate what this is.

I do not like to enter into the intricacies of Philosophy or Religion. What I shall indicate I will do broadly and briefly. The main distinguishing characteristic of Indian religious thought is *Indifference to Worldly desires.* Brahma is truth, worldly desires are visionary ; so turn back from worldly thoughts and concentrate your attention on Brahma. This is our highest teaching, our highest aspiration is to see God in ou soul. The fruit of this is indifference to worldly pleasure. But from this indifference to worldly pleasure has sprung up indifference to society. To see God in one's soul, one must be devoted ; by suppressing passions one is to concentrate the soul's energies, and for this, devotion has become so prominent in Indian religious thought. As indifference to society is a distinctive feature of Eastern ideas, so is attraction towards society, the sign of western ideas. The religion of Jesus is a social religion, its principal aim is to establish the kingdom of God (amongst people). So the main aspiration of western religion is to uplift the people to purify them. The place for austerities of the ancient Hindus was solitary caves ; that of Jesus amongst the sufferers. What a difference !

We hear of two things in the two kingdoms. One says Brahma alone is permanent, devotion is the *summum bonum* of life ; the other says, service to man is service to God. In the former, indifference to worldly pleasures is predominant, in the latter social service has become prominent. Is not the amalgamation of the two necessary ? Too much devotion to worldly pleasures is the chief disease in Europe, repugnance to social service is the chief desideratum of our ancient religious feelings. By the fusion of the two, the wants of both will be removed and a new, full-blooded life will be built up. Europe should be addressed thus "what are you doing ? Do not be so much addicted to worldly pleasures ; pleasure is fleeting ; only the glorification of self is truly desirable and true ; the price

of life is more valuable than the pleasures of life; purification of self is more desireable than the health of your body." At the same time, to old India we may address thus "what are you doing? The *summum bonum* of religion is not indifference to pleasures of life and society; serving man is serving god. Hundreds of people are dying of famine, thousands and thousands of children are becoming orphans; people are suffering from sins; gird up your loins to help them and to save them; remember that the adoption of all possible means to improve society should be one of the chief austerities of religion."

All must have marked that the sin of the west is too much addiction to pleasure. There was a time when in the West also, religious ideas and feelings were predominant. As the Brahmins in India ruled the Rajas, so did the Christian missionaries in Europe. But from the day of Luther's protest, the power of the priests and of the priestly world began to decline and the greed for worldly pleasures began to increase. The fire of insatiate pleasures is burning day and night. The more the things of pleasure are being accumulated, the more is the fire burning, in unsatisfied hearts. The ancient Rishis of India observed :—

"Not by the enjoyment of our desires, doth desire Satiate, but it burns all the more violently like fire into which clarified butter has been thrown."

Let those who want the proof of this look at the west. What a feverish pursuit of pleasures. What insatiable love for worldly advancement! No knowledge or Science is appreciated which does not contribute directly or indirectly to the cessation of pain, or increase of pleasure. As soon as any scientific truth is discovered, the question is asked how much will it conduce to the pleasures of man? People are afraid more of disease, than of sin, so much so that it is not considered derogatory to find out the ways of accumulating wealth.

The ancient Indian sages fully understood that it is better to practise self restraint than to gratify pleasures. Learn to rein your pleasures in. Every person cannot satisfy all his desires. There should be a limit to one's aspirations, otherwise you burn yourself in your own fire. Why dont you then practise self-restraint? Our ancient sages taught various methods of this self-restraint.

There will be a great reaction if the western world does not regulate this inordinate addiction to pleasure. Unnatural rivalry will spoil peace of mind and health; society will become weak and sickly, on account of various social evils; at last war and bloodshed will make them lose their strength and their position will be lowered.

The only way to save the west from this disease is to graft on it ancient India's devotion to religion. In the last

century German scholars did it to a certain extent. Now, some Indian missionaries are also doing the same. So we see that a great necessity has arisen for the fusion of the East and West.

India also requires such a fusion. I have already observed that is has become essential to blend India's religious devotion with western ideas of service to humanity. But how is this possible. So I urge again, we will have to become god-fearing. Do not think, that whatever good is in one country, is meant for that country only. Jute grows in our country. Does it imply that only ourselves are to wear clothes made of jute ? Tea grows in China Does it imply that only the Chinese and none else will enjoy it ? The present commercial connexions belie it Let every one examine his household utensils and he will find how the products of every country have helped to satisfy his needs. Is there any harm in it ? On the contrary it has done an immense amount of good. We are sharing god's gifts. In the domain of knowledge also, we find this distribution. Edison invents something in America, you and I in India enjoy the blessings of this invention. What is the harm ? Nothing. We are enjoying God's gifts by distributing the blessings. Can't you think of Jesus and Mahomet along with your own Manu and Yagnavalkya ? Why can't you think of truth, forgetting time and country ? If you adore the sages of a foreign country, does it imply any insult to the sages of your own ? It would be childish to think so.

Cant you all feel that a period of evolution has dawned all over the world ? We can feel that He who has expounded religious dogmas in this country through the sages, has done the same thing through the sages of other countries also. Under one and the same law, there have been the rise and fall of all religions. The religious books of other countries are our religious books also ; the sages of other countries are our preceptors as well. Does this idea in any way lessen our patriotism or nationalism ? By all means preserve what you have got in your own country ; adore it by all means, but remember that God's kingdom is a vast one and that is meant for one and all.

We are advancing towards that goal when the nations of all countries will feel that all races belong to one family ; that the fatherland of all is this world ; that their parents, preceptors and lords are the same, that their elders and guides are the sages of all countries ; that their preceptors and teachers are the learned men of all countries ; that their goal ss the abode of Brahma and that their chief pleasure is mutual help and devotion to all. In this great fusion, no race wiil lose its individuality ; on the contrary, each one will gain in the general welfare according

to its ows nature and knowledge That this day is far, very far, there is no doubt about it ; but that the fusion of the east and the west which we are marking in India is pointing towards that Goal. The Almighty has chosen India as the place of austerities, as the place of the blending of divergent ideals. We behold the dawn.

THE DAWN OF HUMANITY IN INDIA.

Anthropology divorced from geography gets but short shrift in the present day and as the question of the first appearance of man, the earthly and climatic conditions properly evolved to usher in his existence happened not in the present geological epoch, earth-history, especially of the tertiary and quaternary times, becomes of vital importance to us. So the following from Dr. Vredenburg's excellent *Summary of the Geology of India* (Introductory chapter) cannot but be given the first place when considering the question of the evolution of Hominidae in our part of the world. "From a geological point of view India is divided into three regions :—(1) the peninsular area in which there are no mountains in the truer sense newer than palæozoic, (2) the region of relatively recent mountains upheaved in tertiary times, constituting the ranges of the Himalaya, Baluchistan and Burmah, and (3) the great Indo-Gangetic alluvial plain which with the exception of a fringe of cretaceous and tertiary strata in some points along the sea-coast peninsular India, ***has been a continental area ever since the earliest geological times, and is one of the oldest land areas in the globe.*** The rocks constituting the extra-peninsular area remained mostly occupied by the ocean until late in tertiary times, when the upheaval of the Himalaya was completed. The great Indo-Gangetic plain which now connects the essentially different peninsular and extra-peninsular areas and consists of alluvial soil whose rapid accumulation (mainly in Pliocene and Pleistocene times) has finally obliterated all remnants of an arm of the sea which might still have subsisted between the two areas." In these days of polygenism it is not possible to deny perhaps that humanity may have evolved at different times in different places under almost identical circumstances and that the old controversy about the cradle of humanity has lost much of its savour ; but still Dr. Wright's theological zeal gives us late in 1913 a laudable book on *The Origin and the Antiquity of Man* which is pledged to prove the orthodox canon that man appeared suddenly probably by the intervention of God in Central Asia not more than fifteen thousand years ago. Apart from the fact that in the face of the Piltdown skull in which Boule is chary of admitting any generic

difference from a full-blooded Homo, tertiary man is well-nigh proven, who would think of questioning that man could combat the rigours of the glacial epoch and that the dawn of the human race belongs to a past more remote than the great Ice-Age (Sollas, *Ancient Hunters*, 1911, p. 60). How and where it possibly happened is surmised as follows by Lord Avebury with his characteristic lucidity. "Without expressing any opinion as to the mental condition of our ancestors in the Miocene period, it seems to me evident that the argument derived from the absence of human remains, whatever may be its value, is as applicable to pliocene as to miocene times. Judging from the analogy of other species I am disposed to think that in the miocene period man was probably represented by anthropoid apes, more nearly resembling us than do any of the existing quadrumana. We need not, however expect necessarily to find the proofs in Europe; our nearest relations in the animal kingdom are confined to hot almost to tropical climates; and though we know that during parts of the miocene period the climate of Europe was warmer than at present, so that monkeys lived north of their present limits, still it is in the warmer regions of the earth that we may reasonably find the earliest traces of the human race." It is exactly this which is impressed on us when we read the recent article of Dr. Pilgrim on "*New Siwalik Primates and their bearing on the question of the Evolution of Man and the Anthropoidae*" in the *Records of the Geological Survey* (1915). He makes out a strong case for a Sarmation (Miocene) ancestor of man from the Siwalike thus: "The remarkable characters possessed by the mandible of Sivapithecus ally it in many respects rather to man than to any of the Simiidae" After pointing out that a short symphysis is a primitive characteristic as seen in the Propliopithecus of Fayum and that its extreme shortening is a special development in man he points out that this characteristic combined with other peculiarities leads him to place it on the line of man's ascent. The outward curvature of the premolar region, in his opinion, involves the co-existence of the breadth of jaw and a degree of separation of the mandibular rami which is essentially peculiar to man. The inner cusp of p, m. 3 as in the cebidae, the large canines with primitive features, the hinder heel of the lower canine as in the gibbon, etc., forces him to the conclusion that Eoanthropus represents a marginal species which did not lead to man being one of nature's experiments at producing the higher human type and that Sevapithecus diverging long before the appearance of that genus represents a marginal species of the human ancestor.

Dr. Hayden in his annual address to the Asiatic Society of Bengal last year has appositely referred to the article of

Mr. W. K. Gregory and pointed out that quite a different view is possible and that the existence of miocene man has yet to be proved though the human stem branched off from the simian during the tertiary epoch, not later probably than the middle of the miocene period, or from thirteen to sixteen million years ago. But in any case Dr Pilgrim's paper has the greatest importance for us. "There can be little doubt that man evolved somewhere in southern Asia, possibly during Pliocene or Miocene times" — this is the verdict of Dr. Haddon. (The *Wandering of Peoples*, p. 15) and we know it was with this conviction that Dubois launched his expedition to Java and discovered the famous Pithecanthropus. It is of supreme interest for us as Java was at that time connected with the mainland and Osborn in his *Men of the Old Stone Age* (1918) surmises that the Trinil race, as he calls it, was also most probably living in India at that time.

The case of the Pithecanthropus is too well-known to need much elaboration how it belongs to an intermediate position between ape and man so far as the capacity of the skull is concerned but its thigh bone is distinctly human as it definitely establishes its erectness of stature. This is physiognomically the most important factor as it is practically the starting point of human culture thus fully brought out by Dr. Munro in his presidential address to the Anthropological section of the British Association in 1893 :—"With the attainment of the erect position, and the consequent specialisation of his limbs into hands and feet, man entered into a new phase of existence. With the advantage of manipulative organ and a progressive brain he became *Homo sapiens*, and gradually developed a capacity to understand and utilise the forces of nature. As a handicraftsman he fashioned tools and weapons, with the skilful use of which he got the mastery over all the other animals. With a knowledge of the use of fire, the art of cooking his food, and the power of fabricating materials for clothing his body, he accommodated himself to the vicissitudes of climate, and so greatly extended his habitable area on the globe. As ages rolled on he accumulated more and more of the secrets of nature, and every such addition widened the basis for further discoveries. Thus commenced the grandest revolution the organic world has ever undergone—a revolution which culminated in the transformation of a brute into a civilised man."

This is not all. We shall see later that from the tertiary of Burma and the older ossiferous gravel beds of Narbada and Godavari have been discovered in the fifties of the last century genuine human artifacts which on account of their antiquity have been widely noticed. But on examining them afresh in the light of the latest

researches, in the Indian Museum I was struck by the fact that though on palæontological grounds they cannot be later than the pre-Chellean phase in Europe their technique was of the sort of much greater finish of later palæolithic phases in Europe. The Hackett Nurbada find inevitably recalls a Levallois artifact and the Godavari agate chip is more the prototype of a Chellean II 'knife' than anything that I know. Unfortunately I could not find the Burma specimens in the Indian Museum but from the plate in the Records of the Geological Survey it appeared to me that some of them specially the rectangular and irregular forms belonged to the Chellean II type and moreover seemed to be more akin to Egyptian forms of palæoliths given in figs. 16, 18, 23, 26, of Morgan's *Recherches sur les Origines de l' Egypte* (*L'Age de la Pierre et les Metaux*, pp. 58, 60, 64, 66). Thus we find Haddon is probably being upheld by archæological evidence when he states the likelihood of inter-glacial man in Europe being represented by pre-glacial man in Asia (*The Wanderings of Peoples*, p. 15).

Whatever may be said in respect of other centres as starting points of humanity, one has ulimately to give up the cases of South America or South England or Southern France or even Egypt or the blessed land between the two rivers and formulate with Dr. Mathew a South Central Asiatic home for the earliest man. In other words we can state with Sir H. H. Johnston as follows :—"From such meagre facts as have already been collected by scientific investigation we are led to form the opinion that the human genus was evolved from an ape-like ancestor somewhere in Asia, most probably in India, but quite possibly in Syria on the one hand, or in the Malay Peninsula or Java on the other. So far, the nearest approach to a missing link between the family of the anthropoid apes and the family of perfected man has been found in the island of Java (*Pithecanthropus erectus*), but there are slight indications pointing to *Burma or the southern part of the Indian Continent having been the birthplace of humanity*" (*The Opening up of Africa*, p. 10).

AT DUSK.

WHERE the paven streets go down
To the edges of the town,
Where the long white roads begin,
Leading far from stress and din,
Look ! he beckons us away,
Floating in the shadows gray.

Where the paven streets arise
To the starry evening skies,
Where the long white roads begin,
Leading far from toil and din,
Winding through calm hills of night
To the round moon, distant, white,
See ! he beckons us away,
Up there in the shadows gray.

Far away from din, from noise,
Banging guns and shouting boys,
Clattering cart and jolting car,
Out to where still places are—
Country places, lonely, calm,
Hazy in the evening's balm—
Look ! he beckons us away,
Beckons 'mid the shadows gray.

And a song blows through my ears,
Throbbing mirth, yet throbbing tears,
And a mist floats in my brain
As I see him, here, again,
Beckoning—where the streets go down
To the edges of the town,
Beckoning--away ! away
To the wild at close of day !

NITA H. PADWICK.

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

১০ম খণ্ড } ঢাকা—বৈশাখ, ১৩২৭। { ১ম সংখ্যা।

জাগৃহি

জেগে উঠ মোর মন,
এ নব আলোক-উৎসব মাঝে
জাগো অন্তরধন।
একি আনন্দ ভুবনে-ভবনে,
কুঞ্জবীথিকায়—আকুল পবনে,
সাগরের বুকে—ফুলের নয়নে,
একি মধু-জাগরণ!
নবরূপে আজ সবার মাঝারে
প্রকাশিলে নারায়ণ!

এ নব-আলোকে আজি,
অন্তরবাসী বন্ধু আমার
উঠ গো নয়ন মাজি।
মুছে ফেল লোর—ঘুচুক্ বেদন,
টুটুক্ শঙ্কা—শোক-আবরণ,
করমের শাঁখ ওই শোন মন
উঠিছে সঘনে বাজি;
কর্ম্মশালার এ মহাযজ্ঞে
জেগে উঠ মন আজি।

ওরে মোর বীণাখান!
নবীন-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে
সঙ্গীত কর দান।
"সবই সুন্দর—সবই মধুময়,
মহাজননীর সকল তনয়
একই রাখী-ডোরে বাঁধা যেন রয়,"
ধরার এ মহাগান—
ঝঙ্কৃত হোক্ সব তারে তোর
ওরে মোর বীণাখান!

ওগো সুন্দরতম!
লহ হৃদয়ের প্রীতি-বন্দন—
পূজা-আয়োজন মম।
সত্যরথের হে মহা-সারথি,
মানবসঙ্ঘ জানায় প্রণতি,
যাচিছে করুণা—চাহিছে শকতি
তৃষিত চাতকসম;—
সত্যের পথে জাগাও সবারে
ওগো সুন্দরতম!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

কপালকুণ্ডলার "নায়ক"।

এই পত্রিকার পূর্ব্ব এক সংখ্যায় 'কপালকুণ্ডলা'-শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা কপালকুণ্ডলা চরিত্রের কমনীয়তা ও বিশেষত্ব কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসের তথা কথিত 'নায়কে'র চরিত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'কপালকুণ্ডলা তত্ত্বে' লিখিয়াছেন, "কপালকুণ্ডলার চিত্রপট (Canvas) অল্প পরিসর, বৃত্তান্ত ক্ষুদ্র, বিশেষতঃ নায়িকার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্ত বৃত্তান্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র।" এ কথা সত্য হইলেও, কপালকুণ্ডলা পুস্তকখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবার পর ইহাই কি সকলের মনে হয় না যে, এই উপন্যাসখানিতে নায়িকাই বার আনা, আর অন্যান্য পাত্র চারি আনা মাত্র বা তদপেক্ষাও কম? অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার চিত্রপটে একমাত্র কপালকুণ্ডলার চিত্রই প্রধান স্থান বা অগ্রভূমি (fore ground) অধিকার করিয়া আছে, আর সকল চিত্র পশ্চাত (back groundএ) থাকিয়া প্রধান চিত্রেরই সৌন্দর্য্য-বিকাশে সহায়তা করিতেছে মাত্র। নবকুমারকে অধ্যাপক ললিত বাবু "এই আখ্যায়িকার নায়ক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাব্য সমালোচকরূপে ললিত বাবুর পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতার প্রতি আমাদের আন্তরিক প্রগাঢ়তম শ্রদ্ধা সত্বেও তাঁহার এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিষয়টি অবিশেষজ্ঞ—পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ বলিয়া আমাদের বক্তব্য একটু বিস্তৃতভাবেই বলিতে চেষ্টা করিব।

"নায়ক" শব্দ অলঙ্কারশাস্ত্রে সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতায় পতি বা প্রিয়কে নায়ক বলা হয়। শব্দ-কল্পদ্রুম 'রসমঞ্জরী'র অনুসরণ করিয়া 'নায়ক' শব্দের অর্থ দিয়াছেন—"শৃঙ্গার-সাধকঃ, স চ ত্রিবিধঃ পতিরূপপতির্বৈশিকশ্চ" ইত্যাদি; উইলসন্ লিখিতেছেন, "(In erotic poetry) The man, husband or lover" ঐরূপ 'নায়িকা' শব্দের অর্থ শব্দকল্পদ্রুমে দেওয়া হইয়াছে—"শৃঙ্গাররসালম্বন-বিভাবরূপা নারী, সা চ ত্রিবিধা স্বীয়া, পরকীয়া, সামান্য বনিতা চ" ইত্যাদি। 'আলম্বনবিভাব' শব্দের অর্থ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া রসবিশেষের উদ্গম হয়। উইলসন্ 'নায়িকার' অর্থ লিখিয়াছেন, "A mistress, a wife, the famale in the amatory poetry of the Hindus." উভয় অভিধানেই 'নায়ক' ও 'নায়িকা' শব্দের অন্যান্য অর্থও প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু ঐ অর্থগুলির কোনওটিই অলঙ্কার শাস্ত্রের পারিভাষিকরূপে প্রদত্ত হয় নাই। যথা 'নায়ক' শব্দের অর্থ, নেতা (leader) * শ্রেষ্ঠ, হারমধ্যমণি; 'নায়িকা' শব্দের অর্থ দুর্গাশক্তি, কস্তুরীবিশেষ।

রসমঞ্জরী প্রভৃতি কেবল শৃঙ্গাররসে 'নায়ক' 'নায়িকা'র প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করায় উহা কাব্যে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণার্থ পাইয়া আসিয়াছে। এককালে আমাদের দেশে কাব্যবিচারটা সাধারণতঃ খুচরা ভাবেই অর্থাৎ এক একটি শ্লোক লইয়াই অধিক হইত, সমগ্র একখানি কাব্য লইয়া তেমন হইত না। ইহাতেই নায়ক শব্দের অর্থে ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়িয়াছিল। তথাপি ইহা বলা আবশ্যক যে শব্দকল্পদ্রুম বা উইলসনে না পাওয়া গেলেও একখানি সমগ্রকাব্যের প্রধান পাত্ররূপ অর্থে 'নায়ক' শব্দের প্রয়োগ যে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত নহে তাহা নয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্যের লক্ষণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ

* "নায়কো নেতরি শ্রেষ্ঠে হারমধ্যমণাবপি" বিশ্ব ও হেমচন্দ্র।

কেহ কেহ নেতৃশব্দ হইতেই 'নায়কের' কাব্যগত অর্থ টানিয়া আনিয়াছেন, যথা বিশ্বনাথ—

"আলম্বনং নায়কাদি স্তমালম্ব্যরসোদ্গমাৎ......তত্র নায়কঃ—
ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।
দক্ষোহনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা।"

এইস্থানে 'নেতা' ও 'নায়ক' পরস্পরের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উভয় শব্দ মূলে এক হইলেও রসবিচারে নায়ক শব্দেরই সর্ব্বদা ব্যবহার হয়, নেতৃ শব্দের ব্যবহার কম। তথাপি যে একবারে নাই তাহা বলা যায় না। শিশুপালবধ টীকায় মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,—

নেতাত্রিম বল্লভঃ ভগবান্ ইত্যাদি।

একবংশভবাঃ ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা। ইত্যাদি মহাকাব্যের একজন নায়ক থাকেন, তিনি দেবতা বা সদ্বংশজ ক্ষত্রিয় এবং ধীরোদাত্তগুণান্বিত। কখনও কখনও একবংশসম্ভূত কুলীন বহু ভূপতিও নায়ক হইতে পারেন। 'রঘুবংশ' বোধ হয় শেষোক্ত বহুনায়ক মহাকাব্যের উদাহরণরূপে অভিপ্রেত হইয়াছে, যদিও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন যে, ঐ পুস্তকেও বস্তুতঃ একই নায়ক। সে যাহা হউক, মহাকাব্যের যিনি "নায়ক" তাহাকে সর্ব্বদাই শৃঙ্গারসাধক* বলা যায় না। নায়ক শব্দ এস্থলে অঙ্গীরসের নেতা, সুতরাং কাব্যের প্রধান, বা আখ্যানবস্তুর কেন্দ্রীভূত পাত্র অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ইংরাজী ভাষাতেও hero (নায়ক) শব্দের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একটা উদাহরণ দিয়া এই বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' একখানি সুবিখ্যাত মহাকাব্য। পাঠকগণ অনেকেই হয়ত জানেন ইহাতে ঈশ্বরতনয়ের প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ সয়তানকর্ত্তৃক পরিচালিত কতকগুলি বিদ্রোহী পরীর (angel) স্বর্গ হইতে নরকে পতন, তথায় পুনঃ ষড়যন্ত্র, তৎপর সয়তানকর্ত্তৃক মানবজাতির আদি-মাতা ঈভের প্রলোভন ও তাহার ফলে ঈশ্বরের আদেশে নন্দন-কানন (Paradise) হইতে আদম ও ঈভের নির্ব্বাসন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যখানির নায়ক কে তৎসম্বন্ধে দুই শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ তর্ক চলিতেছে। কেহ বলিয়াছেন,— স্বয়ং ঈশ্বর ইহার নায়ক; কেহ বলিয়াছেন,—মহাকাব্যের আবার নায়ক কি? ইহাতে নায়ক মোটেই নাই; তবে যদি একজনকে নায়ক বলিতেই হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরতনয় (Messiah—ভাবী খৃষ্ট) ইহার নায়ক; কাহারও কাহারও মতে আদম নায়ক, আবার কেহ কেহ সয়তানকে নায়ক বলিয়াছেন।* প্রত্যেক পক্ষেরই যুক্তির মূলে, স্পষ্টভাবে হউক বা অস্পষ্টভাবে হউক, 'নায়ক' শব্দের এক একটা বিশিষ্ট অর্থ সংস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে। ঐ অর্থগুলি কতকটা এইরূপ—

(১) কাব্যোল্লিখিত পাত্রগণের মধ্যে যাহার কৃতিত্ব অধিক বা কবি যাহাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন তিনি নায়ক;

(২) যিনি গুণে প্রধান বলিয়া স্বীকার্য্য তিনি নায়ক;

(৩) যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কবি সকল কার্য্য নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি অধিকাংশ ঘটনার ফলভোগী তিনি নায়ক;

(৪) যে পাত্রের সৃষ্টিতে কবির কৃতি-কৌশল ও আন্তরিক (যদিও অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন) সহানুভূতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রদর্শিত হইয়াছে তিনি নায়ক।

প্রত্যেক মতেই কাব্যের প্রধান পাত্রই নায়ক বটে, কিন্তু সেই প্রাধান্যটা কোন প্রকারের তাহা লইয়াই যত গোল। প্রথম তিনটি মত বুঝিতে কষ্ট হয় না, চতুর্থ পক্ষের কথা এই—কাব্যে জয়-পরাজয়, নৈতিক শ্রেষ্ঠতা, এবং কতকগুলি, এমন কি অধিকাংশ, ঘটনার সহিত লিপ্ত থাকাও শিল্পের হিসাবে অবান্তর প্রসঙ্গমাত্র। সমালোচককে কবির অঙ্কিত চিত্রপটের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে, কোন আলেখ্য তাঁহার কল্পনাকে সমধিক উদ্দীপিত করিয়াছে, কোনটির সহিত তাঁহার যথার্থ অর্থাৎ রসানুগত সহানুভূতি অধিক, এবং সেই জন্য কোন পাত্রটিকে তিনি (সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে হউক বা কিয়ৎপরিমাণে অজ্ঞাতসারেই হউক *) চিত্রপটের

* অন্ততঃ শৃঙ্গার শব্দ উপলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শব্দকল্পদ্রুম বা উইলসন্ প্রদত্ত অর্থ হইতে উপলক্ষণের ভাব পাওয়া যায় না।

* সেক্ষপীয়রের মার্চ্চেণ্ট অব ভিনিস নামক নাটকের নায়ক-সম্বন্ধে মতভেদও উল্লেখযোগ্য। অল্পসংখ্যক লোকের মতে পোর্শিয়া নায়িকা বলিয়া বেসানিও এই নাটকের নায়ক, অনেকের মতে এণ্টনিও নায়ক, ইদানীং কাহারও কাহারও মতে সাইলক নায়ক। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

* সয়তানকে প্যারাডাইস্ লষ্টের নায়ক স্বীকার করিয়া অধ্যাপক র‍্যালি সাহেব লিখিয়াছেন - It was not for nothing that Milton stultified the professed moral of his poem, and emptied it of all spirtual content. He was not fully conscious, it seems, of what he was doing; but he

অগ্রভূমিতে স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপে যে পাত্র কেবল নীতিবলে নয়, কতকগুলি ঘটনার ফলভোক্তৃ-রূপেও নয়, কিন্তু কবির কৃতিকৌশলগুণে কাব্যের সরসতার কেন্দ্র হইয়া পড়ে, তাহাকেই নায়ক বলিতে হইবে।

এখন দেখা যাক্ 'নায়ক' শব্দের পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থগুলির কোন কোনটি নবকুমার সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ রসমঞ্জরীর প্রদত্ত অর্থ ধরিলে, খুচরারীতিতে "কপালকুণ্ডলা"র নানা-স্থান হইতে কতকগুলি বর্ণনা ধরিয়া দেখান যায় যে, কপালকুণ্ডলা নবকুমারগত রতিনামক স্থায়ী ভাবের আলম্বন-বিভাব বটে; সুতরাং কপালকুণ্ডলা নায়িকা ও নবকুমার নায়ক; পারিভাষিক শব্দের আরও ছড়াছড়ি করিলে বলা যায়, নবকুমার "পতি", "ধীরপ্রশান্ত" ও "অনুকূল" জাতীয় নায়ক। অধ্যাপক ললিতবাবু এরূপ খুচরারীতিতে নবকুমারকে নায়ক বলেন নাই। এরূপ বলা যে অসঙ্গত তাহা সংস্কৃতজ্ঞ অল্প লোকেই তাঁহার অপেক্ষা অধিক বুঝে। দ্বিতীয় অর্থে নবকুমারকে নায়ক বলা যায় না। 'কপালকুণ্ডলা' কাব্যখানি সমগ্রভাবে ধরিলে দেখা যায়, যে কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের প্রেম এই কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বস্তু নহে। সুতরাং নবকুমার অঙ্গী রসের নেতা বা আখ্যানবস্তুর কেন্দ্র নহেন।

প্যারাডাইস্ লষ্টের নায়কবিষয়ক তর্ক হইতে আমরা নায়ক শব্দের যে বিশিষ্ট অর্থগুলি পাইয়াছি তাহাদের প্রথমটি এ কাব্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। দ্বিতীয় অর্থে নবকুমারকে নায়ক বলা চলে। নবকুমারের এতগুণ যে যাঁহারা আদর্শচরিত্র সৃষ্টি করাই কাব্য ও উপন্যাস-রচনার একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া মানেন, তাঁহারাও একাধারে এতদধিকগুণ আশা করিতে পারেন না।* কিন্তু কেবল গুণভূয়িষ্ঠতা হেতু কোনও পাত্রকে নায়ক-রূপে স্বীকার করিতে ইদানীং অল্পলোকেই সম্মত হইবেন। তৃতীয় অর্থ নবকুমার সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা যায় না, কেননা যদিও নবকুমার গ্রন্থগত সবগুলি ঘটনারই ফলভোগী, তথাপি তাঁহাকে উদ্দিষ্ট বা কেন্দ্র করিয়া কবি সকল ঘটনার নির্দেশ বা ব্যবস্থাপনা করিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। চতুর্থ মতানুসারেও নবকুমার নায়ক নহেন। এই পরিচ্ছেদের সূচনায় কপালকুণ্ডলার সহিত অন্য পাত্রের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই উহা উপপন্ন হইবে। কপালকুণ্ডলা যদি Romeo and Julietএর মত কাব্য হইত, তবে কপালকুণ্ডলাকে নায়িকা ও নবকুমারকে নায়ক বলা যাইত। "রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েটে" রোমিও ও জুলিয়েট উভয়েরই স্থান তুল্য, উভয়ের প্রতিই কবি ও পাঠকের রসানুগত সহানুভূতি প্রায় সমান; রোমিওর প্রতি কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও জুলিয়েটের স্থানও অগ্রভূমিতে এবং রোমিওর পার্শ্বে সমসূত্রে। নবকুমার ও কপাল-কুণ্ডলা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় কি? কপালকুণ্ডলার চিত্রপটে নবকুমারকে—এবং কেবল নবকুমারকে বলি কেন?—মতিবিবি, কাপালিক, শ্যামা, অধিকারী ইহাদের প্রত্যেককে—পশ্চাদ্ভূমিতে যথাযোগ্য স্থানে

builded better than he knew. ("Milton" ১০৩ পৃষ্ঠা) সাইলককে যাহারা মার্চ্চ্যাণ্ট অব ভিনিসের নায়ক বলেন, তাঁহারাও বোধ হয় এইরূপ কথাই বলিবেন। তবে সেক্সপীয়রের "professed moral" কিছু নাই। আর তিনি প্রথমে Merchant of Veniceএর অন্তর নাম The Jew of Veniceই দিয়াছিলেন।

* উপন্যাসের নায়ক নায়িকাকে নানা দুর্লভ গুণে ভূষিত করিবার প্রথার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একজন পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিক (Anthony Trollope) লিখিয়াছেন:—Perhaps no terms have been so injurious to the profession of the novelist as those two words hero and heroine. In spite of the latitude which is allowed to the writer in putting his own interpretation upon these words, something heroic is still expected; whereas if he attempt to paint from Nature, how little that is heroic should he describe! "Claverings" xxviii.

বঙ্কিমচন্দ্র অনাবশ্যকরূপে নবকুমারকে নানাগুণে গরীয়ান্ করেন নাই। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় তাঁহার সবগুলি গুণই কপালকুণ্ডলা কাব্যের পক্ষে আবশ্যক।

স্থাপন করিয়া সুনিপুণ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রভূমিবর্ত্তিনী কপালকুণ্ডলার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। * নবকুমারের প্রত্যেকটি গুণ বিশেষতঃ তাঁহার সুগভীর প্রেম, এবং তাঁহার ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও আত্মত্যাগ—সকলই কপালকুণ্ডলার বৈশিষ্ট্যবিকাশের জন্য একান্তরূপে প্রয়োজনীয়। তাঁহার প্রতি পাঠকের যে সহানুভূতি জন্মে, তাহা গভীর হইলেও গৌণ। পাঠকের মুখ্য সহানুভূতি কপালকুণ্ডলাতেই নিবদ্ধ। সেইজন্য আমরা কপালকুণ্ডলাকে নায়িকা বলি, কিন্তু নবকুমারকে নায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কাহারও কাহারও কাণে হয়ত নায়কহীন উপন্যাস * বা নায়কহীন নায়িকা শুনিতে কিছু অদ্ভুত লাগিবে। কিন্তু "নায়ক"-হীনতাই কপালকুণ্ডলা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের গৌরব।

গ্রন্থারম্ভেই নবকুমারের সহিত পাঠকের পরিচয় হয়, এবং প্রথম হইতেই তাঁহার প্রতি পাঠকের একটা প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধন স্থাপিত হয়। যদিও কপালকুণ্ডলার বর্ণনীয় ঘটনাগুলির কল্পিত কাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ, * তথাপি গ্রন্থের মধ্যে কোথাও নবকুমারকে নিতান্ত সেকেলে লোক বলিয়া মনে হয় না বরং মনে হয়, তিনি এই সে দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও একটা উচ্চ পরীক্ষা দিয়া হয়ত ফলের প্রতীক্ষায় বাড়ীতে বসিয়াছিলেন এবং একটু অবসর বুঝিয়া গঙ্গাসাগর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।" তারপর যখন তাঁহার সঙ্গী বৃদ্ধটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি গঙ্গাসাগরে এলে কেন?" তিনি বলিলেন, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" আবার কেবল

* স্বর্গীয় গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী স্বপ্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্রের" কপালকুণ্ডলা-খণ্ডে নবকুমারকে "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিতাবলীর" অন্তর্গত করিয়া শ্যামা, অধিকারী ও কাপালিকের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। মতিবিবি "ক্ষুদ্র চরিতাবলীর" মধ্যে গণ্য হয় নাই। তৃতীয় বর্ষের আর্য্যদর্শনের কয়েক সংখ্যায় কপালকুণ্ডলার যে বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে (১১৭ পৃষ্ঠা পাদটীকা) একবার উল্লেখ করিয়াছি। সমালোচকের নাম পূর্ণচন্দ্র বসু। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "এ গ্রন্থের প্রধান চিত্র নায়িকা কপালকুণ্ডলা। তাহারই চরিত্র, তাহারই প্রকৃতি বিশেষরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য যাবতীয় ঘটনার আয়োজন ও গ্রন্থীয় ব্যাপার কল্পনার সৃষ্টি।" অন্যত্র লিখিয়াছেন, "কপালকুণ্ডলার পুরুষপাত্রগণ যে অতি যৎসামান্য তাহা বলিয়া দিবার আবশ্যক করে না। তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবিই প্রধানা। বঙ্কিম বাবুর প্রায় সকল উপন্যাসই স্ত্রীপ্রধান।" আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন, "কপালকুণ্ডলার উপাখ্যানে এই মতিবিবির চিত্র যেমন উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে, এমত কাহারই নহে। মতিবিবির চিত্র সুস্পষ্ট উজ্জ্বল, কপালকুণ্ডলার চিত্র অস্পষ্ট, মলিন। মতিবিবিকে প্রকাণ্ড দেখায়, কপালকুণ্ডলাকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখায়।" নবকুমার কপালকুণ্ডলার তুলনায় অপ্রধান পাত্র বটে, কিন্তু মতিবিবির তুলনায় "ক্ষুদ্র" বা "যৎসামান্য" নহে। কপালকুণ্ডলা যে মতিবিবির তুলনায় "অস্পষ্ট, মলিন" ও "অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র" ইহাতে চিত্রপটে মতিবিবি হইতে তাহার প্রাধান্যের হ্রাস হয় নাই। বরং নায়িকার চিত্রে বর্ণবাহুল্যের অভাবে কবির কৃতিত্ব অধিক দ্যোতিত হইয়াছে।

* ইংরাজীতে অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক থেকারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস Vanity Fair এর অন্যতর নাম A Novel without a Hero (নায়কহীন উপন্যাস)। অবশ্য এইরূপ নামকরণের মূলে থেকারের স্বভাবসিদ্ধ বক্রোক্তিপ্রিয়তা ও সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদিগের রচিত গ্রন্থাবলীর প্রতি কটাক্ষ আছে। থেকারে যে অর্থে নিজ উপন্যাসকে নায়কহীন বলিয়াছেন, সে অর্থে তাঁহার উপন্যাসে নায়িকাও নাই। একজন সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, ঐ গ্রন্থের পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে যাহারা সৎ তাহারা সব হাবা, এবং যাহারা চতুর তাহারা সকলেই বজ্জাত। থেকারে স্বীয় উপন্যাসকে নায়কহীন বলিলেও, এ ট্রলপ্ বেকী সার্পকে নায়িকা ও রডন ক্রলিকে নায়ক বলিয়াছেন। আবার অনেকে এমিলিয়াকে নায়িকা ও ডবিনকে নায়ক বলিয়াছেন।

* বাদশাহ আকবরের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে লুৎফ উন্নিসা আগরা হইতে উড়িষ্যা যাত্রা করেন। উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যে রজনীতে তাঁহার নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হয় সেই রজনীতেই তিনি সংবাদ পাইলেন আকবরের মৃত্যু হইয়াছে এবং সেলিম বাদশাহ হইয়াছেন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন আকবর শাহের মৃত্যু ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

ইহাই নহে, সমুদ্রের স্মৃতি মনে পড়ায় অমনি কালিদাসের রঘুবংশ হইতে একটা শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ফেলিলেন। নবকুমারের কথাবার্ত্তায় ও মতাবলীতে যাহাকে একটা আধুনিক কালের ছাপ বলিয়া মনে হইতে পারে,' বস্তুতঃ উহা বাঙ্গালী যুবকের চিরন্তন মুদ্রাচিহ্ন। নবকুমারের কোনও ধর্ম্মই অসাময়িকত্ব দোষে দুষ্ট নহে। † নবকুমারের স্থায় রসজ্ঞ অথচ উদার উন্নতচরিত্রশালী, বহু যুবক চিরদিনই বাঙ্গালায় ছিল, এবং আশা করা যায় চিরদিনই থাকিবে।

নবকুমার শিক্ষিত, কুসংস্কারহীন, সৌন্দর্য্যবোধ-সম্পন্ন, বিনয়ী, ধীর, আত্মত্যাগশীল ও সাহসী। কপাল-কুণ্ডলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বেই আমরা তাঁহার এই গুণগুলির পরিচয় পাই। কাপালিকের কবল হইতে পলায়ন করিয়া যখন তিনি কপালকুণ্ডলার সহিত অধিকারীর মঠে আসিলেন, তখন দেখিতে পাই, তিনি স্বীয় প্রাণরক্ষিত্রীর বিপদাশঙ্কা করিয়া অধিকারীকে বলিতেছেন. "আমার প্রাণদান করিলে যদি কোনও প্রত্যুপকার হয়, তবে তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমি এমন সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্ম-সমর্পণ করি। তাহা হইলে ইহার রক্ষা হইবে।" শেষে অধিকারী ধীরে ধীরে ও "রাঢ় দেশের ঘটকালির" সুকৌশলপূর্ণ কায়দায় যখন বুঝাইয়া দিলেন যে, নবকুমারের সহিত বিবাহ হইলেই কপালকুণ্ডলার মঙ্গল, তখন কিন্তু নবকুমার সহসা উত্তর করিলেন না। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অতি দ্রুত পাদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অধিকারী তাঁহার মনের ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি নবকুমারকে ভাবিবার অবসর দিয়া গেলেন। নবকুমার কি ভাবিতেছিলেন? তিনি কুলীনসন্তান আর কপালকুণ্ডলা অজ্ঞাতকুলশীলা বলিয়া কুলভঙ্গভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছিলেন কি? তাহা নয়। তিনি কপালকুণ্ডলার রূপে আত্মহারা, তাঁর কাছে প্রাণদান পাইয়াছেন। নবকুমারের চিন্তা তাঁর নিজের জন্য নয়, কপালকুণ্ডলার জন্য। অজ্ঞাতকুলশীলা কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ করিলে সমাজ উৎপীড়ন করিতে পারে, এবং সে উৎপীড়নে তাঁহার স্বজনগণ হয়ত কপালকুণ্ডলাকেই হেতু মনে করিয়া তাহাকে অনাদর, অপমান ও আরও কত কি করিতে পারেন, সেই ভয়ে নবকুমার বিবাহপ্রস্তাবে সহসা সম্মত হইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না, বিবাহ কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ সুখের ও শান্তির হেতু হইবে কি না। শেষে সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাহ করাই স্থির করিলেন, এবং পরদিন প্রাতে বলিলেন, "আজ হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্ম্মপত্নী, ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিব।"

বিবাহ হইল। অধিকারী তিথি নক্ষত্রাদি "সবিশেষ সমালোচনা" করিয়া কহিলেন,—"আজি যদিও বিবাহের দিন নহে তথাচ বিবাহের কোন বিঘ্ন নাই। গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিব।" ঠিক বলিতে পারি না বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও সুকৌশলে একটা নিমিত্ত সূচনা করিয়াছেন কি না। অধিকারী জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন; কিন্তু সেটা যে মাঘ মাস তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গোধূলিলগ্নে বিবাহ প্রশস্ত বটে, কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে বলে—"মার্গশীর্ষে তথা মাঘে গোধূলিঃ প্রাণনাশিকা।" ভবিতব্যতা প্রবল, তাই প্রাণনাশক লগ্নে নবকুমার-কপালকুণ্ডলার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর অধিকারীর মঠ হইতে সপ্তগ্রামযাত্রার পথে মতিবিবির সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের আলাপ হইতে বুঝিতে পারি নবকুমার নবপরিণীতা পত্নীর রূপে অন্তরে অন্তরে গর্ব্ব ও আনন্দ বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু কই, অন্যান্য উপন্যাসে বর্ণিত যুবক প্রেমিকদিগের মত নবকুমার ত কপাল-কুণ্ডলার সহিত একটিবারও প্রেমালাপ করিলেন না?

† নবকুমারের সঙ্গী বৃদ্ধটীর মধ্যেও বাঙ্গালী গ্রাম্যবৃদ্ধের চিরন্তন মুদ্রাচিহ্ন আছে। "তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?"—এ বোধও আছে; আবার "বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেলে ছেলেপিলে সংবৎসর খাবে কি?" —সে জ্ঞান সরোবব্যগ্রতাও আছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Skylark-এর তার ইঙ্গিত True to the kindred points of Heaven and Home। এরূপ গ্রাম্যবৃদ্ধ বাঙ্গালায় চিরদিনই ছিল, এখনও আছে।

? আবার কেমন? এই কপালকুণ্ডলাকে সমুদ্রতীরে প্রথম দেখিয়া না তাঁহার "বাক্‌শক্তি রহিত" হইয়াছিল? এবং তাঁহার কণ্ঠের প্রথম কথা—"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? শুনিয়া না তাঁহার হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই ধ্বনি তাঁহার কাণে বা মনে হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতেছিল, পবনে বহিতেছিল, বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতেছিল, এবং তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতেছিল? নবকুমারকে ত প্রেমালাপ করিতে শুনিলামই না, এমন কি কপালকুণ্ডলার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মিলামিশা করিতেও দেখিলাম না। ইহার হেতু কি?—নবকুমার নিজের সুখ খোঁজেন না; কপালকুণ্ডলার সুখশান্তির কথাই তিনি এখনও ভাবিতেছিলেন। তাঁহার গৃহে আসিয়া কপালকুণ্ডলা—তাঁহার বড় সাধের, বড় গর্ব্বের ধন কপালকুণ্ডলা,—তাঁহার প্রাণাধিকা প্রাণরক্ষিত্রী কপালকুণ্ডলা—আদৃতা হইবেন কি না? যে পর্য্যন্ত তিনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিতেছিলেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। তিনি চপল প্রেমিক নহেন; 'ভবিষ্যতে যাহাই হউক, বর্ত্তমানের আনন্দটুকু হইতে কেন আপনাকে বঞ্চিত করি', এ বোধ তাঁহার নাই। কপালকুণ্ডলার সুখের চেয়ে আপনার আনন্দ তাঁর কাছে বড় নয়! প্রেমে অন্য উপন্যাসের নায়ককে চপল করে; প্রেমে নবকুমারের স্বভাবতঃ ধীর প্রকৃতিকে গম্ভীরতর করিয়া ফেলিল।

নবকুমার যখন বাড়ী আসিলেন, তখন হারাধন পাইয়া তাহার আত্মীয়-স্বগণ নাকি একেবারে "আহ্লাদে অন্ধ" হইলেন। "তখন তাঁহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার বধূ কোন্ জাতীয় বা কাহার কন্যা?" ভালই হইল। দেবীবরের মেলবন্ধনের পরে এমন কুলীন সমাজ বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যের প্রয়োজনেই নবকুমারের ভাগ্যে জুটিয়াছিল। * সে যাহা হউক,

"যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল; অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই, অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণপ্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই; এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও এ পর্য্যন্ত বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করেন নাই, পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল; জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপল মোচনে যেরূপ দুর্দ্দম স্রোতোবেগ জন্মে সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।

এই প্রেমাবির্ভাব সর্ব্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমিষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত। যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন তাহাতে প্রকাশ পাইত। যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত, যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত। সর্ব্বদা অন্যমনস্কতা সূচক পদবিক্ষেপে প্রকাশ পাইত। তাঁহার প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যেখানে চাপল্য ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য্য জন্মিল, যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল; নবকুমারের মুখ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; বিরক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল। মনুষ্যমাত্র প্রেমের পাত্র হইল; পৃথিবী সৎকর্ম্মের জন্য মাত্র সৃষ্ট বোধ হইতে লাগিল; সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।*

* দেবীবর ঘটক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

* মানবের মনে প্রেমের প্রভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোরম উক্তিগুলি পড়িতে পড়িতে টেনিসনের নিম্নলিখিত কবিতাবলে পড়ে—

ভালবাসা পাইয়াও ভালবাসিতে শিখিল না বলিয়া যাঁহারা কপালকুণ্ডলাকে বেয়াড়া বা অস্বাভাবিকপ্রকৃতি ভাবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই কথাগুলি মনোযোগ দিয়া পাঠ করা উচিত।

যে প্রেমাবির্ভাব কথায় ব্যক্ত হয় না, তাহাও সমাজের রীতিনীতিতে অভিজ্ঞা, স্বামিপ্রেমলোলুপা কোনও চতুরা কিশোরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারে না, কাজেই তাহার সমুচিত প্রতিদানও যথাসময়ে পাওয়া যায়। কিন্তু নবকুমারের দুর্ভাগ্যক্রমে কপালকুণ্ডলা লোক-চরিত্রে—বিশেষতঃ সামাজিক লোকের চরিত্রবিষয়ে—নিতান্ত অনভিজ্ঞা। সমাজের সকল বালিকাই কপাল-কুণ্ডলার বয়সপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মা, মাসী, খুড়ী, পিসী প্রভৃতির পরস্পর কথোপকথনে, কিংবা সখীগণের সহিত আলাপ-আলোচনায় স্বামিস্ত্রীর ভালবাসার বাহ্য নিদর্শন সম্বন্ধে অনেক তথ্যই শিখে, এবং স্বামীর ভালবাসা যে স্ত্রীর, একান্তকাঙ্ক্ষনীয় তাহাও বাল্যাবধিই শুনিতে পায়। অবশ্য বাল্যে তাহার সকল মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, কিন্তু বুঝিবার বয়স হইলে সেই সকল পূর্ব্বশ্রুত তথ্য আপনা হইতেই তাহাদের মনে উদিত হয়। কিন্তু কপালকুণ্ডলা জীবনে তাদৃশ সামাজিক শিক্ষার অবসর পান নাই। পরন্তু তান্ত্রিকসংসর্গে তিনি যে শিক্ষা পাইয়া-ছিলেন, তাহার ফলে দেবীর পাদপদ্ম হইতে ত্রিপত্র-চ্যুতিদর্শনে তাঁহার দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, স্বামি-সংসর্গ তাঁহার শুভকর হইবে না। * তাঁহার ন্যায় 'সৃষ্টিছাড়া' প্রেমপাত্রীকে আপনার করিয়া লইতে হইলে প্রেমিককে নবকুমারের ন্যায় চাপা লোক হইলে চলিবে কেন? "কপালকুণ্ডলা" পড়িতে পড়িতে ইহা কি মনে হয় না, আহা! নবকুমার অন্য প্রেমিকের মত হইলে বুঝি বা' কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিত? যে বিষয়ে যাহার স্বাভাবিক প্রবণতা নাই, পূর্ব্বপ্রাপ্ত শিক্ষারও একান্ত অভাব, যে বিষয়ে তাঁহাকে কেবল নিজের বুদ্ধি বা সুমতির উপর ফেলিয়া রাখিলে চলিবে কেন? শ্যামাসুন্দরী হিতৈষিণী সখীর ন্যায় যোগিনীকে প্রেমময়ী গৃহিণীরূপে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎপক্ষে যে তিনি কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। আর চেষ্টা করিলেও, তাঁহার চেষ্টা ও নবকুমারের চেষ্টার ফল একক্ষেত্রে তুল্য হইবে কেন? নবকুমার ভালবাসেন; কিন্তু গম্ভীর বলিয়া, আত্মবিসর্জ্জনে অভ্যস্ত বলিয়া, হয়ত অতি উচ্চশ্রেণীর প্রেমিক বলিয়াই, ভালবাসাইবার কৌশল প্রয়োগ করিতে শিখেন নাই। যে মুখে বলে, "ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে" কিংবা "আমি নিশি-দিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও" সে যাহা বলে, তাহা তাহার মনের প্রকৃত ভাব নহে। নবকুমারকে মুখে ওরূপ ভাব প্রকাশ করিতে না শুনিলেও—হয়ত শুনি না বলিয়াই—আমরা বুঝি, উহাই তাঁহার ভালবাসার মূলমন্ত্র। কিন্তু "গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়"। অদৃষ্টদোষে ঐরূপ গাম্ভীর্য্য, ঐরূপ প্রতিদানপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাহীন ভালবাসাই, তাঁহার কাল হইল, তাঁহার বড় আদরের, বড় গর্ব্বের ধন কপালকুণ্ডলারও কাল হইল। সে ভালবাসিতে,—একান্তভাবে তাঁহার উপরে নির্ভর করিতে,—নিজের হৃদয় তাঁহার সমক্ষে খুলিয়া দিতে শিখিল না। তাই সেই কালরাত্রিতে ব্রাহ্মণ যুবকবেশিনী লুৎফ উন্নিসা যখন কপালকুণ্ডলাকে বলিল "আমার প্রাণদান দাও—স্বামিত্যাগ কর", তখন কপালকুণ্ডলা "চিন্তা করিতে লাগিলেন—পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন?" এই যে জীবনের একটা গুরুতর-

Love took up the glass of Time, and turn'd it in his glowing hands;
Every moment, lightly shaken, ran itself in golden sands
Love took up the harp of Life, and smote on all the chords with might;
Smote the chord of Self, that, trembling, pass'd in music out of sight.

* কপালকুণ্ডলা দ্বিতীয় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া স্বামীকে দেখিতে না পাওয়া, ইহা কেবলই কপালকুণ্ডলার বেয়াড়ামি নয়, ইহাতে নবকুমারেরও যেন একটু দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। ইহা অস্বাভাবিকপ্রকৃতিকতার চিহ্নও নয়; নবকুমারকে বঙ্কিম যেমনটি করিয়াছেন, তেমনটি রাখিয়া কপালকুণ্ডলাকে তাঁহার প্রতি প্রণয়িনী করিয়া তুলিলেই সে চরিত্র অস্বাভাবিক হইত, না তোলায় অস্বাভাবিক হয় নাই।

সপ্তগ্রামে মতিবিবির সহিত ব্যবহারে নবকুমারের দৃঢ় আত্মসংযম প্রকাশ পাইয়াছে। ওজোগুণে ঐ পরিচ্ছেদটি গ্রন্থের মধ্যে অতুলনীয়। নবকুমার ও মতিবিবি দুইটা চিত্রই অতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। একের দিকে চাহিতে যেন চক্ষু ঝলসিয়া যায়, অন্যের দিকে চাহিতে তেমন হয় না বটে, কিন্তু মনে হয়—"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।" দুয়ের সম্মিলনফলও অতি অপূর্ব্ব। নবকুমার যেন অভ্রঙ্কষ গৌরীশঙ্করশৃঙ্গ; আর মতিবিবি যেন তাহার পাদদেশলম্বিনী দাবাগ্নিশিখা। আগুন শত বাহু বিস্তার করিয়া সহস্রপতঙ্গ প্রলোভনকর সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া গিরিশৃঙ্গকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে, কিন্তু গিরিশৃঙ্গ নির্ব্বিকারভাবে আপন অটল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মতির প্রার্থনার উত্তরে নবকুমারের মুখ হইতে যে দুই চারিটি কথা বাহির হইতেছে, তাহা গিরিগাত্রস্খলিত তুষারখণ্ডের ন্যায় দাবাগ্নিশিখাকে এক একবার দমিত করিয়া দিতেছে। কিন্তু ক্ষণ পরেই আগুন আবার বাহুবিস্তার করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে। মতির একটা কথা শুন—

"তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে সুখ বলে সকলই দিব।"

কথাটি শুনিয়া সয়তানকর্ত্তৃক যীশুর প্রলোভন মনে পড়ে:—

And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them; for that is delivered unto me: and to whom soever I will I give it (St. Luke iv) •

ধন মান প্রণয় রঙ্গ রহস্যের প্রলোভন নিষ্ফল হইলে মতি নিষ্কাম প্রেমের নামে নবকুমারের মনে দয়ার উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিল এবং শেষে পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু এ যে গিরিশৃঙ্গ,—পাষাণ। তাহাতে কোমলতা কোথায়? অথচ পাঠক মনে রাখিবেন, নবকুমার স্ত্রীসুখে সুখী নহেন। তাঁহার এক স্ত্রী যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই পিতার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ হেতু বর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। (নবকুমার অদ্যাপি জানেন না যে তাঁহার প্রলোভনকারিণীই সেই স্ত্রী,) দ্বিতীয় পত্নী যুবতী ও রূপবতী হইলেও তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী নহেন। এমন অবস্থায় অন্য কোনও যুবার পক্ষে কি সম্ভব তাহা চিন্তা করিলে নবকুমারের চরিত্রের ঔন্নত্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাইবে।

ক্রমে নবকুমারের গাম্ভীর্য্য ও আত্মবিসর্জ্জনশীলতা তাঁহাকে আত্মপীড়নে প্রবৃত্ত করিল। তিনি স্বভাবতঃ চাপা লোক ছিলেন; শেষ দিকে দেখি, কপালকুণ্ডলার অবাধ্যতায় পদে পদে মর্ম্মাহত হইয়াও তিনি নিজ মনোদুঃখ কথায় ব্যক্ত করিতে জানেন না। তিনি কেবলই ভাবেন, আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, কর্ত্তব্যের পথ ভাল দেখিতে পান না। কপালকুণ্ডলাকে একাকিনী রাত্রিতে বাহিরে যাইতে কৃতসঙ্কল্পা দেখিয়া যখন তিনি বলিয়াছিলেন, "চল আমি তোমার সঙ্গে যাইব," তখন—

কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।

নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিঃশ্বাসসহকারে কপালকুণ্ডলার হাত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তার পর কপালকুণ্ডলার কবরীচ্যুত চিঠি হাতে পাইয়া নবকুমার যখন তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইলেন, তখনই বা তিনি কি করিলেন?

"নবকুমার নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। রোদন করিয়া কিছু সুস্থির হইলেন। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যসম্বন্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। আজি তিনি কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না। কপালকুণ্ডলা যখন সন্ধ্যার সময় বনাভিমুখে যাত্রা করিবেন, তখন গোপনে তাহার অনুসরণ করিবেন, কপালকুণ্ডলার

মহাপাপ প্রত্যক্ষীভূত করিবেন, তাহার পর এ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না; আপনার প্রাণ সংহার করিবেন। না করিয়া কি করিবেন?—এ জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না।"

যখন উৎসাহ উদ্যমের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ঠিক সেই সময়ে এইরূপ অপুরুষোচিত সঙ্কল্প নিতান্তই অশোভন মনে হয় না কি? নবকুমার যদি স্বভাবতঃ একটু চাপা, একটু ভাবুক, একটু আত্মবিসর্জ্জনশীল না হইতেন তাহা হইলে তাহার মনে হয়ত এসময়ে এরূপ সঙ্কল্পের উদয় হইত না। নবকুমারের জীবনের এই ভাগটা পড়িতে পড়িতে কাহারও কাহারও হয়ত হ্যামলেটকে মনে পড়িবে। হ্যামলেটও নানাগুণে বিভূষিত হইয়া ভাগ্যদোষে আত্মপীড়নে রত। এ সময়ে তাঁহাকেও জীবনে বীতরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। নবকুমার যেমন স্থির করিলেন এ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন,—এ জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না, হ্যামলেটও সেইরূপই ভাবিয়াছিলেন—

To die—to sleep,
No more; and by a sleep, to say we end
The heart-ache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to—'t is a consummation
Devoutly to be wish'd

নবকুমার হ্যামলেটের মত অধিক বিচার করেন না। তিনি অদৃষ্টদোষে যেন মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। অদৃষ্টের প্রভাব হ্যামলেট নাটকেও অতি স্পষ্ট। হ্যামলেট নিজেই বলিয়াছেন—

There's a divinity that shapes our ends
Roughhew them how we will.

নবকুমারচরিত্রে ঐ প্রভাব আরও স্পষ্ট। নবকুমার জীবনের অতি গুরুতর মুহূর্ত্তে যেটুকু কার্য্যও করিবেন বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাও পারিলেন না। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা বাহির হইবার সময় গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিবেন—তাঁহার "মহাপাপ" প্রত্যক্ষ করিবেন। যদি তিনি তাহা করিতে পারিতেন তাহা হইলে (কে বলিতে পারে?) হয়ত তাঁহার সকল সন্দেহের সুমীমাংসা হইয়া যাইত—লুৎফ উন্নিসাকে চিনিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু যখন বাহিরে যাইতেছিলেন সেই সময়েই কাপালিক আসিয়া তাঁহার পথে পড়িল, তাহার সহিত কথোপকথনে, বিশেষতঃ তাহার প্রদত্ত সুরাগরল পান করিয়া নবকুমারের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিল। স্বস্থাবস্থায় হয়ত তিনি ক্রোধের বেগে বা সন্দেহ ভালরূপে নিরসন করিবার উদ্দেশ্যে লুৎফ উন্নিসার সম্মুখীনও হইতে পারিতেন, কিন্তু কাপালিক সঙ্গে থাকায় তাহা সম্ভব হইল না। পুরুষবেশিনী লুৎফ উন্নিসার সহিত একত্রে দেখিবার পরও তিনি কপালকুণ্ডলাকে কোনও কথা সময় থাকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন না, কোনও তিরস্কার করিলেন না। কপালিকের কথায়, ও হয়ত তাঁহার প্রদত্ত সুরার প্রভাবে, পূর্ব্বকৃত আত্মহননের সঙ্কল্পও বিস্মৃত হইলেন—মূঢ়ের ন্যায় তাহার পূজার আয়োজনের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন এবং তাহার আদেশ মত কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইতে চলিলেন। যখন তাঁহার মোহ মন্দীভূত হইয়া আসিল তখন উভয়েরই কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। জীবনের সেই শেষ মুহূর্ত্তে চিরাভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া, চাপা ভাব দূরে নিক্ষেপ করিয়া, নবকুমার সুচিরাবদ্ধ হৃদয়কপাট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। হ্যামলেটেরও কি এইভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগিয়া ওঠে নাই? শ্মশানের মধ্য দিয়া ভাগীরথীর দিকে যাইতে যাইতে কপালকুণ্ডলা দেখিতে পাইলেন নবকুমার কাঁপিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয় পাইতেছ?" নবকুমার বলিলেন "ভয়ে মৃন্ময়ী?—তাহা নহে।" "তবে কাঁপিতেছ কেন?"

নবকুমার কহিলেন, "ভয়ে নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, "কাঁদিবে কেন?"

নবকুমার কহিলেন, "কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি! তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই।" বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। "তুমি ত কখনও আপ-

নার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।" এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

"মৃণ্ময়ি! কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও, একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

পাঠকের কি মনে হয় না হায়! এমন কথাগুলি নবকুমার আর একটু আগে বলেন নাই কেন? তাহা হইলেই ত তাঁহাদের এ দুর্গতি হইত না। নবকুমারের আচরণে যে ত্রুটি ছিল তাহা সরলা কপালকুণ্ডলাও বুঝিয়াছিল।

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন— মৃদুস্বরে কহিলেন "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই?"

তারপর যখন নবকুমার শুনিলেন, ব্রাহ্মণবেশী প্রকৃতপক্ষে পদ্মাবতী, এবং কপালকুণ্ডলা অবিশ্বাসিনী, নহেন, তখনও অদৃষ্ট প্রসন্ন থাকিলে তাঁহারা ফিরিয়া গৃহে আসিতে পারিতেন। অবশ্য কপালকুণ্ডলা "ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে" কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগ্নবাহু কাপালিকের পক্ষে নবকুমারের সাহায্য ভিন্ন কপালকুণ্ডলাকে বলি দেওয়া সম্ভব ছিল না। মতিবিবিও একার্য্যে তাহার সহায় নহে, আর সে সঙ্গেও ছিল না। কিন্তু অদৃষ্টের বিধান অন্যরূপ। তাই যখন সকল সন্দেহ মিটিয়া গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—

চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া তথায় তটাগ্রভাগে প্রহত হইল; অমনি তট মৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলার সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল।

তারপর যাহা হইল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এ ব্রতের যে এই কথা তাহা ত ভবানীর পাদপদ্মে ত্রিপত্রচ্যুতি হইতে এবং শেষ রজনীতে কপালকুণ্ডলার গৃহত্যাগকালে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইতেই * পাঠক আশঙ্কা করিতেছেন। তথাপি এমন দুইটি জীবনের এমন শোচনীয় পরিণতি অনেকের প্রাণেই সহ্য হয় না। হয়ত সেই জন্যই স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় কপাল-কুণ্ডলার মূলগত অদৃষ্টবাদটুকু বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন নাই। তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে অধিকারিপ্রদত্ত ত্রিপত্র ত জগজ্জননী গ্রহণই করিয়াছিলেন; তবে এ বিবাহ অমঙ্গলান্ত কেন হইবে? সেই জন্যই তাঁহার "মৃণ্ময়ী" রচিত হয়। বাঙ্গালার কোনও পাঠকের নিকটই দামোদরবাবুর "মৃণ্ময়ী" আদৃত হয় নাই। সুতরাং দামোদরবাবুকর্ত্তৃক কপালকুণ্ডলার "উপসংহার" রচনার প্রতি কটাক্ষ করিয়া রায়সাহেব হারাণচন্দ্র যে লিখিয়াছেন, "কপালকুণ্ডলা এদেশের অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছে", তাহা কিরূপে উপপন্ন হয়?

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন

* কপালকুণ্ডলা চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নববর্ষে।

নবীন পুলকে মাতায়ে হৃদয়
এস গো নবীন অতিথি আজ,
আবাহন তোমা করে সব হিয়া,
জাগরণ এল ধরণী মাঝ।
এস গো হরষে নূতন বরষ,
এনেছ বন্ধু কি দান বহি?
বুক ভরি দাও স্নেহ-ভালবাসা
সকল দুঃখ যাতনা দহি।
শিরেতে মোদের বিতর আশীষ,
হৃদয়ে কর গো শকতি দান;
নবীন পুলকে নব-উৎসাহে
ভরিয়া মোদের উঠুক্ প্রাণ।
আগমনে তব সেজেছে আবার
উজল সাজেতে প্রকৃতি রাণী,
সরস-হরষ-পরশে তোমার
জাগিয়া উঠিল ধরণীখানি।
রস-হিল্লোলে মুঞ্জরে হৃদি,
এ কি কল্লোল বহিছে আজি,
মৃদুল ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন-গীতি উঠিছে বাজি।

শ্রীভক্তিসুধা রায়।

কলিকাতা

দক্ষিণাপথ ভ্রমণ।

সপ্তমী পূজার দিন মাদ্রাজ-মেলে চাপা হইল। "কুপে" গাড়ীর উপরে নীচে গদি, পাইখানা ও মুখ ধুইবার ঘর আছে। রিজার্ভ টিকিট থাকা সত্বেও লোক উঠিবার চেষ্টা করাতে ঘুম ভাল হইল না। দামোদর, রূপনারায়ণ, ব্রাহ্মণী, সুবর্ণরেখা, বৈতরণী, কাঠজুড়ী ও মহানদী পার হইয়া ভোরবেলা খুর্দ্দাতে ট্রেণ পৌঁছিল। ৺জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পথ বামে রহিল।

অষ্টমীর দিন আলো হইতে না হইতে দূরে বামে চিল্কা হ্রদের জল উঁকি মারিতে লাগিল। গাছের ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে জল দেখা যায়, মাঝে মাঝে দেখা যায় না। পাহাড়ের কোলে চিল্কা হ্রদ ক্রমশঃ প্রশস্ত আকার ধারণ করিতে লাগিল। হ্রদের মাঝেও স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাহাড় ও ছোট ছোট দ্বীপ। ছোট বড় নৌকাও চলিতেছে। তীরে গ্রাম ও শস্যক্ষেত। পাহাড় ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

পথে বড় বড় ষ্টেসনের মধ্যে বহরমপুর, ভিজিয়ানাগ্রাম, রাজমহেন্দ্রী, গোদাবরী নেলোর। সকাল ও সন্ধ্যাবেলা যেখানে দরকার গরম জল ও দুধের বন্দোবস্ত ছিল, ঠিক সময়ে চা পান হইয়াছে। সঙ্গে খাবার ছিল।

কলিকাতার মেটা সাহেব পাশের গাড়ীতে বরাবর ছিলেন। ভিজিয়ানাগ্রামে ক্যাপ্টেন্ পেটাডেল্ মহাশয় যাইবার জন্য উঠিলেন। বাবুর পুত্র অরুণ এবং ছোট আদালতের জজ সোরাওয়ার্দ্দী সাহেবের পুত্র সঙ্গের গাড়ীতে ছিল। সন্ধ্যার পর গোদাবরী নদীর পুল পার হইলাম। এখানে গোদাবরী বহুবিস্তৃত।

নবমী পূজার দিন বেলা ১১ টার সময় মাদ্রাজ পৌঁছিলাম। ষ্টেসনে শিবাজী রাজার লোক মোটর লইয়া উপস্থিত ছিল। অনেক ছাত্র অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিল, ফুলমালা প্রভৃতি ছিল। আনন্দ-ভবন নামক হোটেলে বাসা ঠিক হইল।

বিশ্রামান্তে মোটরে করিয়া সহর বেড়ান হইল। প্রকাণ্ড সহর। হাইকোর্ট, সেনেট হাউস, লাট সাহেবের বাড়ী, ফোর্ট সেন্ট জর্জ্জ কেল্লা, স্কুল, কলেজ, ক্লব, ব্যাঙ্ক, আপিস, দোকান ইত্যাদির সব বাড়ীই সুন্দর। সমুদ্রের ধারে বেড়াইবার রাস্তা চমৎকার। হাইকোর্টের রেলিংএ এমডেন জাহাজ যেখানে গোলা মারিয়াছিল তাহা দেখিলাম। হাইকোর্টের মাথায় বাতীঘর।

সন্ধ্যার পর খাবার দাবার লইয়া সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে উঠিলাম। ষ্টেসনের নাম এগ মোর। গাড়ী রিজার্ভ ছিল, বেশ ঘুম হইল। সরস্বতী পূজার জন্য সেদিন সহরে বাড়ীতে বাড়ীতে মন্দিরে মন্দিরে উৎসব।

বিজয়া দশমী। বেলা ৮৷৷০ টার সময় তাঞ্জোর পৌঁছিলাম। ষ্টেসনে রাজার লোক ও মোটর ছিল। মোটরে গোলাপের গড়ে মালা উপহার দিল।

কাফিপানের পর সাত মাইল দূরে ত্রিভেদী সহরে কাবেরী-স্নান করিতে সকলে গেলাম। সেখানে রাজার চতুষ্পাঠী টোল আছে, অনেক ছাত্র সংস্কৃত পড়ে। তাহাদের সঙ্গে অনেক আলাপ হইল। সংকল্প করিয়া স্নান করিলাম।

পথে ব্রহ্মা শিব, খণ্ডীশ্বর শিব, সুব্রহ্মণ্য মন্দির প্রভৃতি দেখা হইল। শিব ব্রহ্মার পাঁচ মাথার একমাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। মাথা-কাটা ব্রহ্মার মন্দিরও আছে। বিষ্ণুর ও কার্ত্তিকেয়ের মন্দির অনেক দেখিলাম। তাঞ্জোরে প্রায় ৬৪টা বড় বড় মন্দির আছে।

প্রধান মন্দিরের নাম বৃহদেশ্বর বা মহাশিব। প্রকাণ্ড নন্দীশ্বর বণ্ড, বিশাল শিব, প্রশস্ত উঠান, সুবিশাল গজস্তম্ভ,—সবই বিপুলায়তন। অম্বিকার মন্দিরও প্রকাণ্ড। এই সকল বিশাল মন্দির ও সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ প্রকাণ্ড কেল্লার ভিতর রহিয়াছে। সেখানে দর্শন ও পূজা হইল।

তারপর রাজপ্রাসাদের ভিতর রাজার কুলদেবতা চন্দ্রমৌলিকেশ্বর শিব দর্শন করিলাম। সেখানে বিস্তর সোণা রূপা, প্রবাল ও মরকতের মূর্ত্তি আছে। স্ফটিকের চন্দ্রমৌলিকেশ্বর মূর্ত্তি অতি সুগঠন, খাঁটি মরকতের চন্দ্রমৌলিকেশ্বর মূর্ত্তিও রহিয়াছে। স্বর্ণনির্ম্মিত অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দেখিলাম। এতদ্ব্যতীত রাজারাণীদের স্বর্ণমূর্ত্তি আছে। মহারাজ শিবাজী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রাজারই মূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। প্রায় দুই মণ সোণার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি আছে।

সন্ধ্যার সময় রাজার দশেরা দরবার পুরাতন ধরণে হইল। ছোট রাজা ও বড় রাজার সঙ্গে আলাপ দেখাও করা হইল। কাজের কথাবার্ত্তা কতক হইল।

ছত্রপতি শিবাজীর বংশধর বলিয়া বর্ত্তমান রাজবংশের দাবী। দশেরার দিন মহারাষ্ট্রীয়গণ যেরূপ বিজয়-যাত্রার আয়োজন করিয়া যুদ্ধে যাইত, এই দরবার তাহারই অনুকরণ মাত্র। রাজার পারিষদ, আত্মীয়, ভৃত্য, প্রজা ও সৈনিক যে কয়েকজন আছে, সকলেই যথাসাধ্য বেশভূষা করিয়া উপস্থিত। বাদ্য, আলোক, পুষ্প, মালা, নিশান, পতাকা, ধ্বজার অভাব নাই। সভাপণ্ডিত, রাজ পুরোহিত, ভাট, নকীব, মোসাহেব, মন্ত্রী, দেওয়ান, সেনাপতি যথাসম্ভব উপস্থিত। বন্দী জয়ধ্বনি করিল, পুরোহিত এবং সপুত্র রাজা শমীবৃক্ষ (শাঁইগাছ) পূজা করিলেন। পূজান্তে রাজা নিজ তরবারী কোষমুক্ত করিয়া মন্ত্রীর হস্তে দিলেন, মন্ত্রী শত্রুনাশচ্ছলে শমীপত্র ছেদন করিয়া রাজসম্মুখে রৌপ্যপাত্রে রক্ষা করিলেন। তাহাই রাজা সকলকে বিতরণ করিলেন। দরবারের মত তাহা কতক রাজার নিজহস্তে কতক মন্ত্রীহস্তে বিতরিত হইল। নারিকেল-প্রধান ভেট সকলে উপস্থিত করিল। শমীপত্র বিতরণের পর ভাট বন্দী স্তুতিগান করিলে দরবার ভঙ্গ হইল। রাজা মালা দিয়া আমার সম্মান-বর্দ্ধন করিলেন।

পরদার অন্তরালে রাণী সখীগণকে লইয়া বসিয়াছেন। রাজমাতাও উপস্থিত। মোটর পাঠাইয়া আমার সহযাত্রিণী মহিলাগণকেও লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে যথেষ্ট খাতির করিয়া বিদায় দিলেন। আমি তারপর ছোটরাজা ও বড়রাজার সহিত স্বতন্ত্র দেখা শুনা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিলাম।

সভাসদগণের সহিতও পরিচয় হইল। তুরীভেরী নিনাদে দরবার-ভঙ্গ ঘোষণা হইল।

প্রকাণ্ড কেল্লার মত বাড়ী—প্রকাণ্ড উঠান—পুরাতন আস্‌বাব্ পোষাক। কিন্তু এখন দৈন্ত-দশায় সব শ্রীহীন।

সমস্ত রাত্রি দশেরা ও মহরমের বাজনা, আলো এবং লোকসমাগমে নগর মুখরিত রহিল।

একাদশীর দিন খাবার দাবার লইয়া দশটার গাড়ীতে ত্রিচিনাপল্লী যাত্রা করিলাম। সাড়েবারটার সময় ত্রিচিনাপল্লীর দেশবিশ্রুত পাহাড়ের উপর কেল্লা নয়নগোচর হইল। বহু ক্রোশ দূর হইতে উহা দেখা যায়। গাড়ীতে সেদিন ভিড় ছিল। ষ্টেসনে আহারাদি করিয়া পাহাড়-কেল্লা দেখিতে গেলাম। এখানে পর্ব্বতোপরি প্রকাণ্ড মন্দির, রাজবাড়ী, বড় বড় হল। অসংখ্য পাথরের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। পাহাড় কাটিয়া সিঁড়ি বাহির করা হইয়াছে। আশে পাশে যেখানে জায়গা আছে সেখানেই প্রকাণ্ড হল, ঘর, আপিস, দালান। সিঁড়ি বড় চড়াই বলিয়া আমি ও মহিলাবর্গ সর্ব্বোপরি গেলাম না। মধ্যের হলে বিশ্রাম করিতে করিতে ম্যানেজারের নিকট বসিয়া মন্দিরের ও কেল্লার ইতিহাস শোনা হইল। বিজ্ঞানেশ্বর গণেশ এখানকার দেবতা।

সেখান হইতে শ্রীরঙ্গম দ্বীপে রঙ্গনাথের মন্দির দেখিতে গেলাম। নদীর মধ্যে শ্রীরঙ্গম দ্বীপ। শ্রীরঙ্গনাথ শিলা ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ দেবতা। স্বর্ণকৌটার মধ্যে ভিতর মন্দিরে আছেন। তাঁহার উপর সোণার ফটক পশ্চাতে প্রকাণ্ড তাকিয়া, দেয়ালে পাথরের বিশাল অনন্তনাগ। নামগোত্র ধরিয়া পূজার কর্পূরারতি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সকল মন্দিরেই স্বতন্ত্র করিতে হইল। মন্দিরের উপর সোণার কলস। বাহিরের নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীরঙ্গনাথের সোণার প্রতিনিধি বিগ্রহ-মূর্ত্তি।

আজ একাদশী বলিয়া বিস্তর উপাসক উপস্থিত। সাজান ছোট ছোট হাতী যাত্রীদিগের নিকট পয়সা আদায় করিতেছে। মন্দিরের চারিপাশে প্রকাণ্ড হল, দালান, দরদালান, তাহার দেওয়ালে বড় ছোট, মাঝারী অসংখ্য মূর্ত্তি ও ছবি; ছাতেও অসংখ্য ছবি পৌরাণিক দেবতার লীলামূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে ছড়ান। দেখিতে দেখিতে মাথা ঘুরিয়া যায়। কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে দেখিব, কাহার কথা বলিব লিখিব স্থির করা যায় না। দাক্ষিণাত্যের সকল মন্দিরের সম্বন্ধে একথা খাটে। সব প্রকাণ্ড, সব সুন্দর, সব অদ্ভুত! এরূপ শ্রেণীর মন্দির উত্তর ভারতবর্ষে বোধহয় কোণার্ক ছাড়া কোথাও নাই। ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দির ইহাদের সকলের কাছেই ছোট। যেমন বিশাল গঠন, তেমনি সুন্দর শিল্পচাতুর্য্য তেমনি সুরুচি ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

মন্দিরের বাহিরে দালানের পর দালান, উঠানের পর উঠান, চত্বরের পর চত্বর প্রাঙ্গনের পর প্রাঙ্গন প্রাকারের পর প্রকার পার হইতে হয়। এক একদিকে সাতটি করিয়া "গোপুরং" অর্থাৎ ফটক। কোনটি ছোট, কোনটি মাঝারী, কোনটি বড়, কোনটি খুব বড়, কোনটি আকাশস্পর্শী। কোনটির কাজ শেষ হইয়াছে, কোনটির কাজ শেষ করিবার সময় কুলায় নাই: কাল নিজ প্রধান্য স্থাপন করিয়া মানব শক্তি ও মানব কৃতিত্বের নশ্বরতা প্রচার করিতেছে। চারিদিকে সাতটি করিয়া আটাশটি "গোপুরং" তাহারই অনুপাতে চারিদিকে রাস্তা, দালান, দরদালান, হলঘর রন্ধনশালা ভৃত্যশালা, রক্ষকশালা, ধনাগার অস্ত্রাগার পুস্তকাগার ও পুরোহিতগণের বাসস্থান। একটা প্রাকারের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড হল, তাহাতে হাজার থাম আছে। থামগুলি সুন্দর ভাবে জ্যামিতির শ্রেষ্ঠ নিয়মানুসারে সাজান। যেখানে দাঁড়াও সমশ্রেণীর স্তম্ভাবলী দেখিতে পাইবে। মধ্যস্থলে উচ্চবেদীর উপর শ্রীরঙ্গনাথের উৎসব মূর্ত্তি বিরাজমান, দুইদিক হইতে অগণ্য উপাসক দর্শন করিয়া ধন্য হয়। উঠান পার হইয়া আবার হাতীশালা ও ঘোড়াশালা, এখন করোগেটেড লোহার সংযোগ কৃপায় হতশ্রী। চারিদিকে শৃঙ্খলা ও নিয়ম বলবান। মন্দিরের কার্য্য সকল জায়গায় সরকার পক্ষ হইতে অধ্যক্ষদিগের হস্তে আছে। কোনরূপ অত্যাচার, বিশৃঙ্খলা কিংবা অনিয়ম হইতে পারে না। দাক্ষিণাত্যের প্রধান তীর্থস্থানগুলির এবিষয়েও যথেষ্ট প্রাধান্ত।

বাহিরের প্রাকারে বাজার দোকান ইত্যাদি আছে। ইংরাজ, মুসলমান ও এদেশের অস্পৃশ্য জাতি (যাহাদিগকে "পারিয়া" বলে) এই পর্য্যন্ত যাইতে পারে।

দেখিয়া আশা মেটে না, অথচ সময় অল্প বলিয়া যাহা হয় করিয়া দেখা শেষ করিয়া লইতে হইল। নিজেদের যেন টানিয়া ছিঁড়িয়া কাড়িয়া লইয়া যাইতে হইল। বাড়ীর স্নেহভাজন যাহারা আসিতে পারে নাই, তাহাদের সকলের অনুপস্থিতির জন্য সকলেরই মনে সর্ব্বত্র বিশেষ কষ্টবোধ হইতে লাগিল।

এইখানে রঙ্গনাথের শ্রেষ্ঠ ভক্ত রামানুজ সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার সমাধি-মন্দিরও মন্দির-প্রাকারের মধ্যেই আছে।

রঙ্গনাথের মন্দির হইতে জম্বীরেশ্বর-শিব-মন্দির দেখিতে গেলাম। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ,—এখানকার মন্দিরের অবস্থা তাই! আবার সেই "গোপুরং," প্রাকার, উঠান, ফটক, দালান, দরদালান! সব বড়, সব বিস্তৃত, সব উচ্চ অঙ্গের শিল্প-সম্পদে আবৃত। অনেক নূতন মেরামত হইতেছে। মান্দ্রাজের কোন "চেটী" অর্থাৎ "শেঠ" মেরামতের ভার লইয়াছেন। কিন্তু মেরামতের সাহায্যের চাঁদাও যাত্রীদের নিকট হইতে আদায় হইতেছে। আমাদের একজন সহযাত্রী বলিলেন,—"চেটী" পাইবেন খেতাব, আমরা দিতেছি চাঁদা! পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এমনি হয়।

জম্বীরেশ্বর শিবের মন্দিরের পার্শ্বেই অম্বার মন্দির, কষ্টি-পাথরের বালিকা-মূর্ত্তি, হাতের উপর সোণার পাখী খেলার জন্য রহিয়াছে। গৌরীর বিবাহের পূর্ব্বেকার এই মূর্ত্তি।

জম্বীরেশ্বর শিব বারমাস জলের মধ্যে ডুবিয়া আছেন, কেবল পূজার সময় দশবারজন পূজারী তাড়াতাড়ি খানিক জল সেঁচিয়া কতকটা চন্দন মাথায় দিয়া পূজা সারিয়া লয়। পশ্চাতেই প্রকাণ্ড জম্বীর অর্থাৎ জামগাছ! ইহার তলায় শিব থাকিতে ভালবাসেন বলিয়া, তাঁহার নাম জম্বীরেশ্বর। দাক্ষিণাত্যে শিব কোথাও জামগাছ, কোথাও আমগাছ, কোথাও বা কদম গাছ ভালবাসেন। সেই অনুসারে তাঁহার নাম হয়। তুলসীতে শিব ও কালীর পূজাও হয়।

বাহিরের প্রাকারে দোকান, এমন কি চাউল, তরকারী, ফল পর্য্যন্ত বসিয়াছে।

আবার ত্রিচিনাপল্লীর পাহাড় মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ষ্টেসনে চা খাইলাম। আমাদের সহচর জগদীশ ও তাহার ভ্রাতা সুব্রহ্মণ্য (মণি) কত যত্ন করিয়া সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিল বলা যায় না। কোন বিষয়ে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে দেয় নাই। যথাসময়ে চা, খাবার, পান, বিছানা, রিজার্ভ গাড়ী, যান বাহন, যাহা প্রয়োজন জোগাইয়াছে। যাহাকে যাহা দিলে ভাল হয় তাহা দিয়াছে, কাহারও সহিত কোন বচসা কলহের অবকাশ রাখে নাই। এমন বন্দোবস্ত না হইলে এই সুদীর্ঘ পথে এই সকল সুদূরবর্ত্তী তীর্থস্থানে এমন সুবিধা হইত না। ইহাতে খরচ কিছু বেশী হইয়াছে বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব সুবিধাও হইয়াছে। রাত্রে দুইখানা রিজার্ভ গাড়ী ছিল, সকল সুবিধাই হইল।

দ্বাদশীর ভোরবেলা হইতে রামেশ্বর মন্দির প্রতীক্ষায় সকলেই উৎসুক, কিন্তু চা পাইবার জন্য ঔৎসুক্য কাহারই তাহার চেয়ে কম নয়। তার করিয়া মণ্ডপ ষ্টেসনে চা, গরমজল ও দুধের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

পম্বান ষ্টেশন হইতেই দ্বীপের দুই পার্শ্বের সমুদ্র দেখা যাইতে লাগিল। নারিকেল গাছের ভিতর দিয়া সমুদ্রের সুন্দর দৃশ্য! পম্বান ও রামেশ্বরের মধ্যে সমুদ্রের প্রকাণ্ড 'খাড়ী' (creek)। রেলওয়ে ব্রিজে তাহা সম্প্রতি পার হইয়া ধনুষকোটী পর্য্যন্ত রেল-লাইন গিয়াছে। প্রকাণ্ড রেলওয়ে ব্রিজ! তারপর সমুদ্র ডাইনে বামে দেখিতে দেখিতে রামেশ্বরের বিশাল দেউল নয়নগোচর হইল। আমার উপদেশমত রামেশ্বরে না নামিয়া বরাবর ধনুষকোটী চলিয়া গেলাম। সেখানে রেলওয়ের ডাক্তার ডাকবাঙ্গালায় সব বন্দোবস্ত ঠিক রাখিয়াছিলেন। গরুর গাড়ীতে দুই ক্রোশ বালি ভাঙ্গিয়া, সংকল্প করিয়া স্নান ও শ্রাদ্ধপিণ্ড শেষ করিয়া আসিয়া যথেষ্ট আহার বিশ্রাম হইল।

ধনুষকোটীর তিনদিকে সমুদ্র। রামচন্দ্রের ধনুকের 'কোটী', অর্থাৎ অগ্রভাগে অবস্থিত। এইখানে স্নানই যথার্থ "সেতুস্নান"। অধিকাংশ যাত্রী কষ্ট করিয়া এতদূর

না আসিয়া রামেশ্বরেই স্নান দর্শন সব শেষ করে। প্রবাদ আছে, রামচন্দ্র সমুদ্রকে এইখানে বাণবিদ্ধ করিবার ভয় প্রদর্শন করায় সমুদ্র বাঁধা পড়িতে স্বীকৃত হন। এইখানে জাহাজ চড়িয়া সিংহল যাইতে হয়, পরে রেলওয়েতে কলম্বো যাওয়া যায়।

৪টার গাড়ী। অর্দ্ধঘণ্টার পথ অতিবাহন করিয়া রামেশ্বর পৌঁছিলাম। সমস্ত পথ, যাইবার আসিবার সময়ই, রামেশ্বরের প্রকাণ্ড দেউল দেখা যাইতে লাগিল। বাসায় জিনিসপত্র রাখিয়া গরুর গাড়ীতে করিয়া সমুদ্র তীরে গেলাম। প্রথমে অগ্নিতীর্থ দেখিলাম,—ইহা সীতার অগ্নি পরীক্ষার সাক্ষী। কোন বাড়ী ঘরদ্বার এ তীর্থে নাই, বিস্তৃত উন্মুক্ত সমুদ্রই পরীক্ষার সাক্ষী। নিকটে এক কালী-মন্দির আছে। অদূরে সমুদ্র তীরে মহাশ্মশান।

আমাদের সহচর জগদীশ বাসার বন্দোবস্তে ব্যস্ত ছিল বলিয়া আমরা নিজেই মন্দিরের ভিতর গেলাম। একটার পর একটা মন্দিরে যেখানে যাই সেইখানেই অধিকতর বিস্ময় উৎপন্ন হয়। মন্দিরের ফটক, তোরণ (গোপুরং), চারিদিকের দরদালান, উঠান, চত্বর, প্রাকার—সবই বহুবিস্তৃত, দীর্ঘ ও অপূর্ব্ব। দরদালান এত দীর্ঘ যে সেরকম দরদালান (Corridor) আর কোথাও নাই বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। দরদালানের গায়ে পুরাতন রাজা, ঋষি, দেবতা ও নানা পশুপক্ষীর পাথরে, চূণ সুরকীতে কোথাও কাঠের বৃহৎ মূর্ত্তি। ছাতের গায়ে ও দেয়ালে অসংখ্য ছবি। বড় বড় অ্যাসিটেলিন্ গ্যাসের আলোকে দরদালান, হল সব আলোকিত। অতএব রাত্রে দর্শনেও কোন বাধা নাই। রামেশ্বর শিব ও অম্বিকা তো আছেনই, তাহা ছাড়া বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও অন্যান্য দেবতাও বিস্তর আছেন। সর্ব্বত্রই সকল দেবতা বর্ত্তমান।

লঙ্কা বিজয়ের পর রামচন্দ্র মহাদেবের সম্মানার্থ রামেশ্বর শিব স্থাপন করেন। হনুমানের ইচ্ছা হইল। কাশীর বিশ্বেশ্বরকে এইখানে আনিয়া বসান হউক, গন্ধমাদন আনিয়া হনুমানের আস্পর্দ্ধা ও অভিমান বাড়িয়া গিয়াছিল, তাই বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিতে ছুটিলেন। বিশ্বনাথ আসিলেন কিছু দেরী করিয়া। অন্নপূর্ণা মোটেই আসিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার প্রতিনিধি বিশালাক্ষী আসিলেন। হনুমানের সম্মানার্থ রামচন্দ্র হনুমানকে দিয়াই বিশ্বনাথ ও বিশালাক্ষীর প্রতিষ্ঠা করাইলেন। অন্যান্য বিস্তর দেবতা চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠিত। বৃহৎকায় নন্দীকেশ্বর ষণ্ড, গজস্তম্ভ প্রভৃতি শিবমন্দিরের উপযোগী সমস্ত আয়োজন রহিয়াছে। পাটকিলা রঙ্গের শিবমূর্ত্তি, পশ্চাতে অসংখ্য প্রদীপের মালায় আলোকিত মূর্ত্তি দেখা যায়। কর্পূর আরতি উপলক্ষেই যাত্রীগণ দূরে অন্ধকারের মূর্ত্তি ভাল দেখিতে পায়।

স্বতন্ত্র প্রাকারে অম্বিকা মূর্ত্তি অবস্থিত। সেখানে মন্দির নূতন করিয়া গঠন হইতেছে।

আরতি দর্শন করিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিলাম। ত্রয়োদশীর দিন প্রাতে পুনরায় মন্দিরে যাইয়া পুনরায় মন্দির ও দেবদর্শন করিলাম। মন্দিরের আকৃতি, গঠন-সৌন্দর্য্য ও শিল্পসম্ভার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। মন্দিরের চারিধারে প্রকাণ্ড দরদালান। তাহার গায়ে প্রতি থামের উপর কত দেবতা, কত রাজা, কত পশু পক্ষীর প্রস্তরময় সুন্দর ও বিরাট মূর্ত্তি তাহার সংখ্যা করা যায় না। মন্দিরের ভিতরে প্রকাণ্ড পাথর বাঁধান পুষ্করিণীও আছে। মন্দিরের ফটক, দরজা, সব বিরাট। বাহিরে হনুমানের মাতা অঞ্জনার মন্দির। যে দশাননকে বধ করিবার বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ রামেশ্বর শিবস্থাপন, তাহারও এক মন্দির স্থাপন করিতে ভুল হয় নাই। রামচন্দ্র মূর্ত্তিও এক মন্দিরে আছে।

দিনের আলোতে গোপুরং এবং মন্দিরের উচ্চতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

রেলকর্ম্মচারী, ডাককর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলেই বিশেষ যত্ন করিয়া সকলরূপ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। পথের আহার সংগ্রহ করিয়া ৯|৽ টার গাড়ীতে চাপা হইল। আবার পাম্বানের উপর পুল পার হইয়া সমুদ্র-লঙ্ঘন করা হইল। সেতুবন্ধের যথার্থ চিহ্ন রামেশ্বর, ধনুষ্কোটী বা পাম্বান হইতে দেখা যায় না। নৌকা কিংবা জাহাজ করিয়া দূর সমুদ্রে গেলে সমুদ্রে ডোবা পাথর কোথাও কোথাও দেখা যায়।

বেলা ১২॥ টার সময় মদুরা পৌঁছিলাম। বড় রৌদ্র বলিয়া ষ্টেসনে বিশ্রাম করিয়া চা খাইয়া সহর দেখিতে গেলাম। প্রথম "টেপাকুলং" নামক বাঁধান প্রকাণ্ড সরোবর দেখিলাম। সরোবরের মধ্যস্থলে ছোট দ্বীপ, তাহার উপর বাগান ও মন্দিরের সৌন্দর্য্য চমৎকার। দ্বীপের চারিকোণে চারটি ছোট ছোট মন্দির।

তারপর মদুরার রাজবাড়ী দেখিতে গেলাম। এত উচ্চ থামওয়ালা বাড়ী কোথাও দেখি নাই। মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড উঠান। চারিপাশে প্রকাণ্ড মোটা থাম-দেওয়া বাড়ী ও দালান, এখন তাহা আদালত হইয়াছে। রাজবাড়ীর এরূপ ব্যবহারে বড় ব্যথা বোধ হয়। যদি শুধু ফেলিয়া রাখিতে আপত্তি ছিল, অন্ততঃ মিউজিয়ামের মত করিয়া রাখিলেও চলিত।

তেমন থাম ও খিলানের বাহার কোথাও দেখি নাই। থামওয়ালা ফটক এত উচ্চ যে ছাত যেন নজর হয় না।

রাজবাড়ী দেখিয়া সহরের প্রধান মন্দির মীনাক্ষীর মন্দির দেখিতে গেলাম। কাগজে কলমে সে মন্দিরের যথেষ্ট বর্ণনা এখনও কেহ করিতে পারে নাই। দেখিয়াও সহজে ধারণা হয় না। ক্রমাগত একমাস ঘুরিয়া দেখিলেও সব দেখা হয় কিনা সন্দেহ।

কেল্লার মত মন্দিরের বাহিরে দেয়াল। চারদিকে চারটা বড় ফটক বা গোপুরং আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, তাহাদের গায়ে অসংখ্য মূর্ত্তি। ভিতরে ছোট ছোট ফটক বা গোপুরং বিস্তর। তারপর প্রাকারের পর প্রাকার, উঠানের পর উঠান, হল, দরদালান, ঘর, মন্দির, মণ্ডপ, মূর্ত্তি, ছবির সংখ্যা হয় না। ইলেক্ট্রিক আলো চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। অসংখ্য প্রদীপের আলোতেও মন্দিরের ভিতর আলোকিত। কেবল মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বর শিবের মন্দিরের মধ্যে ইলেক্ট্রিক আলো জ্বালা হয় না। স্বর্ণকমল সরোবর নামে মাঝখানে বাঁধান সরোবরে অসংখ্য যাত্রী স্নান পূজা করিতেছে। বাঁধা ঘাটের উপর দালান, তাহাতে স্থানে স্থানে কত পুরাণ মহাভারত পাঠ চলিতেছে। দালানের গায়ে অসংখ্য শিবের লীলামূর্ত্তি। প্রতি থামের গায়ে অপূর্ব্ব, ভীষণ অথবা সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি চক্ষে পড়ে পড়ে। রাজা, দেবতা, মুনিঋষি, রক্ষ, যক্ষ, কিন্নর, নবগ্রহ প্রভৃতির অসংখ্য মূর্ত্তি। কষ্টি পাথরের মূর্ত্তিও মণ্ডপে যে কত তাহার সংখ্যা বোধ হয় কেহ কখনও করিতে পারে না। এক প্রাকারের মধ্যে সহস্র স্তম্ভ দেব সমাগম স্থান, তাহাকে 'হল' বলিতে হয় বল, মন্দির বলিতে হয় বল। মধ্যস্থলে দেবতার উৎসব বেদী। প্রাকারের মধ্যে শতস্তম্ভ 'হল'।

বাহিরের প্রাকারে প্রকাণ্ড বাজার। কত লোক যাইতেছে আসিতেছে, বেচাকেনা করিতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

আজ মহাপ্রদোষ অর্থাৎ চতুর্দ্দশী-যুক্ত ত্রয়োদশী তাই দেবতার 'যাত্রা' দেখিতে পাওয়া গেল। রৌপ্য বাহনে সুন্দরেশ্বরের প্রতিনিধি মূর্ত্তি মহাসমারোহ করিয়া মন্দিরের ভিতর প্রাকারে যাত্রা বেশে ভ্রমণ করেন। সঙ্গে ছোট ছোট হাতী, বাজনা, আলো, বেদপাঠী ব্রাহ্মণ দল বাঁধিয়া চলিতে লাগিল। ধূপধুনার গন্ধে মন্দির আমোদিত। যাত্রাশেষে শত শত ব্রাহ্মণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বসিয়া বেদপাঠ করিতে লাগিলেন। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলে হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

মীনাক্ষীর মূর্ত্তি কষ্টিপাথরের। সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষীর মন্দিরের উপর সোনার কলস। উহা মন্দির-পরিভ্রমণ সময়ে ও সরোবর-তীর হইতে দেখা যায়। গোপুরং ও ফটক আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু দেবতার নিজের মন্দির অতি ছোট। দেবতার মাহাত্ম্যই বুঝিতে হইবে। রামেশ্বর-মন্দিরে শেষে ভ্রান্ত ভক্ত যাহাই করুক, মন্দির-নির্ম্মাতা আরম্ভে রাম, সীতা বা লক্ষ্মণের কোন প্রাধান্যই দেন নাই। ভুবনেশ্বরের মন্দিরেরও দোষ দেওয়া হইয়াছে যে, বিশ্বকর্ম্মা নিজ মন্দির-কার্য্য শেষ করেন নাই।

চের, চোল, পাণ্ড্যবংশ দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর-রাজ্য ধ্বংসের পর কি আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, শিল্পকলার কতদূর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহার কতক প্রমাণ মদুরা, তাঞ্জোর, শ্রীরঙ্গম্ এবং রামেশ্বর-মন্দিরে পাওয়া যায়। মুসলমান প্রতাপ এদিকে বড় বাড়িতে

পারে নাই। বিশ্বনাথ নায়ক, আর্য্য নায়ক, তিরুমল্ল প্রভৃতির নাম এখন ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত বলিলেই হয়। এ সকল স্থান দেখিয়া তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি আবার জাগিয়া উঠে। দুঃখ হয় যে, বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ সে সকল বিষয়ে এত উদাসীন! অগস্ত্য-যাত্রার ফলে দাক্ষিণাত্যের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। আর্য্য-সভ্যতা ও সাহিত্য দাক্ষিণাত্যে স্থান না পাওয়াতে অভিমান-স্ফীত আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্যকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। অগস্ত্য ঋষির প্রভাবে তামিল-সাহিত্য সাহায্যে এক, নূতন বল বা পুরাতন বল, সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু পরিচয় এখন পাওয়া যাইতেছে। মুসলমান-বিজয়পুর ধ্বংসের ভিত্তির উপর শিবাজীর রাজ্য, হিন্দু-বিজয়নগর ধ্বংস-ভিত্তির উপর চের, চোল, পাণ্ড্য-সমৃদ্ধি।

মদুরাতে ছোট বড় বিস্তর মন্দির আছে, ধরণ সব একই। মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বরের মন্দির দেখিয়া আর কোন মন্দির দেখিবার প্রয়োজন হয় না। এক মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বরের মন্দির তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে কতদিন লাগে বলা কঠিন।

উপরোক্ত মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়ঃ—

১। মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বরের মন্দির ও তাহার স্বর্ণকলস বা বিমান।
২। স্বর্ণপদ্ম সরোবর—বাঁধা দীঘি।
৩। রাজার খাম্বা হল।
৪। রৌপ্যের নটসেন মূর্ত্তি।
৫। তাণ্ডব-নৃত্যোন্মত্ত নটরাজ মূর্ত্তি।
৬। শতস্তম্ভ হল।
৭। চতুর্দ্দিকের "প্রাকারং" ও "গোপুরং"।
৮। অষ্টশক্তি মণ্ডপ বা অষ্টলক্ষ্মী মণ্ডপ।
৯। বিরাট-মূর্ত্তি গণেশ।
১০। চণ্ডিকেশ্বর।
১১। মণ্ডপ।
১২। দক্ষিণামূর্ত্তি।
১৩। প্রাচীন কদম্ব বৃক্ষ—শিব ইহা বড় ভালবাসিতেন।
১৪। কৈলাস পর্ব্বত মাথায় করিয়া রাবণ।
১৫। দণ্ডপাণি।
১৬। মীনাক্ষীর মাতা কাঞ্চণমালার মূর্ত্তি।
১৭। পদু মণ্ডপ বা মন্দিরের বাহিরে নূতন মণ্ডপ।
১৮। কল্যাণ মণ্ডপ।
১৯। সপ্তসমুদ্র সরোবর।
২০। শুন্তোদর।

মদুরার দর্শন শেষ করিয়া ষ্টেসনে ১২৷৷০টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। ঠনঠনিয়ার শরৎ মিত্র, কালী মিত্র ও চারু মিত্রের পরিবারবর্গ, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের মাতা প্রভৃতির সহিত মন্দিরে দেখা হইয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে কাটাইয়া চতুর্দ্দশীর দিন পুনরায় তাঞ্জোর পৌঁছিলাম। পথে ত্রিচিনাপল্লীতে কাফি খাওয়া হইল। ত্রিচিনাপল্লীর পাহাড়-কেল্লা ও শিক্ষানেশ্বরের মন্দির আবার দেখা গেল। রাজার মোটর ও লোকজন তাঞ্জোর ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল। বৃহদেশ্বরের মন্দির আবার চক্ষে পড়িল।

বৈকালে সেই প্রকাণ্ড মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গন ও আকাশস্পর্শী গোপুরং, গণেশ, কার্ত্তিকেয় ও বৃহন্নায়িকার মন্দির ও মূর্ত্তি এবং আরতি তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল; প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থাও হইল।

কাল কষ্টিপাথরের এত বড় বৃষ আর কোথাও নাই। খাতায় নাম সহি করিয়া মন্দির হইতে বিদায় লইলাম।

লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন প্রাতে ও সমস্তদিন বিশ্রাম করিয়া ছোট রাজার চা-পার্টিতে গেলাম। ছোটরাণী নিমন্ত্রণ করিয়া আমার সহযাত্রিনী মহিলাবর্গকে লইয়া গিয়া অনেক খাতির যত্ন করিলেন। দশমীর দিন বড় রাজা ও তাঁহার মাতা ও বড়রাণীও এইরূপ করিয়াছিলেন।

যে গোলাপের তোড়া ও মালা উপহার পাইলাম, তেমন আমরা কখনও দেখি নাই। এইরূপে এখানে অনেক জায়গায় গোলাপের মালা পাওয়া গিয়াছে। মহিলাদিগকে স্বতন্ত্র মালা দিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছে। সরস্বতী নাম্নী জগদীশ আয়ারের এক বুদ্ধিমতী ও সেবাপরায়ণা ভ্রাতুষ্পুত্রী সকলের যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিয়াছে। ভাষাজ্ঞানের অভাবেও সে আকার ইঙ্গিতে সকলের সকল অভাব জোগাইয়াছে,—দৌড়াইয়াছে,

হাসিয়াছে, আলাতন করিয়াছে, মালা তোড়া লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছে।

জগদীশ ও তাহার ভ্রাতা নটসেন কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়াছে। তাহাদের মামাতো ভাই সুব্রহ্মণ্য রেলে কর্ম্ম করে। ত্রিচিনাপল্লী, শ্রীরঙ্গম্, ধনুষ্কোটী—সকল জায়গায় সুবন্দোবস্ত তাহারই সাহায্যে হইয়াছিল। সে নিজের কাজের ক্ষতি করিয়া মদুরায় আমাদের সাহায্য করিতে গিয়াছিল।

ছোট রাজার চা-পার্টি'র পর বড় রাজার সহিত কাজকর্ম্মে অনেক রাত্রি হইল। মোটর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য মন্দির দেখিতে যাইবার ইচ্ছা ছিল, সময় হইল না।

পরদিনও (২৩শে আশ্বিন, শুক্রবার) সকালবেলা রাজবাড়ীতে কাজের জন্য যাইতে হইল। রাজবাড়ীতে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী আছে, তাহাতে ২৮০০০ হাতে লেখা তালপাতার পুঁথি ও অন্যান্য অনেক পুস্তক রহিয়াছে।

বৈকালে বড় রাজা আমার জন্য প্রকাণ্ড চা-পার্টি দিলেন। সহরের গণ্যমান্য সকল লোককে আলাপ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

(পরসংখ্যায় সমাপ্য।)

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

খেলা

নিশিদিন বুকে চাপা এই ভয়
নয় আর, আর নয়।
আলোকের ঘায়
ভয়াতুর হৃদয়ের ঘুমের আরাম ছুটে যায়,
দিবস-শয়ন ত্যজি গুটি গুটি বাহিরিয়া আসে
যেই খানে ভোরের বাতাসে
ডাল পাতা নড়ে ওঠে, পাখীদের টুটে যায় ঘুম
আরামেরে ধাওয়া করে মাবুবার লেগে গেছে ধুম।
ভীরুর আরাম বটে ভয়,
পঙ্গুর আরাম পরাজয়।
কান্নার আরামটুকু লগ্ন ছিল কিশলয়ে ঘাসে,
চকিতে শুকায়ে সেও আসে
আলোর প্রখর শরাঘাতে
আঁকড়িয়া নারে দুই হাতে
ধরিয়া রাখিতে তার আশ্রয়ের শেষ তৃণ গাছা।
ওরে এ অল্পাখা থেকে আপনারে বাঁচা তুই বাঁচা,
ফুলের হাসির মতো আগে ভাগে সব দিয়ে ফেলা
জুড়িয়া দে হাসিমুখে মরণের সনে সেই খেলা।
ঝরে ঝরে যায় ফুল হার নাহি মানে,
মরণেরে ঋণী করে জীবনের দানে।

শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী।

মরণ।

ভাবি যবে সব ছেড়ে চলে যাব কোন্ দিন,
হয়ত হবেনা বলা যত কথা বলিবার,
না বাজিতে যৌবনের মদির মধুর বীণ্
কঠোর নিয়তি স্পর্শে হয়ত ছিঁড়িবে তার!

নক্ষত্র খচিত ওই নীলাকাশ রজনীর,
ঊষার সলজ্জ উঁকি পূবাশার দ্বার খুলি,'
নীরব কাহিনী কত ভাষাহীন প্রকৃতির
আঁকিবেনা আর কভু কল্পনার মায়াতুলি!

আর,—যবে মনে হয়, মানস-প্রতিমা অয়ি,
ফুটন্ত মাধুরী তব হেরিতে পাব না হায়,
প্রেমের অমর রাজ্যে আরত, কুসুমময়ি,
পারিব না তব সনে মিশাইতে আপনায়!

সংসার সাগর তীরে দাঁড়ায়ে যেন গো একা
তখন, মিলায় শূন্যে প্রেম ও যশের রেখা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

সাহিত্যিক পত্র

(স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি, আই, ই মহোদয়ের নিকট লিখিত। তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।)

স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্তের পত্র।

শ্রীহরিঃশরণম্।

২৮। ১৬ অখিল মিস্ত্রীর লেন

কলিকাতা, ১৫ই পৌষ, ১৩০১।

বন্ধুবরেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি। যে বিষয় লিখিতে চাহিয়াছেন, তাহা মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে পাইলেই ভাল। পত্রের ভাবে লিখিয়া পাঠাইলে উহা পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইবে—তৎপরে পত্রিকায় বাহির হইবে। আর যদি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের ভাবে লিখিত হয়, তাহা হইলে একা এক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। আমার বিবেচনায় পত্রিকার ৫। ৬ পেজ হইতে পারে, এরূপ একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলেই ভাল হয়। ঐ প্রবন্ধ মাঘ মাসের ৮। ১০ দিনের মধ্যে পাইলেই হইবে। আর যদি একান্ত অবকাশ না হয়, তাহা হইলে পত্রের ভাবেই লিখিবেন।

শ্রীযুক্ত দীনবাবুর * নিকটে প্রাদেশিক শব্দের সম্বন্ধে আফিস্ হইতে পত্র গিয়াছে। বোধহয়, তিনি উহা পাইয়াছেন। শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থাবলীতে প্রাদেশিকত্ব সম্বন্ধে কিরূপ নিয়ম অবলম্বন করা উচিত, তদ্‌বিষয়ে তিনি মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। আপনার সহিত যদি দেখা হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে এ বিষয় বলিবেন।

যে সকল প্রাচীন সঙ্গীত ও কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয় নাই, তৎ সমুদয় আপনার নিকটে সংগৃহীত থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রিকার প্রকাশের জন্য দিবেন। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে যিনি যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, পরিষদের সাহায্যে তিনি তৎ সমুদয় প্রকাশ করিতে পারেন। এ বিষয়ে কাহারও অমত হইবার সম্ভাবনা নাই। ঢাকায় শ্রীযুক্ত বাবু অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয় কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। উহা প্রকাশের জন্য পত্র লেখা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উহা এখানে প্রকাশ করিতে সম্মত হয়েন নাই। পূর্ব্ববঙ্গের লোক যদি পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের জাতীয় গৌরবের বিষয় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃতিত্ব বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা। এ বিষয়ে অক্রুর বাবু কেন অমত করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না।

আমরা একরূপ আছি। আপনাদের কুশল সংবাদে সন্তোষিত করিবেন। ইতি

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র।

শ্রীহরিঃশরণম্।

নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।

১৬ই ফাল্গুন ১৩১৬।

মহাশয়,

অদ্য 'বুকপোষ্ট' যোগে আপনার নিকট "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক আমার একখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠাইলাম। ইহাতে অনেকগুলি দর্শন ও নীতি বিষয়ক কথার আলোচনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন কথা লইয়া অবশ্যই মতভেদ হওয়া সম্ভাবনীয়। পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গালি সমাজের আপনি একজন প্রধান নেতা। এই পুস্তক অথবা ইহার কিয়দংশ অবসর মত আপনি পাঠ করিলে প্রীত হইব।

আশা করি আপনি এক্ষণে শারীরিক ভাল আছেন। ইতি—

আপনারই

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

* স্বর্গীয় দীননাথ সেন

স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

বেনারস সিটী—
অক্টোবর ৮—৯৯

সবিনয়ে নিবেদন মিদং—

গতকল্য মণিঅর্ডারের দ্বারায় ১০০৲ (একশত) টাকা পাইয়াই তখনই পৌঁছ সংবাদ আপনাকে জানাইয়াছি। অদ্য আপনার পত্র পাইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত আবার জানাইতেছি। আমার ন্যায় ভিক্ষুককে যে ভুলেন নাই ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।

*　*　*　*　ইতি

আশ্রিত
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছিন্নকমল

আমার পরাণপদ্ম ফুটেছিল ওগো
　　তোমারি তরে
　তোমার পূজার লাগি
তব রাতুল চরণ মাগি!
　　হৃদয় ভরা
মধু-সুমধুর এত নিবেদন
　　আকুল করা
　　পড়িবে ঝরে?
তব, মৌন-মরণ-মন্ত্র-মন্ত্রে
　　আমার প্রাণ
　　চাহে কি দান?
ওগো তুমি যে মৃণাল আমি তব ফুল
　　গেলে কি ভুলে?
　লুকাইয়া ছিলে জলে
আজি লুটিয়া পড়িলে তলে
　　বাঁধন টুটি;
তুমি আর আমি দূরে ছাড়াছাড়ি
　　হইনু দু'টি—
　　কিসের ভুলে?
তব লুলিত ও লতা পুন ফুল সাজে
　　ভরিবে ফুলে
　　নূতন কূলে!
আমার বিফলবিলাপ বেদনার দল
　　পড়িছে খসি
　অকূল আনন্দেশে
তাই যেতেছি কেবলি ভেসে
　ক্রমশ দূরে!
যদি কোনদিন ফিরে আসি এই
　মানবপুরে
　　এঘাটে পশি
তুমি শিহরিয়া যেন দিওনা সরায়ে
　　হে মহীয়সি,
　　চির প্রেয়সী!
থাক্ তোমার ও তীরে চির নিশিদিন
　　বিরাম হীন
বেঁচে প্রেমের ফাগুন রাগ;
মোর চির প্রতীক্ষা যাগ
　বহ্নি বাজে
ফিরিয়া পাইতে তোমারে আবার
　আমারি মাঝে!
　　পাবই ধ্রুব।
তবু আপনার জনে ফিরিয়া পাইতে
　　সাধনা কেন,
　　যাতনা হেন?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

লক্ষ্মণ-মাণিক্যের "বিখ্যাত বিজয়।"

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার যে দ্বাদশ জন ভৌমিক বঙ্গদেশের উদ্ধার-কল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভুলুয়ার লক্ষ্মণ-মাণিক্য অন্যতম। তাঁহার অসমসাহসিকতা এবং রণনৈপুণ্য বঙ্গোপসাগরের জলযুদ্ধে বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। আরাকানবাসী মগদিগের অমানুষিক অত্যাচারে যখন বঙ্গভূমির শ্যামায়মান পূর্ব্বপ্রান্ত শ্মশানে পরিণত হইতেছিল, তখন এই বীরবর অসির ফলকে শত্রুপৃষ্ঠে গভীর রেখাপাত দ্বারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, শিশু এবং বিপন্ন নরনারীর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছিলেন। পর্ব্বত মেখলা চট্টলের গৈরিক মৃত্তিকা এবং নীলাম্বু-বেষ্টিত ভুলুয়ার সৌকতভূমি মগ-শোণিতে রঞ্জিত করিয়া বীরপ্রাণ লক্ষ্মণ-মাণিক্য দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু রণক্ষেত্রে বিপুল যশ অর্জ্জন করিয়াও ইনি বীণাপাণির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলেন। রণ-শ্রান্ত দেহে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রান্তি অপনোদনের জন্য ব্যসনে সময় ক্ষেপন করা অপেক্ষা কাব্যালোচনায় চিত্ত-বিনোদন করাই তিনি শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতেন। তিনি অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বলবিক্রমের গৌরব-কাহিনী কালস্রোতে বিলীন হইয়া গেলেও তাঁহার কবি-প্রতিভার অমল ধবল যশোমাল্য কখনও ম্লান হইবে না। এই বীর-কবির লেখনী-প্রসূত "বিখ্যাত বিজয়" নামক একখানি সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি কুমিল্লা নগরীতে পণ্ডিত অন্নদা চরণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। পুথিখানি তালপত্রে বঙ্গাক্ষরে লিখিত। আকার ১৪"×১½"। শ্লোক-সংখ্যা ত্রয়োদশ শত। ষড়ঙ্কে এই নাটকখানির পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

১৬৭৭ শকাব্দায় এই পুথিখানি নকল করা হইয়াছে। কিন্তু প্রণয়নের সন বা তারিখের উল্লেখ নাই। কোনও সময়ে লক্ষ্মণ-মাণিক্য তীর্থ-ভ্রমণোদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সমবেত ভারতীয় নৃপতি-বৃন্দের চিত্ত-বিনোদনের জন্য তাঁহাদিগের অনুরোধে নাট্যাচার্য্য মনোহর মিশ্রের তত্ত্বাবধানে এই নাটক অভিনীত হইয়াছিল। নাটকের বিষয়, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণবধ। প্রথমাঙ্কে শ্রীকৃষ্ণানয়ন জন্য সহদেবের দ্বারকা নগরে অভিযান এবং শ্রীকৃষ্ণানয়ন। দ্বিতীয়াঙ্কে কর্ণ-শল্যের বাক্‌বিরোধ, নকুলের সহিত কর্ণের যুদ্ধ এবং নকুলের নিগ্রহ। তৃতীয়াঙ্কে কর্ণবধের জন্য পাণ্ডবদিগের উদ্যোগ। চতুর্থাঙ্কে কর্ণ ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধারম্ভ পঞ্চমাঙ্কে গাণ্ডীব নিন্দার জন্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি অর্জ্জুনের ক্রোধ এবং শ্রীকৃষ্ণের তাহা উপশমন ও কর্ণবধ ষষ্ঠাঙ্কে কর্ণ-নিধনে আনন্দিত পাণ্ডবগণের উল্লাস।

এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, লক্ষ্মণ-মাণিক্য আরও কয়েকখানা নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তদ্বিরচিত আর কোন নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বীর-কবির রচিত এই নাটকখানি বীররস প্রধান। কাব্যাংশেও ইহা সংস্কৃত ভাষার একখানি অলঙ্কার-স্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ :—

প্রারম্ভ।

বিক্রান্তির্নারসিংহী নিশিতনখমুখক্ষুণ্ণ দৈত্যেন্দ্রবক্ষঃ-
স্রাভূন্নির্ঘাতবেগোচ্ছলিতঘনরজঃরুদ্ধপংক্তিস্রবন্তী।
পাতুব্বাং কেশরাগ্রপ্রপদনখশিখাযোগপদ্মপ্রতানৈ-
র্ব্বাধঃপীড্যমানপ্রশিথিলবিচলন্মধ্যমব্রহ্মডিম্বা॥

অপিচ।

দৃষ্ট্বা সৌমিত্রিমর্ম্মগতনিশিতমহাশক্তিমুৎক্রান্তধৈর্য্যা—
স্তচ্ছান্ত্যর্থং তদেব ত্রিভুবনবিবরোৎসারিভিঃ শস্ত্রজালৈঃ।
উৎকৃত্তৈরুত্তমাঙ্গৈ রজনিচরপতের্দিকপতিভ্যো দদত্যা
স্তীব্রামোদপ্রদং বো বলিমুপহৃতবান্ রামচন্দ্রঃ পুনীতাম্॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ। অলমতিবিস্তরেণ। অয়ে কিমিদমপূর্ব্ববস্তুবিলোকনাদুৎসাহপরীবাহং বিগাহমান ইব সংবৃত্তোঽস্মি। কিঞ্চিদূদ্ গ্রীবমবলোক্য। অহো প্রবলঘনঘটা প্রতিভটদম্ভাবলপটলঘণ্টাটোপটঙ্কা রতিরক্তাপিঞ্জনয়ো দিগিভাগা বর্ত্তন্তে॥

প্রবিশ্য পারিপার্শ্বিকঃ ভাব বিজয়তাং বিজয়তাং জগদুত্তরকীর্ত্তিমত্তয়া।

সূত্রধারঃ মারিষ বিজয়সম্ভাবনাবিশেষঃ প্রস্তূয়তাম্।

পারিপার্শ্বিকঃ অস্ত খলু কুরুক্ষেত্রযাত্রাগমাহূত-মহাপতিমণ্ডলমুকুটমাণিক্যভূতৈর্ভূপালভারতায়োধনভূবিলোকন প্রাদুর্ভূতোদ্দীপনবিভাবৈঃ সংভূয় সান্দ্রৈ অস্মদ্‌গুরবো মনোহরমিশ্রাঃ যৎ ত্বং মনোহরতয়া বিশ্রুতোহসি তৎসাহস্ত্রায়ি প্রবন্ধপ্রয়োগাবধাতৃতয়া বৃতোহস্যভিনয়ার্থানুসারিণীং ক্রিয়াং প্রতিপাদয়স্বেতি।

পারিপার্শ্বিকঃ তদনুকারী কতমঃ প্রবন্ধোহনুসন্ধীয়তে সতীর্থপ্রতীক্ষেণ।

সূত্রধারঃ যাদৃক্ সমুচিতোহয়ং সমাবেশঃ।

প্রক্ষাবৎ পরিতোষনিস্তুষমহামাণিক্যরত্নাকরঃ
প্রাক্ সৎপুরুষপৌরুষোৎকরকথাস্রোতস্বতীভূধরঃ।
দৃপ্যাচ্চারণ চাতুরীমধুকরী প্রাগল্‌ভ্যপুষ্পাকরঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণভূপতেরভিনবস্তাদৃক্ প্রবন্ধোত্তরঃ॥

পারিপার্শ্বিকঃ সানুমোদং। ভাব
আশ্রয়া যস্য রাজানস্তস্য বীররসস্য চেৎ।
প্রবন্ধো ভূভুজা বদ্ধস্তস্মিন্নৌপায়িকঃ শ্রমঃ॥

কিঞ্চ যদ্যপি মহীমহনীয়মহিম্না তেনোপনিবদ্ধানি দৃশ্যকাব্যানি বহুন্যনুবর্ত্তন্তে। তথাপি বিশিষ্টবিশেষণৈবিখ্যাতবিজয়ং নাম নাটকং কণ্ঠোত্থমিব সম্ভাবিতং ভাবস্য। ইত্যাদি।

শেষাংশ রাজা। ভগবন্ যুধিষ্ঠিরৈকশরণ! কিমতঃপরং প্রিয়মস্তি।

আজন্মপ্রতিকূলতাং প্রথিতয়ন্ দুর্য্যোধনঃ সাম্প্রতং প্রত্যাশাভাবভগ্নাশ্চতমুখঃ শোকার্ণবে মজ্জিতঃ।
বিখ্যাতো বিজয়ঃ ক্ষিতো সমজান প্রৌঢ়প্রতিপক্ষয়াদত্তৈব দ্বিরদাহ্বয়েহপ্য ভবতা ভদ্রাসনে স্থাপিতঃ॥

তথাপীদমস্তু।

লক্ষ্মীনন্দনরেন্দ্রনির্ম্মলনয়ৈর্নির্ম্মূলিতোপপ্লবা
স্বৈরং স্তেন-কুতন্ত্র-দুর্জ্জন শঠৈঃ শূন্যাস্তু সর্ব্বংসহা।
অপ্রাপ্তং ভুবি সৎপ্রসঙ্গবচনৈর্ব্যাবিদ্ধবিধ্বংসনাৎ
চিত্তং চন্দ্রকলাকিরীটচরণে ভূয়াৎ স্থিরং মাদৃশঃ॥
ঈদৃক্ কাব্যং প্রণেতুঃ প্রতিভতাবিপবঃ সন্তু গোত্রপ্রসূতাঃ
শ্রোতৄণাং পশুতাঞ্চ প্রথয়তু পরমাং স্বন্দর্বেন্দুচূড়ঃ।
ভূয়াৎ কীর্ত্তির্নাপ্তিদৃঢ়মভিনয়তাং প্রত্যহং নর্ত্তকানাং
আকল্পান্তং প্রবন্ধঃ স্ফুরতু কৃতধিয়াং কৌমুদীবানন্দে॥

সর্ব্বে এবমস্ত্বিতি নিষ্ক্রান্তাঃ॥

পুষ্পিকা ইতি শ্রীশ্রীযুত লক্ষ্মণ-মাণিক্যদেব বিরচিতে বিখ্যাতবিজয়নাম নাটকে পরমমহোৎসবো নাম ষষ্ঠোহঙ্কঃ॥ শুভমস্তু ১৬৭৭।*

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

* Notices of Sanskrit Manuscripts, Vol. II. 186.

পাগল। *

ভারতবর্ষ-সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের নব-প্রকাশিত 'পাগল' নামক উপন্যাসখানার সমালোচনা করিতে যাইয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিব না ;—আমি শুধু এ প্রবন্ধে পুস্তকখানার একটু ক্ষুদ্র পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

উপন্যাসের প্লটটি, বর্ত্তমানযুগের প্রথানুসারে অযথা ফেনানো-ফাঁপানো দোষে দুষ্ট না হওয়ায় পাঠকগণ তৃপ্তির সহিত পুস্তকখানা পাঠ করিতে পারেন।

পুস্তকের বর্ণিত ঘটনাটি সংক্ষেপে এই,—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ঘোষ কেদারপুরের ছয় আনির জমিদার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ম্যানেজার। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর গরিবের কন্যা মোহিনীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। মোহিনী আর কিছু শিখুন আর নাই শিখুন, স্বামীকে কেমন করিয়া হাতের মুঠার মধ্যে আনিতে হয়, তাহা শিখিয়াছিলেন। সুতরাং নলিনী বাবুও যে অত্যল্পকাল মধ্যে মোহিনীর একান্ত অনুগত দাস হইয়া পড়িল, ইহা বলাই বাহুল্য। অমিয়, নলিনী বাবুর প্রথম পক্ষের ছেলে। নলিনী বাবু দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া মোহিনীর মোহিনীশক্তিতে বশীভূত হইয়া অমিয়কে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। অমিয়, মাতৃবিয়োগের পর মাতুলের সাহায্যে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন কিন্তু মাতুলও দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে পর আর অমিয়ের পড়ার খরচ চালাইতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে অমিয় কিছুদিন পিতার প্রদত্ত খরচেই কলেজে পড়িতে লাগিলেন। বাড়ীতে তাহার একমাত্র ব্যথার ব্যথী ছিল বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অনিল। সে যে অমিয়কে এত ভালবাসিবে, তাহার উপদেশানুসারে কায করিবে, ইহা মোহিনীর মোটেই সহ্য হইল না। একদিন স্পষ্টভাবে অমিয়কে বলিল,—"সাবধান করে দিলাম, আর কখন অনিলের সঙ্গে কথা বল্‌লে তোমার এ বাড়ীতে স্থান হইবে না।" শুধু তাই নয়, নলিনী বাবুকেও বুঝাইল যে অমিয়ের সাথে অনিলের কোন প্রকারেই মেশা উচিত নয় কারণ অমিয় অনিলকে সিগারেট খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ প্রকার অসৎসংসর্গ অবিলম্বে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। নলিনী বাবুও এ মিথ্যা অপবাদ অনায়াসে বিশ্বাস করিয়া অমিয়কে নানাপ্রকারে ভৎর্সনা করিলেন। অমিয় ভাবিলেন,—"যিনি এমন মিথ্যাকথা সাজাইতে পারেন, তিনি অনায়াসে তাহাকে চোর বলিয়াও প্রতিপন্ন করিতে পারেন।" বিমাতা নারাজ পিতা বিমুখ, সুতরাং গৃহে তাহার সুখ কোথায়? সে তখন স্থির করিল, যা থাকে অদৃষ্টে, গৃহত্যাগ করিতে হইবে। বাড়ীতে থাকা আর কিছুতেই নিরাপদ নহে। অমিয় সে রাত্রিতেই গৃহত্যাগ করিল এবং গোয়ালন্দ যাওয়ার উদ্দেশ্যে ষ্টীমার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টীমার ঘাটে একটি ভদ্রলোকের দৃষ্টি এই বালকের উপর পতিত হইল। ইঁনি বালকের সহিত আলাপ করিয়া সকল অবস্থা অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন। এই উদার-হৃদয় ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের নাম শ্রীযুক্ত হরিমোহন বসু। হরিমোহন বাবুর বাড়ীতেই অমিয় আশ্রয় লাভ করিয়া কলেজে পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। ঘটনাচক্রে একদিন হরিমোহন বাবু অপরাহ্নকালে আফিস হইতে বাহির হইয়া ডেলহাউসি-স্কোয়ারে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় নলিনী বাবুর সহিত তাঁহার আলাপ হয়। কথায় কথায় অনিলের ব্রেণ-ফিভারের কথাও জানিতে পারেন, এবং ইহাও জানিতে পারেন যে, যে দিন হইতে অমিয় নিরুদ্দেশ হয়, তারপরদিন হইতেই অনিলের জ্বর। জ্বরে শুধু দিন-রাত 'দাদা' 'দাদা' করে। মুখে আর কথা নাই শুধু 'দাদা'। প্রথমে হরিমোহন বাবু অমিয়কে অনিলের এ প্রকার অসুস্থতার সংবাদ না জানাইয়া নিজেই সপরিবারে অনিলকে দেখিতে যান। পরে অমিয়কেও তাহার প্রাণ-প্রিয়

* শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স হইতে শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী—১৩২ পৃষ্ঠা। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

ভ্রাতার নিকট লইয়া যান। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোনই ত্রুটী হইল না সত্য কিন্তু অনিলকে মৃত্যুর নির্ম্মম কবল হইতে রক্ষা করিতে পারা গেল না। অমিয় এ কঠিন আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, সেও অল্পকাল মধ্যে ভ্রাতার শোকে 'পাগল' হইয়া গেল।

যে উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থকার এ পুস্তকখানা লিখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে। ভ্রাতৃস্নেহের এ প্রকার উজ্জ্বলচিত্র আমরা আর কখনো দেখি নাই।

পুস্তকের সবগুলি চরিত্রই অতি সজীব হইয়াছে। দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর যে সকল গুণ না থাকিলেই নয় তাহার সবগুলি গুণই মোহিনীর চরিত্রে অধিকতর উজ্জ্বলরূপে শোভা পাইতেছে। স্বামী-রাজীকরণ সম্বন্ধে মোহিনীকেই শুধু দোষী করা যায় না কারণ উহা সকল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরই একটা ন্যায়তঃ প্রাপ্য বস্তু। গ্রন্থকারের ভাষাতেই বলা যাইতে পারে,—"বিধাতা-পুরুষ সন্তান জন্মের পর ছয়দিনের দিন প্রসবাগারে প্রবিষ্ট হইয়া শিশুর কপালে যখন তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হইবার কথা লিখিয়া দেন, তখনই নাকি তাঁহার কর্ণে স্বামী-বশীকরণ-মন্ত্রও দিয়া যান; সেই জন্যই দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী অতি সহজেই স্বামী-বশ করিয়া থাকেন।" নলিনী বাবুর মত স্ত্রৈণ অথচ 'পুরুষ' নামধেয় অনেক মহাত্মাই আজ কাল ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন। কে জানে এই সকল অভিশপ্ত জীবনের কবে মুক্তি হইবে? ভৃত্য রামকমলের চরিত্র অতি প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। অমিয়ের গৃহত্যাগের পর সে যখন নলিনী বাবুকে স্পষ্ট ভাষায় বলিল—"যে পথে ঘরের লক্ষ্মীকে আজ পনর বছর আগে বিদায় দিয়াছিলাম, যে পথে আজ ভোরে তার সোণারচাঁদকে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেই পথেই চল্লাম। বাবু, এ বাড়ীতে আর রামকমলের স্থান নেই। অনেক-দিন তোমাদের নিমক খেয়েছি; আর না।"—তখন কি ভৃত্য রামকমলকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় না—"শূদ্র তুমি ক্ষুদ্র নহ"?

ধর্ম্মপ্রাণ, উদার-হৃদয় হরিমোহন বাবুর কথা, তাঁহার স্নেহশীলা স্ত্রীর কথা এবং তাঁহাদের সেবাপরায়ণা কন্যা অচলার আত্মনির্ভরতার কথা ভাবিতেও প্রাণ শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অবনত হইয়া আসে। হরিমোহন বাবু রামমোহন, কেশব সেনের প্রচারিত ধর্ম্মের উপযুক্ত ভক্ত বটে। এই প্রকার আদর্শ পরিবার যে দিন প্রতি ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে, সে দিন পৃথিবী নন্দনকাননের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিবে। অনিল ও অমিয় দেবশিশু;—তাহাদের চরিত্র অতুলনীয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, নলিনী বাবুর পরিণামটী বিশদভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। ভ্রাতৃ প্রীতির উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করাই গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিয়াই বোধ হয় শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার নলিনী বাবুর পরিণামটী তেমন বিশদভাবে দেখেন নাই। এই পুস্তকে মামুলী-ধরণের প্রেমে-পড়া নাই, বাজে রোমান্স নাই; অদ্ভুত বর্ণনাও কেহ ইহাতে খুঁজিয়া পাইবেন না। যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি আছে, তাঁহারা ইহাতে ভাবিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় পাইবেন।

সুরুচিসঙ্গত সুখপাঠ্য উপন্যাস পাঠকের নিকট মধুর ভাষায় লিখিত এ পুস্তকখানা বিশেষভাবেই আদৃত হইবে, সে ভরসা আমাদের আছে।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

সমর্পণ।

উদাস প্রাণে মলিন চিতে
আসি যখন ধেয়ে তোমার পাশে,
কইতে আমার আবেগ-ভরা
মনের কথা দীন ভিখারীর বেশে,
জুড়ায় আমার তপ্ত হিয়া
তোমার স্নিগ্ধ করুণ মূর্ত্তি হেরে,
মরম-গলা নয়ন-বারি
মিশে যায় কোন্ অশ্রু-সাগর-নীরে !
পাঁজর-ভাঙ্গা দুঃখরাশি
নিয়ে যখন ফিরি গৃহের মাঝে,

না জানি কোন্ অধীর সুরে
মরম জুড়ে ব্যথার বীণা বাজে !
আকুল হয়ে লহর তুলে
কি যে কাঁদন ফেঁপিয়ে ওঠে প্রাণে ?
দীর্ণ হিয়ার নীরব ব্যথা
কে বোঝে গো, কে শোনে, কে জানে,
ওগো আমার ব্যথার সাথী !
সারা জনম সইব গো আর কত ?
এক নিমেষে শেষ করে দাও
অন্তবিহীন দুঃখ-জ্বালা যত।

শ্রীআশুতোষ রায়।

REGISTERED TRADE MARK

রেজেষ্টরী করা — শঙ্খমার্কা আসল

লালমোহন সাহা শঙ্খনিধির পৃথিবী ব্যাপিত

সর্ব্বজ্বরগজসিংহ

৮ ঘণ্টায় সর্ব্ববিধ জ্বর, ১ সপ্তাহে প্লীহা যকৃৎ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব

মূল্য বড় ডিবা ১॥০ দেড় টাকা, মধ্যম ১৲ এক টাকা, ছোট ॥৵০ নয় আনা।

ডাকমাশুল ১ হইতে ১২ ডিবা ৵০ দুই আনা।

জগদ্বিখ্যাত।

সর্ব্বদদ্রুহুতাশন

২৪ ঘণ্টায় দাউদাদি চর্ম্মরোগ বিনা ক্লেশে আরোগ্য হয়।

মূল্য ১ ডিবা।৵০ ছয় আনা, ডাকমাশুল ১ হইতে ২৪ ডিবা ৵০ দুই আনা

সুপ্রসিদ্ধ।

কণ্ডুদাবানল

খোশ পাচড়াদি ক্ষতরোগ অতি শীঘ্র বিনাক্লেশে আরোগ্য হয়।

মূল্য ১ ডিবা।৵০ ছয় আনা, ডাকমাশুল ১ হইতে ১২ ডিবা ৵০ দুই আনা।

চিরবিনাত—শ্রীগৌরনিতাই সাহ শঙ্খানাধ।

মেনেজিং—প্রোপ্রাইটার।

ঠিকানা— ঢাকা, বাবুরবাজার, শঙ্খনিধি মেডিকেল হল কিম্বা ভজহরিসাহাষ্ট্রীট।

Printed by P. B. CHAKRAVARTY, at the Sreenath Press, 5, Nayabazar Road, Dacca
and
Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca.

VOL. 10. No. 2 & 3.

MAY & JUNE, 1920.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY
RAI SHAHEB,
BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,
AND
SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . Rs. 5-6-0
Single Copy . 0-8-0

REGINUS

To sufferers from bodily fatigue, nervous prostration, o
oı memory, energy and manly spirit, constipation, loss of appetite sleeplessness, and other troubles, Reginus acts like magic. Bot. Re. 1 each.

DIABETES—the troublesome symptoms are quickly relieved. Excessive urination with discharges of Saccharine matter, high specific gravity, and all other troubles, are successfully combated. Bot. Rs. 3 each.

ASTHMA—with dry cough, hard breathing, with sticky phlegm, tightness of chest, heavy perspiration, sleepless night, periodical fits, etc. Cured completely with our specific remedy. Bot. Rs. 5 each.

Ranaghat Chemical Works,

Ranaghat, Bengal.

Edwards Tonic

The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.

Sole Agents :—**B. K. PAUL & CO.,** *7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.*

B. K. PAUL & CO'S,
Gold Sarsaparilla
A SURE AND SAFE AGENT FOR PURIFYING BLOOD. A MARVELLOUS REMEDY FOR ALL SYPHILLITIC AND MERCURIAL DISORDERS.
Price-Each Phial Rs. 2/8,
BUTTO KRISTO PAUL & Co,
CHEMISTS & DRUGGISTS,
CALCUTTA.

Cytogen AN IDEAL DIGESTIVE TONIC WINE
Invaluable in CONVALESCENCE from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c.,
Extremely Useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,
INDISPENSABLE AFTER PARTURITION
Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.
B. K. Paul & CO.,
CALCUTTA.

Branch Sovabazar Street.

Head office :—7 & 12 Bonfield's Lane Calcutta. The Research Laboratory —18 Sashi Bhuson Sarker's Lane

লুপ্ত-রত্নের পুনরুদ্ধার !

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ !

‘বঙ্গদর্শন’ আবার বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করুক ! যে ‘বঙ্গদর্শন’ নব-যুগের নূতন বঙ্গ-সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, যে ‘বঙ্গদর্শন’ নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন শক্তিতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, আমরা সেই ‘বঙ্গদর্শন’ পুনর্মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছি। বাঙ্গালীর পক্ষে সুসংবাদ নহে কি ?

রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

“বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা, তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়-রবিরশ্মি-সমুজ্জ্বল তুষার-কিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। * * * রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এতসত্বর এমন দ্রুত পরিণত লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।”

“বঙ্গদর্শন”ই বঙ্গসাহিত্যের সেই তুষার কিরীট।

চারি বৎসরের চারি খণ্ড ‘বঙ্গদর্শন’

আমরা প্রকাশিত করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবর্দ্ধিত ও সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ নিতান্ত দুর্ল্লভ, এক সেট ‘বঙ্গদর্শন’ যদি বা দৈবাৎ পাওয়া যায়, তাহাও

১৫০৲ দেড় শত, ২০০৲ দুই শত টাকা মূল্যে

কিনিতে হয়। এমন বাঙ্গালী পাঠক নাই, যিনি ‘বঙ্গদর্শনে’র নাম শুনেন নাই। কিন্তু কয়জন চোখে দেখিয়াছেন ? সাহিত্যের যে মন্দাকিনীধারায় বাঙ্গালা নব-জীবনে সঞ্জীবিত, ‘বঙ্গদর্শন’ যে তাহার গঙ্গোত্রী, তাহা আজ কে অস্বীকার করিবে ? সেই সুদুর্ল্লভ ‘বঙ্গদর্শন’ আমরা অত্যন্ত সুলভ মূল্যে আপাততঃ কেবল

‘সাহিত্যে’র গ্রাহকগণকে

দিবার ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু এই দুর্মূল্যের দিনে কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই প্রভৃতির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির সময়ে তাঁহাদের পক্ষে

প্রথম বৎসরের মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র

নির্দ্দিষ্ট হইল। ‘বঙ্গদর্শনে’র বার্ষিক মূল্য ছিল—তিন টাকা ছয় আনা। এখন তাহা অমূল্য। অসম্ভব মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না।—সেই ‘বঙ্গদর্শন’ ‘সাহিত্যে’র গ্রাহকগণ দুই টাকায় পাইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ যে আকারে, যে অক্ষরে, ছাপা হইয়াছিল, আমাদের সংস্করণও ঠিক সেইরূপ ছাপা হইবে। অর্থাৎ, ইহা—**Fac-similie** সংস্করণ।

এ বৎসর “সাহিত্য”র উৎকর্ষবিধানের যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে।—প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উপন্যাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির ছোট গল্প “সাহিত্য”কে আরও সমৃদ্ধ করিবে।

যাঁহারা তিন টাকা দিয়া চৈত্র মাসের মধ্যে ‘সাহিত্যে’র গ্রাহক হইবেন, অর্থাৎ ‘সাহিত্যে’র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও ‘বঙ্গদর্শনে’র প্রথম বর্ষের মূল্য দুই টাকা, মোট পাঁচ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারাই এই অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন—

ম্যানেজার, সাহিত্য।

২।১, রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

পাঠের ও উপহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।

মুক ও বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন প্রণীত

নল-দময়ন্তী

দ্বিতীয় সংস্করণ—মুল্য ১৷৷০ টাকা।

কয়েকখানি বহুবর্ণের চিত্র ভূষিত। বেগুণি রংএর ...টীন কাপড় মনোরম প্যাড্ বাঁধাই—তদুপরি একখানি ...ন রংএর চিত্রে পরিশোভিত। বাঙ্গালা ভাষায় উপহার ...বার এমন সরল সুন্দর মধুর পুস্তক আর একখানিও ...ই।

মালঞ্চ সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত

এম, এ প্রণীত

ভারতনারী

সিল্কের কাপড়ে প্যাড্ বাঁধাই মুল্য ১৷৷০

সাটীন কাপড়ের শোভনরাজসংস্করণ—মূল্য ২৲

বহু চিত্র ভূষিত আদিতি, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সতীলক্ষ্মী আর্য্যনারীগণের চিরপূজ্য আদর্শ কাহিনী। বাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই নিত্য পাঠ্য।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ সম্পাদিত

(বঙ্গদেশের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক স্কুলসমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত এবং কলিকাতা ইউনিভারসিটী কর্ত্তৃক মহিলাদিগের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট)

কাশীদাসী মহাভারত (সচিত্র) মূল্য ৩৷৷০

কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সচিত্র) মূল্য ২৷৷০

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চিরসমাদৃত—বাঙ্গালী জীবনের চিরমধুময়—চির নবীন রূপ কথা!

ভূতপূর্ব্ব শিশু সম্পাদক শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ঠাকুরমার ঝোলা বা বাঙ্গালীর রূপকথা

যেমন সুন্দর কাগজ—তেমন সুন্দর নির্ভুল ছাপা—তেমনি সুন্দর ঝক্‌ঝকে বাঁধা আবার তেমনি সুন্দর সুন্দর রাশি রাশি ছবিতে ভরা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

Amrita Bazar Patrika says, "AN INIMITABLE PRODUCTION."

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্, এ মহাশয় বলেন—"...ইহাতে আশৈশব পরিচিত সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর কথা, ডাইনী রাক্ষসীর কথা,...পিঠে গাছের কথা ত আছেই আবার পুষ্পকুমার, ঋরাণী প্রভৃতি সুকোমল নামের ও ততোধিক সুকোমল প্রকৃতির নায়কনায়িকার কথা সরল ভাষায়, সুন্দর রীতে, কল্পনার তুলিকায় কবিত্বের উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে......।"

সত্য বাবুর নূতন পুস্তক—অভিনব শিশু উপন্যাস

মূল্য ৷৵০] **দগোবার্ট** [মূল্য ৷৵০

ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লিখিত প্রভুভক্ত কর্ম্মবীরের অলৌকিক কাহিনী। এরূপ ছেলেদের উপন্যাস আর বাহির হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

৬৫নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।

A NEW BOOK—Just published.

A HISTORY OF EDUCATION IN ANCIENT INDIA.

BY

NAGENDRA NATH MAZUMDER, M. A., B. T.

Professor, Dacca Training College

WITH AN INTRODUCTION

BY

E. E. BISS, I. E. S.

Principal, Dacca Training College.

MACMILLAN & Co.

Calcutta.

Price Re. 1-8-

Sir Gooroodass Banerjea writes:—"The book presents in a well-arranged form and within a short compass much useful information regarding ancient Hindu culture."

Babu Hirendra Nath Dutta, M. A., P. R. S. says:—"I have gone through it (Education in Ancient India) with interest. You have broken new ground and opened up a fruitful and interesting field."

Dr. Brajendra Nath Seal, (George V Professor of Philosophy, Calcutta University) writes.- I have read with great pleasure Mr. Nagendra Nath Majumdar's "History of Education in Ancient India." As a clear and interesting account of the ideals and practices of the Ancient and Mediæval Hindus in the sphere of Education, it is eminently suited to serve as an introduction to the study of the subject.

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শক্তি ঔষধালয়

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড্। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট্, ঢাকা। কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২নং বিডন ষ্ট্রীট্। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন্ রোড্ (হাওড়া পুলের নিকট শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১৩৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্। (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—৭১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—১২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের।	দাদ্‌মার—৵০ কৌটা। (এক দিনে দদ্রু নিশ্চয় আরোগ্য)।	বহরের নদী—।০ শিশি। (নালীঘা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহৌষধ)।
পঞ্চতিক্ত ঘৃত—৪৲ সের।	দশন সংস্কারচূর্ণ—৵০ কৌটা। (সর্ব্ববিধি দন্তরোগের মহৌষধ)।	অমৃতারিষ্ট—।০ আনা শিশি। (ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ।
কামদেব ঘৃত—১২৲ সের। (মেধাস্মৃতি বর্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায় ব্রাহ্মীঘৃত—৬৲ সের)	সারিবাদ্যারিষ্ট ৩৲ সের (রক্তদুষ্টি বাত বেদনার মহৌষধ)।	

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শক্তি বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ,

হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্‌মাষ্টার

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Sir Henry Wheeler. K. C. I. E.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M. A.
„ Sir N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. Donald, C. I. E., I. C. S.
„ Mr. W. W. Hornell, C. I. E., M. A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. G. Cumming, C. S. I., C. I. E.
„ F. C. French, C.S.I., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
D. G. Davies Esq., I. C. S.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
„ Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
„ J. C. Kydd, M. A.
„ W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
„ T. T. Williams M. A., B. Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
G. H. Langley, M. A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.

Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagpor, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cassimba zar, K.C.I.E.
The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.
The „ Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
The Hon'ble Sir Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
„ Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra
„ Jagadananda Roy.
„ Binoy Kumar Sircar.
„ Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law.
Principal, Lahore Law College
Khan Bahadur Syed Abdul Latif.

CONTENTS.

A Mem-Sahib's View	E. B. Mayne	21
Relics of Indigenous Local Government in Modern India	Prof. Radha Kamal Mukherji, M. A. (Calcutta University)	28
The Ghugrahati Copper-plate Inscription of Samachara Deva and connected questions of later Gupta chronology ...	Nalini Kanta Bhattasali M. A., Curator, Dacca Museum	39
A Pilgrim's Impressions (of a visit to a temple, Ramna, Burdwan) ...	Nalindra Nath Ghose	58

সূচী।

১। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন এম্, এ,	২৭
২। কবিবল্লভের “রসকদম্ব” ...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, ...	৩৩
৩। সপ্তর্ষি মণ্ডল	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বি, এল ...	৪৫
৪। ভক্ত ও ভগবান	শ্রীযুক্ত যশোদালাল বণিক বি, এল, ...	৪৫
৫। সাহিত্যিক পত্র	... ...	৪৯

BANGIYA SAHITYA PARISHAT

THE DACCA REVIEW

VOL. X. MAY, & JUNE, 1920 No. 2 & 3.

A MEM-SAHIB'S VIEW.

BY E. B. MAYNE.

Writing as the wife of a member of the Indian Civil Service, who has spent twenty years on and off in India, Kipling's lines are brought to my mind :

I have eaten your bread and salt ;
I have drunk "water and wine" ;
The deaths you have died I have watched beside,
And the lives ye led were mine.

And yet at the end of that time how many depths of the life of India remain unfathomed ! The imperturbability of the villager (for we must always remember that scarcely one-tenth of the population of 315,000,000 lives in cities or even small townships), the mystery of many of his ways of thought, his religious susceptibilities, and what seem to us his superstitions, deep-rooted in an immemorial past—we know but the surface of them. It takes the travelling M. P. and the tourist to explain them to us for :

They understand in half a mo',
What it takes one of us ten years or so
To know that we shall never know

India ! the magic name India—to me it stands for so many varied phases of life. Visions pass in bewildering, kaleidoscopic fashion before my mind at the word India.

The first vision is that of the simple village life, amid which we spent some informal happy months during the camping season. Let us imagine that we are with the Deputy Commissioner on a morning's ride one lovely, crisp, cold-weather morning. A clump of mango-trees ahead, and perhaps some lofty palms, announce the proximity of a village. As we canter up to the outskirts a white-clad group awaits us, the headman of the village, with some of the villagers. The first salaams over and courteous inquiries as to health received and reciprocated, we advance to the village. We will leave the sahib

to talk over the state of the crops and listen to any grievances or complaints that may be laid before him, and walk up the straggling village street. The little single-storied houses are of rough dried bricks or of bamboo plastered with mud and roofed with sun-baked tiles. Each house is in its little enclosure ; it consists of one or two low, dark rooms, with a neat verandah, the floor of hard sun-dried earth plastered over with sweet-smelling cow-dung and picked out with whitewash. Naked brown babies tumble about the streets and enclosures, old crones sit sunning themselves, the pariah dogs bark incessantly, thin undersized fowls scuttle about, kids and calves are tied up in every yard awaiting the return of their mothers, who have been driven out to graze. A chattering greets our ears, we are approaching the village well, where the women meet every morning and combine the necessary labour of drawing water with a good gossip, and may be a little quarrelling. The advent of strangers causes a sudden hush to fall over the animated scene the more timid draw their veils close round their faces or turn away in unconsciously graceful attitudes, their heavy water-pots poised on their heads.

Two women may be seen grinding at the mill, in good old Biblical fashion, the mill being two heavy stones, the flat surface of the upper revolving on the flat surface of the lower one, which is fixed. From the main streets go off side-streets and we come to the large open space where the weekly bazaar is held, and the pice, one-twelfth of a penny, is current coin. Here is a spreading peepul-tree, under which the village elders sit of an evening and discuss the news of the day.

Here the houses are more pretentious perhaps a few two-storied ones owned by the village grain-dealer, the money-lender, the jeweller. The headman's house is a more imposing affair, built round a courtyard flanked by two watch-towers, reminiscent of the times when marauding enemies came sweeping over the plains. As we pass on we hear the hum of the ubiquitous Singer's sewing-machine, the tap of the carpenter the clank clank of the blacksmith, the droning of the potter's wheel, the click click of the weaver's shuttle. All these crafts are carried on out of doors under the cheerful rays of the cold-weather sun. Next we pass the white school-house, where the Indian schoolmaster is imparting a knowledge of the three R's to the children of this and the surrounding villages, for only the larger villages have schools. The children are all little boys—it is very rare, alas! to find any little girls at the village school. The boys are all drawn up in a row to salaam the passing sahibs, and not infrequently they let off a carefully prepared little song in our honour. I have forgotten the village beggars, they are always there, but they feel none of the degrading, soul-crushing shame of

poverty of these Northern climes. Are they not the means whereby others may "earn merit" in giving, as "Kim's" Llama would say; and are not the most holy men of India always poor by preference, having willingly bereft themselves of all that we Westerners hold makes life dear?

I have dwelt long on my vision of the village life of India, for again I would emphasise that 90 per cent of the people live in such villages. And now that the time has come to introduce these good folk to democratic institutions they must follow their town-dwelling leaders, they cannot stand still whilst the rest of the world moves forward. The leaders of the new India that has come to birth with the passing of the Reforms Act will, it is hoped, secure the allegiance and capture the hearts and minds of the villagers and lead them successfully to a wider view of life. I most sincerely hope it will lead to greater prosperity and less poverty in the villages, fewer who live as day labourers, close to the margin of starvation when hard times come, due to a failure of rains. But we must guard very carefully lest it also lead to the gradual passing of the self-sufficient friendly village life, with its many home industries, and where every one knows every one else.

In British Columbia I talked often with Sikhs working in the lumber-mills, attracted thither by the tremendous wages, three dollars a day (then fifteen shillings a day, now less on account of exchange) as against the six pence or eight pence a day they would be earning in their own villages, and chaffingly asked them where they were going to bury the huge treasure they were accumulating! Always I found the intention was to return eventually to some little Punjab village and settle down to the ancestral village life—no idea, as we in the West have, of a fine town house and a changed standard of living. The old ways were good enough for them.

There is a great demand for compulsory education for all (it has been successfully established in six Indian states), and indeed it is a splendid ideal, one that must be pursued in the end; but I can call to mind many a villager who went to school and mastered reading and writing in his youth and fifteen years later had forgotten both owing to lack of use.

On one occasion my husband and I came to a village site marked on the map, but of which no trace remained, and on inquiring of our guide what had become of it, he assured us a village had never been there. We insisted that we remembered the place; then he told us that after our previous visit the rumour had gone forth that a school was to be established, and the inhabitants had decamped at such a prospect and built a new village in the jungle some miles off. In justice I must state that the villagers were Gonds, a

primitive aboriginal tribe. But these facts are nevertheless damping to the educational enthusiast!

Another vision rises, the very opposite of the first. It is that of a big official function where we are quite apart from the life of the people and meet each other on smilingly formal terms, dressed in our best, to exchange formalities. Here we meet only with Indian gentlemen of high birth or of high official position. I do not dwell long on this vision, it holds no charm for me. It is not the real India, but only a social function of the West taking place in the East.

Yet another vision, the Zenana of some Indian gentleman's house, and here the memsahib. gaily garlanded and breathing the heavy perfume lavishly distributed in her honour on dress and kerchief, sits and talks to the gentle, brown-eyed ladies squatting on the cushioned couches or standing around her. What grace in their timid, retiring manners, their old-world courtesy! We admire the exquisite draperies and realise that in some matters we have much to learn from our gentle Indian sisters, who do not foolishly run after the dictates of fashion as we do, but wear a charming style of dress whose fashion has not changed for 2,000 years or longer. Then there is the heavy gold jewellery and flashing precious stones to be looked at, and they in turn marvel exceedingly that the Englishwoman should be so plainly dressed and so devoid of jewellery. I had always a sneaking fear that my sahib might be looked upon as mean in not giving me jewellery, and explained that it is not our custom to wear much of it by day, that it was left at home to be worn on state occasions. Pretty, gaily-dressed children are brought in, the last fat brown baby kicking and crowing lustily, clad frequently only in an embroidered cap and a jewelled chain round its chubby little middle. Each child has its eyelids heavily blackened to warn off the "evileye." I recollect on several occasions being offered valuable gifts, which it was my duty as the wife of an official to refuse. One dear, persistent old mother-in-law—always a very important person in the zenana—pressed some golden mohurs-roughly Indians sovereigns,—into my hand, and begged me to whisper a word in my husband's ear, at a propitious moment, in favour of a case being tried in his court. I explained that such things are not done, and the old lady disappeared shaking her head ,and I was left to feel the glow of a moral lesson suitably imparted. But, alas, for my moral lesson! a few minutes later the dear old lady was back again and pressing twice the sum into my hand. She had merely thought that I was a greedy memsahib and that my price had not been reached by the first offer!

The above zenana (though not the above instance) is very typical of the vast majority of the upper-class Indian

homes. But I must also speak of the charming Parsi homes and advanced Bengali homes, into which I have had the honour of being received, where all that is best in Western modes of thought regarding the freedom of women has been assimilated, but the charming dress, and kindly manners and dignity of the East retained.

As I hear the demand for Votes for Women, I realise the wisdom of Mr. Montagu's judgment : "That the question goes deep into the social system and susceptibilities of India and it can only be settled in accordance with the wishes of Indians themselves." Personally, I should wish the last clause altered into "the wishes of Indian *women* themselves."

Another vision of the Anglo-Indian domestic circle arises, where the purest devotion and the most cunning cheating are met side by side. I see my ayah who was with me twenty years and who never took a week's holiday, nor ever left me for twenty-four hours. She accompanied me in charge of the children to Australia and New Zealand and to Europe. Many a time I asked her to take a little holiday, but the answer was always the same : "Leave my baba-log (baba-folk)! What would missus and the babas do without me?" She gloried in her indispensability and responsibility, but, alas ! the cruel parting had to come, and we two women who shared so many joys and sorrows now live 5,000 miles apart, both grey-haired, but bound together in spirit by indissoluble memories, one in London and one in her village home where, in pensioned ease, she dreams of former days and looks with pride at the photos of her now grown-up babas.

Then there was Gafur, the "bearer" of sixteen year's service, who refused to eat for three days when his sahib lay very ill, and had to be coaxed out of this unpractical but very real form of devotion.

There was also Mohamed, the cook, who, even after twelve years' service, cheated me odiously in his accounts, "blackened my face" in the eyes of the tradespeople by not paying them the money entrusted to him, and yet gallantly stood between me and a wounded tiger in a "beat," declaring I could shoot when the tiger was on him. This man, for all his lying and cheating, was capable of what Jesus proclaimed was the highest love : "Greater love hath no man than this that he lay down his life for his friend." India is *par excellence* the land of devotion to personality, a great and valuable asset, which has played a great part in the success of the British administration up to now.

Again the vision changes, this time to stalking along the narrow jungle paths, through feathery bamboos, over dried-up water-courses, or stepping carefully over the great teak leaves that if touched make a noise like the rending of newspapers and sends the game scattering

through the jungle. We follow the naked, brown, sinewy body of the Gond, or Bhil, a member of one of the aboriginal tribes, who, shouldering his axe, leads the way, treading ever so silently on his bare, splay, turned-in feet. Suddenly he halts and crouches, and there through the trees, antlered and proud, stands a stag, gazing at us with startled eyes—a rustle, a spring, and he has gone!

In the evening, after a day in the jungle, we gather round the camp fire and start the gramophone. The villagers steal silently up to listen to the strange music; presently we put on one of Harry Lauder's songs. 'Stop your Tickling, Jock' or the like. As the gramophone-laughter rings out broad grins overspread the faces of villagers, and presently the jungle-camp resounds with side-splitting laughter, led by the jovial Scotchman, who perhaps had hardly expected that his infectious laugh would some day wake the echoes in an Indian jungle. Laughter needs no translating, it is the common speech of all.

I have tried in my visions to give true glimpses of India. The . English public hears of India from three sources: the missionary, the social reformer, the bureaucratic Anglo-Indian official, and these three classes are quite unintentionally apt to give false impressions. They are bound to be biassed on account of their position and also on account of the ends they have in view.

The missionary, who does excellent and valuable social work, is too often apt to consider that his religion is *the* only right one, and failing to grasp the deep fundamental truths at the base of all religions, considers himself right and that the India he deals with is blind and heathen. The social reformer is never representative of the masses of India, the 90 per cent who live in villages, His historical sense is weak, he fails to realise that the democratic institutions it has taken us eight hundred years to acquire cannot be forced on a people quite unprepared for them. Alas! he is too often possessed of an intense hatred of everything British, and in these times of transition it is brotherly understanding and not hatred that is wanted to guide India. The bureaucratic Ango-Indian considers his system perfect and sees danger in any change. He, too, fails in historic sense and does not realise that human society and individuals are evolving, and that a system that has suited a people a hundred years ago may be iniquitous a hundred years hence. Because desire for freedom has expressed itself in anarchy and murder at the beginning of the century, in the minds and acts of a few misguided students, our official would look upon all criticism as dangerous—an untenable position, for every one is entitled to criticise the government under which he lives.

But in dealing with India I do feel it is the truth, the truth, and nothing but

the truth that we want to have put forward. There are three great salient facts that should always be borne in mind in thinking of India, and these are :

1. That the population of India consists of a vast congeries of races and peoples and castes and creeds, descendants of Dravidians (the aboriginal races who inhabited India before the arrival of the Aryans many thousands of years ago), the Aryans the Mahomedans of Central Asia and the Mahamedans of the West, Persians, Portuguese, and now other Europeans, and that these people have not amalgamated but remained apart in religious customs and modes of thought.

2. That 90 per cent of the people of whatever race live in villages, conservative, aud largely illiterate.

3. That higher English education is the monopoly of the upper-caste town-dwellers ; it is they who make the brilliant scholars, they who have assimilated Western social and political ideals, and that, unfortunately, they are in no way representative of the 90 per cent who live in the villages.

The bureaucratic system that has done such fine service in the past must gradually give way to democratic institutions. The villager and land-owner must have education in order to understand the engrafted ideals of the West. The poverty that is so prevalent among the day labourers and small farmers must be destroyed, the standard of living raised.

We Englishwomen are much to blame for leading our lives so much apart from the Indian women. The lady missionaries and Roman Catholic sisters undoubtedly do a great work in ministering to the bodily and medical needs of the *purdah* women and of the poor ; but the average English women attend too exclusively to their family and social interests, and make a closed coterie among themselves. The domestic life of the bungalow and servants, the dinner parties, bridge parties, and dancing, the golf and tennis fill our lives exclusively, and we let pass the opportunities of obtaining the valuable friendship of our Indian sisters. Ignorance is the enemy of sympathy !

It is no light task : the Indian woman is so quiet and does not speak, until spoken to, before strangers ; but it is our very distinct duty to take of our fuller life and by tactful friendship enlarge the Indian women's interests. Social clubs for both races are very useful, where games are played. I remember how the making of shirts and socks for our soldiers who were fighting in Mesopotamia and Palestine formed a great bond of union during the war.

Sometimes my heart misgives me. Is not the simple life of the village best after all, where wants are few and friendships life-long, and caste-fellow holds out the helping hand to caste-fellow in time of trouble? Is it the right ideal to draw the vast millions of India into the seething vortex of our industrial

and economic and now our political life? Have we made such a wonderful success of our own civilisation? Have we not brought about the most appalling human catastrophe in history, a war that cost ten millions of the bravest and best lives of all countries?

However, these misgivings are vain. India cannot retain her old-world isolation; already the American Standard Oil Company's tin is replacing the gracefully-shaped water-pitcher carried on the heads of the village women, the factory cotton-goods are finding their way into the village markets in place of the hand-woven materials, prices are rising, fortunes are being made in cotton and jute; but the even distribution of wealth is no nearer. The economic net is spread. As Mr. Montagu says, we must trust in the goodwill and wise leadership of India's own educated sons to guide their country through the period of political transition. The day of leading-strings is over. May India's sons prove worthy of the great task in which they are henceforward to play so important a part, and may Mr. Montagu, or whoever may be the Secretary of State for India, be guided to remove, with due wisdom, the safeguards against too rapid a transition from bureaucracy to complete self-government!

RELICS OF INDIGENOUS LOCAL GOVERNMENT IN MODERN INDIA.

History has with many of us in India a way of numbing generous emotions. All things we had; they are of little avail now; we can expect little of them in future. A lukewarmness develops into contempt of the past in the case especially of those who think of building for the future. Yet we can have little security without a sense of the dependence of the present upon the past. History, like all true knowledge, is an aid to the solution of recent problems though it does not provide specific answers to specific questions. In the past we built a shrine. History provides the experience for building a shrine again within us, but does not build it. If we have the site, the clay, the brick and the mortar, we can rebuild it. Recent Indian studies in our ancient democratic institutions and public administration give us a good deal of data, but have however all been neglected in our present day politics; the historical sense seems to be absent within us; we think we can make whatever we will of the land we inhabit but did not create.

The vitality of the old communal village system of the land and the large jurisdiction exercised by local bodies and assemblies, exuberant in their growth and variety have been the surprises which a recent work,

Dr. Radhakumud Mookerjee's "Local Government in Ancient India" has offered. We find here Lord Metcalfe's well-known observations once again reiterated: and the efficacy of a democratic system of rural polity in extending and preserving one of the oldest of the world's cultures through broken and chequered political history demonstrated by thoughtful and scientific research. The immediately practical interest of such a work lies in the lessons which past annals furnish for an insight into the needs and forms of present Indian government: but we refuse to profit by it. While researches such as these are accepted as proving that Hindu Society was capable of evolving a highly vigorous system of co-operative village administration, the melancholy 'fact' is adduced without such evidence that the local institutions are "dead and buried beyond the possibility of resurrection". The dictum that Politics is the fruit of history, insists upon the attempt to benefit from past political experiences; at the same time chauvinistic and other 'tendencies' should not be permitted to warp the enquiry into existing facts, and conditions as well as the judgment about building the future on them. The methods of rearing a political constitution on the foundation of existing local juridical bodies and Village assemblies would receive readier solution in the hands of history, the more the present enquiry is unbiassed and discriminating.

Throughout the course of political evolution in the past, and through all the vicissitudes that the land has passed through, the Indian village assemblies have in some provinces till late in the eighteenth century enjoyed a sort of semi-independence. India like China or Russia had been a land of myriads of petty republics; and though their autonomy and scope of jurisdiction shrank from time to time with the rise of a strong and influential kingdom, and the location of *kardars, jaghirdars*, capitalists and farmers of state revenue in the neighbourhood, the village assemblies were left to enjoy their autonomy as long as they collected the revenue or tax, which they themselves apportioned among the inhabitants and sent them to the royal treasury. The supreme government dealt with the village assemblies, not with the inhabitants. Time, joint burden and responsibility, and the advantages of agricultural co-operation cemented the different elements of the village together: and one of the well-known types of the village community developed itself perhaps streaked by local peculiarities. The village assemblies looked after revenue, collection. economic management and the administration of justice, both civil and criminal. The state in India, as Dr. Mookerjee vividly reminds us, throughout recognised the precedence of these village communes by treating with them "more or less on terms of equality," and by paying great

deference to the village headmen. A most interesting inscription (9th century) is that in which some chiefs who are at war with one another entered into an agreement with a village headman to look to the peace of the villagers under their protection, and to pay a fine of 100 *panam* if any village is injured. The king had to respect the laws of the local bodies (p. 105) and he interfered only in cases of gross mismanagement or embezzlement of communal funds (p. 111). South Indian inscriptions go to show that the village assemblies seem to have been the absolute proprietors of the village lands. All property except those reserved as crown lands or dedicated to temples was regarded as belonging to the village assemblies, not to the state. New clearings and reclamations of virgin lands went to the village assemblies and not to individual proprietors, as also lands abandoned for crime against the village (grama-droha) or arrears of dues. (P. 146) They also sanctioned settlements and assessed the taxes, and were authorised to confiscate and sell the lands, if taxes were unpaid for full two years (No. 29 of 1893). Some inscriptions give examples of "double transactions," i. e., the king grants certain lands tax-free and then the temple authorities have the charter engraved by the villagers and the remitted tax deducted from the village accounts (Nos. 540, 541, 542 of 1911). The rights of village self-taxation recognised by the state through long centuries still linger in the South and this alone can explain not only the existing variety of taxes and sources of village communal funds but also the rights the South Indian villagers still want to exercise over the *samudayam* property, both land and fisheries. Three classes of village assemblies have been said to exist in the south ; those of the general body of residents in a village which were called *ufar* and those of the merchants (and professionals ?) called *najarattar*. The district assembly *nattar* was also a body which met when, perhaps, subjects touching the interests of the whole district were discussed, or when there were no sabhas to represent the villages within the district (H. Krishna Shastri). There were qualifications laid down for membership. The assemblies met perhaps in the *sabha-mandapams* of the temples or under the big pipal, or olive tree on the platforms where were also installed the *Nagas* sitting in judgment over right decisions or charitable gifts. The Brahman sabhas were ordinarily communal local assemblies, governing every kind of interest in the villages, but would form local associations for other purposes ; merchants and traders (nagarattas), villagers and district representatives (nattar) were spoken as joining (No. 14 of 1906). These assemblies split themselves into district committees to watch the interest of the gardens, wet and dry fields, leases and irrigation, tolls and shop-rents, waste-

lands and their reclamation, the regular management of temple services and charities. Even now village assemblies in the Tamil country are seen as of old managing not merely common village lands or temple lands levying fees or cesses on purchase and sale of goods for common purposes such as irrigation, sanitation or communal recreation but also advancing agricultural loans out of padupanam, and deciding all petty cases which otherwise would have gone to the courts. Nor is the segregation of caste-government so marked as to interfere with the active participation of all castes in the village councils as in the past.

The elements of ancient Kalarian and Dravidian culture first mingled together to produce the compact and efficient village system: this was assimilated and comprehended by the political institutions of the village community which formed the foundation of the Indo-Aryan polity. Thus was evolved the conglomerate structure of the Indian village communities, knit together no longer by tribal customs or motives of self-interest, but by common ethical and social ideals worked out in a deeply humanised and socialised life by the abiding instincts of communalism with which these races have been so richly endowed.

The aboriginal or the Aryan unit in India was the village. About the difference between the primitive Dravidian and the primitive Aryan village, about the early growth of law and the subsequent growth of a *quasi* feudal society, a great deal may be written. But it is worthy of remark that in the old as well as in the existing form of Dravidian and Kolarian village there is developed a compact tribal organisation under a more or less centralised government; the tribes are sub-divided and grouped into village communities, each under a headman, who allots the land within the village area, and settles any disputes as to the location of any family; there is a hierarchy of village officers, who look after tribal morality and equitable distribution of land; there is an elaborate establishment of lots or holdings for the headman, the priest, the deputy or accountant and a staff of artisans and menials. The village sacred tree or grove, the village deity and the village dance or festival symbolise the unity of the village settlement, while a group of villages or tribal territorial divisions unite to form a larger territorial unit comprising from 10 to 100 villages, a confederacy meeting in assemblies to confer on any important matter that concerns several of the villages in common. In every village there seems to have been a more or less distinct plan or method of location and of allotting different holdings. When new settlers were to be admitted, there was a redistribution of lands and holdings, for which reservoirs were created by a dam or by supplying irrigation for the terraced rice-field on the hill side.

The regular institutions of Dravidian autonomous villages, unions of villages and territorial divisions, of which evidences meet us everywhere, show different degrees of social and economic development in different regions and among different stocks under different geographical and historical conditions. In some tracts the original Dravidian agriculturist holdings are overborne by overlord tenures on a feudal basis with their connected fiefs and minor holdings and this specially in inacessible mountain fastnesses and forest regions. While in some broad and fertile plains, as in the south, when the difficulties of clearing the jungles was once surmounted everything would be favourable to the development of an elaborate organisation of rural self-government, which a powerful monarchy had to tolerate in its own interests. Thus the Indian village has in a crystallised form survived the feudal tendencies which grow from within, the encroachment of a centralised kingship as well as the successive foreign invasions and their resulting overlordships. Into the successive types of village rule its headman has always been adopted as an integral part. As a leader of the party of settlers the headman had a special holding set apart for him, and the territorial chief was also supported by another lot of land in each village, the entire produce of which went to him. This latter plan, however, was gradually superseded by the chief taking a share in the grain produce of all lands, except the village headman's and certain other privileged settlers. This share in the grain became the principal source of state revenue, and is the parent of our modern land revenue. With the introduction of the grain share came the appointment of a second official, the prototype of the *Patwari* or the *Kurnam*, and he also was remunerated by a hereditary holding of land. It is these ancient holdings that were afterwards called by the Mahomedan rulers *watan*. All the *watan* lands and the various privileges and dignities associated with them constituted a family property which was capable of descending to a number of heirs jointly. Further, in each village there grew up a staff of artizans, menials and servants, who became hereditary and served the village, not for payment by the job (such a thing was of course unknown) but for a regular remuneration, paid in kind, chiefly by a fixed share in the harvest. Conquest or usurpation or Mahomedan dominion and grant introduced many grantees and other superior holders of estates whose successors remain to this day. It is very significant, however, that the Mahomedan land-holding villages and tribes in Northern India generally follow the custom of family land holding. The Mahomedan law of inheritance is not much adhered to; the joint family system is observed; thus the forms of Mahomedan joint village are strikingly similar to the Rajput, Jat,

Gujar villages in the north, though there are varieties of joint villages, whether tribal, "democratic," or held by the joint descendants of ' aristocratic " founders, as the prevailing tenure from the plains of the Indus to those of the Ganges and the Jamuna. In any case grant or conquest or usurpation has always created overlord tenures bearing down the rights of an earlier joint community, who once had the village lordship and are now gradually reduced in their turn to being inferior proprietors. Thus have been created in every province of India subordinate or inferior interests in particular plots and fields and sometimes interests extending over the whole of the older cultivation if not over the whole village area. It would be an interesting task for a sociologist to analyse each of these elements, Dravidian, Aryan, or Mahomedan, to indicate its respective marks on the structure and composition of the village assembly, the caste punchayet or the tribal organisation on the system of agrarian settlement and distribution on methods of cultivation or on communal rights in land in the different provinces and among different stocks and strata of Indian society, or on the plan and structure of the village and the temple, determined by ritualistic and symbolical principles still active in different parts of India.

Be this as it may, the vigorous system of co-operative village rule to the manifold and complex growth of which all the elements of Indian civilisation have contributed was already a tried structure of venerable antiquity when the Anglo-Saxon invaders were first establishing their self-governing villages in Britain in the 5th century A. D. and has survived usurpation or conquest or the shock and collision of the forces of history. The Anglo-Indian land-revenue system is the most recent of the forces of disintegration, but has eclipsed not superseded the strength of the village community and of its assembly. The policy of direct relations with the individual ryots in matters of land-revenue,—a system which has long been in force under the British in Madras and Bombay and which is tending to substitute itself for the old joint proprietary ryots in the United Provinces has worked as much mischief as legislation and administration on an individualistic basis or the establishment of local civil and criminal courts, but has not entirely suppressed communal interests and the regular village system which is still rendering useful services. The Board of Revenue, Madras, making a last protest against the introduction of the Ryotwary settlement which in their opinion threatened to break up the community of interest on which the village system depends, once remarked : "to dissolve this unity of interest and common stock of labour by requiring each to take instead of a share he possessed and owned, a defined part of the whole land of the village, would not be very

different from dissolving a joint stock company in England and requiring each proprietor to trade upon his own portion of it, in order that it may be separately taxed." But the dissolution has since continued in the interests of a Bureaucratic system of revenue collection and management though the village system has notwithstanding still retained his unity. Throughout the country the village assemblies are still administering village affairs, finance and justice. Neither Mauryan bureaucracy, nor Muhammedan inroads, neither the centralised administration of Akbar or Aurangzeb, nor modern British ryotwari or permanent settlement have obliterated the traditional rights of the village communities as described in the Arthasastra or the Sukra-Niti, though the tendencies of British rule have been most disintegrating and disruptive so far as the village system is concerned. The village assemblies are still to be seen looking after public property, e. g., that of temples and village endowments, and forming a court of justice for the decision of small civil suits, such as the boundaries of lands for the trial of petty criminal cases like larceny and assault. All this persist and represent a continuity of traditions described by Kautilya (Arthasastra, Book II, Chap. I). The officers of the village mentioned by Sukra, viz, the headman, the superintendent of police, the revenue-collector, the toll-gatherer, the clerk and the watchman, are still to be found in full complement in many parts of India, but their independence of authority and autonomous jurisdiction have become unknown. Formerly the village officers were not subject to vexatious interference from the central administration. The king's officers 'must live' outside the village (Sukracharyya V, 179), and did not ordinarily interfere with the administration of local affairs except when their counsel was invited, though occasionally they called for the village accounts and adjusted matters relating to temple endowments, common-funds, the collection of village cesses, etc, when any complaints were forthcoming. But cases of close inspection and interference are the rule rather than the exception under the present system. In the Muhammedan period it was not the invasions, the internal wars or the dynastic revolutions but the pernicious system of appointing revenue agents and officials, too often outsiders and strangers from the imperial or provincial courts for the collection of the imperial revenue that affecttd the political influence the village communities possessed under Hindu rule. But local autonomy was preserved under a government, almost entirely fiscal like that of the Muhammadan. Sir William Hunter says: "This separation has stamped itself in the language of the people. The terms for the village and its internal life are almost everywhere taken from the vernacular Indian speech but beyond the village stretched

the Persian zila or district and beyond the zila, the Persian subah or province, whose capital formed the residence of the remote government or Persian Sarkar." Even under the beneficent Akbar though the village elders were not treated in terms of respect which belonged to independence, they were entrusted with complete freedom in the management of local affairs, while in the South, where the long and effective hand of Muhammedan administration could not reach, the village assemblies enjoyed considerable autonomy till the British ascendency, imposing fines for breaches of communal laws and even having jurisdiction in cases where capital punishment was given and which were decided by the assembly of the whole *nadu* or region presided over by the king's deputy. It is very characteristic that in the south some of the terms of the smritis connected with local government still linger showing the abiding influence of Indo-Aryan culture on the Dravidian polity. Such words as *sabha*, or *samuha* (village assembly), *vadi* (plaintiff), *kula-caste* assembly, *pratibadi* (accused), *pradhani*, *kula-ejman* (headman of caste), *gumastha* (clerk), *kanakan* (accountant who deals with gold), *grama-panam*, *grama-samudayam* (village funds), *karyasthan prabartikaran adhikari* (secretary), *dharma-mahimai*, (portion of profit set apart for religion), *samuha-mutham*, *mula-parishad*, *simetoka* are culled by me from experiences of the present day rural administration of Tamil and Telugu districts, of Travancore, Malabar and Coorg. The number of Dravidian terms in this connection is too numerous to mention : the institutions are similar in their nature and procedure to those of the north. Neither Mahommedan nor Dravidian emperors, neither Mahratta nor Kamatic rulers could eclipse the strength and prestige of South Indian rural democracy, which is also to-day offering the sturdiest resistance to the disintegrating forces and circumstances. It was indeed a surprise when in a Brahmin village I saw a *samuham* (a smriti word and institution) owning common lands (*samudayam*, again a smriti word), worth a lac of rupees, maintaining a guest-house, a temple, a Veda-pathshala, and arranging out of communal income for sahasranamajapam and the recital of the Vedic hymns Kavenpuranam and Bhagbatam, of the incantations from the Atharvaveda during times of epidemic as well as for the periodical festivals of Saraswati, Bhagavati and Ganesa and Sastha, for poor relief feeding on dwadashi, upakarma and Gayatrijapam days and the performance of the funeral ceremonies, of the destitute, auspicious occasions like jalakarma, namakaranam, annaprasanam, choulam, upanayanam, vivaham and simantam, a small fee is charged which goes to the *samuham.* Every group of ten families has a vote to elect a member for the assembly (sabha) which consists of 30 members.

From out of these the executive committee, *nirvaha* sabha, of nine is appointed. The president, *gramani* (a word commonly to be met with in Vedic polity) and the secretary. kanakan, are members both of the committee and the general assembly. This is the traditional village organisation of Indo-Aryan polity described in our old *nitis*, and this along with the technical names of the officials and bodies has survived so far south as Travancore where the process of centralisation is not less marked than in British India and the village *parbatikarans* are often unposted by the native government from outside a stranger to the village community. From the north to the south, from the east to west nothing can show better the fundamental cultural unity of India.

The rights of the Indian village community which were jealously safeguarded before but now jealously encroached upon have not disappeared, even as the central tree and the platform, the tank and the shrine with associated public hall and court with the guardian deity of justice installed therein have survived,—enduring monuments of a democratic polity and of a socialised religion with which this polity is so closely bound up. They are too old and deep-rooted to fall a prey to only fifty years of a powerful and centralised administration. But not merely in villages. The principle of self-government still operates also to craft-guilds, banking and mercantile corporations and religious organisations in our urban congregations. The informal customs and laws of these multiform bodies and associations also represent a continuity of historic traditions embodied in our old legal literature. Similarly the federation of a group of local bodies, either village communities or guilds, still survives.

Indian political evolution does not stop, as is so often alleged, with the history of the self-governing village. We have instances of the union of villages in a larger political and administrative organization. In inscription No. 600 of 1908 the great assembly of twelve nadus at Tiruppidavur is referred to. There is also another reference to the assembly of the inhabitants of valla-nadu, a sub-division, which declared that thenceforward they will afford protection to the cultivators residing within the four boundaries of the sacred village of Tiruvarangulam and its devadara villages. If any one of the assembly was found to rob, capture the cows or do other mischief to cultivators, the assembly agreed to assign two *mas* of wet land to the temple by way of fine for the offence committed (No. 273 of 1914). Another inscription records that the people living in the district called Rallapadikonda-Chola-Vala nadu, covering a large portion of the Pudukkotai state, entered into an arrangement for collecting brokerage on betel-leaf. This arrangement was supervised by the people of the district and the blameless five hundred men (constituting) the

army (padai) of the district. The word nadu, which is still in use, means a country or district, and the assembly of a particular nadu or a large number of nadus, which will be equivalent to a modern provincial conference or congress grouped together under one political authority, represents a more complex political integration. Thus beginning from the Brahmin *sabha* or the village urar, we find an ascending series through the Mahasabha, the larger Brahmin assembly, the nagarattar, the assembly of the traders and merchants, the *nanadeshi* or merchants from abroad, the nattar or the district assembly, and the assembly of the nadu or a larger division in ever-expanding circles of territorial jurisdiction, marking also the transition from an ethnogenic to a demotic composition. In such a federation backward communities like the all interests, industrial, commercial, agricultural and Brahminical, were represented, and the principles of functional and territorial represensation were fused. These democratic gatherings, which comprised often more than a thousand people, were held to protect from invasion, to found new towns or to levy import duties in a region and arrange for their collection, etc. But everywhere the necessity of greater strength for defence has been the main cause of federation in ancient Greece in mediæval and modern Europe as well as in medieval India. Thus the assemblies of the Nadu resembled to some extent the Boeotian, the Achoean and the Aetolian leagues.

The development out of the more primitive group of village communities was in two directions. First, the extensive caste or guild may be called a sort of a large federation of villages. Secondly, there was normally a very loose federation of agricultural communities,traders and merchants, villages and cities whose political union became closer as civilisation went on or the forces of aggression from without became more powerful. Whether meetings were summoned ordinarily or in occasions of special urgency depended on the periods of weakness or strength of the popular consciousness, whether it was a union of co-ordination on an equal footing depended upon the relative power of the individual units ; whether it was a mere juxta-position of the different elements and not their fusion depended upon local conditions and circumstances. But the fact cannot be denied that the village communities and the cities, while retaining their original independence and plurality in all internal matters, were passing into larger political organisations on a federal basis rising layer upon layer from the lower rural and communal stratifications on the broad and stable basis of a national democracy. This crucial phenomenon in our socio-political history demands attention for it is almost universally supposed that India did not evolve any political organisation between the autonomous village and

the central Government. The special corporations of merchants or religious sects or sub-sects jointly exercising their rights and privileges including those of taxation and coinage of money or their modern counterparts the guilds of craftsmen and merchants, Komtis, Shanas, Lingayets, Marwaris and even Panchamas who are distributed among a number of sub-divisions and even districts yet come under a centralised social management under ejamans, mahajans or gurus, in a far-off temple, trade-centre or village. Such non-local associations represent an intergration by mere reduplication of parts for satisfying functional needs. The assembly of the nadus, on the other hand, is a territorial organisation, which has a composite structure and constitution of its own meant to give expression not to functional needs or interests, but to the whole corporate life of communities, rural and urban, under their jurisdiction.

RADHA KAMAL MUKHERJEE.

EASTERN BENGAL NOTES AND QUERIES.

(Second Series: No. II.)

EDITED BY

H. E. STAPLETON, I. E. S.

THE GHUGRAHATI COPPERPLATE INSCRIPTION OF SAMACHARA DEVA AND CONNECTED QUESTIONS OF LATER GUPTA CHRONOLOGY.

BY

NALINI KANTA BHATTASALI,

Curator, Dacca Museum.

This plate appears to have been discovered sometime about 1908 by a cultivator in the village of Ghugrahati, under the Kotalipara police station of the Faridpur district of Bengal. Babu Kalipada Maitra, Assistant Settlement Officer, who was working on the Settlement operations in that quarter at the time, got hold of the plate and sent it to Mr. H. E. Stapleton, who entrusted Mr. R. D. Banerjee of the Archaeological Survey with its decipherment and publication. Mr. Banerjee's article on the plate, with a prefatory note from Mr. Stapleton appeared in the August, 1910 number of the Journal of the Asiatic Society of Bengal. Dr Bloch had pronounced this plate to be a forgery and Mr. Banerjee upheld that opinion by a discussion of the paleography of the plate in which he, "after prolonged examination, found some of the minor irregularities in the script." Thus, though the inscription in his opinion was mainly written in the regular alphabet of the sixth century A. D., he could detect in it scripts of the 3rd, 4th and 5th centuries A. D., as well as some belonging to 7th and 8th centuries. The other grounds for taking the plate to be a forgery were: (1) the unusual draft of the document; (2) the ambiguous and sometimes unintelligible language; (3) the triangular shape of the slit in the place where the missing seal had been attached, the holes met with in copperplates being always circular; (4) the mixture of Prakrit and Sanskrit in the language; (5) the too frequent use of the word *Tamrapatta.*

Three other copper-plates of a similar nature had however been found * in the Faridpur district in 1891 and 1892 and been purchased for the Asiatic society of Bengal by Dr. Hoernle and these after various vicissitudes, were taken in hand by Mr. Pargiter and published in the Indian Antiquary, for July 1910, in a very able and critical article. The publication of these plates necessitated the reconsideration of Mr. Banerjee's

* All my efforts at determining the exact find-spot of these three plates have hitherto been unavailing. Dr. Christie, Hony. Secretary to the Asiatic Society of Bengal in his letter No. 2234 of the September 1919, informed me that the plates belonged to one Kohiluddin and were purchased from Abdul Kak Abid; but he could not tell me in which particular village the plates were found.

propositions which he did in an article in the June, 1911 number of the J. A. S. B. His decision there is—"The paleographical evidence of these four plates taken jointly prove that the grants are spurious. The alphabets in which they are written has been compiled from that of three different centuries viz :—4th, 5th and 6th centuries A. D." (J. A. S. B, June, 1911, P. 296). Elsewhere he remarks. "This alone would point out the date of these inscriptions and place them in the last half of the sixth century or the 1st half of the 7th."

Shortly afterwards, Mr. Pargiter published an article in the August, 1911 number of the J. A. S. B which was based on the first article of Mr. Banerjee and was evidently written before Mr. Pargiter had occasion to see Mr. Banerjee's second article. In it Mr. Pargiter very ably defended the genuineness of these Faridpur plates and published a revised reading of the Ghugrahati plate which went a long way towards clearing it from the aspersions of ambiguity and unintelligibility that had been cast on it. Mr. Pargiter, also showed by discussiug the paleography of the grant that it was not spurious but perfectly genuine and valid. "The features" says Mr. Pargiter, "which he distrusts are to be found in other almost contemporaneous inscriptions which are genuine; so that as regards the script, there is nothing suspicious in this grant" (J. A. S. B., Aug., 1911, p.p. 495-96).

Mr. Banerjee answered this article in his paper entitled "Four forged grants from Faridpur" in J. A. S. B., December, 1914. A perusal of this article leaves the impression that the writer is trying to escape with ill success from an uneviably tight corner. The discovery from the village of Damodarpur in the Dinajpur district of Bengal of five plates, —two of Kumara Gupta I, two of Budha Gupta and one of a Gupta whose name is lost,—and their publication by Prof. R. G. Basak in the Epigraphia Indica Vol. XV, No. 3, will perhaps induce Mr. Banerjee to reconsider his decision as these plates bear a close family resemblance to the Faridpur plates, both as regards paleography and documentary form. I hope I shall be able to adduce proofs in the course of this article which will furnish additional reasons for the recognition of the Faridpur plates as genuine.

Before I proceed further, I should offer my edition of the plate, which is now in the Dacca Museum, having been presented to it by Babu Kalipada Maitra, the original owner. I have been studying the inscription and connected literature for a long time, and I think that in the present edition I have been able to improve Mr. Pargiter's reading of the plate in several important points. The whole document is now as clear as any ancient composition can be and explainable in the minutest details; and there is nothing at all doubtful in it with the exception of some technical

words, of the meaning of which we are not absolutely certain.

The **Plate** measures $8\frac{1}{4}'' \times 4\frac{3}{4}''$ and is $\frac{1}{10}$th of an inch in thickness. The **Seal** was attached to a conical projection to the proper right of the inscription but it has disappeared, exposing a triangular slit which evidently was meant to receive a shaft which connected the seal to the plate. It may be noted here that plate No. 2 published by Prof. Basak (E. I. XV. 3) has also got a similar slit which was originally triangular. So there is nothing suspicious in the triangular shape.

The plate is inscribed on both sides, the obverse containing 12 lines and the reverse 11 lines of writing. The letters vary from ·16 to ·40 inch in size. They are everywhere very clearly incised and are in a perfect state of preservation throughout. They belong to the North-eastern variety of the Gupta script of the 6th century A. D. **Numeral signs** for 10, 4 and 2 occur in recording the regnal year and the date of the month.

The *Language* of the inscription is correct Sanskrit prose. At the end occur two imprecatory verses and towards the middle a verse has been quoted (from some *smriti* work which I am unable to trace) on the virtue of making fallow land useful. Mr. Pargiter conjectured the presence of many *prakritisms* in the inscription but without much ground. Except some proper names occurring in the details of demarcation of the land granted, which are bound to be Sanskritisations of names in common use among the people, there is hardly any trace of *Prakrit* words in the inscription. The expressions which appeared to be derivatives of Prakrit forms are probably all misreadings or scribe's or engraver's mistakes.

As regards *Orthography*, it is interesting to note that a special feature of the Bengali language, the use *va* even in places where *ba* should be used, was asserting itself even in this early period. In this inscription there is only a doubtful case of the use of *ba* in the word *Sabata* সাবটা L. 13, where, if the letter used is *ba*, it is wrongly used. This custom of using only one sign for *ba* and *va* became universal in later Bengal inscriptions.

Superscript *ra* has doubled the following letters, ক, ণ, ত, দ, ম, ব; but the *va* in অভৈশ্চর্য্যবহারিভিঃ which in reality is *ba*, has not been doubled. Superscript *ra* has not doubled the following letters গ, জ, ধ, ভ, য, হ. Compound ত্র has always doubled the previous ত. The *avagraha* sign has not been used in যতোস্য L. 5.

The inscription refers itself to the *14th year* of the reign of a hitherto unknown *Emperor Samachara Deva*, who is styled *Maharajadhiraja*. In that year, *Jivadatta* was the Governor in *Navyavakasika*, which appears to have been the provincial head-quarters. The *District Officer* approved by Jivadatta in the *visaya* of *Varakamandala* was *Pabittruka*. This District Officer was assisted in his administration by a *District Council*

headed by the *Councillor Damuka.* This Council seems to have consisted of the *District Elders* Vatsa-kunda, Suchi-Palita, Sura-datta, Priya-Datta, Janarddana-Kunda and several other gentlemen. This seems to be too large a Council for a district, for directly administrative purposes, but of them only Damuka, the one man, who is styled a *Councillor,* appears to have been the executive assistant of the District Officer. The others, who were probably representative elders of the district, formed a consultative body of considerable power and influence.

Supratika Swami, a Brahmin approached the District Council headed by Damuka and applied for a piece of waste land for settling himself on it. The Council decided to give him the piece of land free of any consideration and after recognising Kesava, Nayanaga and others as the chief men of the public, gave (in their presence) the piece of land to Supratika Swami. The measurement of the land, which was situated in Vyaghra-choraka is not given but it was the whole of that place *minus* three *Kulyavapas,* which were already granted to some one else, and which were separated before the grant was made to Supratika Swami. I edit the inscription from the original plate.

TEXT.

Obverse.

১। সিদ্ধিরস্তু। স্বস্ত্যস্যাম্পৃথিব্যামপ্রতিরথে নৃগনহুষযযাত্যম্বরীষ সম

২। ধৃতৌ মহারাজাধিরাজশ্রীসমাচারদেবে প্রতপত্যে তচ্চরণকমল[1]

৩। যুগলারাধনোপাত্ত নব্যাবকাশিকায়াং সুবর্ণ[2]বী[3]থ্যাধিকৃতান্তর

৪। ঙ্গ উপরিক জীবদত্তস্তদনুমোদিতক বারকমণ্ডলে বিষয়-

৫। পতি পবিত্রুকো যতোস্য ব্যবহ[4]রতঃ সুপ্রতীকস্বামিনা জ্যেষ্ঠাধি

৬। করণিক দামুকপ্রমুখমধিকরণষ্বিষয়মহত্তর বৎস

৭। কুণ্ড মহত্তর শুচিপালিত মহত্তর বিহিতঘোষ শূরদ [ত্ত][5]

৮। মহত্তর প্রিয়দত্ত[6] মহত্তর জনার্দ্দনকুণ্ডাদয়ঃ অন্যেচ

৯। শহবঃ প্রধানা ব্যবহাণশ্চ[7] বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছাম্যহং ভবতা[8] প্রসা[9]

১০। দাচ্ছিরো[10]বসন্নখিলভূখণ্ডকং বলিচরুসত্রপ্রবর্ত্তনায়[11]

১১। ব্রাহ্মণোপযোগায় চ তাম্রপট্টিকৃত্য তদর্হথ প্রসাদকত্তু[12]

১২। মিতি যত এষ[13]দত্যর্থমনুপলভ্য শংযো[14] পরিলিখিতা

Reverse.

১৩। স্থৈর্য্যবহারিভিঃ সম্বত্য[15] সাবটা[16] খাপদৈস্তু ষ্টা রাজ্যোধর্ম্মর্থ[17] নিষ্কল।

১৪। যা[18] তু ভোগ্যীকৃতা ভূমি নৃপস্বৈদার্থে ধর্ম্ম কৃ[19] তদস্মৈ ব্রাহ্মণা[20] দায়তামি

১৫। ত্যবধৃত্য করণিক নয়নাগ কেশবাদীন্কুলবারান্প্রকল্প্য প্রাক্তাগ্রপট্টী

১৬। কৃত ক্ষেত্রকুল্যবাপত্রয়ং মপাস্ত[21] ব্যাঘ্র চোরকো[22] যচ্ছেষং তচ্চতুঃসীমা

১৭। লিঙ্গা[23] নির্দ্দিষ্টং কৃত্বাস্ম সুপ্রতীক স্বামিনঃ তাম্রপটীকৃত্য প্রতিপাদিত

১৮। সীমা লিঙ্গানি চাত্রঃ[24] পূর্ব্বস্যাং পিশাচ পর্কটি দক্ষিণেন বিস্তা

১৯। ধর কোটিকা পশ্চিমায়াং চন্দ্র বম্ম[25] কোট কোণঃ[26] উত্তরেন[27] গো

২০। পেত্রচোরক গ্রামসীমাচেতি ॥ ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ষষ্টিবর্ষসহ

২১। স্রানি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা বা তান্যেবনরকে বসেত্।

২২। স্বদত্তা[28] পর দত্তাম্বা যো হরেত বসু[29] ন্ধরাং স্ববিষ্ঠায়া[30] কৃমিভূত্বা[31] পিতৃভি[32]

২৩। সহ পচ্যতে ॥ সম্বত ১০ ৪ কার্ত্তি দি ২[33] ॥

NOTES ON THE READING.

(1) Read কমল। (2) The second ণ looks like a ভ and may be a sign for 2. (3) Mr. Pargiter reads it as বোধ্যা, but on a comparison with the other ও and ঔ marks used in this inscription, it will appear that the correct reading is বী and not বো. (4) read ব্যবহারন্তঃ (5) The word is in all probability শূরদত্ত as the subsequent name প্রিয়দত্ত suggests. The omission of the adjective বহুত্তর before the name is probably due to carelessness. The উ mark is indicated by the sign for উ accompanied by a short horizontal stroke or dot below, to the right. Here the left limb of the উ mark is curtailed for want of space and of the two dots to the right, one is probably a natural depression. (6) The engraver originally inscribed প্রিয়দাস, which was subsequently emended to প্রিয়দত্ত with the result that the word now appears like প্রিয়দাত্ত (7) Read ব্যবহারিণশ্চ। (8) Read ভবতাং (9) Only the left half of the letter ম is shown. The other half could not be drawn for want of space. (10) Read ষা (11) The letter at first sight appears to be ষী, but it is in reality ষা as it should be. Compare the other া marks in the inscription, esp. স্যা, L. 1. 3. (12) Read কর্ত্তৃর্বিভি (13) Read এতৎ (14) Mr. Pargiter had much trouble with this word which cannot be anything else than বপো. of ব occuring as the 3rd letter of this line. The left loop of ব is clearly visible in the original plate, but is incised much shallower than the ordinary letters. The mistaken horizontal bar towards the middle is responsible for its being confused with প। (15) The word as Mr. Pargiter very reasonably brought out, is undoubtedly সংস্কৃত্য। But the projection of the perpendicular stroke of ম upwards cannot be taken as an Anuswara as the other ম's in this inscription have also this peculiarity. The Anuswara over ম seems to have been left out through the engraver's mistake. (16) Mr. Pargiter's suggestion of ষষ্ঠা here as the irregular instrumental case of the numeral ষষ্ is inadmissible as it would give ষষা and not ষষ্ঠা। The 2nd letter of the word looks like *ba* but has also a very close resemblance to প occuring after two more letters in the same line. If it is a *ba* which has in no other place been used in this plate, it is an incorrect use as the word

খবট, meaning 'holes' is spelt with *v* and not *b*. The letter may however be either প or ব and should in all cases be emended to ব (17) Read বর্দ্ধার্ধ। The া mark is left out. Mr Pargiter's suggestion that the word is ভাব্যার্থ cannot stand. The letters clearly read বর্দ্ধর্ধ, the doubling of ব being indicated by a peculiar stroke looking like² which we have met in স্থবর্ণ, L. 3. (18) The second letter of this word is neither চ্ছ as Mr. Banerjee takes it nor ৎস as Pargiter reads it. It is clearly ক্ষু. The first letter has certainly been ill-formed and the simplest and the most probable emendation is যা. (19) Read কৃত (20) Read ব্রাহ্মণায় দীয়তাম্ (21) Read প্রণয়পাস্ত (22) Read তোরকে। (23) Read নিরবিদিতৈঃ (24) Omit : (25) Read বর্দ্ধ। It is not স্প as Mr. Pargiter takes it to be cf. বর্দ্ধ in line 14. (26) The word is কোণঃ and not কেণঃ। The right stroke which makes it ো and not ে is represented by a series of short shallow strokes, which are clearly visible on the original plate and which may also be seen on the excellent reproductions accompanying Mr. Banerjee's article and Dr. Bloch's article in the Archaeological Survey Report—1908. Neither Mr. Banerjee nor Mr. Pargiter observed these strokes and by misreading this important word, they missed some very important historical information furnished by this plate. (27) Read উত্তরেণ (28) Read খণ্ডাম্ (29) Mr. Pargiter reads স্থ, but there is no justification for it in the original plate. The right horizontal stroke in the middle which makes উ is absent. (30) Read ষাং (31) Read ভূ (32) Read ভিঃ (33) The figure is 2 and not 1. Both Mr. Banerjee and Mr. Pargiter have overlooked the fact that the figure is written by two strokes and not with only one stroke.

Translation.

May success attend (¹) ! May welfare accrue (²) ! While the supreme King the Lord of Kings, Samachara Deva, who is without a rival on this earth and who is equal in prowess to Nriga, Nahusha, Yayati and Ambarisha, was ruling in splendour, the Privy Councillor Jivadatta, master of the bullion market, (³) flourished, as Governor in Navyavakasika (⁴) through paying court to the twin lotus-like feet of that monarch (Samachara Deva) ; and the District Officer in the Varaka Circle (⁵) approved of by him (Jivadatta) was Pabittruka.

Whereas, according to the practice prevailing in these tracts (⁶) the (district) Council, headed by the eldest Councillor Damuka and (consisting of) the District Elder (⁷) Vatsa Kunda, the Elder Suci Palita, the Elder Vihita Ghosha, (the Elder) Surada (tta) the Elder Priya-Datta, the Elder Janarddana Kunda and others and many others skilled in law (⁸), were apprised by Supratika Swami (thus) :— "I wish through your Honours' favour for a piece of waste land which has long lain neglected, for the establishment of Bali' Charu and Sattra (⁹) and thus for assigning it for the enjoyment of a Brahmana ; do ye favour me with it by issuing a Copperplate Deed."

Wherefore, the above enumerated (elders) and the others who were skilled in law, receiving this petition and calling to mind (the following sloka) :— "The land which is full of pits and which is infested with wild beasts is unprofitable to the King both as regards revenue and religious merit. That land on the other

hand which is made capable of being used brings revenue and merit to the King himself." and having arrived at the decision,—" Let it be given to this Brahmin "—and having recognised (constituted) the *karanikas* Nayanaga Kesava and others as the chief men of the public (10),—and having separated three *kulya*—sowing (11) areas of land previously granted away by a copper plate,—the aforesaid Elders established the land that remained in Vyaghra-choraka by the issue of a copper plate as being (henceforward) in the possession of this Supratika Swami, after the demarcation of boundaries.

And the boundary indications are these: on the east, the goblin-haunted *Parkkati* tree; on the south the Vidya-dhara Jotika (12); on the west, the corner of Chandra Varman's fort; on the north, the boundary of the village Gopendra Choraka.

And here apply the verses:—The grantor of land delights in Heaven for sixty thousand years. The confiscator or one who approves of confiscation resides in Hell for an equal number of years. Whoever takes away land granted by himself or others becomes a worm in his own ordure and rots there along with his ancestors. The year 14: the 2nd day of Karttika."

Notes on the Translation.

1. Expressed by a symbol.

2. This phrase expresses the force of the word স্বস্তি better than simply 'Hail!'

3. সুবর্ণবীথ্যাধিকৃত is in all probability a title, honorary or otherwise. বীথি means a market, stall or shop in a market, and hence I have translated the phrase literally, as above. The real title may however have been 'Master of the Treasury or Mint.'

4. Navyavakasika was without doubt the Divisional Headquarters. For a discussion of its site, see below.

5. The name of the district was *Varaka-mandala* and here at least, *mandala* is not to be taken to mean, a territorial division distinct from *Visaya*. The expressions such as বারক মণ্ডলে বিষয়পতি পবিত্রুকঃ, বারকমণ্ডলবিষয়াধিকরণস্য suggest that the name of the Visaya itself was Varaka-mandala. From a study of the Bengal plates, it appears that ভুক্তি (Bhukti) was the largest territorial division, consisting of large tracts bounded by natural barriers, and divided into a number of Visayas or districts. Visayas were again divided into Mandalas, or circles, which again were, sometimes subdivided into Khan-dalas or Parts.

6. অস্য refers more reasonably to the tract of country in which this transaction took place than to the King, as Mr. Pargiter understood it.

7. মহত্তর is a title, something like the 'Honourable' of the present day.

8. The technical term ব্যবহার is ordinarily used to mean 'law' and ব্যবহারিণ, 'those that were experts in the law'.

9. Manu (Chap. III, from verse 67)

enjoins on all householders the performance of the five great sacrifices (*Pancha Mahayajnas*) viz :—(1) Study and teaching which is called Brahmayajna or Rshiyajna ; (ii) offering oblations to departed ancestors = Pitriyajna ; (iii) giving food to all creatures = Bali or Bhutayajna ; (iv) Entertaining guests = Nryajna ; (v) *Homa* or sacrifice = Deva Yajna. Of these, the 2nd, 3rd and 4th (which are equivalent to *Charu*, *Bali* and *Sattra*) appear to have been most important, and the term *Bali-charu-Sattra-pravartanam* (i. e. establishment of Bali, Charu and Sattra) came to mean the establishment of a house-holder. This stereotyped term is of frequent occurrence in the inscriptions of the period. *Vide* Fleet's 'Gupta Inscriptions" No. 25, 27, 23, 29: also Fleet's Note on p. 116. This term occurs also on the Tippera plate of Lokanatha edited by Professor R. G. Basak. Nos. 2 and 5 of the Damodarapura plates were also issued for the same purpose.

10. Mr. Pargiter explains কুলবারান্ as referees or arbitrators on what I consider to be insufficient grounds. The word is composed of two sections কুল and বার ; the former means, "the chief," "the head," and the latter means "the common people," "the public." So the natural meaning of the term *Kulabaran* is, "the chief men on the people's side."

11. As much land as could be sown by a *kula* (winnowing basket), full of seeds. The term is met with on most of the plates of this period.

12. Mr. Pargiter explains *Jotika* (জোটিকা) as equivalent to the Bengali word *Jot* (জোত্) meaning "cultivating tenure." This is hardly defensible though he is correct in stating that the word is a derivative from *Jota* (জোট). *Jot* (জোত্) is most likely derived from the Sanskrit word যৌতক which means "one's exclusive private property,"— 'any property in general". (*Vide* Apte's Sanskrit—English Lexicon.) The word জোট is derived from the root জুট্ = to come together, to unite, and জোট is still a very common word in Bengali, meaning "union" or "coming together." What its technical meaning was in the period of these copper-plates is more difficult to decide. It may be interesting to note that I have been able to find both জোট and জোটিকা in another Bengal grant, viz the Khalimpur grant of Dharmmapala Deva. (*Vide* Epigraphia Indica, vol IV ; but the references below are to the improved reading of the plate published in *Gauda-Lekhamala* edited by Mr. A. K. Maitreya C. I. E.) There (lines 36 and 37) we find the following expressions—পিণ্ডারবিটি-জোটিকাসীমা, উক্তার জোটস্য দক্ষিণান্তঃ, ধর্ম্মায়ো জোটিকা ; but unfortunately these expressions do not help us much in getting at a correct meaning of the words জোট and জোটিকা. For further discussion, *vide* the note below on the topography of the land granted by the plate.

Now I propose to discuss in some detail the various issues raised by the

inscription edited above. The first point is the determination of the identity of Samachara Deva.

SAMACHARA DEVA.

NUMISMATIC EVIDENCE OF HIS EXISTENCE.

Did Samachara Deva actually live and reign? Mr. Pargiter has already answered this question. "Even if the grant were spurious, no forger would be so foolish as to date it in the reign of a King who never existed." (J. A. S. B. August, 1911, p. 499). Fortunately, we can adduce stronger proofs of his existence than mere reasons,—proofs which have been actually in the hands of previous writers, though unfortunately no one has ever suspected their existence hitherto. I refer to the two gold coins, described as 'uncertain' on pages 120 and 122 of the I. M. C. Vol. I. and illustrated as Nos. 11 and 13 on Plate XVI. They are both of gold (considerably alloyed with silver). One of them, of the *Rajalila* or the 'throned King' type was found on the banks of the Arunkhali river near Muhammadpur in the Jessore district of Bengal. It was found along with a gold coin of Sasanka and another gold coin of the light-weight "Imitation Gupta" type as well as silver coins of Chandra Gupta, Skanda Gupta. and Kumara Gupta. (Allan; Catalogue of Gupta coins—Introduction—Section 171; and J. A. S. B., 1852, Plate XII). The provenance of the other coin is unknown. It is of the common archer type of Gupta coins. The King's name occurs below the right arm of the King but Mr. V. A. Smith did not venture a reading. A letter occurs between the feet of the King which Mr. Smith recognised as *cha*. The reverse legend he recognised as *Narendra-Vinata* with some hesitation. Of the Rajalila coin, he read the name of the King on the obverse as *Yamadha* written in characters of the **close of the sixth century** and the reverse legend as *Narendraditya*. Mr. Allan in his "Catalogue of Gupta Coins" attributes the 'archer type' coin to a period earlier than that of Sasanka (Introd, p lxi); and from the supplanting of the Garuda standard of the Guptas by the Bull standard on this coin, surmises that the coin was that of a devout *Saiva*. The King's name he reads hesitatingly (Section 165) as *Saha* or **Samacha** or *Yamacha*, and thus wants to connect it with the *Rajalila* coin on which he reads the Kings name as *Yamadha*. The reverse legend he reads on both the coins as *Narendraditya*.

In the Archaeological Surveys' Report for 1913-14, Mr. R. D. Banerjee discusses these two coins again, and after a careful study he comes to the conclusion that the name of the King on the obverse of both the coins is the same viz:—*Yama*. The reverse legend is read as *Narendravinata*.

A careful study of the two coins will, I believe, convince any scholar, that the name of the King is the same on both the coins and that it cannot be read as

anything else than *Samacha* (সমাচা); and the reading is confirmed when we come to know of a contemporary king Samachara Deva by name, whose copper-plate inscription was discovered not far* from the find spot of one of these coins (the *Rajalila* coin) and the lettering of whose name, as written on his copper-plate, closely agrees to the lettering on these coins. The coins may therefore be assigned to the Samachara Deva of the Ghugrahati plate and they furnish proofs hitherto wanting of his existence and reign, and of the genuineness of the Ghugrahati plate. These coins may be described thus :—

No. 1 Coin of Samachara Deva. Alloyed gold.; provenance unknown. Wt. 148·2 gr.; diameter :—·9 in.

Obv. :—The King, a powerful figure in traditional Gupta dress standing in *Tribhanga* pose. A halo is seen round the head and he looks to his own right; to the left of the head, curls are shown. A necklace of pearls or golden beads is prominent round the King's neck. A bow is shown in the left hand while the right hand is offering incense at the altar. Below the left hand, in characters of the close of the 6th century *Sama*, (সমা) between the feet *cha* (চা) and above the Bull of the standard, probably *ra*(র). The first *a* (া) in *Ma* (মা) is a superscript angular stroke and the second *a* (া) in *cha* (চা) is a short perpendicular stroke to the proper left, exactly as found on the Ghugrahati plate of Samachara Deva; but in this plate *cha* has the angular stroke and *ma* the perpendicular one. These methods of marking (া) appear to have been indiscriminate.

To the right of the King appears a standard firmly planted on the ground surmounted by a Bull. The Bull standard unmistakably shows that the King was a devout Saiva.

Reverse :—A Goddess, nimbate, seated on a full blown lotus. The appearance of the face does not seem exactly human but has resemblance to that of a lion's face. If so, the goddess would appear to be *Narasimghi* (নারসিংহী). She has a lotus bud with a stalk in her left hand and a noose in the right hand. To the right of the head of the goddess, what appears to be an indistinct monogram is seen and on the left margin occurs the legend *Narendravinata*, in blurred characters.

No. 2. Coin of Samachara Deva; alloyed gold, slightly purer than No. 1; wt. 149 gr.; diameter; ·8 in.

Obv. The King nimbate, sits on a couch in (for coins) unique *rajalila* pose, and looks to his right. His left hand is raised, as if to fondle the female figure standing to the left by touching her chin, or as if to point to the lettering above composing the first two letters of his name. The right hand is placed on the hip in a manner which, taken with the pose of the head, seems to express indifference or, defiance to, the female figure

*The distance between Muhammadpur and Ghugrahati is about 30 miles, the latter being to the S. E. S. of the former.

standing to the right though the meaning of the pose is not very clear. Above the pointing left hand occurs *sama* (সমা), below the couch *cha* (চা) and beneath the feet of the female figure to the right of the King, *ra* (র).

Reverse :—The goddess Saraswati * nimbate, stands in a lotus bed (কমলবন) in Tribhanga pose looking to her right, the left hand resting on a lotus with a bent stalk, while the goddess draws another lotus to her face (as if to smell it) with her right hand. A lotus bud on a stalk below the bend of the right hand, below which again is a *hamsa* (swan) with neck stretched upwards (উৎকমলহংসঃ). Two fan-like lotus leaves are visible on the two edges of the coin. On the left margin occurs the legend *Narendra-vinata.* The reverse type is also unique.

Some conclusions force themselves upon the careful observer of these two coins :—

(1) The King was certainly not of the Gupta lineage though he may well have been a successor of the Guptas in the dominions where the Guptas had once held sway.

(2) Samachara must on palæographic grounds be placed earlier than Sasanka in chronology ; also because there is no place for Samachara in chronology after Sasanka whose immediate successors in Eastern India were Aditya Sena and his descendants.

(3) He was a devout Saiva. The continuance of the Bull Symbol by Sasanka, as well as the facts (a) that the *rajalila* coin was found with a coin of Sasanka and (b) that Sasanka's lineage and parentage has never yet been satisfactorily established make it almost certain that Samachara was a predecessor of Sasanka in the kingdom of Gauda, and of the same lineage, possibly his father.

(4) The *rajalila* coin may be later than the other coin, as it shows a distinctly greater change from the almost conventional type of the latter.

SAMACHARA DEVA'S RELATION TO THE GUPTA DYNASTY.

Two other kings stand connected with Samachara Deva, viz: *Maharajadhiraja* Dharmmaditya and *Maharajadhiraja* Gopachandra of the Faridpur plates published by Mr. Pargiter. In order, therefore, to locate the position of these Kings in the chronology of the country, it is necessary to obtain a definite idea of the hitherto uncertain chronology of the Gupta kings and of their successors during the 6th century A. D. The publication by Professor Basak of the 5 plates of the Gupta kings Kumara Gupta, Budha Gupta and Bhanu (?) Gupta (Ep. India. XV, 3) has given all students interested the possibility of re-discussing the matter. Professor Basak is to be congratulated on the able

* Allan calls the figure Lakshmi, but *Hamsa*, swan is ordinarily associated only with the goddess of learning, Saraswati.

manner in which he has edited these important plates, but there is legitimate ground for difference of opinion as regards some of the deductions he draws from them.

The latest date hitherto met with on Skanda Gupta's silver coins is 148 G. E. = 467 A. D., and for all practical purposes it may reasonably be taken as the last year of the reign of that monarch. The Sarnath image inscription * of Kumara Gupta, shows that he was on the throne of the Empire in G. E. 154 = 473 A. D. and consequently he was in all probability the successor of Skanda Gupta and should be taken as Kumara Gupta II. The relationship between him and Skanda Gupta is not yet known, but the immediate succession naturally leads one to suppose that Kumara was the son of Skanda, especially when we find him named after Skanda's father, the first Kumara Gupta. The accession of Kumara Gupta II may be dated with some certainty in G. E. 149 = 468 A. D.

The evidence of the Bharsar hoard, as correctly understood by Allan (Gupta Coins, Introduction, p. li) in which coins of Samudra Gupta, Chandra Gupta II Kumara Gupta I, Skanda Gupta and Prakasaditya were found buried together made possible the natural deduction that Prakasaditya succeeded Skanda Gupta and that the hoard was buried in Prakasaditya's reign. It may now be accepted that Kumara Gupta II was the son and successor of Skanda Gupta, and so we must see if he can be connected with the coins bearing the legend of Prakasaditya. These coins are all of the 'horseman' type, and the letter which signifies the King's name on the obverse has been taken to be an otherwise inexplicable *ru*. (Allan. p. 135-36 Plate XXII. Nos. 1—6). I think, however, that this reading will have to be revised. The letter in coin No. 1 is almost certainly *ku*, the *matra* or the top horizontal line being very prominent. On coins Nos. 3 and 4, this letter is indistinct while on coins 2 and 6, the letter certainly looks like **ru**. The letter on coin No. 5 is very peculiar. It has been made in one stroke thus— and it is hardly possible to read it as *ru*. This symbol, I think, will have to be taken as *ku* and the letters on Nos. 2 and 6 as *kus*, as badly executed as the horse and the horseman on the coins are.

Kumara Gupta II was succeeded on the Imperial throne by Budha Gupta, probably about G. E. 157 = 476 A. D. as the Sarnath Inscription of Budha Gupta is dated in G. E. 158 = 477 A. D. Here again, his relationship with his predecessor is not known, but until evidence is produced to the contrary we may take him as Kumara's son. The latest date on the silver coins of Budha Gupta is G. E. 175 = 494 A.D.

* Progress Report of the Superintendent of Hindu and Buddhist monuments.—Northern Circle—1914-15. Pp. 6-7.

(Allan—No. 617). Budha Gupta had therefore a prosperous reign of about 17 years, and enjoyed a kingdom extending from Eastern Malwa to the Brahmaputra river. The theory hitherto current that he was a local ruler of Malwa of some importance, will now have to be abandoned, as Professor Basak has already shown in editing the Damodarapura plates, two of which are of the time of Budha Gupta. He was without doubt still the master of the greater part of Northern India, but the western parts had already been lost during the latter days of Skanda Gupta, as the limited circulation of his coins, and the total absence of the coins of his successors in the Western provinces, show.

The next king Bhanu Gupta, who from his name (Bhanu and Budha are both names of planets) appears to have been a brother of Budha Gupta, may be tentatively taken to have come to the throne in G. E. 177 = 495 A. D.

The Hunas under Toramana had by this time consolidated their kingdom in the Punjab and were preparing to contest with the Guptas the sovereignty of India. In G. E. 165 = 484 A. D. the two brothers Matrivishnu and Dhanyavishnu, who were local rulers of Eran about 250 miles W. S. W. of Allahabad and about 100 miles north of Sanchi in the Bhopal State, had acknowledged the suzerainty of Budha Gupta in the Eran pillar inscription (Fleet, p. 88). But in the Eran Boar Inscription of Dhanya-vishnu, the interval between which and the pillar inscription cannot very well be more than 25 years, the suzerain acknowledged is Toramana, in whose 1st year * the Boar was installed. Toramana must have ousted the Guptas from these parts in the course of these 25 or 26 years.

I think, we can be definite as to the year of Toramana's victory. The memorial Eran inscription of Goparaja, of G. E. 191 = 510 A. D. gives a clue to the situation. The inscription mentions that Goparaja was killed at Eran while fighting a great battle, —probably with the Hunas under Toramana—in the company of Bhanu Gupta and his allies

From the acknowledgment about the same time of the suzerainty of the Guptas in the eastern parts of the country (modern Central Provinces) by the Paribrajaka Maharajas and Maharajas of Uchchakalpa, Professor Basak

* The exact year of Toramana's accession to the position of Overlord of the Indian dominions of the White Huns is not known but it was unquestionably later than 484 A. D., the date of the Eran Inscription of Budha Gupta, which mentions Matrivishnu as the local King while Dhanyavishnu was his younger brother. In the Eran Boar Inscription of the 1st year of Toramana, Dhanyavishnu is the local king and his elder brother Matrivishnu is said to have gone to heaven. If Toramana ascended the throne immediately after 484 A. D., the battle of Eran in 510 A. D. in which Goparaja was killed will have to be taken as Bhanu Gupta's attempt to regain the former possessions of the Guptas from the grasp of Toramana or of his son Mihirakula.

has been led to suppose (Ep. India. XV. 3. p.{125) that Bhanu Gupta was the victor in the battle in which Goparaja was killed. But I do not think that the supposition is reasonable. The following facts should be considered :—

(i) Goparaja, who appears to have been a powerful ally of Bhanu Gupta, was killed in the battle.

(ii) If Bhanu Gupta were victorious the fact would certainly have been mentioned. Victory lay on the other side, hence the silence and the consolation of some high sounding adjectives.

(iii) Bhanu Gupta had evidently lost his former power, for, had he still been the suzerain, the fact would have been mentioned.

(iv) The suzerainty of Toramana is acknowledged by Dhanyavishnu King of Eran, while some years previously, he and his elder brother Matrivishnu had acknowledged Budha Gupta as their suzerain.

From these considerations it appears to be clear that the contest between Bhanu Gupta and the aggressive Tora mana took place in Eran, in 191 G. E. = 510 A. D. and that the battle resulted in the Gupta Emperor being worsted and having to cede Malwa to the invader. Bhanu Gupta was probably killed in action as was his faithful ally Goparaja, and also perhaps Matrivishnu ; or if Bhanu Gupta survived, he is not likely to have survived for long. The loss of Malwa still more circumscribed the already diminished Gupta Empire which after the loss of Malwa consisted of modern Bengal, Behar, Orissa (?) the Central Provinces and the Eastern half of the United Provinces.

From Skanda Gupta to Bhanu Gupta, we have thus an unbroken line of succession. Where, then is the place for Pura Gupta of the Bhitari seal and his line ? Mr. Allan, and others have assumed that during the latter days of Skanda Gupta, Pura Gupta, his brother or half-brother revolted and established an independent principality. (Allan, Introd. Sec. 62). But where was this principality ? We find Budha Gupta implicitly obeyed from Malwa to Paundra Vardhana. Where is the place in which Pura Gupta or his successors were obeyed ?

Prof. Basak saw this difficulty and wrote. (Ep. Ind. XV. 3) p. 120) "But with our present stock of knowledge, it is not very easy to indicate the place, where the branch line headed by Pura Gupta may have ruled ; it may be believed that the rulers of the stronger branch may, by courtesy and in good will, have suffered the other branch to rule somewhere in the eastern portion of the Gupta Empire, perhaps in South Behar."

It is easy to see that this supposition does not meet the situation, and such courtesy to a branch whose origin was by revolt is, to say the least, impolitic. The truth seems to be that Pura Gupta was a child of four or five when Kumara Gupta I died and

Skanda Gupta succeeded him on the throne, and that the child was brought up in the harem, as his name signifies. When the last king Bhanu Gupta of the main line died—possibly without leaving any successor—this Gupta prince, the great uncle of the last 2 kings who must now have reached an age of at least 60 years, was called to fill the vacant throne.

Pura Gupta cannot have reigned for more than a few years and the accession of his son Nara Simha Gupta Baladitya may be dated in 196G.E = 515A. D. Mihirakula may have succeeded his father at Sakala about this time.

We know from Yuan Chwang that Mihirakula invaded the kingdom of Baladitya who is called King of Magadha. In the battle that ensued, Mihirakula seems to have been taken prisoner, and condemned to death by Baladitya, but was saved from death by the intervention of the mother of Baladitya, whose name from the Bhitari seal is known to have been Vatsadevi. This contest may be dated (in view particularly of the mention of Mihirakula in one of the Mandasore inscriptions, we shall refer to next) about 525-533 A. D.

We have also to take note of a powerful prince, called Yasodharmman, who is known from the three Mandasore. Inscriptions (Fleet. Nos. 33, 34, 35) He claims to have subjugated the whole of Northern India, and received homage even from Mihirakula.

This boastful statement of Vasula, the enlogiser of Jasodharmman, who expressly states that he wrote to please his master Jasodharmman, has led all scholars to presume that he conquered Mihirakula, and they have taken great pains to reconcile the statement of Yuan Chwang that Mihirakula was conquered by Baladitya of Magadha with the boast of Yasodharmman's poet.

I fail however to see anything in the language of the Prasasti from which we can definitely conclude that Jasodharmman, engaged Mihirakula in battle and routed him. The boast of Yasodharmman is like that of a powerful upstart who revels in high-sounding panegyrics which represent all other Kings as subordinate to him and doing him homage. The Mandasore eulogy of Yasodharmman does not appear to convey more than that.

The third Mandasore Inscription links another king Vishnuvardhana with Yasodharmman, and a summary of this important inscription will now be given.

The inscription opens with an invocation of the God Siva. Next follows an enlogy of Yasodharman, the King.* This is followed by an eulogy of King Vishnuvardhana, whose famous lineage is said to have *Aulikara* royal insignia, the meaning of which term is not

*The term *Janendra*, as Allan has rightly pointed out, should not be taken to have any special significance, other than simply King.

clear. He brought into subjection very mighty kings of the east and north both by peaceful overtures and war, and thus obtained the titles of *Rajadhiraja* and *Parameswara*, so difficult to obtain.

An old servant of this line of kings was Sasthidatta. His son was Varahadasa. His son was Rabikirtti who married *Bhanu Gupta*† who gave birth to three sons,—Bhagabaddosha, Abhayadatta, and Doshakumbha. Abhayadatta, who appears to have done the duties of a viceroy (*rajasthaniya*) in the region between the Vindhyas and the western ocean, died early and was succeeded by his nephew Dharmmadosha, son of Doshakumbha; and Daksha, the younger brother of Dharmmadosha dug a well in memory of their uncle Abhayadatta in the Malava year 589 = 533—34 A. D.

The mention of Yasodharmman before Vishnuvardhana may mean either, (i) that he was the suzerain of Vishnu-Vardhana. This however fits in badly with the latter's indication of high status (Parameswara); or (ii) that Yasodharmman was the founder of the fortunes of the family and that Vishnuvardhana was one of his successors. The present-tense of *jayati* (is victorious), used in eulogising Yasodharmman, need not be taken too seriously, as by the terms of language then used in inscriptions the King might have been spoken of as victorious in heaven also. I am inclined to think that these two Kings were of the same family, that Yasodharmman was dead when this inscription was incised in 533 A. D. and Vishnuvardhana was gradually acquiring some degree of overlordship in India and subjugating the last Kings of the Gupta line in the east. The time of Bhanu Guptā, Rabikirtti's wife, exactly fits in with that of Bhanu Gupta, and the Gupta dynasty must have fallen on evil days to let a sister of the Emperor unite herself with a servant of these upstarts of Western India.

Narasingha Gupta Baladitya did not probably long survive his victory over Mihirakula, and the accession of the next King Kumara Gupta III may be dated in G. E. 213 = 532 A. D. The last Damodarapura plate is dated in 214 G. E. and it was issued during the reign of a Gupta whose name has been broken away. Professor Basak supposes that only two letters have been broken off and lost, but the letter *ra*, the last letter of Kumara which is simply a perpendicular stroke does not occupy much space, and future discoveries will, I think, show that the Gupta king ruling in the East in 214 G. E. = 533 A. D. was Kumara Gupta III, son of Baladitya.

On the testimony of the Kalighat hoard * which contained coins of Baladitya, Kumara Gupta III, Chandra Gupta III, and Vishnu (——') Chandra-

†As noted by Fleet, the name is a striking one, and Bhanu Guptā was very probably the sister of the Emperor Bhanu Gupta, given in marriage for political reasons to this Brahmana servant of Vishnuvardhana's family.

*See Allan, Introd. Sec. 166—169 and pages 137—146.

ditya, we may take the successor of Kumara Gupta III as Chandra Gupta III, who appears to have been succeeded by one whose name began with *Vishnu* and whose title was Chandraditya. * In the present state of our knowledge we cannot say definitely, who this Vishnu was, but from the sun and moon symbol on the reverse of the No. 3 Mandasore inscription it may be suggested that Vishnu Chandraditya of the Kalighat coins, was no other than Vishnuvardhana, who may by this time have made an end of the Gupta line of Kings in the east and thus become the paramount sovereign of Northern India. For the remaining period until the first established date of Sasanka in 606 A. D. (i. e. the year in which he slew Rajya Varddhana) Eastern India was ruled, as Mr. Pargiter has demonstrated from the Faridpur copper plates, by the Emperors Dharmaditya, Gopachandra and Samachara. It has been already pointed out that, unlike the Guptas but like Vishnuvarddana in the Mandasore inscription of 533 A D. and Sasanka in 606--625 A.D. Samachara was a devoted Saivite; and though much still remains to be cleared up in this hitherto obscure period, it does not seem an impossible conjecture that all these Kings were related to one another and formed a dynasty that took the place of the Guptas in Eastern India.

The following Chronological Table summarises the above discussions.

* A sun as well as a moon. A sun of scorching rays to his enemies and a moon of pleasing and cool rays to his friends.

Dates	Events	Reference
G. E. 94=413 A. D.	Accession of Kumara Gupta	V. A. Smith Early History of India. p. 27
G. E. 136=455 A. D.	Accession of Skanda Gupta	Do
G. E. 148=467 A. D	The latest date on Skanda Gupta's silver coins.	Do
c. G. E. 149=468 A. D.	Accession of Kumara Gupta II	
G. E. 154=473 A. D.	The Sarnath Image inscription of Kumara Gupta II	Ann. Progress Rep. of Supdt. of Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, 1914—15 p. 6—7.
c. G. E 157=476 A. D.	Accession of Budha Gupta	
G. E. 158=477 A. D.	The Sarnath inscription of Budha Gupta	Do Do
G. E. 175=494 A. D.	The latest date on the silver coins of Budha Gupta	Allan, Catalogue of Gupta Coins p. 153, coin No.617.
c. G. E. 176=495 A. D.	Accession of Bhanu Gupta	
G. E. 191=510 A. D.	Battle in which Goparaja is killed, having fought a battle in the company of Bhanu Gupta. The Guptas ousted from the West.	Fleet. G. I., p. 91
c. G. E. 192=511 A. D.	Death of Bhanu Gupta and accession of Pura Gupta in Magadha and the East	
„ G. E. 192=511 A. D.	Probable date of occupation by Toramforna the North, West and Central India.	Fleet. G. I., p. 158.
„ G. E. 196=515 A D.	Accession of Narasimgha Gupta Baladitya in Magadha and Mihirakula at Sakala.	
„ G. E. 211=530 A. D.	Defeat of Mihirakula by Baladitya	

Dates	Events	Reference
G. E. 214=533 A. D.	Mandasore Inscription of Vishnu-vardhana.	Fleet G. I., 150, no. 35.
G. E. 214=533 A. D.	The Damodarapura copper-plate inscription of the time of (III Kumara ?) Gupta.	Basak, Ep. Ind., Vol xv., no 3.
G. E. 214– c. G E 231 =533 A. D —c550 A. D.	Kumara Gupta III, Chandra Gupta III, Ghatotkacha Gupta, Vishnuvardhana, etc.	
c. A. D. 550–565	Dharmmaditya in Eastern India.	(*Vide* Pargiter Ind. Ant. 1910 for discussion of length of his reign which may have begun earlier than 550 A. D.
c. A. D. 565–585	Gopa Chandra in Eastern India.	He reigned for at least 19 years, this being the Regnal Year of Mr. Pargiter's third plate.
c. A. D 585–602	Samachara Deva in Eastern India.	Ditto 14 years (*vide* plate edited above)
c. A. D. 602–c.625AD.	Sasanka in Eastern India.	Ep. Ind. VI. P. 143.
A. D. 606.	Accession of Harshavardhana.	
A. D. 647.	Death of Harshavardhana.	
c. A. D. 648.	Independence of the Guptas of Magadha under Adityasena.	

(To be continued).

A PILGRIM'S IMPRESSIONS,

(Of a short visit to a temple-shrine Ramna, Burdwan.)

Silence! for it is sacred ground. The sun of a summer afternoon is scorching the mortals outside but inside all is calm and serene. Nature is hushed in silence and the inmost soul of even the man of the world who goes past the gate and steps into the midst of this peaceful retreat is subdued for the moment—for has not this place been sanctified by the heart-anguish of a Prince for whom the material world had lost its charm, who had indeed found out the mockery and hollowness of things and come into this retreat in search of that Bliss, ineffable and abiding—the goal and aspiration of all true devotees and which, two thousand five hundred years ago, was sought and found by another Prince in the forests of Budh-Gaya!

We left the conveyance at the gate and with it we were glad to leave behind the littleness of the world. The opportunity was there. Indeed the custodian of the gate of this sylvan retreat was the last emblem of the material world we were leaving behind us. And the moment was auspicious when, with an expectant and a beating heart, we first touched the dust of what was indeed to us a place of pilgrimage. Pilgrims we were, though not in the sense in which the word is understood at the present day. We hardly expected to see a hoary temple hiding in its bosom the gloomy mystery of bygone ages; and we were not surprised when there arose before our entranced vision beautiful little shrines under the canopy of one of which was placed the image of the greatest *deva* of the Hindu Pantheon, the personified idea of Renunciation, the God of the Sanyasins, the God of Gods—Shiva the Eternal; and in another, Parvati his Consort—the emblem of Force and Power, the Supreme Manifestation, the Energy-in-Play of Shiva the Reposeful. Nor did it evoke in us anything but a sense of forgetfulness of the ephemeral surroundings when we found carved in marble, beaming at us—even as it did at the beginning of things, as it will do through all Eternity—the word "Om" the Sound Symbol of the Eternal Ego the Self-Existent Sound which has no origin in duality.

To our right as we entered, at the far end, there is another little shrine which speaks of the catholic spirit of the worshipper for, within it, is placed the Image of Sankaracharya side by side with that of Buddha—the Man of Intellect alongside the Man of the Heart—the two Personalities, who met at the same point travelling by different roads—the one calling his path, the path of Mukti, the other the path of Nirvana—the one merging in Brahma, the other in the Nought-That-Is. Sankaracharya is depicted as a Sannyasin that he was and Buddha with a kid in his bosom—the

kid perhaps which he saved from being slaughtered at the altar of Desire. The artist in the worshipper has come out in the conception of these two Images—the one with the contented look of a Sannyasin—a look revealing the inner Man to whom the physical world had no existence, and with whom Existence itself was identified with One and One alone, who was Existence, Knowledge and Bliss combined and who was without a Second;—the other with eyes beaming with the light of mercy shedding its protective lustre upon the life of a kid, nay, even of a tiger. It was the look of a Man who would wait through all Eternity in order to show the path of Nirvana to his brethren and who would not care to to enter the gate of Bliss before even the humblest and weakest of his fellow mortals.

Lastly we came to the spot where, under the shade of a tree would sit the Prince in the garb of a commoner meditating on the Eternal in the soft still hours of the early dawn realising his oneness with the Spirit-That-Is and through It with the whole creation. This indeed is the sacred place where the purple robes were put off for the ochre-coloured garment of Renunciation. The stranger would not tarry here long for fear of disturbing the serene atmosphere of the spot. His eyes would however wander about the place and would in the end fix upon the enclosing wall on which were worked in relief the words of wisdom which were uttered centuries ago by sages who had realised the Truth. The words in prominent letters would remind one of the emptiness of things even as the atmosphere of the whole place would. The words indeed would meet you at every step, and wherever one's eyes would rest, one would have the sense of a passing vision of the Beyond through these sculptured utterances.

The stranger would come away with a sense of heaviness in his heart though not unrelieved by a ray of hope for he was leaving behind him all that was pure and all that was harmonious, though carrying with him a silent message of peace to the little world he was about to re-enter. He would come away on the approach of the evening but he would not come back the same man for his first impressions would never die and oftentimes in the stillness of the night there would come back to his memory the hour which uplifted his mind and the place which sanctified his soul.

NALINDRA NATH GHOSE.

BANGIYA SA... PARISHA...

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

১০ম খণ্ড | ঢাকা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭। | ২য় সংখ্যা।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী

'বঙ্গদর্শনে'র প্রথমপর্য্যায়ে উহাতে বঙ্কিমরচিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ছয়খানি আখ্যায়িকা প্রকাশিত হয়,—বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী ও রজনী। কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রথম নয়টি পরিচ্ছেদ মাত্র প্রথম-পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। একবৎসর বন্ধ থাকিবার পর সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয়পর্য্যায় আরব্ধ হইলে উহার প্রথমবর্ষমধ্যেই ঐ আখ্যায়িকা সমাপ্ত হয়। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত ছয়খানি আখ্যায়িকার মধ্যে ইন্দিরা প্রথমে অতি ক্ষুদ্রাবয়ব ছিল। কুড়িবৎসর পরে উহার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ঐ আকারেই উহা ইদানীং সকলের পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের মধ্যে স্তরনির্ণয় করিতে গিয়া কেহ কেহ এই গুলিকে "দ্বিতীয় স্তরের বা মধ্যস্তরের" উপন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মতে প্রথম তিনখানি উপন্যাসে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ছাড়া বঙ্কিমের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু মধ্যস্তরে উপন্যাসগুলি প্রায়ই এক একটা উদ্দেশ্য লইয়া সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত।" "মধ্যস্তরের উপন্যাসে অন্যান্য বিষয়ের (যথা "লিখনভঙ্গিমা, রস-মাধুর্য্য, চরিত্রচিত্র" প্রভৃতির) আদর্শ উৎকৃষ্ট দেখাইলেও সৃষ্টিচাতুর্য্যে এবং সৌন্দর্য্য অবতারণায় বঙ্কিম কাব্যের আদর্শ হইতে এক সোপান নামিয়া গিয়াছেন"। এই উক্তিগুলি রায়-সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিতের। তিনি আরও বলিয়াছেন, "অসাধারণ যশঃ ও সম্মানলাভের ফলে প্রতিভাবান্ বঙ্কিম, যেন পাঠকের মনোরঞ্জনের দিকে একটু লক্ষ্য করিলেন।—কিসে পাঠকের ভাল লাগিবে, কিসে সাময়িক সুখ্যাতি হইবে, কি উপায়ে ধর্ম্ম, নীতি, সংসার, সমাজ-প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ে প্রবেশ-লাভ করিয়া লোকশিক্ষকের উচ্চাসন লইবেন—এই রকম বিষয় যেন তিনি মনে মনে নির্ব্বাচিত করিয়া এক একখানি উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন"। "শেষাবস্থায় বুদ্ধিমান বঙ্কিম আপনার এ ভ্রম বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি সপ্তমে সুর চড়াইয়া আদর্শের চরম (?) পরাকাষ্ঠা দেখাইবার উদ্দেশ্যে স্বদেশভক্তি,

* বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম ১ম পরিচ্ছেদ।

মানবপ্রীতি ও ঈশ্বরপ্রেম—এই তিনটি পরমপদার্থকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাহারই ফলে আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামের সৃষ্টি হইল"।

আমরা আপাততঃ বঙ্কিমের এই শেষোক্ত তিনখানি উপন্যাসসম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলিব না। কিন্তু রায় সাহেব হারাণচন্দ্র যেগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যস্তরের উপন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঐগুলিতে 'কিসে পাঠকের ভাল লাগিবে, কিসে সাময়িক সুখ্যাতি হইবে, কিসে ধর্ম্মনীতি, সংসার সমাজ প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ে প্রবেশলাভ করিয়া লোকশিক্ষকের উচ্চাসন লইবেন,' খ্যাতি বা প্রতিপত্তির প্রতি বঙ্কিমের এমন অনুচিত আগ্রহ লক্ষ্য করিতে পারি নাই। বরং দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনীর ন্যায় এগুলিতেও সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই বঙ্কিমের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। আমরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিব, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারাম রচনার সময় যদিই বঙ্কিমচন্দ্র লোক-শিক্ষার প্রবৃত্তি কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া থাকেন, তথাপি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দ্বারাই সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কোনওটিতে হয়ত তিনি অধিক সফল হইয়াছেন, কোনওটীতে হয়ত তিনি অল্প সফল হইয়াছেন; কোনও একটা উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হওয়ার দরুণ যে সাফল্যের ন্যূনতাতিরেক ঘটিয়াছে তাহা নহে। একই শিল্পী সকলপ্রকার উপাদান দ্বারা একশ্রেণীর সমানসুন্দর বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারে না। একই কুম্ভকার সকলপ্রকার মাটি দিয়া সমান কারুকার্য্য যুক্ত ঘট করিতে পারে না। অবশ্য বয়োভেদে মানুষের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি, বিবেচনার ত্রুটি ইত্যাদি দ্বারাও সাফল্যে ইতরবিশেষ হয়। কিন্তু একটু নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম সমসাময়িকসমাজ-নিরপেক্ষ ভাবে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিষবৃক্ষ ইত্যাদিতে সমসাময়িক সমাজের অবস্থা অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, আর আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে যেন একটা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উদ্যোগী হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে হারাণ বাবুর লক্ষিত তিন স্তরের মধ্যে উপাদানেরই কিছু পার্থক্য আছে; বস্তুতঃ আদর্শ-বিষয়ে পার্থক্য বা ভ্রম হয় নাই।

তারপর স্তরের কথা। গ্রন্থসমূহ অনেকসময়েই গ্রন্থকারের মানসিক বিবর্ত্তনের বা রুচি ও প্রতিভার পরিণতির চিহ্ন বহন করে ইহা আমরা অস্বীকার বা অবিশ্বাস করি না। একই লেখকের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত গ্রন্থাবলীর আদর্শ এক হয় না। এক এক যুগে তাঁহার কল্পনা এক একটা ভাব বা আদর্শ দ্বারা সন্দীপিত হয়। সেই জন্য কোনও লেখকের রচনাসমূহের মধ্যে স্তরনির্ণয় অর্থাৎ তাঁহারা মানষিক বিবর্ত্তনের ইতিবৃত্ত নিরূপণচেষ্টা অনেকসময়েই বেশ কৌতুহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ হয়। জার্ম্মাণ সমালোচকগণ এই রীতি অবলম্বনে সেক্সপীয়র প্রভৃতির গ্রন্থাবলী হইতে অনেক অপূর্ব্ব তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে এক শ্রেণীর দোষের সম্ভাবনাও যে না আছে তাহা নয়। কখনও কখনও দেখা যায়, স্তরনির্ণয়চেষ্টার উৎসাহে সমালোচক হয়ত পূর্ব্বগঠিত একটা মত বা সংস্কার অবলম্বন করিয়া পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল সেই মত বা সংস্কারের পরিপোষক প্রমাণ অনুসন্ধানেই রত থাকেন; কখনও কখনও বা সাধ্য ও সাধনের স্বাতন্ত্র্যই বিস্মৃত হইয়া যান। তখন স্তরটা তাঁহার চক্ষে যত বড় প্রতীয়মান হয়, স্তরের অন্তর্গত গ্রন্থগুলি তত বড় মনে হয় না, কাজেই তাহাদের সূক্ষ্ম বিশেষত্বগুলির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও কোনও সমালোচক যে বিষবৃক্ষ হইতে তদীয় উপন্যাসে এক নূতন স্তরের সূচনা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাও আমাদের মতে অপ্রচুর সমীক্ষার ফল বলিয়া মনে হয়। কপালকুণ্ডলা একখানি নির্জ্জল নিছক কাব্য, এবং দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী নভেল অপেক্ষা কাব্যধর্ম্মে অধিক সমন্বিত ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিষবৃক্ষকে কেহ কেহ social novel বা সামাজিক উপন্যাসমাত্র মনে করিলেও বস্তুতঃ উহা ঠিক নভেল নহে, উহাও একখানি রোমান্স। যুগলাঙ্গুরীয়ও একটি ক্ষুদ্র রোমান্স। "চন্দ্রশেখর" দুর্গেশ-

নন্দিনী ও মৃণালিনীর সহিত সমসূত্রে স্থাপ্য। "রজনী"তেও রোমান্সের ধর্ম্মই বলবৎ। সুতরাং বিষবৃক্ষ হইতে বঙ্কিম যে পূর্ব্বাবলম্বিত আদর্শ ত্যাগ করিয়া নূতনপথে চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়?

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে প্রথম তিনখানি উপন্যাস পাঠ করিবার পর বিষবৃক্ষপাঠে প্রবৃত্ত হইলে একটা ভিন্ন রকমের আব্-হাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম বোধ হয়। ইহার কারণ এবারে বঙ্কিমচন্দ্র কিঞ্চিৎ নূতন প্রকারের উপাদান লইয়া আখ্যায়িকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সে উপাদান আর কিছু নহে তাঁহার সমসাময়িক সমাজের অবস্থা। এ সমাজে মনোরমার ন্যায় "বিধবা"র বিবাহের জন্য পশুপতির ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজমন্ত্রীকেও একটা রাজ্য যবনহস্তে তুলিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিতে হয় না; নগেন্দ্রের মত স্বসমাজে প্রতিপত্তিসম্পন্ন সাধারণ একজন ধনী লোকই অক্লেশে বিধবাবিবাহ করিয়া ফেলিতে পারে। এ সমাজে কন্যা ও পুত্রবধূকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য খৃষ্টানী শিক্ষয়িত্রী (মিস্ টেম্পল) নিযুক্ত করা হয়। এ সমাজে তারাচরণ মাষ্টার-রূপ মহামহোপাধ্যায় কুক্কুটমিশ্রপাদ 'Citizen of the World' এবং "Spectator' পড়িয়া এবং তিন বুক জিওমেট্রি সমাঘ্রাণ করিয়া সমাজসংস্কারসম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে প্রবন্ধ লিখেন, এবং "হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর!' এই ভণিতায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া সকলকে বলেন, "তোমরা ইটপাটকেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জ্যেঠাইদের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।" আরও একজন রিফর্ম্মার (দেবেন্দ্র বাবু) কলিকাতা হইতে "বাবুগিরিতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া", "দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন……।" তিনি আবার মেয়েদের বিবাহ করা বিষয়ে "বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন", কিন্তু সেটা নাকি "বাহির করার অর্থ বিশেষে।" * ইহা ছাড়া বিষবৃক্ষের সমাজে বৈষ্ণবীরা ভিক্ষায় বাহির হইয়া "বৈরাগিরঞ্জন রসকেলি কাটিয়া খঞ্জনীর তালে মধুকানের কি গোবিন্দ অধিকারীর গীত" § গায়; বৈষ্ণবী বাড়ীর ভিতর গেলে পৌরস্ত্রীগণ গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে বা দাসরথি রায়ের † গান ফরমাস করে, এক ভূম্যধিকারিবংশের দুই শাখায় পুরুষানুক্রমে মোকদ্দমার ফলে এক শাখার সর্ব্বস্ব ডিক্রীজারিতে নষ্ট হয়, এবং অন্য শাখা তাহাদের তালুক মুলুক সকল কিনিয়া লয়। এ সবই যেন বড় জানা, বড় চেনা, বড় realistic ব্যাপার। তথাপি একটু বিশেষ আছে। নগেন্দ্রনাথ পূর্ব্বরাগের প্রথম আবেশে কুন্দনন্দিনীসম্বন্ধে হরদেব ঘোষালকে লিখিয়াছিলেন,—"বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবীছাড়া কিছু আছে, রক্তমাংসের যেন গঠন নয়, যেন চন্দ্রকর কি পুষ্প-সৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে"। বিষবৃক্ষ একটা অপরিচিত জগতের চিত্র হইলেও উহাতেও যে কুন্দের রূপের মত জগৎছাড়া কিছু আছে, তাহা একটু নিপুণভাবে নিরীক্ষণ করিলেই ধরা পড়ে। সেটুকু কবির কল্পনারাজ্যের আলোক, আদর্শ লোকের ছায়া,—ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের ভাষায়—

> The light that never was, on sea or land,
> The consecration, and the Poet's dream. •

বস্তুতঃ বিষবৃক্ষকে আমরা সামাজিক নভেল বলিতে সম্মত নহি। উহা রোমান্স; কিন্তু "romance without idealism" (আদর্শলোকের ছায়াহীন কল্পনামাত্র-সম্বল আখ্যায়িকা) নয়, উহার "beauty without glory" (সৌন্দর্য্য গৌরবহীন) নহে। বিষবৃক্ষের

---

* বিষবৃক্ষ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। তারাচরণের তিনবুক জিওমেট্রি পর্য্যন্ত পঠিত থাকায় কথায় পাঠকের Goldsmith এর village school masterকে মনে পড়িবে। And even the story ran that he could gauze.

† বিষবৃক্ষ দশম পরিচ্ছেদ।

§ বিষবৃক্ষ সপ্তম পরিচ্ছেদ। মধুকান বা মধুসূদন কিন্নর বিষবৃক্ষ প্রকাশের কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে (১৮৬৮ কি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে) এবং গোবিন্দ অধিকারী মধুকানের প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করেন।

† গোপাল উড়ের জন্ম-মৃত্যুর সন তারিখ বিশেষ জানা যায় না। তবে তিনিও যে ইহাদের সমসাময়িক তাহার প্রমাণ আছে। দাশরথি রায় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন

• Elegiac Stanzas suggested by a Picture of Peele Casle, in a Storm.

কাব্যধর্ম্মটুকু তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে স্ফুট। ঐ পরিচ্ছেদের নাম বঙ্কিম একটা পাশ্চাত্য কবিসময় অবলম্বনে "ছায়া পূর্ব্বগামিনী" † দিয়াছেন। কুন্দের স্বপ্ন কতকটা কপালকুণ্ডলার স্বপ্নের মত *। কপালকুণ্ডলা একজন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ (কাপালিক) এবং ভীমকান্ত শ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারীকে (মতিবিবিকে) দেখিয়াছিল, কুন্দ নগেন্দ্রনাথ ও হীরাকে দেখিল। কপালকুণ্ডলারও যেমন ব্রাহ্মণবেশধারীর আহ্বানে গৃহের বাহিরে না যাওয়াই ভাল ছিল, কুন্দেরও সেইরূপ হীরার সংসর্গে না যাওয়াই উচিত ছিল। কপালকুণ্ডলার ন্যায় কুন্দও ক্রূর অদৃষ্টের হাতের একটা ক্রীড়াপুত্তলিকা। জীবননাট্যের শেষ অঙ্কে কপালকুণ্ডলা বন হইতে গৃহাভিমুখে চলিতে চলিতে জাগ্রত অবস্থায়ই (স্বপ্নের ন্যায়) আকাশপটে ভৈরবীমূর্ত্তি দেখিয়াছিল, এবং শুনিয়াছিল ভৈরবী তাহাকে বলিতেছেন, "বৎসে, আমি পথ দেখাইতেছি"। † কুন্দও শেষস্বপ্নে মাতার মুখে শুনিয়াছিল, "এখন যদি সংসারসুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।" এসবই কাব্য; উপন্যাস (নভেল) নহে। ‡ কপালকুণ্ডলার মত বিষবৃক্ষে বঙ্কিম পদে পদে নিমিত্তাদি সূচনা করেন নাই বটে, তবু দেখা যায় নগেন্দ্রের প্রতি প্রেমের সূচনায়ই প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দ ভাবিতেছে "বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব?…" ইত্যাদি। আবার নিশীথে নগেন্দ্রের গৃহত্যাগকালে কুন্দ নগেন্দ্রের শয়নাগারে কাচের আবরণে বদ্ধ বর্ত্তিকায় পতন জন্য পতঙ্গগণের নিষ্ফল প্রয়াস দেখিয়া হৃদয় মধ্যে পীড়িতা হইয়াছিল। * এই সকল স্থলে কৌশলে কুন্দের প্রেমের ভাবী পরিণতি সূচিত হইয়াছে।

সূর্য্যমুখী "বিষবৃক্ষে"র গৌরব। ঐ চরিত্রটির প্রতি উহার স্রষ্টার কিরূপ সহানুভূতি ছিল তাহা আমরা কবি নবীনচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি। † বস্তুতঃ এই আখ্যায়িকায় প্রায় সমস্ত idealism ঐ একটি চরিত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিম সূর্য্যমুখীকে কোন আদর্শে গড়িয়াছেন বলা কঠিন; মনে হয় সূর্য্যমুখীর চরিত্রসৃষ্টিকালে সত্যভামার চরিত্র-চিত্র বঙ্কিমের মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সত্যভামার একখানি চিত্র নাকি সূর্য্যমুখীর শয়নগৃহে ছিল; সে চিত্রে রজত-কাঞ্চনের ওজনে স্বামীর মূল্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্তা সত্যভামার বিড়ম্বনা অঙ্কিত হইয়াছিল। ঐ চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী নাকি স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! স্বামীর সঙ্গে রূপার তুলা।" * সূর্য্যমুখীকে অবশ্য

† ইংরাজীতে বলা হয়—Coming events cast their shadows before.

* কপালকুণ্ডলা চতুর্থখণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ। বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের শিরোদেশে বায়রণ হইতে এই পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—I had a dream which was not all a dream সেক্ষপীয়রের Richard III Act I Sc. IV ক্ল্যারেন্সের স্বপ্নটি এই স্বপ্নের সঙ্গে তুলনীয়।

† কপালকুণ্ডলা চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

‡ কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নে বৃহৎচন্দ্রমণ্ডলসদৃশ এক জ্যোতির আকাশ হইতে অবতরণ ও ক্রমে তাহাতে কুন্দের মাতার মূর্ত্তিবিকাশের বর্ণনা কিয়ৎপরিমাণে শিশু-পালবধে বর্ণিত নারদের আকাশ-হইতে অবতরণের তুল্য।

চয়ত্বিষামিত্যবধারিতংপুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্।
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ॥
শিশুপালবধ প্রথমসর্গ তৃতীয় শ্লোক।

* পঞ্চম পরিচ্ছেদেও কুন্দের পিতৃগৃহ হইতে নগেন্দ্রের অনুগমকালে বঙ্কিম বলিয়াছেন, কেহ কেহ এমন পতঙ্গবৃত্ত যে জলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবৃষ্ট হয়। বহ্নি-পতঙ্গ দৃষ্টান্তটি বঙ্কিমের খুব প্রিয়। পাঠক অবশ্য জানেন, কুমারের তৃতীয়সর্গে (৬৩ সংখ্যক শ্লোকে) হরবদ্ধলক্ষ্য কন্দর্পকে পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ বলা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক উপন্যাসে ঐ দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—মৃণ্ময়ী "জলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।" 'কৃষ্ণকান্তের উইল, প্রথমখণ্ড ১৪শ পরিচ্ছেদে রোহিণীসম্পর্কে "পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" এই কথাটিই আছে। 'চন্দ্রশেখর' দ্বিতীয় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদে শৈবলিনী প্রতাপ সম্বন্ধে বলিতেছে "সে শৈবলিনীপতঙ্গের জলন্ত বহ্নি"। আবার পঞ্চমখণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে, "দলনীপতঙ্গ বহ্নিমুখেবিবিক্ষু হইল"। "কমলাকান্তে"র সমগ্র "পতঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

† ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* বিষবৃক্ষ ৪৪শ পরিচ্ছেদ।

স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবতী ও স্বামীর মর্য্যাদাসম্বন্ধে গভীরবিশ্বাসপরায়ণা দেখি। তিনি বলেন, "পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে তবে সে স্বামী"। † একথাগুলিকে আন্তরিকতাহীন বিবেচনা করিবার কোনও হেতু নাই। কিন্তু সেই সূর্য্যমুখী যখন স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত কুন্দের বিবাহ ঘটাইয়া দেবার পর স্বয়ং গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন, তখন তাহাতেও সত্যভামার ক্ষণিক মোহের ন্যায়, ক্ষণিক আত্মাদরের প্রাবল্য দেখিলাম। কুন্দের বিবাহের পর বিস্মমানা সূর্য্যমুখীকে কমলমণি যথার্থই বলিয়াছিলেন "তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দাহ হতেছে। তবে কেন বল 'আমি কে?' তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও 'আমি'তে ভরা, নাহলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?" সূর্য্যমুখীকে অন্তর্দাহে দগ্ধা দেখাইয়া বঙ্কিম হয়ত তাহাকে লক্ষহীরা-কাহিনীর পতিব্রতা পত্নীর ন্যায় "আদর্শ" রমণী করেন নাই কিন্তু যথার্থ রক্তমাংসের একজন স্ত্রীলোক করিয়াছেন। অভিমান, ভ্রম মানুষের স্বাভাবিক; সূর্য্যমুখীর ন্যায় পতিপ্রাণা রমণীতেও তাহা অস্বাভাবিক বা অশোভন হয় নাই। দুই দিন পরে সেই অভিমান ও ভ্রম কাটিয়া গেলে সূর্য্যমুখীর চরিত্র অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। বস্তুতঃ সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ কেবল রোমান্স নয়; উহাতে ভাবিবার ও শিখিবার কথা আছে।

কমলমণির সহিত ব্যবহারেও সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া সত্যভামাকে মনে পড়ে। ননদ ভ্রাতৃবধূতে এমন প্রীতি মহাভারতের পরে কোনও হিন্দু কবি দেখান নাই। শ্যামাসুন্দরী-কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিম ইহার ছায়াপাতমাত্র করিয়াছিলেন।

সূর্য্যমুখীর পরে কমলমণিই বিষবৃক্ষের উজ্জ্বলতম নারীচরিত্র। সূর্য্যমুখী গম্ভীরা, কমল কিছু রসিকা—এ প্রভেদ যে উভয়ের বয়সের প্রভেদে ঘটিয়াছে তাহা মনে হয় না। কমলমণিতে বঙ্কিম গিরিজায়ার প্রফুল্লতাটুকু যোল আনাই আনিয়া ফেলিয়াছেন; আনেন নাই কেবল তাহার কণ্ঠের সঙ্গীত আর হাতের ঝাঁটা। সূর্য্যমুখী নিঃসন্তান; ঐ দৈবকৃত অপূর্ণতাটুকু কমলমণিতে পরিপূর্ণ করিয়া বঙ্কিম দেখাইয়াছেন মাতৃত্ব স্ত্রীলোকের পক্ষে কত সৌন্দর্য্যের—কত গৌরবের বস্তু। সূর্য্যমুখী অনুরক্তা পত্নী ও বৃহৎপরিবারের যোগ্যতমা গৃহিণী। কমলমণি অনুরক্তা পত্নী ও স্নেহময়ী মাতা। সন্তানের স্নেহে তাহার স্বামিপ্রেম বুঝি আরও গভীর—আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রথাঙ্গনাম্নোরিব ভাববন্ধনং
বভূব যৎ প্রেম পরস্পরাশ্রয়ম্।
বিভক্তমপ্যেকসুতেন তত্তয়োঃ
পরস্পরস্যোপরি পর্য্যচীয়ত॥ *

সূর্য্যমুখী ও কমলমণি এই যুগলমূর্ত্তিতে বঙ্গীয়া রমণীর পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়।

কুন্দনন্দিনী কাব্যকাননের অস্ফুটন্ত কুন্দ-কুসুম, বড় শুভ্র কিন্তু ফুটিবার অবকাশ না পাওয়ায় সবটুকু সুবাস বিতরণ করিতে পারে নাই। তিলোত্তমার ন্যায় সে নীরবসহিষ্ণুতা, "মুগ্ধা নায়িকা"; কপালকুণ্ডলার ন্যায় সে দৈবহতা। দেবেন্দ্রের লালসাবহ্নির উত্তাপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় উহা হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত করিয়া কুন্দকে উপহত করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন বিধবাবিবাহের কুফলপ্রদর্শনই কুন্দনন্দিনীর সৃষ্টির হেতু। আমরা তাহা মনে করি না। সে শ্রেণীর মোটা রকমের সমাজশিক্ষার প্রয়োজনে কুন্দকে বিধবা করা হয় নাই, সূক্ষ্ম কাব্যকলার প্রয়োজনে করা হইয়াছে। বিষবৃক্ষ-কাব্যের যাহা শিক্ষা তাহা বঙ্কিম স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

† ঐ ১১শ পরিচ্ছেদ।

* রঘুবংশ তৃতীয় সর্গ ২৪শ শ্লোক। চক্রবাক-চক্রবাকীর ন্যায় তাঁহাদের (দিলীপ ও সুদক্ষিণার) পরস্পরের প্রতি যে অন্যনিরপেক্ষ প্রেম ছিল, একটি তনয় তাহার ভাগ গ্রহণ করিলেও, পরস্পরের প্রতি তাহা বর্দ্ধিতই হইল।

ইংরাজীতে যাহাকে parallelism বলে, এবং একশ্রেণীর একাধিক পাত্রপাত্রীকে সমসূত্রে স্থাপন করিয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্যপ্রদর্শন যাহার উদ্দেশ্য, বিষবৃক্ষে বঙ্কিম সেই রীতি প্রচুরপরিমাণে অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ দেখিতে পাই তিনি আমাদের সম্মুখে তিনটি পরিবারের বিবরণ স্থাপন করিয়াছেন। প্রথম দেবেন্দ্রের পরিবার—যাহা তদীয় পত্নী হৈমবতীর "রূপে গুণে" উৎসন্ন হইয়াছে পাঠক শুনিয়াছেন হৈমবতীর অনেকগুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনা, আত্মপরায়ণা; যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয় তখন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, লেখা পড়ায় তাহার বিশেষ যত্ন ছিল, এবং প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয়ই তাহার কাল হইল! ইহার পার্শ্বে কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের গার্হস্থ্য-চিত্র স্থাপন কর, দেখ এ একেবারে বিপরীত কি না। স্বামিস্ত্রীতে কেমন সম্বন্ধ! তবে শ্রীশের আফিসের কেরাণীরা বলে শ্রীশচন্দ্র নাকি "বড় স্ত্রৈণ"। সেটা শ্রীশ নিজে অপমানের বিষয় মনে করে না; কোন পাঠক করেন? এ পরিবারের নিত্য উপচীয়মান স্নেহপ্রীতি রঙ্গরসের বালাই লইয়া মরিতে কার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু পরিবারটি বড় ক্ষুদ্র; বহুকুটুম্বযুক্ত বাঙ্গালী পরিবার নহে—সাহেবী পরিবারের মত ক্ষুদ্র পরিবার—সহরে চাকুরে লোকের যোগ্য। পরিবারটি ক্ষুদ্র বলিয়াই গৃহিণীর তরল আনন্দ, চপল স্ফূর্ত্তির অবকাশ আছে। নগেন্দ্রের পরিবার অন্যবিধ; সূর্য্যমুখীর ন্যায় শিক্ষিতা,পতিভক্তিমতী, সুরুচিশালিনী, গম্ভীরা, দৃঢ়চিত্তা নারীই ইহার যোগ্যা গৃহিণী। এ সংসারে যে অশান্তি প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিদোষে নহে, অদৃষ্টের দোষে—নগেন্দ্রের চিত্তসংযমের অভাবে। নগেন্দ্র যে শ্রীশের মত স্ত্রৈণ নন, তাহা তাঁহার দুর্ভাগ্য। তাই হেলায় রতন হারাইবার পূর্ব্বে তিনি বুঝেন নাই, সূর্য্যমুখী তাঁহার কি ছিল; পরে বুঝিয়াছিলেন।

সূর্য্যমুখী আমার—সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার। আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য। আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?*

পারিবারিক চিত্রগত parallelism বা তুলনা ছাড়া ব্যক্তিগত parallelismও বিষবৃক্ষে আছে। তাহা পূর্ব্বে কিছু দেখান গিয়াছে—আরও কিছু দেখাইব। নগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্র ও হীরা এই তিন ব্যক্তিই স্বহস্তে স্বেচ্ছায় বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ নিতান্ত হীনচরিত্র, তাহার রুচি অতি নিকৃষ্টশ্রেণীর ইন্দ্রিয়সেবায়। তাহার পরিণামও অতি জঘন্য। নগেন্দ্রনাথ উন্নতরুচি, কেবল সংযমের অভাবে বিড়ম্বনাগ্রস্ত। দুঃখের কঠোর শিক্ষায় পরে তিনি চৈতন্যলাভ করিয়া ছিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা; সেও চিত্তসংযমের অভাবে প্রথমে আপনি মজিল,—আপনার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিল; পরে দেবেন্দ্রের প্রতি ক্রোধে নিরপরাধা কুন্দকে বিষ দিল। পাপের পথে পতন যে কতদূর দ্রুত ও বিকট হয়, হীরা তাহার দৃষ্টান্ত। পাপের পথে পতন যে কত নীচ ও বীভৎস হয় দেবেন্দ্র তাহার দৃষ্টান্ত। নগেন্দ্র রূপজমোহগ্রস্ত হইয়া বিধবা কুন্দকে "বৈধ" উপায়ে পত্নীরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন,কিন্তু মোহ সর্ব্বাবস্থায়ই অবৈধ—পাপ: নগেন্দ্র পাপপথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগজনিত আঘাতে প্রবুদ্ধ হইলেন। সুরুচি, সুশিক্ষা ও সম্ভবতঃ পত্নীর পুণ্যবল তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। দেবেন্দ্রে এই তিনটিরই বড়

* নগেন্দ্রের বিলাপের সঙ্গে রঘুবংশের অজ বিলাপের "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।" ইত্যাদি তুলনীয়। এই স্থলে কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর মৃত্যুর পূর্ব্বে ভ্রমরসম্পর্কে গোবিন্দলালের উক্তিও স্মরণীয়। নবজলতার ব্যক্তিভক্তি সম্পর্কে রজনীর কৌতুকমিশ্র উক্তিগুলিও তুলনা করা যাইতে পারে।

অভাব। তাহার অদৃষ্টও মন্দ। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র উভয়েরই সদুপদেষ্টা ছিল, দেবেন্দ্রের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার উপদেষ্টা সুরেন্দ্র "প্রত্যহ রাত্রে" (প্রায়ই দেবেন্দ্রের মত্তাবস্থায়) একবার আসিতেন। তাহার উপদেশবীজ অকালে উপ্ত হইত বলিয়া অঙ্কুরিত হয় নাই। হরদেব ঘোষালের সময়োপযোগী উপদেশগুলি নগেন্দ্রের চৈতন্যোদয়ের সহায় হইয়াছিল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন।

কবিবল্লভের "রসকদম্ব"।

মালদহে প্রথম এই পুঁথি পাওয়া যায়। ১৩০৮ সালে ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী "প্রদীপ পত্রিকায়" ইহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৩০৯ সালের সাহিত্য পারিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করেন। কাব্যাংশে ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থখানি উপাদেয়। অধিকন্তু ইহা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার প্রচার বাঞ্ছনীয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে এই কবির কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় গ্রন্থেও ইহার কোন নিদর্শন উদ্ধৃত হয় নাই। বঙ্গীয় কাব্য ও সাহিত্যামোদীর নিকট ইহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রসকদম্বের সময় নির্ণয়।

কবিবল্লভের রসকদম্বের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন গোল নাই, কারণ গ্রন্থ শেষে কবি স্বয়ংই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—

ফাল্গুনী ফাল্গুণ ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে॥
বিংশতি অধিক পঞ্চ দশ শত শক।
তখনে রচিল রস কদম্ব পুস্তক॥

শুধু শকের উল্লেখ থাকিলে কিছু সংশয়ের কারণ থাকিত, কিন্তু কবি বার নক্ষত্র ইত্যাদি যেরূপ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে শকাঙ্কটা ঠিক হইল কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার সুবিধা হইয়াছে। বন্ধুবর তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গণনা করিয়া দেখিয়াছেন ১৫২০ শকে বাস্তবিকই 'ফাল্গুণী ফাল্গুণ ফাগু পৌর্ণমাসী' মিলিয়াছে। অতএব গ্রন্থ রচনার কাল ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ইহা নির্ব্বিবাদে ধার্য্য হইল। প্রাচীন গ্রন্থের রচনাকাল নির্দ্দেশ লইয়া নানা প্রকার গোলোযোগ উপস্থিত হয়। এই গ্রন্থে এইরূপ গোলোযোগের কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ১৫৩৭ শকে সমাপ্ত হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তাহার ১৭ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়, সুতরাং বৈষ্ণব তত্ত্ব হিসাবে ও প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার নমুনা স্বরূপ ইহার মূল্য অনেক।

কবিবল্লভের পরিচয়।

সৌভাগ্যক্রমে কবিবল্লভের কিছু পরিচয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। গ্রন্থ শেষে কবি লিখিয়াছেন—

পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা॥
করতোয়া তীর মহাস্থানের সমীপে॥
অরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে॥

এই মহাস্থান বগুড়া জেলার একখানি গ্রাম। এই গ্রামে গিয়া অনুসন্ধান করিলে কবির সম্বন্ধে আরো কিছু পরিচয় ভবিষ্যতে পাওয়া যাইতে পারে সে অনুসন্ধান করা সময় সাপেক্ষ।

মকুট বা মুকুট রায় নামে কবির এক বন্ধু ছিলেন, যাঁহার প্ররোচনাতেই তিনি এই রসকদম্ব গ্রন্থখানি লিখেন। গ্রন্থের শেষাংশে আছে—

কৃপার ঠাকুর নরহরি দাস নামে।
সে পদ মকুট রায় ভজিল যতনে॥
দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
অনুরোধে জানাইল প্রবন্ধাতিশয়॥
তাহার উদ্যোগে কিছু লিখিতকারণ।
যন্ত্রযোগে শব্দ যেন বোলে যন্ত্রীগণ॥

এই নরহরি দাস ঐ খণ্ডের প্রসিদ্ধ নরহরি দাস বা সরকার ঠাকুর। কবিবল্লভ ইঁহাকে 'প্রেমের ঠাকুর' বলিয়াছেন, নরোত্তম দাস তদীয় 'হাট পত্তনে ইঁহাকেই প্রেমের রমণী' বলিয়াছেন—

প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরি।

এই নরহরিই 'চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা লোচন দাসের গুরু। লোচন দাস তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

শ্রীনরহরি মোর প্রেম ভক্তি দাতা।

নরহরি নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত অবস্থান করিতেন। প্রসিদ্ধ আছে ইনিই প্রথমে গৌর লীলার পদরচনা করেন। ইঁহার গ্রন্থের নাম—ভক্তিচন্দ্রিকা পটল ও ভক্তামৃত অষ্টক। ১৪৬২ শকে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের ৫ বৎসর পরে ইঁহার তিরোভাব হয়।

কবিবল্লভ নরহরি দাসের মুকুট রায় নামক যে শিষ্যের উল্লেখ করিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে কোন তথ্য এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। যাহা হউক, এই উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে চৈতন্যদেবের এক পুরুষ পরেই কবিবল্লভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যেহেতু শ্রীচৈতন্যের পারিষদের অনৈক শিষ্য কবির বন্ধু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য দর্শন কবিবল্লভের ভাগ্যে ঘটে নাই। ঘটিলে তাহার উল্লেখ গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যাইত। রসকদম্ব লিখিবার সময় তাঁহার বয়স কত ছিল বলা যায় না। যদি ৫০ বৎসর বয়স ছিল ধরা যায়, তবে তাঁহার জন্ম শক ১৪৭০ হয় অর্থাৎ তিনি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সময় ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র ছিলেন।

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলিতে শ্রীচৈতন্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

চৈতন্যে করুক নিত্য চৈতন্য সঞ্চয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় গ্রন্থের আর কুত্রাপি চৈতন্যের কোন উল্লেখ নাই, অথচ চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব কথাই রসকদম্বের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ঐ মঙ্গলাচরণেই কবিবল্লভ, চৈতন্য পারিষদের মধ্যে নিত্যানন্দ অদ্বৈত ও গদাধরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ও অন্যান্য ভক্তগণকে উদ্দেশে নমস্কার করিয়াছেন—

চৈতন্যের প্রিয় যত বৈষ্ণব সুজনে।
তা সভাতে চিত্ত যেন রহে অনুক্ষণে॥

অতঃপর নিজের গুরুকে বন্দনা করিয়াছেন—

শ্রীযুত উদ্ধব দাস জ্ঞান চক্ষুদাতা।
সে পদ কমলে মন রহুক সর্ব্বথা।

এই উদ্ধব দাস কে?

পদ কল্পতরু নামক পদ সংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধব দাসের অনেকগুলি পদ আছে। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৩১৬ সালের ২য় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় উদ্ধব দাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাই যে পদ কল্পতরুতে উদ্ধব দাসের পদের মোট সংখ্যা ৯৭, পরিচয় মাত্র এই যে তিনি রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। এই রাধামোহন ঠাকুর মহারাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন অতএব তাঁহার শিষ্য উদ্ধব দাস আমাদিগের প্রাচীন উদ্ধব দাস হইতে পারেন না।

কিন্তু সতীশবাবুর প্রবন্ধে উদ্ধৃত উদ্ধব দাসের একটী পদই আমাদের কবির গুরু উদ্ধব দাসের সন্ধান দিতেছে। এক উদ্ধব দাস আর একজন উদ্ধব দাসের সন্ধান দিতেছে, এই সাহিত্যিক রহস্য মন্দ নহে।

পদকর্ত্তা উদ্ধব দাসের পদের শেষাংশ এই—

শ্রীঠাকুর মহাশয়, তার যত শাখা হয়,
মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ।
রামকৃষ্ণ আচার্য্যখ্যাতি, গঙ্গানারাণ চক্রবর্ত্তী,
ভক্তিমূর্ত্তি গাম্বিলা নিবাস॥

রূপরাধু রায় নাম, গোকুল শ্রীভগবান,
ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস।
শ্রীনরাধাবল্লভ, চাঁদরায় প্রেমার্ণব,
চৌধুরী শ্রীখেতুরী নিবাস।
শ্রীরাধামোহন পদ, যার ধন সম্পদ,
নাম গায় এ উদ্ধব দাস॥

সতীশ বাবু সন্দেহ করিয়াছেন যে পদবর্ণিত "ভক্তি-মান শ্রীউদ্ধব দাস" ও এই পদকর্তা উদ্ধব দাস এক ব্যক্তি নহেন। ঠিক কথা, আমরাও তাহাই বলি। পদবর্ণিত এই উদ্ধব দাস আধুনিক উদ্ধব দাসের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ও সম্ভবতঃ ইনিই আমাদিগের কবিবল্লভের গুরু।

পদবর্ণিত উদ্ধব দাস "শ্রীঠাকুর" মহাশয়ের শাখা-ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই "ঠাকুর মহাশয়" নরোত্তম ঠাকুরের এক উপাধি। নরোত্তম ঠাকুর ১৫০৪ শকে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজসাহীর অন্তর্গত খেতুরী নামক গ্রামে বাস করিতেন "বঙ্গভাষার লেখক" পৃঃ ৭৯৩ "বিশ্বকোষ"। উদ্ধৃত পদেও এই খেতুরীর উল্লেখ আছে। এই খেতুরী উত্তর বঙ্গ বৈষ্ণবের মহাতীর্থস্থান, এখনও সেখানে বৎসর বৎসর বড় মেলা হয়। আমাদের মনে হয় 'শ্রীযুত উদ্ধব দাস' নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উত্তর বঙ্গের বৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবিবল্লভ বগুড়া জেলার লোক, দেখিয়াছি। উত্তরবঙ্গবাসিদিগের প্রধান বৈষ্ণব তীর্থস্থানেও তিনি যাতায়াত করিতেন ও সম্ভবতঃ তদুপলক্ষেই 'শ্রীযুত উদ্ধব দাসের' সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও তাঁহার নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুনশ্চ, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এক প্রাচীন উদ্ধব দাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি গদাধর শাখার অন্তর্ভুক্ত ও উদ্ধব দাস নিজেও এক প্রশাখা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন॥
শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবত আচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণ প্রেমময়॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধব দাস।
জিতামিত্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস॥
* * * *
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিত গোসাঞিরগণ
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন॥

বঙ্গবাসী পৃঃ ৪৯।
আদি—১২শ

এই দুই উদ্ধব দাস অভিন্নব্যক্তি হইতেও পারেন। গ্রন্থের শেষে আর একটি উল্লেখে দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনে রূপসনাতন মহাশয়।
বনমালী দাস স্থানে কহিল নিশ্চয়॥
তাহাতে শুনিল নিত্য লীলার আরম্ভ।
পয়ারে লেখিল তব সরস কদম্ব॥

ইহা হইতে মনে হয় কবিবল্লভের সহিত বনমালী দাসের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। এই বনমালী দাস অদ্বৈত শাখার উপশাখা প্রবর্ত্তক বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে—

শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা উপশাখার নাহি হয় লেখা॥
* * * *
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্য দাস।
দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥

বঙ্গবাসী পৃঃ ৪৮
আদি—১২শ।

এই সকল উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে কবি-বল্লভ শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের এক পুরুষ পরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আর কিছু পরিচয় আমরা দিতে অসমর্থ। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ পাঠে সম্যক উপলব্ধি হয়। অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না তাহার সংবাদ আমরা পাই নাই। তিনি নিজে কোন বৈষ্ণব শাখা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন কি না তাহা জানি না।

'কবিবল্লভ' তাহার উপাধি, না নাম, তাহাও আমাদের জানিবার কোন মালমসলা নাই। পূর্ব্বে উদ্ধৃত চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে যে পদ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এক 'বল্লভের' উল্লেখ আছে—

বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণ প্রেমময়।

এই বল্লভ উপশাখা প্রবর্ত্তয়িতা, আমাদের কবিবল্লভের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানি না। অথচ রসকদম্বের ধর্ম্মমত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কবিবল্লভ একটু বিশেষ মতাবলম্বী ছিলেন। চৈতন্য পরবর্ত্তী হইয়াও তিনি যেন কেমন একটু পৃথক ভাবাপন্ন ছিলেন। এই রসকদম্ব গ্রন্থে তিনি চৈতন্য মহিমা একেবারে বর্ণনা করেন নাই, অথচ তিনি চৈতন্যকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন। কৃষ্ণ প্রেমই তাঁহার বক্তব্য বিষয় গৌরাঙ্গের কোন বর্ণনা তাঁহার গ্রন্থে নাই। অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভাব যদিও বৈষ্ণবকেই প্রধান বলিতেছেন—

"শাক্ত শৈব গৌর আর বৈষ্ণব প্রধান॥

এই সকল দেখিয়া মনে হয় কবিবল্লভ হয়তো একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার গ্রন্থের প্রচার হয় নাই।

সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত "পদকল্পতরু" গ্রন্থের ৯৩৭ নং পদ সেই বিখ্যাত—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু ভাব বাখানিয়ে
অনুখণ নৌতুন হোয়॥
জনম অবধি হৈতে ওরূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেলা। ইত্যাদি।

এই পদ বিদ্যাপতিরকৃত বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস, কিন্তু পদকল্পতরুতে ভনিতা দেওয়া আছে—

কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি।

এই কবিবল্লভ কে? আমাদের কবিবল্লভের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি?

পুনশ্চ, ঐ পদকল্পতরুতে 'বল্লভ' ভনিতাযুক্ত নিম্নলিখিত সংখ্যকপদ দেখা যায়—৯৭ (বল্লভ দাস), ১০০৬ (বল্লভ দাস) ১০০৭ (বল্লভ দাস), ১০১০ (বল্লভ), ১০১১ (বল্লভ), ১০২০ (বল্লভ), ১০২২ (শ্রীবল্লভ), ১০৬০খ (বল্লভ)। ইহাদের সঙ্গে আমাদের কবির কোন সম্বন্ধ আছে কি? এই পদগুলির সমস্ত কৃষ্ণ বিষয়ক, গৌরাঙ্গবিষয়ক নহে। আমাদের কবিবল্লভও গৌরাঙ্গভক্তি বিষয়ে তাহার গ্রন্থ মধ্যে কোন উক্তি করেন নাই, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশ বাবু পদকর্ত্তাদিগের ইতিহাস প্রকাশিত করিলে, এই বল্লভ নামধেয় পদকর্ত্তার বার্ত্তা পাওয়া যাইতে পারে, আশা করি। *

গৌরপদতরঙ্গিনীর উপক্রমণিকাতে যে সকল বৈষ্ণব কবির পরিচয় দেওয়া আছে, তন্মধ্যে একজন বল্লভদাসের পরিচয় এইরূপ আছে—

"বংশীবদন দাসের পুত্র চৈতন্য দাসের দুই পুত্র—রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের তিন পুত্র, যথা বংশীশিক্ষা গ্রন্থে"—

শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, শ্রীকেশব।
তিন প্রভু, যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ভব॥

এই বল্লভ দাস বংশীলীলাগ্রন্থে স্বীয় প্রপিতামহের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, বল্লভদাস ঠাকুর মহাশয়ের সমসাময়িক এবং তৎপ্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। একটী পদে লিখিয়াছে,—

নরোত্তমদাস, চরণে বহু আশ,
শ্রীবল্লভ মনভোর।

অন্য একটী পদে তিনি ঠাকুর মহাশয়ের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্য কাহারও কাহারও মতে ঠাকুর

* চৈতন্যসম্প্রদায়ের আট কবিরাজের মধ্যে একজন কবিরাজের নাম বল্লভ দাস। এই পদগুলি তাঁহার কৃত হইতে পারে। কিন্তু ইহাও অনুধাবন যোগ্য যে যেমন একাধিক গোবিন্দ দাসের পদ এখন বাছিয়া লওয়া যায় না, অসম্ভব নয় যে সেইরূপ বিভিন্ন বল্লভ নামধেয় পদকর্ত্তাও একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন এই সন্দেহ সত্বেও এই পদগুলির কোন একটা যে কবিবল্লভ কৃত তাহা বলিতে পারি না।

মহাশয়ের শিষ্য রাধাবল্লভই বল্লভ ভনিতায় এই পদগুলি রচনা করেন। ইঁহার রসকদম্ব নামে একখানি গ্রন্থ আছে।"

ভদ্র মহাশয় বা তত্বনিধি মহাশয় কেহই রসকদম্ব গ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং কবিবল্লভের মাতা ও পিতা ও বাসস্থানের উল্লেখ তাঁহারা দেখিবার সুবিধা পান নাই। অতএব গৌরপদ তরঙ্গিনীর এই পরিচয় হইতে আমাদের কবিবল্লভের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্বনিধি মহাশয়কে আমি পত্রদ্বারা এই ব্যাপার জানাইলে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে পুঁথির উল্লেখই প্রামাণিক বলিয়া ধরিতে হইবে ও গৌরপদ তরঙ্গিনীর এই পরিচয় ভ্রমমূলক বলিয়াই গৃহীত হইবে।

কবিবল্লভের আর কোন সংবাদ এখনও আমরা দিতে অক্ষম। পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই পুরাতন কবি সম্বন্ধে কোন নূতন তত্ত্ব খুজিয়া পান, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

গ্রন্থ পরিচয়।

সমগ্র গ্রন্থখানি ২২ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়গুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

দুইটী সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়া, কবি কৃষ্ণ মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

হেন প্রভুর মহিমা বোলিতে কেবা পারে।
দরিদ্র গৃহস্থ যেন আশা করি মরে॥

অতঃপর অন্যান্য ভক্তগণকে বন্দনা করিতেছেন—

চৈতন্যে করুক নিত্য চৈতন্য সঞ্চয়।
নিত্যানন্দ আনন্দ করুক অতিশয়॥ ১৯
অদ্বৈতে অদ্বৈত যেন করে প্রেমসঙ্গ।
গদাধর ধারা যেন রসের তরঙ্গ॥
চৈতন্যের প্রিয় যত বৈষ্ণব সুজনে।
তা সভাতে চিত্ত যেন রহে অনুক্ষণে॥ ২০
শ্রীযুত উদ্ধব দাস জ্ঞান চক্ষু দাতা।
সে পদ কমলে মন রহুক সর্ব্বথা॥ ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম সুত্র রস। আরম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা সকলের উল্লেখ করিয়া কবি দ্বারকা নির্ম্মাণ বর্ণনা করিতেছেন। দ্বারকা ও দ্বারকাবাসির অতি কবিত্বময় বর্ণনাদ্বারা এই অধ্যায় উপসংহার করিয়াছেন।

এইরূপে দ্বারকার অদ্ভুত চরিত্র।
কহিতে নারেন ব্রহ্মা যার গুণ রীত॥
দ্বারকার বৈভব বর্ণিতে কেবা চায়।
এক অংশ বর্ণিতে হি শত জন্ম যায়॥ ৫৩

তৃতীয় অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম বৈভব রস। দ্বারকার ঐশ্বর্য্য বর্ণন। স্থানে স্থানে বর্ণনা অতিশয় কবিত্বময়। দ্বারকার হস্তীর বর্ণনা যথা,

অতি মত্ত গজগণ　　অলসে দোলয়ে ঘন
শুণ্ড যেন সুরীত ভুজঙ্গ।
অবিরত ঝরে মদ　　চালাইতে নারে পদ
কটাক্ষে নেহালে নিজ অঙ্গ॥
চলিতে চরণধুলি　　নিজ শুণ্ডে লয় তুলি
পেলিতে পেলিতে পুন রাখে।
সতত সমর রস　　অঙ্কুশের নহে বশ
চলন রহন নিজ সুখে॥ ৬০

তথা অশ্ব বর্ণনা—

সুরঙ্গ তুরঙ্গ সব　　পৃষ্ঠে করি নিজ ধর
নিজ শিরে পাতি শির ঢাকে।
প্রসারিঞা নাসাভাতি　　শিথিল অধর আতি
গদ গদ স্বরে অল্প ডাকে॥
প্রধান চরণ দুই　　অল্পে অল্পে ভূমি ছুই
আধ পদে পুচ্ছ বক্র করি।
উন্নত শ্রবণ দেখি　　সঘন চঞ্চল আখি
নৃত্য করে মনোরথ পুরি॥ ৬১
চমকি চমকি ঘন　　চারিদিগে করে মন
চপল চরিত্রে ঘন খেলে।
বুঝিঞা পতির মতি　　অনুক্ষণ করে গতি
পবন জিনিতে চাহে হেলে॥ ৬২

এই প্রকারে সরোবর ও তরুকুলের বর্ণনাও সুন্দর কবিত্বময় ও নিখুঁত চিত্র বলিয়া মনে হইবে। নাগরী বর্ণনায় কবি পূর্ব্ব কবিদিগের প্রথা অনুসারে উপমার

ছড়াছড়ি করিয়াছেন। সুন্দর ভাষায় সুন্দর উপমা অতীব মধুর বলিয়া বোধ হইবে। উদাহরণ যথা—

(১) বদন মদন ভরে কনক সদন হরে
চান্দ পদ্ম কহন না যায়। ৭০

(২) সচল কনক লতা অচল তড়িত ঘটা
কিবা সিত ননীর পুতলি। ৭১

(৩) বিধির নির্ম্মাণ সীমা মদন বিজয়ী বামা
আপন আপনে মন মোহে। ৭২

দ্বারকার ষোল শত আট পুরে এই প্রকারের সুন্দরী নাগরী বিরাজমানা।

কৌতুকে দ্বারকা পতি অতি সুখে করে গতি
ষোলয় সহস্র অষ্ট পুরে।
সভাকে করিয়া বশ সভাতে সমান রস
সর্ব্বজন মানস বিহরে॥ ৭৫

চতুর্থ অধ্যায়।

অধ্যায়ের নাম হাস্যরস। এই অধ্যায়েই গ্রন্থের প্রাগুপান্ত বিষয়ের প্রকৃত আরম্ভ। নায়ক নায়িকার নিখুঁত ভাব ও ভঙ্গী অঙ্কণে কবিবল্লভের লেখনী অসীম নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছে।

আরম্ভে কবি দ্বারকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরার বর্ণনা দিয়া নায়িকা রুক্মিণীর ও নায়ক শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

আসনে দেখিল পতি রুক্মিণী সুন্দরী।
চামরে ব্যজন করে শত অনুচরী॥
পতিভাবে মহাদেবী সমুখে দাড়াঞা।
সখী হস্ত হৈতে লৈল চামর কাড়িঞা॥ ৯৭

ও কার্য্য ছলে সখীগণকে অন্তত্র পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে পতিসেবায় নিযুক্ত হইলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একটু রসিকতা করিবার প্রবৃত্তি হইল। এইখানের হাব-ভাব কবি বড় সুন্দর ফুটাইয়াছেন—

নিকটে আনিল দেবী মিষ্ট সম্ভাষণে।
অঞ্চল ধরিঞা করে বসান আসনে॥
বাম উরুদেশে প্রিয়া রাখিঞা শ্রীহরি।
বামভুজমূলে অঙ্গ হেলাঞা সুন্দরী॥ ৯৯

দক্ষিণ শ্রীভুজে তবে চিবুক তুলিঞা।
কহিল মধুর কিছু ঈষৎ হাসিঞা॥ ১০০

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তোমার স্বয়ম্বরকালে কত কত প্রধান নৃপতি আসিয়াছিল, তুমি আমাকে বরণ করিলে কেন? সে সকল নৃপতির সহিত তুলনায় তো আমি নিতান্ত অপদার্থ—

জাতি কুল হীন আমি জানহ বিশেষে।
সমুদ্রে বসতি করি তা সভার ত্রাসে। ১০০
নৃপতি নহিয়ে আমি নাহি অধিকার।
নাম যশ কর্ম্ম কেহো না জানে আমার॥ ১০৪
অবিচারে সে সকল নৃপতি ছাড়িলে।
না জানি কেমন লোভে আমাকে বরিলে॥ ১০৫

যাহা হউক, তুমি বরণ করিয়াছ যখন, তখন সে কথা আর নাই বলিলাম। কিন্তু অত বড় রাজার কন্যা তুমি, এখন চামর ব্যজন রূপ হীন কর্ম্ম কেন করিতেছ?

হেন কর্ম্ম যদ্যপি ঘটিল ভাগ্যদোষে।
তবে হীন কর্ম্ম তুমি কর কোন রসে॥
তুমি আমি সিংহাসনে থাকি অহর্নিশি।
পরিচর্য্যা করুক সে সব যত দাসী" ॥ ১০৬

পাঠক রুক্মিণীহরণ ব্যাপার বিশেষভাবে অবগত আছেন শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা রুক্মিণীর প্রতি এই প্রকার উক্তি পরিহাস বাক্য হইলেও তাঁহার প্রাণে কিরূপ বাজিয়াছিল বলুন দেখি? কবি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—

কৃষ্ণের রভস কথা শুনিঞা সুন্দরী।
কৃষ্ণমুখ নিরখিল লজ্জা ত্যাগ করি॥ ১০৮

এই চাহনির অর্থ মর্ম্মজ্ঞ পাঠক বুঝিবেন। রুক্মিণীর প্রাণের ভিতর এই পরিহাস আঘাতে কি ভাব হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত বর্ণনা কবি বাদ দেন নাই—

অন্তরে জন্মিল ক্রোধ ভয় অপমান।
নয়ন কটাক্ষে করে কৃষ্ণ মুখ ধ্যান॥ ১০৮

রুক্মিণী অধুনিক দলিতা ফণিনী হইলে 'নয়ন কটাক্ষে' 'কৃষ্ণমুখ ধ্যান' করিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

পুনশ্চ,

সচল নয়ানে জল সঞ্চারিতে না দে।
অধর কাঁপিতে পুন রাখে অনুরোধে॥

দীর্ঘশ্বাস জন্মে পুন অন্নে অন্নে ছাড়ে।
নানাযুক্তি করে মনে কহিতে না পারে ॥ ১০৯

কোন বয়সে কবি এই কাব্য লিখিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু রসজ্ঞানের পরিচয় তিনি বেশ নিপুণভাবেই দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস মাত্র করিয়াছেন, রুক্মিণী তাহা বুঝিয়াছেন। কিন্তু সতীসাধ্বীর প্রতি এ বড় কঠোর পরিহাস। রুক্মিণী হাসিয়া এই পরিহাস উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহা কি পারা যায়?

হাসিতে অধর পুন করে বক্রগতি।
বিষাদ জন্মিতে পুন করে হাস্যমতি ॥ ১১০

কিন্তু দুষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে তো উত্তর দিতে হইবে? অতএব

হাস্য আর ক্রন্দনে রাখিঞা দুই ভাব।
ধৈর্য্য হঞা কহে কিছু সরস প্রস্তাব ॥ ১১০

কবিবল্লভের রুক্মিণী 'সরস প্রস্তাব' করিতেছেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর কিরূপ 'প্রস্তাব' করিতেন, তাহা পাঠক মীমাংসা করিবেন।

রুক্মিণী, কৃষ্ণের নিগূঢ় মহিমার উল্লেখ করিয়া, আসল উত্তর যাহা দিলেন তাহা অতি মনোরম—

সংসারী সকলে যাহা যত্ন করি ভজে।
তোমার সেবক তাহা যত্ন করি ত্যজে ॥ ১১৫

শ্রীকৃষ্ণের একান্ত সেবিকার পক্ষে ইহার বাড়া উত্তর আর নাই।

আরও কহিলেন—

অবলা চঞ্চলা জাতি না বুঝিয়ে রীতি।
এসব নিষ্ঠুর দণ্ড তাহাতে উচিত ॥ ১১৭
যাকে দাসীজ্ঞান করি না জানিয়া মর্ম্ম।
তারা শুদ্ধ প্রেমভাবে করে সেবা কর্ম্ম ॥ ১১৮

এটা অভিমানের সুর। কিন্তু কি মধুর ও দাসীদিগের প্রতি কি উদারভাবের পরিচায়ক! এই দাসীগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিতে চাহেন, আর রুক্মিণীকে সেবা ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? এই দাসীরাই ভাগ্যবতী, ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্ম বুঝিয়াছে, তাই তিনি দয়া করিয়াছেন, আর—

আমি দৈবে ভাগ্যহীন তত্ত্ব না বুঝিঞা। ১১৮

রুক্মিণীর হৃদয় বড়ই আলোড়িত হইয়াছে, তিনি বুঝি আর সামলাইতে পারিলেন না। রমণী কি এইরূপ আঘাত সহ্য করিতে পারে?

এইরূপে কহিতে কহিতে রূপবতী।
শিথিল অধর গণ্ড অরুণ সুগতি ॥
শিথিল দক্ষিণ কর তুলিবারে নারে।
হস্ত হৈতে চামর পড়িলা ক্ষিতিতলে ॥ ১১৯

রুক্মিণী কি ধাতুতে নির্ম্মিত তাহা পরম রসিক শ্রীকৃষ্ণ ভালই জানিতেন। অপর মহিষী সত্যভামাকে তিনি এরূপ পরিহাস করিয়া নিশ্চয়ই অল্পে নিষ্কৃতি পাইতেন না। রুক্মিণীর প্রেমভাব কত উচ্চ অঙ্গের তাহা যে সত্যভামার পার্থিব প্রেমের নিকট স্বর্গ মন্দাকিনী তাহা পাঠক জানেন। গ্রন্থের শেষভাগে কবি অভিমানী সত্যভামার চিত্রও আঁকিয়াছেন, পাঠক দেখিবেন তিনি মর্য্যাদায় রুক্মিণীকে অতুলনীয়া করিয়াছেন। রুক্মিণী চরিত্রের অদ্ভুত মহিমা এই যে—পুরাণ ইতিহাস কোথায়ও এই চরিত্রের কোন হীনতা প্রকাশ পায় নাই। আমাদের কবির বিশ্লেষণে এই চরিত্র আমাদের নিকট আরও মাধুর্য্যময় হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে রুক্মিণীকে সান্ত্বনা করিলেন—

প্রিয়ার মনের ভাব বুঝিয়া শ্রীহরি।
সম্ভ্রমে বদন দেখি হাসিলা মাধুরী ॥
ভুজমূলে ভুজ ধরি হৃদয়ে রাখিঞা
দৃঢ় আলিঙ্গন দিল অন্তর বুঝিঞা ॥ ১২০

অধিকন্তু কহিলেন,

কেন হে প্রাণের প্রিয়া কর হেন রীত।
গ্রাম্য রমণী হেন না কর চরিত ॥ ১২২

শ্রীকৃষ্ণের এ বড় সুন্দর স্তোকবাক্য। নারীত্বে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়াই রুক্মিণী বিচলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজার কন্যা, দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বনিতা তাঁহার কি সামান্য স্ত্রীলোকের মত অধীর হওয়া উচিত? চতুরচূড়ামণির কথাটী সুন্দর বটে, কিন্তু ভাবুকজন বিচার করিবেন রুক্মিণী যদি গ্রাম্য রমণী হইবেন, শ্রীকৃষ্ণ এরূপ পরিহাস করিয়া কোন্ প্রকার প্রেমের অভিনয় দেখিতে পাইতেন।

এই রুক্মিণী পরিহাস ব্যাপার কবিবল্লভ শ্রীমদ্ভাগবত

দশম স্কন্ধ, ৬০ অধ্যায় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তথাকার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

কর্হিচিৎ সুখমাসীনং স্বতল্পস্থং জগদ্‌গুরুম্।
পতিং পর্য্যচরদ্ভৈষ্মী ব্যজনেন সখীজনৈঃ॥ ১
পয়ঃ ফেন নিভে শুভ্রে পর্য্যঙ্কে কশিপূত্তসে।
উপতস্থে সুখাসীনং জগতামীশ্বরং পতিম্॥ ৬
বালব্যজনমাদায় রত্নদণ্ডং সখীকরাৎ।
তেন বীজয়তী দেবী উপাসাঞ্চক্র ঈশ্বরম্॥৭
তাং রূপিনীং শ্রিয়মনন্যগতিং নিরীক্ষ্য
যালীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূপা।
প্রীতঃ স্ময়ন্নলককুণ্ডল নিষ্ককণ্ঠ
বক্ত্রোল্লসৎস্মিতসুধাং হরিরবভাসে॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ।

রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈর্লোকপাল বিভূতিভিঃ।
মহানুভাবৈঃ শ্রীমদ্ভী রূপৌদার্য্যবলোর্জ্জিতৈঃ॥ ১০
তান্ প্রাপ্তানর্থিনো হিত্বা চৈদ্যাদীন্ স্মরদুর্ম্মদান্।
দত্তা ভ্রাত্রা স্বপিত্রা চ কস্মান্নো ববৃষেঽসমান্॥ ১১
রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্।
বলবদ্ভি কৃতদ্বেষান্ প্রায়স্ত্যক্তনৃপাসনান্॥ ১২
অস্পষ্ট বর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ॥ ১৩
নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ নহ্যাঢ্যা মাং ভজন্তিসুমধ্যমে॥ ১১
যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্য্যাকৃতির্ভবঃ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধমযোঃ কচিৎ॥ ১৫
বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায় ত্বয়াদীর্ঘসমীক্ষয়া;
বৃতা বয়ং গুণৈর্হীনা ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা॥ ১৬
অথাত্মনোঽনুরূপং বৈভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্।
যেন ত্বমাশিষঃ সত্যাইহামুত্র চ লপ্স্যসে॥ ১৭
চৈদ্যশাল্বজরাসন্ধ দন্তবক্রাদয়োনৃপাঃ।
মমদ্বিষন্তি বামোরু রুক্মী চাপি আগ্রজঃ॥ ১৮
তেষাং বীর্য্যমদান্ধানাং দৃপ্তানাং স্ময়নুত্তয়ে।
আনীতাসি ময়া ভদ্রে তেজোপহরতাসতাম্॥ ১৯
উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুর্থকাঃ।
আত্মলব্ধ্যাস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ॥ ২০
এতাবদুক্ত্বা ভগবানাত্মানং বল্লভামিব।
মন্যমানামবিশ্লেষাৎ তদ্দর্পঘ্ন উপারমৎ॥ ২১
ইতি ত্রিলোকেশ পতেস্তদাত্মনঃ
প্রিয়স্য দেব্যশ্রুত পূর্ব্বমপ্রিয়ম্।
আশ্রুত্য ভীতা হৃদি জাতবেপথু
শ্চিন্তাং দুরন্তাং রুদতী জগামহ॥ ২২
পদাসুজাতেন নখারুণ শ্রিয়া
ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ।
আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরুষিতৌ স্তনৌ
তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্॥ ২৩
তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোক বিনষ্টবুদ্ধে
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বায়ুবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্॥ ২৪
তদ্দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ার প্রেমবন্ধনম্।
হাস্যপ্রৌঢ়মজানন্ত্যাঃ করুণঃ সোঽন্বকম্পত॥ ২৫

ইহার পরে ভাগবতে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে সান্ত্বনা করিলেন।

প্রমৃজ্যাশ্রুকলে নেত্রে স্তনৌ চোপহতৌ শুচা
আশ্লিষ্যবাহুনা রাজন অনন্য বিষয়াং সতীম্॥ ২৭

তৎপর কৃষ্ণের উক্তির এক শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
যন্নর্ম্মৈর্নীয়তে যামঃ প্রিয়য়াভীরু ভামিনি॥ ৩১

ইহার উত্তরে রুক্মিণী অনেকগুলি কথা বলিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার অবসর নাই। ভাবার্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তিনি রাজাদিগের অপেক্ষা কিসে কম প্রতাপান্বিত? আর তিনি অন্য পতি কেন গ্রহণ করিবেন? তবে কাহারা করিবে?

যাতে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী।

তারপর আরও অনেক ভাল ভাল কথা আছে সতী স্ত্রীর লক্ষণের অনেক বিবৃতি আছে।

ভাগবতের এই বর্ণনার সহিত আমাদের কবির বর্ণনার তুলনা করিলে দেখা যায় যে তিনি ইহা পাঠ করিয়া ইহারই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই স্থানে ধর্ম্মোপদেষ্টার আসনে না বসিয়া রসিক কবির চক্ষে এই

চিত্রটী দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। ভাগবতের পরিহাস বড় কঠোর—

অথাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভ।

সতী পত্নীকে এরূপ পরিহাস করা চলে না। তাই কবিবল্লভ স্বয়ম্বরকালেরই উল্লেখ করিয়া পরিহাস রচনা করিয়াছেন—

অবিচারে সে সকল নৃপতি ছাড়িলে।
না জানি কেমন লোভে আমাকে বরিলে॥

ইহাতে যে সরস কল্পনা হইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। বস্তুতঃ কবি নায়ক নায়িকা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর স্বাভাবিক মাধুর্য্য রক্ষা করিয়াও তাঁহাদের দেবীরূপে অঙ্কন করিয়াছেন, ইহা দুই বর্ণনা তুলনা করিলেই উপলব্ধি হইবে। আরও অনেক কথার বিশ্লেষণের ভার পাঠকের উপর থাকিল।

এখন এই অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ অনুসরণ করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষজাতির দুঃখের বর্ণনা আরম্ভ করিলেন; এই অংশ কবিত্ব হিসাবে অতি মনোরম, পাঠক স্বয়ং পড়িয়া বুঝিবেন। কবি বেশ রসিক পুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই, অনেক স্থানেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। পুরুষ জাতির বৃদ্ধকালের দুঃখের বর্ণনা অতি পরিপাটী—

বৃদ্ধ হৈলে পতি তার হয় অভাজন।
নিরবধি সহে পত্নী পুত্রের তর্জ্জন॥ ১৪২
ধান্যের বায়স খেদে গাভীর সেবা করে।
শিশুপুত্র দৌহিত্র পালিঞা থাকে ঘরে॥
পত্নী পুত্র বোলে বৃদ্ধ জীয়ে অকারণ।
সকলে বাঞ্ছয়ে সদা বৃদ্ধের মরণ॥ ১৪৩
অসুস্থ অবল দেখি সভে মন্দ বোলে।
না মরে কারণে সভে নিত্য তিরস্করে॥ ১৪৪
বৃদ্ধ মৈলে তার নারী বোলে পুত্র স্থানে।
অল্প ব্যয়ে তার কর্ম্ম কর সমাধানে॥
সে মৈল তাহার হেতু ছাড় উপবাস।
ক্রন্দন অসুখ না করিহ ধন নাশ॥ ১৪৫

বুড়াদিগের প্রতি কবির যেন অতিশয় সহানুভূতি—তিনি কি বুড়া বয়সে এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ও নিজের কথাই লিখিয়াছিলেন? যে কবি এইরূপ পাঠকের সংশয় জন্মাইতে পারেন তিনি নিপুণ চিত্রকর বটেন।

যুবক পাঠকেরা হাসিবেন না, কবি ভয় দেখাইয়াছেন—

পুত্রগণ কর্ম্ম করে মায়ের বচনে।
তা সভার এই গতি হয় কালক্রমে॥ ১৪৬

রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের এই বক্তৃতার একটা চমৎকার পাল্টা জবাব দিলেন—কুলজার ধর্ম্ম। এই বক্তৃতা অতি উপাদেয় বস্তু, না পড়িলে বুঝান যাইবে না। দু চারিটা কথা উদ্ধৃত করিতেছি— কুলজাস্ত্রী—

নায়কের প্রিয় যত জানিঞা সন্ধান।
প্রাণপণে সেবা করে তনয় সমান॥ ১৬১
যেবা যত বোলে তাহা পতিকে না কহে।
তিরস্কার পুরস্কার সমভাবে সহে॥
ভূমিগত নয়ান অন্তরগত কথা।
পতি কর্ম্মে চিত্ত তার প্রেমগত ব্যথা॥ ১৬৩
মুক্তিকালে শুদ্ধ মন্ত্রী করণে কিঙ্করী।
মাতৃমত স্নেহ রাতিকালে বেশ্যানারী॥
ধর্ম্মযোগে পত্নী সেই কেলিযোগে সখী।
কেবল পতির বশ করে ধর্ম্ম শিক্ষা॥ ১৬৪
কুলজা রমণীগণ সর্ব্বদুঃখ সহে।
পতির কপটে মাত্র তনু প্রাণ দহে॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিঞা অধীন।
পতিবশ হঞা থাকে ভাবে নহে ভিন্ন॥ ১৭১
ই বড় প্রমাদ নাথ কহিল তোমারে।
কেবল কুলজাগণ জীয়ন্তে হি মরে॥ ১৭৩
মরিলে মরণ নহে দুঃখ নাহি মানে।
আসক্তি বিৎসেদে জন মরে ক্ষণে ক্ষণে॥ ১৭৪

সীতা সাবিত্রীর দেশের আদর্শ নারীর চরিত্রের এই অতি সুন্দর বিশ্লেষণ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতে বাধ্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিতে গিয়া সতীত্বের গর্ব্বে গর্ব্বিতানারীর এই চরম উত্তর শুনিয়া—

অপরাধ হৈল হেন মানিল বিশেষ।

এই সরস রুক্মিণী পরিহাস প্রসঙ্গ কবির আসল রস কথার ভূমিকাস্বরূপ। ভূমিকায় কবি, ভাষায় ও ভাবে যেরূপ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থের অন্যত্রও

স্ততোধিক সরসতার আস্বাদন করিবার জন্য পাঠক স্বতঃ লোলুপ হইবেন। আমরা পাঠককে আশ্বাস দিতে পারি তিনি বঞ্চিত হইবেন না।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

"তোমার প্রসাদে আমি রসলেশ ধরি ॥
তোমার সরসভাবে আমি রসবান্।
নিত্য নব তোমার রসের উপাদান ॥ ১৭৫
যে সব আসক্তি রস কহিলে আপনে।
মনুষ্য শরীরে মাত্র কেহো কেহো জানে ॥ ১৭৬

যাহারা এই রসে রসিক তাহারা রৈবতক গিরিতে বিরাজ করেন"। অমনই রুক্মিণীর কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি তথায় যাইবার জন্য স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন।

অশেষ কৌতুক রস আছে ক্ষিতি মাঝে।
পুরুষের মধ্যে কেহো কেহো মাত্র বুঝে ॥
বিশেষ অবলাগণ লাজ ভয় বশ।
দেখিবে কি কাজ তারা নাহি শুনে রস ॥ ১৮০
পতির অধীন পত্নী কিছু নাহি জানে।
তবে যত দেখে শুনে সব পতি গুণে ॥ ১৮১

আধুনিক পতিগণ রুক্মিণীর বাক্য শিরোধার্য্য করিলে ভাল হয়।

দারুককে ডাকান হইল, রথ আসিল, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী তাহাতে চড়িয়া আকাশে উড্ডীন হইলেন।

রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ রথেত চড়িলা।
মনিময় সিংহাসনে আনন্দে বসিলা ॥
রসাবেশে ঢর ঢর সজল নয়নে।
দুহে দুহা নিরীক্ষণ করয়ে সঘন ॥ ১৮৩
কিছুই না বুঝে কেহো আসক্তির ভাবে।
যে অঙ্গ পরশ করে সেই অঙ্গ দ্রবে ॥ ১৮৩

পঞ্চম অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম প্রেমরস। শেষ অধ্যায়ে রথাধিরূঢ় শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর প্রেমপ্রবণ ভাব এই অধ্যায়ে স্ফুটীকৃত হইয়াছে। এই চিত্র চিত্রকরের তুলিকার যোগ্য বস্তু।

প্রেমময় নায়ক নায়িকা আকাশমার্গে রথে চড়িয়া যাইতেছেন ও পরস্পর পরস্পরের প্রেম ভাবে বিভোর হইয়াছেন।

সঘনে বদন চাহে হাসি হাসি কথা কহে
জন্মাইঞা প্রেমের অঙ্কুরে। ১৮৬

রৈবতকে প্রেমরসে মাতোয়ারা স্ত্রী পুরুষের একটা বর্ণনা, রথে যাইতে যাইতে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দিতেছেন ও শুনিয়া রুক্মিণী হর্ষিত হইতেছেন।

হেন সুখে রথ মাঝে রুক্মিণী গোবিন্দ সাজে
নানা কথা রভস বিহরে ॥ ১৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত রস। আধুনিক পাঠকের নিকটও ইহা অদ্ভুত লাগিবে, কারণ এখন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর নিকট পৌরাণিক ভৌগলিক কাহিনী বিবৃত করিলেন। শত কবিত্ব শক্তিতেও এরূপ নীরস বস্তু সরস করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে কবিবল্লভ যে পণ্ডিত লোক ছিলেন ও সমস্ত পুরাণাদি ভালরূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই অধ্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণ আছে। তাহার ভৌগলিক বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার দিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ সৃষ্টিপত্তন করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড শম্বুকের ডিম্বের মত "শোঁসর গঠন"। সেই ডিম্বের "কঠা"র ভিতর অর্দ্ধেকখানি সলিল। সেই সলিলের ভিতর কূর্ম্ম অবতার বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন। সেই কূর্ম্মের উপর অনন্তদেব নিজ ফণার বসুমতী ধারণ করিয়া আছেন। সেই ফণার উপর একে একে সাতটী পাতাল নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত যথাক্রমে ইহাদের নাম—পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল। এই নামগুলি পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে ও ভাগবত ৫। ২৪ অধ্যায় পাওয়া যায়—

অতলং বিতলঞ্চৈব সুতলঞ্চ তলাতলম্।
মহাতলঞ্চ বিখ্যাতং ততো জ্ঞেয়ং রসাতলম্।
ততঃ পাতালমিত্যেবং পাতালসংজ্ঞকাঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণ ২।৫ অধ্যায়ে একটু বিভিন্ন নাম আছে।

অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্রং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্।

কবিবল্লভ পদ্মপুরাণকে অনুসরণ করিয়াছেন। নিত্য

বৃন্দাবনের বর্ণনায় ঋণও পদ্মপুরাণে বিশেষভাবে দেখা যায়। তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

এই পাতালের উর্দ্ধে

ভূর্লোক সপ্তমো পুরী নব অধিকার *

অর্থাৎ পৃথিবী। তন্মধ্যে সুমেরুপর্ব্বত। ইহার চতুর্দ্দিকে পুনরায় চারি পর্ব্বত—উত্তরে মন্দার (ভাগবত ৫।১৭।১১ অনুসারে মন্দর), পূর্ব্বে মেরুমন্দার (ভাগবতে—মেরুমন্দর), দক্ষিণে কুমুদ, পশ্চিমে সুপার্শ্ব। ইহাদের মধ্যে পুনরায় মন্দারের চারিদিকে চারিগিরি—কুসম্ভ (ভাগবত ৫।১৭।২৬ অনুসারে কুসুম্ভ) বৈকঙ্ক, কুরঙ্গ ও কুরর। মন্দারের উপর নদীর নাম অরুণদা (ভা।৫।১৭।১৭) ও বনের নাম নন্দন। (ভা—৫।১৭।১৪)। মেরুমন্দারের চারিধারে চারি পর্ব্বত যথা—ত্রিকূট, ত্রিশির (ভাগবতে—৫।১৭।২৬ শিশির), পতঙ্গ ও রুচক। এই মেরুমন্দারের উপর নদীর নাম জম্বু (ভা—৫।১৭।১৯) ও বনের নাম চিত্ররথ (ভা—৫।১৭।১৪)। পুনশ্চ, কুমুদের চারিদিকে চারিগিরি—সিতবাস (ভাগবতে শিতিবাস, পদ্মপুরাণে সিতিবাস), কপিল, নিসদ (ভাগবত নিষধ) ও শঙ্খগিরি। ইহার উপরে যে নদী তাহার নাম পঞ্চধারা ও বনের নাম বৈভ্রয়ত (ভাগবতে ৫।১৭।১৪ বৈভ্রাজক)। সুপার্শ্বের চারিদিকের চারি গিরির নাম—বৈদূর্য্য, জারুনিহংস (ভা ৫।১৭।২৪ মতে জারুধিহংস), ঋষভ ও সুনাভ (ভাগবতে নাগক।) ইহার উপরে নদীর নাম কাম ও বনের নাম সর্ব্বতোভদ্র।

পাঠক দেখিবেন গ্রন্থকার এই বিবরণ ভাগবত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা প্রভেদ আছে, উপরে তাহ প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতঃপর সৃষ্টি কথন। ব্রহ্মার মানস পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু ও কন্যা শতরূপা যোগে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মেন (বিষ্ণুপুরাণ ১ম ৭ অধ্যায় ও ২য় ১ম অধ্যায়)। প্রিয়ব্রত মর্ত্ত্যলোকে রাজা হন। তিনি যোগবলে রথ ও অশ্ব লাভ করিয়া সূর্য্যের সুমেরু প্রদক্ষিণ পরীক্ষার্থ ৭ দিন ভ্রমণ করিলেন ও তাঁহার তেজে দিবা রাত্রির ভেদ থাকিল না। তাঁহার রথচক্র কর্ত্তৃক পৃথ্বী খদিত হইল ও সেই সপ্তখাদ সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসিন্ধুতে পরিণত হইল (ভা ৫।১।৩০—৩১).

এই সপ্তদ্বীপ যথা—জম্বু, প্লক্ষ,কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, শাম্মলি (ভা ৫।১।৩২ মতে শাল্মলি) ও পুষ্কর। ভাগবতে এই নামাবলীর একটু বিভিন্ন ক্রম দেওয়া আছে—তথাকার ক্রম যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। এই ক্রমের সার্থকতা আছে, কারণ কবিবল্লভ ও ভাগবতকার উভয়েই বলিতেছেন যে যথাক্রমে "দ্বিগুণ দ্বিগুণ করি দ্বীপের বিস্তার"। ভাগবত ৫।২০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সপ্তসিন্ধু যথা—ক্ষীর, ইক্ষু, মদিরা, ঘৃত, দধি, কষায় ও নির্ম্মল জলযুক্ত সমুদ্র। ভাগবত ৫।১।৩৩ অনুসারে লবণ জল (কষায়) প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে ও শুদ্ধজল সপ্তস্থানে আছে। এই প্রভেদও উল্লেখযোগ্য কারণ ভাগবত ৫।২০ অধ্যায়ে আছে যে ঐ সপ্তসিন্ধু ঐ সপ্তদ্বীপের পরিখাস্বরূপ। কবিবল্লভ জম্বুদ্বীপকেই লবণ সমুদ্র বেষ্টিত বলিয়াছেন (২৩৭)

অতঃপর "কাঞ্চন ভূমির" বর্ণনা (ভা ৫।২০।৩৫) ও লোকালোক পর্ব্বতের স্থিতি (ভা ঐ ও বিষ্ণু ২।৪) নির্দ্দেশ করিয়া প্রিয়ব্রত সপ্ত পুত্রকে সপ্তদ্বীপ ভাগ করিয়া দিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। সপ্তপুত্র অগ্নীধ্র (ভাগবতে আগ্নীধ্র), ইক্ষু জিহ্বা (ভাগবতে ইধ্মজিহ্ব), যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, অষ্টবাহু (ভাগবতে ঘৃতপৃষ্ঠ), মেধাতিথি ও অগ্নিহোত্র (ভাগবতে বীতিহোত্র) যথাক্রমে জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, শাল্মলি, পুষ্কর দ্বীপ পাইলেন॥ বিষ্ণু ২।১ অধ্যায়ে নাম ও বিভাগ একটু ভিন্নরূপ আছে। অগ্নিধ্র নৃপতি নিজরাজ্য জম্বুদ্বীপকে ৯ ভাগ করিয়া ৯ পুত্রকে দান করিলেন। এই ৯ পুত্রের নাম যথা—ইলাব্রত (ভাগবতে ইলাবৃত), রম্যক, হিরন্ময়, উত্তরকুরু (ভাগবতেকুরু), ভদ্রাস (ভাগবতে ভদ্রাশ্ব), কেতুমল, হরিবর্ষ, অজনাভ (ভাগবতে নাভি), কিংপুরুষ। বিষ্ণু ২।১ ও ভা ৫।২ দ্রষ্টব্য।

অতঃপর অবশিষ্ট ছয় দ্বীপ বিভাগ বর্ণিত হইতেছে।

* সপ্তলোক যথা—ভূর্ভুবঃস্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপ-এব চ।
সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্তু পরিকীর্ত্তিতাঃ। অগ্নিপুরাণ।

ইক্ষ্বাকুজহবা রাজা প্লক্ষদ্বীপকে সপ্তভাগ করিয়া শিব আদি সপ্তপুত্রকে দান করিলেন। ইঁহারা সূর্য্যদেবকে পূজা করিতেন। পদ্ম ভূমিখণ্ড ১৩১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য—তথায় শঙ্কর পূজার কথা লিখিত আছে। এইরূপ অন্যান্য দ্বীপ বিভাগের বর্ণনাতেও অল্পাধিক বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে।

যজ্ঞবাহু কুশদ্বীপকে সপ্তভাগ করিয়া সুরোদন আদি সপ্তপুত্রকে ভাগ করিয়া দিলেন। ইঁহারা চন্দ্রদেবকে পূজা করিতেন।

হিরণ্যরেতা ক্রৌঞ্চদ্বীপকে সপ্তভাগ করিয়া বসুদার (পদ্ম—বসুদান) আদি সপ্ত পুত্রকে ভাগ করিয়া দিলেন। ইঁহারা অগ্নিদেবকে উপাসনা করিতেন।

অষ্টবাহু শাকদ্বীপকে সপ্তভাগ করিয়া মধুর কুমারাদি সপ্ত পুত্রকে ভাগ করিয়া দিলেন। ইঁহারা বরুণকে পূজা করিতেন।

মেধাতিথি শাল্মলি দ্বীপকে সপ্তভাগ করিয়া পুরোরবা প্রভৃতি সপ্ত পুত্রকে ভাগ করিয়া দিলেন; ইঁহারা বায়ুর সেবা করিতেন।

অগ্নিহোত্র পুষ্কর দ্বীপকে দুইভাগ করিয়া ধাতক ও মহামতি (পদ্ম—রমণক) নামক দুই পুত্রকে ভাগ করিয়া দিলেন। ইঁহারা ব্রহ্মার সেবা করিতেন।

এই বিভাগের ফলে দেখা যায়—

সপ্তদ্বীপে ষষ্ঠাধিক চল্লিশ কুমার। ২৬৯

অতঃপর ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপে অনন্তশয়নে বিষ্ণুর ও তাঁহার চরণসেবা পরায়ণা কমলার বর্ণনা করিতেছেন। এই শ্বেতদ্বীপের উল্লেখও পদ্মপুরাণানুমত—"স্থানং ভগবতঃ সাক্ষাৎ শ্বেতদ্বীপ ইতীর্য্যতে"। পদ্ম ভূমিখণ্ড ১৩১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এইখানে মর্ত্তালোক অথবা ভূর্লোক বর্ণনা শেষ হইল! এখন অবশিষ্ট ছয় লোকের যথাক্রমে বর্ণনা হইতেছে।

ভুবর্লোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ—এই "ভূর্লোক শূন্যস্থানে" খেচরগণ বাস করে। স্বর্লোক অথবা সুরলোক—সুমেরুর উপরিভাগে ব্রহ্মপুর (ব্রহ্মলোক নহে) স্থিত। ইহার অষ্টদিকে অষ্টলোকপালের পুরী বর্ত্তমান। বিষ্ণু ২।২ দ্রষ্টব্য—তথায় বিবস্বৎ ও সোম, কবিবল্লভ কথিত নৈঋতা ও ঈশান পরিবর্ত্তে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সুরপুরে গঙ্গা চারিধারায় বিভক্ত—সীতা, অলকানন্দা (পদ্ম ও বিষ্ণুতে অলকানন্দা), বঙ্কু (পদ্ম—বঙ্ক্ষু, বিষ্ণু—চক্ষু) ও ভদ্রা। এই সুরলোকে আরও তিন লোক আছে যথা—সপ্তর্ষিলোক, চন্দ্রলোক, ধ্রুবলোক। তদূর্দ্ধে মহর্লোক—এই স্থানে ব্রহ্মভাবে যোগীগণ বাস করেন।

তদূর্দ্ধে তপোলোক—তপস্বিরা এই স্থানের অধিকারী। তৎপরে জন লোক—এই স্থানে বৈষ্ণবজন বাস করেন।

তদূর্দ্ধে সত্যলোক—এইখানে পঞ্চস্থান আছে যথা ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠ, শিবলোক, দেবীলোক ও সর্ব্বোপরি গোলক।

গোলোকের বর্ণনা অতি চমৎকার। কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

নব নব সুখ সব শরীরে উদয়।
মানসে বিস্তর ভোগে না বুঝি নির্ণয়॥
রমণী রসিক যাতে অখণ্ড যৌবন।
বিনি পাঠে সর্ব্বশাস্ত্র জানে সর্ব্বজন॥ ৩০৭
গীত ছন্দে কথা যাতে নৃত্যছন্দে গতি।
সহজ কথনে যাতে বেদের উৎপত্তি॥
না ভোগিলে সর্ব্বরস ভোগে সর্ব্বজন।
না দেখিঞা সর্ব্বরূপ করে নিরীক্ষণ॥ ৩০৯
না বোলিলে সর্ব্বকথা বুঝে অনুমানে।
না শুনিলে সর্ব্বধ্বনি বুঝে সর্ব্বজনে॥
না জানিঞা জানে সর্ব্ব না রসিঞা রসে।
মনের সকল কর্ম্ম পূরে বিনিশ্রমে॥ ৩১০

এইরূপে নীরস সৃষ্টিপত্তনের বর্ণনা শেষে কবি একটু সরসভাব আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পাঠকের পক্ষে এই নীরস অধ্যায়টী বাদদিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমাদের কবি পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে স্বীয় ধর্ম্মতত্ত্বগ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা অধ্যায় না যোগ করিয়া পারেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যের "শূন্য পুরাণ" হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত সকলেই গ্রন্থারম্ভে একটা সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়া আসিয়াছেন। আমাদের কবির বিশেষত্ব এই যে তিনি রীতিমত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া খুঁটিনাটি বিষয়ে পূর্ব্বেকার পুরাণেতিহাসের অনুসরণ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিবার মহাসুযোগ পাইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

সপ্তর্ষিমণ্ডল

আকাশের কৃষ্ণপটে কালের লেখনী
কিন্ দিন লিখিল এ অনন্ত জিজ্ঞাসা
সপ্তর্ষির স্বর্ণবর্ণে? বিনিদ্র রজনী
গোপন অন্তরতলে পোষে কি দুরাশা
হয়ত কখনো তার মিলিবে উত্তর?
বিশ্বের রহস্যময় গূঢ় মর্ম্মকোষে
লুকাইয়া আপনারে, কোন্ যাদুকর
অদৃশ্য অঙ্গুলি স্পর্শে গন্ধরূপ রসে
ফুটাইয়া তুলিতেছে সৃষ্টি শতদল—
ইহাই কি জগতের প্রশ্ন চিরন্তন?
তারি সমাধানে বুঝি, স্থির অচঞ্চল
সপ্তঋষি লক্ষ যুগ ধেয়ান মগন?
অথবা কি প্রতীক্ষিছে, কবে প্রলয়ের
উন্মাদ নর্ত্তন-তালে দ্রুত আবর্ত্তিয়া,
বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গরাশি সৌর গোলকের
আদি তেজঃপিণ্ডে পুনঃ যাইবে ফিরিয়া?
ধ্রুবতারা অভিমুখে চির প্রসারিত
তর্জ্জনী সঙ্কেত ওই চাহে কি বলিতে,
হে অমৃত পুত্রগণ অজ্ঞান আবৃত,
অমর জ্যোতিতে চল তিমির হইতে?
নির্নিমেষ বসুন্ধরা নির্ব্বাক বিস্ময়ে
সমস্যা পুরিবে কবে রহিয়াছে চেয়ে!

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম, এ, বি, এল,

ভক্ত ও ভগবান

"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।"
শ্রীমৎভগবদ্গীতা।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা জয়শঙ্কর যখন সভাভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক মণিকার তাহার বহুমূল্য একখণ্ড হীরকের গ্রাহকানুসন্ধানে সেই রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা হীরকখণ্ড দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বস্তুতঃ তদ্রূপ বৃহৎ, সুচারু ও জ্যোতির্ম্ময় হীরক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি উহা পরীক্ষা করার জন্য প্রাচীন বিচক্ষণ মন্ত্রীর হাতে দিয়া ক্রয় করা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন।

মন্ত্রী হীরকখণ্ড ভালরূপ দেখিয়া কহিলেন, "মহারাজ! ইহার মূল্য অধিক হইলেও এরূপ দুর্লভ রত্ন যে আপনার মহারাজকোষে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অধিকন্তু হীরকের মূল্যাধিক্যহেতু মণিকারকে প্রত্যাখ্যান করিলে মহারাজের অক্ষয় ধন-ভাণ্ডারের উপরও অযথা নিন্দা আনয়ন করা হইবে।"

রাজা কোষাধ্যক্ষ প্রতি হীরকের মূল্য প্রদানের আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, হীরকখণ্ড মন্ত্রীর হাতেই রহিল। তিনি উহা অপরাহ্নে স্বয়ং রাজহস্তে দিবেন মনে করিয়া সম্প্রতি নিজগৃহেই লইয়া গেলেন এবং স্নানাদি সমাপনান্তে ইষ্টপূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে হীরক খরিদহেতু রাজার অন্তঃপুরে যাইতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় রাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজাকে দেখিবামাত্র রাণী তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; রাজাও রাণীকে হীরক খরিদের বৃত্তান্ত কহিলেন।

রাণী কহিলেন, "মহারাজ! সেই বহুমূল্য হীরকখণ্ড

কি আমি একবার দেখিতে পাইনা!" রাজা কহিলেন, "উহা এখন মন্ত্রীর নিকট আছে, অপরাহ্নেই তুমি পাইবে।"

রমণীজনসুলভ কৌতূহল বলিয়া একটা জিনিষ আছে, তাহা ভিখারিণী হইতে রাজরাণী পর্য্যন্ত সকলের অন্তঃকরণেই ন্যূনাধিক পরিমানে বিরাজ করে। উহাই ত্রেতার পঞ্চবটী বনে জনকনন্দিনীকে স্বর্ণকুরঙ্গলালসায় প্রলুব্ধ করিয়া লঙ্কাবিনাশের কারণ হইয়াছিল। রাণীও তৎপ্রভাবে হীরকের জন্য অপরাহ্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেও নিজের অক্ষমতা অনুভব করিলেন। তিনি তাঁহার দুর্জ্জয় কৌতূহল গোপন মানসে কহিলেন, "মহারাজ! এত অধিক মূল্যের হীরকখণ্ড মন্ত্রীর নিকট রাখিয়া আসা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা আপনি আমা হইতে ভাল বুঝিতে পারেন। তাড়াতাড়ি না আসিলে বোধ হয় এরূপ হইত না। যাহাহউক, উহা অবিলম্বে মন্ত্রিগৃহ হইতে আনয়ন করা উচিত কিনা, তাহা মহারাজই বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

রাজা জয়শঙ্কর রাণীর আতঙ্ক দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "মহিষী! একখণ্ড হীরকের জন্য সেই চির-বিশ্বস্ত ধর্ম্মপ্রাণমন্ত্রীর উপর তোমার সন্দেহ আসিতেছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়!"

রাণী কহিলেন "মহারাজ! আমি কোন সন্দেহের কথা বলিতেছিনা। তবে বহুমূল্য হীরক, যদি মন্ত্রিগৃহ হইতে উহা কোনরূপে অপহৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে বড় আক্ষেপের বিষয় হইবে। আর বলিতে কি মহারাজ! ঐ হীরক দেখিবার জন্য আমারও অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। সে কৌতূহলনিবৃত্তি মহারাজেরই কৃপাসাপেক্ষ।"

রাণীর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া রাজা হীরক আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগৃহে জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন।

মন্ত্রী তখনও তাঁহার ইষ্টারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রাণ ধর্ম্মপথে ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু অন্তরায় হইয়াছিল মন্ত্রিত্ব। মন্ত্রী তাঁহার আরাধ্য বস্তুর অনুসন্ধানে কতদিন সংসার ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু কনিষ্ঠ সোদরোপম রাজা জয়শঙ্করের অনুরোধে সে ইচ্ছা এপর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তাই তিনি ইদানীং মনে করিয়াছিলেন, সংসারে থাকিয়াই তাঁহার সে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু তাহারই বা সময় কোথায়? দিবারাত্রি মধ্যে অধিকাংশ সময়ই রাজ্য-পরিচালন চিন্তায় যায়, বাকী সময় আহার নিদ্রায় অতিবাহিত হয়; ইষ্টারাধনার সময় কোথায়? হায়, বিধাতাপুরুষ মানুষকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খুঁটিনাটি সমুদয় সংবাদ লইবার সময় দিয়াছেন, কেবল তাঁহার সংবাদ লওয়ার সময়টুকু দিতেই ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই মানুষ তাঁহাকে ভাবিবার সময় কিছুতেই পায় না। এই সময়াভাব নিবৃত্তির জন্য মন্ত্রী দৃঢ় নিয়ম করিয়াছেন, অহোরাত্র মধ্যে নির্দ্দিষ্ট চারিদণ্ডকাল তিনি ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন থাকিবেন; সেই সময় মধ্যে সংসার তাহার সমুদয় আসবাবপত্রসহ তাঁহার হৃদয়রাজ্য ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া রহিবে, মন্ত্রী তদবসরে মুক্ত হৃদয়মন্দিরে তাঁহার হৃদয়দেবতাকে বসাইয়া অশ্রুধারায় তাঁহার চরণ-কমল বিধৌত করিবেন; তারপর সংসার পুনরায় যখন সেই মন্দিরে প্রবেশ করিবে, তখন সে স্থানমাহাত্ম্যে তুলসীকাননের মৃত্তিকাবৎ পবিত্র হইয়া উঠিবে!

মন্ত্রী মধ্যাহ্নে সেই চারিদণ্ডকাল যখন ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন সংসার তাহার অফুরন্ত প্রশ্নোত্তরের ঝুলি লইয়া আসিয়া যাহাতে কোন বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে, সেজন্য একজন প্রহরী অদূরে দণ্ডায়মান থাকিত। রাজদূত হীরকের জন্য আসিয়া মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল, তখন সেই প্রহরী তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিল, তৎকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই।

ইহাতে রাজদূত নানা কারণে নিজকে কিঞ্চিৎ অপমানিত মনে করিল। প্রথমতঃ মহারাজের দূত; দ্বিতীয়তঃ রাজা স্বয়ং তাহাকে পাঠাইয়াছেন। তৃতীয়তঃ এই অল্পভাষী লোকটা মন্ত্রীর একজন ভৃত্য বই আর কেহই নহে; তারপর আবার এরূপ অবিনীত সংক্ষিপ্ত খোলসা জবাব। কাজেই দূত অবিলম্বে রাজগৃহে ফিরিয়া যাইয়া মন্ত্রিভবনের অভিজ্ঞতাকে কতক অলঙ্কার পরাইয়া রাজার শ্রুতিগোচর করিল।

রাণী সময় পাইয়া কহিলেন, মহারাজ! ভৃত্যদ্বারা রাজদূতের অবমাননায় সন্দেহের কারণ না থাকিলেও ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ যথেষ্ট আছে।"

রাজা মহিষীর শ্লেষবাক্যে লজ্জিত হইয়া হীরকার্থে তৎক্ষণাৎ পুনরায় চারজন সশস্ত্র প্রহরী প্রেরণ করিলেন। তাহারাও মন্ত্রিগৃহে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ বাধাপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু সে বাধায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহারা বল পূর্ব্বক পূজাগৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। তখন সেই গৃহাভ্যন্তরে ধ্যাননিরত মন্ত্রিহৃদয় তাঁহার আরাধ্য দেবের কোটীচন্দ্রোজ্জ্বলচরণনখর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহার প্রাণ সেই চরণারবিন্দ-মকরন্দপানে গুঞ্জনবিরত ভ্রমরের ন্যায় বিভোর হইয়া রহিয়াছিল।

মন্ত্রিভৃত্য প্রহরীদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নিমিষে আসিয়া পূজাগৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইল এবং নিষ্কাসিত অসি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রুক্ষকণ্ঠে কহিল, "রাজভৃত্যগণ! জীবনের মায়া থাকিলে পশ্চাৎপদ হও। তোমরা তোমাদের প্রভুর আদেশ পালন করিতে আসিয়াছ; আমিও আমার প্রভুর আজ্ঞাপালনের জন্য এই স্থানে দণ্ডায়মান আছি। আমার কর্ত্তব্যপালনে রাজাদেশ অগ্রাহ্য করিতে হইলেও আমি কুণ্ঠিত হইব না। তোমরা স্থির জানিও, আমার হস্তে তরবারি ও দেহে জীবন থাকিতে পূজাগৃহে প্রবেশ করা কাহারও সাধ্য হইবে না!"

রাজপ্রহরীরা কথাগুলি শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। তাহারা তখনই সেই অর্ব্বাচীনের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া গৃহে প্রবেশ করার সঙ্কল্প করিল; আবার ভাবিল, রাজার তদ্রূপ কোন আদেশ লইয়া আসা হয় নাই। রাজা ও রাজমন্ত্রীর ব্যাপার; ইহাদের গোলযোগ হয়ত সাক্ষাৎমাত্রই মিটিয়া যাইবে! কিন্তু ইতিমধ্যে বিনা আদেশে একটা রক্তারক্তি করিয়া বসিলে তজ্জন্য তাহাদিগকেই শেষে জবাবদিহি করিতে হইবে। প্রহরীরা জবাবদিহির কার্য্য না করিয়া মন্ত্রিগৃহের বৃত্তান্ত অবিলম্বে আসিয়া রাজাকে জানাইল।

রাণী এবার কহিলেন, "সন্দেহ ও অবিশ্বাস নামক দুইটী জিনিষ অনেক সময় প্রয়োজনে আসে বলিয়াই বিধাতাপুরুষ উহা মানুষকে দিয়াছেন!"

প্রত্যাখ্যাত প্রহরীদের কথা শুনিয়া রাজা জয়শঙ্করের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; রাণীর শ্লেষবাক্যে কর্ণপাত করার অবসর তখন তাঁহার ছিল না। তিনি উদ্ধত মন্ত্রীকে শিক্ষা দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ পঞ্চবিংশতি অশ্বারোহী সৈন্য এই আদেশ দিয়া পাঠাইলেন যে, মন্ত্রী যে স্থানে যে অবস্থায়ই থাকুকনা কেন, হীরকসহ মুহূর্ত্তকালমধ্যে তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিতে হইবে। তজ্জন্য কাহারও শিরশ্ছেদ করা আবশ্যক হইলে দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে না।

অশ্বারোহিগণ বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গেল, কিন্তু তাহাদিগকে বেশীদূর যাইতে হইল না। তাহারা দূর হইতে দেখিতে পাইল, তাহাদের শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী একমাত্র পট্টবস্ত্র পরিধানে তাহাদের দিকেই আসিতেছেন। মন্ত্রী সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "ভাই সকল! তোমাদিগকে আর কার্য্য করিতে হইবে না, আমিই সেই হীরক লইয়া আসিয়াছি। এস, সকলে যাইয়া মহারাজকে উহা বুঝাইয়া দেই!" অশ্বারোহিগণ মন্ত্রীসহ রাজসদনে উপস্থিত হইল।

মন্ত্রী রাজার নিকটে হীরকখণ্ড রাখিয়া দিয়া দৈবঘটিত গোলযোগের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইলে ক্রুদ্ধ রাজা অন্যদিকে মুখ ফিরিইয়া কহিলেন, "রাজা সম্প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কেবল এই হীরকের প্রত্যাশা করেন না! গৃহদ্বারে উদ্ধত প্রহরী রাখিয়া রাজদূতের অবমাননা করা কোন্ জাতীয় রাজভক্তির পরিচায়ক, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করেন!"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ! এই হীরক আমার গৃহে লইয়া যাওয়াতে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে যে অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অর্থ কিরূপ অনর্থের মূল! অথচ এই অর্থ চিন্তায় জীবন কাটাইয়া দিলাম! পরের হিতাহিত চিন্তা করিয়া আয়ু ফুরাইলাম, নিজের ভালমন্দ চিন্তা করিলাম না! যিনি সর্ব্বপ্রকারে নিরপেক্ষ হইয়াও আমাদের অপেক্ষা করেন, সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়াও আমাদের

কল্যাণে লিপ্ত থাকেন, সর্ব্বচিন্তার অতীত হইয়াও আমাদের চিত্ত চিন্তায় মগ্ন রহেন, সেই সত্য সনাতন দেবাদিদেবের চিরমঙ্গলনিলয় চরণকমল চিন্তা করিলাম না! যদি মুহূর্ত্তের জন্য মনকে সেদিকে লইয়া যাই, সংসারের শত কোলাহলে সে আবার তখনই ফিরিয়া আসে! মহারাজ! অভাব অনুযোগের আহ্বান ইষ্টারাধনাকালে মনকে যাহাতে বিক্ষিপ্ত করিতে না পারে, তাহার জন্য পূজাগৃহের অদূরে একজন প্রহরী থাকার নিয়ম করিয়াছি। মহারাজ হীরকখানা আমার হাতে রাখিয়া চলিয়া গেলে উহা অপরাহ্নে আপনাকে বুঝাইয়া দিব মনে করিয়া গৃহে লইয়া গিয়াছিলাম। এবং স্নান সমাপনান্তে ইষ্টপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; সেই সময় রাজদূত ও রাজপ্রহরিগণ যে হীরকের জন্য গিয়াছিল, আমি তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। তবে আমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রহরী আরাধনার বিঘ্ন মনে করিয়া যে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তজ্জন্য আমি মহারাজের নিকট মার্জ্জনাভিক্ষা করিতেছি!”

রাজা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়া মন্ত্রীকে ক্ষমা করিলেন। বলাবাহুল্য, হীরকখণ্ড মহিষীর কৌতূহল নিবৃত্তি করিল। মন্ত্রী নিজগৃহে চলিয়া গেলেন।

সেইদিন অপরাহ্নে রাজা যখন পুনরায় রাজসভায় আসিলেন, মন্ত্রী তখন অতি সঙ্কুচিতভাবে সেই সভায় প্রবেশ করিয়া রাজসমীপে একখণ্ড হীরক রাখিয়া কহিলেন, “মহারাজ! আমি বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট ছিলাম বলিয়াই এই সকল গোলযোগ ঘটিয়াছে। আশা করি আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।”

রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “সেকি মন্ত্রী মহাশয়! এইযে ক্ষণকাল পূর্ব্বেই আপনি আসিয়া আমাকে হীরক দিয়া গিয়াছেন!”

মন্ত্রী ততোধিক বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, “কই মহারাজ! আমিত হীরক লইয়া আর আপনার নিকট আসি নাই!”

রাজা কিছু বুঝিতে না পারিয়া হীরকঘটিত বৃত্তান্তগুলি মন্ত্রীকে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। নবক্রীতহীরক দেখিবার জন্য রাণীর অত্যন্ত কৌতূহল হয়, তাই তিনি হীরকের জন্য মন্ত্রিগৃহে দূত পাঠান। সে তথাকার দ্বারীকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে রাজা পুনরায় চারিজন সশস্ত্র প্রহরী প্রেরণ করেন। এবারও মন্ত্রীর উদ্ধত দ্বাররক্ষক তরবারি ঘুরাইয়া ক্ষমাশীল রাজপ্রহরিগণকে বিমুখ করিয়া দেয়; অথচ মন্ত্রী গৃহমধ্যে থাকিয়াও তাঁহার ভৃত্যের ঔদ্ধত্য সংযত করা আবশ্যক মনে করেন না! ইহাতে মানুষমাত্রেরই ধৈর্য্যচ্যুতি সম্ভব। তাই রাজা, রাজাজ্ঞা অপ্রতিহত রাখিতে কাহারও শিরচ্ছেদ করা আবশ্যক হইলে, তাহারও আদেশ দিয়া হীরকসহ মন্ত্রীকে ধৃত করিয়া আনার জন্য পঞ্চবিংশতি অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা ছুটিয়া যাইতেই পট্টবস্ত্রপরিহিত মন্ত্রী পথিমধ্যে তাহাদের সহিত মিলিত হন, এবং কিছুকাল পূর্ব্বেই রাজাকে হীরকখণ্ড বুঝাইয়া দিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া চলিয়া যান! নতুবা রাজপ্রেরিত অশ্বারোহিগণ এতক্ষণ কি অনর্থ ঘটাইত, কে বলিতে পারে!

রাজবর্ণিত বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে মন্ত্রীর শরীর পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল; এবং চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া দিল। মন্ত্রী যেন স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার আরাধ্য দেবতা তখনও তাঁহার সেই পূজাগৃহের পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া মৃদুমন্দ হাসিতে সংসারের কালকূটরাশিকে অমৃতায়মান করিয়া দিতেছেন! আর পৃথিবীর পাপতাপবিপদপুঞ্জ সূর্য্যকরখচিত সজলজলদবৎ সেই মহাদেবতার চরণকিরণরাজিতে—সমুজ্জল হইয়া হাসি ছড়াইয়া মঙ্গলবর্ষণ করিয়া ছুটিয়াছে!

মন্ত্রী তাঁহার ভাবোদ্বেল হৃদয় আর সংযত রাখিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিয়া আকুল কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “একি লীলা দেখাইলে প্রভু, একি কৃপা দেখাইলে! ওহে নিত্যনিরঞ্জন পরম পুরুষ! অকৃতজ্ঞ জীবের রক্ষার্থে তুমি এমন করিয়া ধাবিত হও। আমি কায়মনোবাক্যে এই পার্থিব প্রভুর হিত চিন্তায় জীবন কাটাইয়াছি, ভ্রমেও তাঁহার অহিত কামনা করি নাই! তথাপি মুহূর্ত্তের অপ্রণিধানে তিনি আমার প্রাণ দণ্ডের

আদেশ পর্য্যন্ত দিতেও কুণ্ঠিত হইলেননা! আর তোমার কথা কি বলিব?

"পতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরনং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয় স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

এহেন চিরবান্ধব তোমাকে যে দিনান্তে একটীবার মাত্র প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারে না; তোমার অনন্ত সৃষ্টি মধ্যে নগণ্য কীটানুকীট সম সেই ভ্রান্ত জীবের দেহ ধারণ করিয়া আসিয়া তুমি তাহাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছ। তাহার জন্য তোমার দাসানুদাস এই রাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া গিয়াছ! কেন প্রভু, তোমার অনন্ত সৃষ্টিতে অহরহ কত গ্রহ, উপগ্রহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, সে স্থলে এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর জীবের মৃত্যু হইলে কাহার কি ক্ষতি হইত! তুমি এ অধমের জন্য এত ক্লেশ সহিতে আসিলে কেন?"

মন্ত্রীর ভক্তিপ্রনোদিত কাতরোক্তি শ্রবণে সভাসদগণের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। রাজা জয়শঙ্কর রহস্যোদ্‌ঘাটনে অসমর্থ হইয়া অন্তঃপুর হইতে পূর্ব্বপ্রাপ্ত হীরক খানা রাজসভায় আনাইলেন। তিনি উভয় হীরক যেই একত্র তুলনা করিয়া দেখিতেছিলেন, অমনি হীরক দুইটী তাঁহার সমুদয় অনুসন্ধিৎসা ব্যর্থ করিয়া দিয়া সহস্র চক্ষুর সমক্ষে মিলিয়া এক হইয়া গেল।

মন্ত্রী তখনও অদূরে দাঁড়াইয়া বাষ্পগদগদকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছিলেন।

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ।
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধাণম্॥
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম।
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥"

শ্রীযশোদালাল বণিক্ বি, এল।

সাহিত্যিক পত্র

(পরলোকগত রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি-আই ই, মহোদয়ের নিকট লিখিত। তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।)

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের পত্র।*

26 | 1 Kanai Lal Dhar's Lane.

Dear Sir,

Please accept my sincerest congratulations on the honours just conferred on you by His Majesty the king Emperor. You are the uncrowned king of Bengali authors and your elevation to the companionship is in reality a royal recognition of the literature of Bengal. May you be spared long to enable our Bengali writers to profit by your personal example and erudition.

Calcutta. 1-1-09 } Yours sincerely
SATISH CHANDRA VIDYABHUSAN.

* ৺পিতামহ দেব সি-আই-ই, উপাধিতে ভূষিত হইলে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া ৺বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ পত্রখানা লিখিয়াছিলেন। "কালীপ্রসন্ন-প্রসঙ্গ" নামক আমার যে পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে তিনি কালীপ্রসন্ন-সম্বন্ধে একটি রচনা দিবেন বলিয়া আমাকে বিশেষ ভরসা দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট, তিনি অকালেই দেহত্যাগ করিলেন। — লেখক।

স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র। †

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়।—

পরমপ্রীতি-শ্রদ্ধাভাজনেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ নিবেদনমিদং। দাদা মহাশয় * * * * "নিভৃতচিন্তা" ধীরে ধীরে নিভৃতেই পাঠ করিতেছি। কিন্তু ইহাতে কি যেন ধরি ধরি করিয়া পাইতেছি না। আপনি এক একবার পরমাত্মার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার বিভূতি দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন; আবার সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন। আমি আপনার প্রেমোচ্ছ্বাসের সহিত ছুটিতে চাই—কিন্তু আবার সংসারক্ষেত্রে পড়িয়া দিশেহারা হইয়া যাই। পুস্তক পড়িয়া আমার প্রাণে যেমন হইতেছে, তাহাই আপনাকে লিখিলাম। কোন সূত্র ধরিয়া গেলে আমার এদিগ্ ভ্রম না হয়, গ্রন্থকার আপনি এ বিষয়ে উপদেশ দিলে কৃতার্থ হইব।

বিলাসিতায় বাঙ্গালি উৎসন্ন গিয়াছে এখনও যাইতেছে। এই বিষবিলাসিতার ফলে বাঙ্গালি কর্ম্ম সংস্থানের উপায় হারাইয়া পথের কাঙ্গালী হইতেছে। পরমার্থ তত্ত্বচিন্তা সে ত বহুদিনই গিয়াছে। ধর্ম্ম গিয়াছে, জাতিও গতপ্রায়, এখন দেহপ্রাণ লইয়া টানাটানি—তবুও যে বঙ্গে বঙ্গসন্তানের চৈতন্য নাই—সেই বঙ্গে প্রাণের রুধির দিয়া আপনি যাহা লিখিতেছেন,—তাহার পাঠক জুটিল না......। দাদা,......হতভাগ্য বাঙ্গালি পাঠক বা লেখকের কথায় বিহ্বল হইবেন না, শাণিত কৃপাণ হস্তে আপনার কর্ত্তব্য করিয়া যান।......নারায়ণের কৃপায় কখন বঙ্গে যদি শুভাদৃষ্টের সূত্রপাত হয়, তাহা হইলে, আপনার মত হৃদয়বান রচকের পাঠক আপনিই জুটিয়া যাইবে।

* * * ইতি সন ১৩০১। ৫ই আশ্বিন।

স্নেহানুগত
চির আশীর্ব্বাদক
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

† ইনি বহুদিন "বঙ্গবাসী" কাগজের সম্পাদক ছিলেন।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পত্র।

৩৩নং বলরাম বসুর ঘাট রোড।
ভবানীপুর, কলিকাতা।
১৫ই আশ্বিন ১৩০১ সাল।

স-সম্মান নিবেদন—

বোধ হয় আপনি আমার পূর্ব্বপত্র পাইয়াছেন। আপনার নিকট প্রায় সম্পূর্ণ বিদ্যাপতিই পাঠাইলাম। কেবল শেষের দুই তিন পৃষ্ঠা ও মধ্যের ৫৯-৬০ এবং ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা পাঠাইতে পারি নাই। মধ্যের পৃষ্ঠাদ্বয়ে কয়েকটী পঙ্‌ক্তি ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া, শেষের কয়েক পৃষ্ঠার সহিত উহার পুনর্ম্মুদ্রণ করিতে হইয়াছে। সেই কর্ম্মাটি প্রেসে আছে বলিয়া পাঠাইতে পারিলাম না। আমি পূজার ষষ্ঠীর দিবস পুস্তক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সুতরাং যদি তাহার পূর্ব্বে কোন পরামর্শাদি প্রদান করেন, বড়ই ভাল হয়। আপনার সময় নিতান্ত মূল্যবান্ তাহা জানি, তবে যখন অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত দেখিতে চাহিয়াছেন, তখন এরূপ আশা করা আমার পক্ষে একেবারে অসঙ্গত নহে। আপনার কুশল সমাচার লিখিয়া সুখী করিবেন।

বিনীত—
শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

রেজেষ্টরী করা

শঙ্খমার্কা আসল

লালমোহন সাহা শঙ্খনিধির পৃথিবী ব্যাপিত

সর্ব্বজ্বরগজসিংহ

৪৮ ঘণ্টায় সর্ব্ববিধ জ্বর, ১ সপ্তাহে প্লীহা যকৃৎ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব।
মূল্য বড় ডিবা ১॥০ দেড় টাকা, মধ্যম ১৲ এক টাকা, ছোট ।৵০ নয় আনা।
ডাকমাশুল ১ হইতে ১২ ডিবা ৵০ দুই আনা।

জগদ্বিখ্যাত।

সর্ব্বদদ্রুহুতাশন

২৪ ঘণ্টায় দাউদাদি চর্ম্মরোগ বিনা ক্লেশে আরোগ্য হয়।
মূল্য ১ ডিবা ।৵০ ছয় আনা, ডাকমাশুল ১ হইতে ২৪ ডিবা ৵০ দুই আনা।

সুপ্রসিদ্ধ।

কণ্ডুদাবানল

খোশ পাচড়াদি ক্ষতরোগ অতি শীঘ্র বিনাক্লেশে আরোগ্য হয়।
মূল্য ১ ডিবা ।৵০ ছয় আনা, ডাকমাশুল ১ হইতে ১২ ডিবা ৵০ দুই আনা।

চিরবিনীত—শ্রীগৌরনিতাই সাহ শঙ্খনাথ।
মেনেজিং—প্রোপ্রাইটার।

[illegible] শঙ্খনিধি মেডিকেল হল কিম্বা [illegible]।

Printed by P. B. CHAKRAVARTY, at the Sreenath Press, 5, Nayabazar Road, Dacca
and
Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatoli, Dacca.

VOL. 10. No. 4 & 5.

JULY & AUGT., 1920.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY
RAI SHAHEB,
BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,
AND
SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . Rs. 5-8-0
Single Copy 0-8-0

REGINUS (TRIED OVER 30 YEARS.)

Composition-Aswagandha-Coco. Munoomica, Damian, Phosphorus, &c.

REGINUS—Universally praised by your physicians as a Brain Food and Tonic.

REGINUS is now prescribed to cure completely Bodily fatigue, Brain Exhaustion, Weakness of every sort, &c., &c.

ASTHMA.—With dry cough, hard breathing periodical fits, palpitation spitting out sticky phlegm Keeping up sleepless nights for fear of Suffocation, &c. Cured radically by our specific remedy. Bottle Rs. 5.

DIABETES and PILES are cured very shortly with our proved Cures. Bottle Rs. 3 each.

Complete list of preparations sent free.

THE RANAGHAT CHEMICAL WORKS.

RANAGHAT. BENGAL.

Edwards Tonic

The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.

Sole Agents :—**B. K. PAUL & CO.,** *7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.*

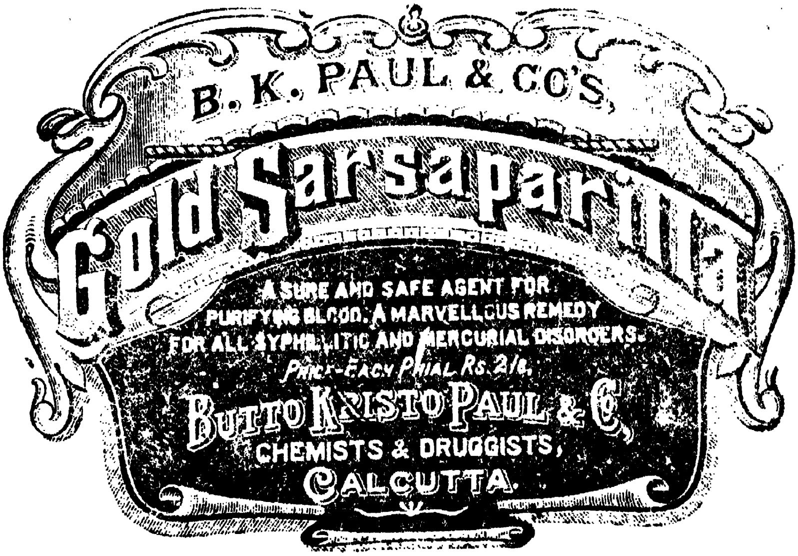

Cytogen AN IDEAL DIGESTIVE TONIC WINE
Invaluable in CONVALESCENCE from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c.,
Extremely Useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,
INDISPENSABLE AFTER PARTURITION
Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.
B. K. Paul & Co.,
CALCUTTA.

Branch Sovabazar Street.

Head Office :—7 & 12 Bonfield's Lane Calcutta The Research Laboratory —18 Sashi Bhoson Sarkar's Lane

লুপ্ত-রত্নের পুনরুদ্ধার!

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'!

'বঙ্গদর্শন' আবার বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করুক! যে 'বঙ্গদর্শন' নবযুগের নূতন বঙ্গ-সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, যে 'বঙ্গদর্শন' নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন শক্তিতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, আমরা সেই 'বঙ্গদর্শন' পুনর্মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছি। বাঙ্গালীর পক্ষে সুসংবাদ নহে কি?

রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

"বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা, তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়-রবিরশ্মি-সমুজ্জ্বল তুষার-কিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। * * * রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এতশীঘ্র এমন দ্রুত পরিণত লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।"

"বঙ্গদর্শন"ই বঙ্গসাহিত্যের সেই তুষার কিরীট।

চারি বৎসরের চারি খণ্ড 'বঙ্গদর্শন'

আমরা প্রকাশিত করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবর্দ্ধিত ও সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' নিতান্ত দুর্লভ, এক সেট 'বঙ্গদর্শন' যদি বা দৈবাৎ পাওয়া যায়, তাহাও

১৫০৲ দেড় শত, ২০০৲ দুই শত টাকা মূল্যে

কিনিতে হয়। এমন বাঙ্গালী পাঠক নাই, যিনি 'বঙ্গদর্শনে'র নাম শুনেন নাই। কিন্তু কয়জন চোখে দেখিয়াছেন? সাহিত্যের যে মন্দাকিনীধারায় বাঙ্গালা নব-জীবনে সঞ্জীবিত, 'বঙ্গদর্শন' যে তাহার গঙ্গোত্রী, তাহা আজ কে অস্বীকার করিবে? সেই সুদুর্লভ 'বঙ্গদর্শন' আমরা অত্যন্ত সুলভ মূল্যে আপাততঃ কেবল

'সাহিত্যে'র গ্রাহকগণকে

দিবার ব্যবস্থা করিলাম। কিন্তু এই দুর্মূল্যের দিনে কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই প্রভৃতির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির সময়ে তাঁহাদের পক্ষে

প্রথম বৎসরের মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র

নির্দ্দিষ্ট হইল। 'বঙ্গদর্শনে'র বার্ষিক মূল্য ছিল—তিন টাকা ছয় আনা। এখন তাহা অমূল্য। অসম্ভব মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না।— **সেই 'বঙ্গদর্শন' 'সাহিত্যে'র গ্রাহকগণ দুই টাকায় পাইবেন।**

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যে আকারে, যে অক্ষরে, ছাপা হইয়াছিল, আমাদের সংস্করণও ঠিক সেইরূপ ছাপা হইবে। অর্থাৎ, ইহা—**Fac-similie** সংস্করণ।

এ বৎসর "সাহিত্যে"র উৎকর্ষবিধানের যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে।— প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উপন্যাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির ছোট গল্প "সাহিত্য"কে আরও সমৃদ্ধ করিবে।

যাঁহারা তিন টাকা দিয়া চৈত্র মাসের মধ্যে 'সাহিত্যে'র গ্রাহক হইবেন, অর্থাৎ 'সাহিত্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের মূল্য দুই টাকা, মোট পাঁচ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারাই এই অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন—

ম্যানেজার, সাহিত্য।

২১, রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

পাঠের ও উপহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।

মূক ও বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন প্রণীত

নল-দময়ন্তী

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১॥০ টাকা।

কয়েকখানি বহুবর্ণের চিত্র ভূষিত। বেগুনি রং সাটীন কাপড় মনোরম প্যাড্ বাঁধাই—তদুপরি একখানা তিন রংএর চিত্র পরিশোভিত। বাঙ্গালা ভাষায় উপহার দিবার এমন সরল সুন্দর মধুর পুস্তক আর একখানি নাই।

মালঞ্চ সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত

এম, এ প্রণীত

ভারতনারী

সিল্কের কাপড়ে প্যাড্ বাঁধাই মূল্য ১॥০

সাটীন কাপড়ের শোভনরাজসংস্করণ—মূল্য ২৲

বহু চিত্র ভূষিত অদিতি, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সতীলক্ষ্মী আর্য্যনারীগণের চিরপূজ্য আদর্শ কাহিনী। বাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই নিত্য পাঠ্য।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ সম্পাদিত

(বঙ্গদেশের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক স্কুলসমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত এবং কলিকাতা ইউনিভারসিটী কর্ত্তৃক মহিলাদিগের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট)

কাশীদাসী মহাভারত (সচিত্র) মূল্য ৩॥০

কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সচিত্র) মূল্য ২॥০

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চিরসমাদৃত—বাঙ্গালী জীবনের চিরমধুময়—চির নবীন রূপ কথা।

ভূতপূর্ব্ব শিশু সম্পাদক শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ঠাকুরমার ঝোলা বা বাঙ্গালার রূপকথা।

যেমন সুন্দর কাগজ—তেমন সুন্দর নিভুল ছাপা—তেমনি সুন্দর ঝকঝকে বাঁধা আবার তেমনি সুন্দর সুন্দর রাশি রাশি ছবিতে ভরা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

Amrita Bazar Patrika says, "AN INIMITABLE PRODUCTION"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয় বলেন—"...ইহাতে আশৈশব পরিচিত সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর কথা, ডাইনী রাক্ষসীর কথা,...পিঠে গাছের কথা ত আছেই আবার পুষ্পকুমার, শঙ্খরাণী প্রভৃতি সুকোমল নামের ও ততোধিক সুকোমল প্রকৃতির নায়কনায়িকার কথা সরল ভাষায়, সুন্দর ভঙ্গীতে, কল্পনার তুলিকায় কবিত্বের উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে.....।"

সত্য বাবুর নূতন পুস্তক—অভিনব শিশু উপন্যাস

মূল্য ৸০] **দগোবার্ট** [মূল্য ৸০

ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লিখিত প্রভুভক্ত কর্ম্মবীরের অলৌকিক কাহিনী। এরূপ ছেলেদের উপন্যাস আর বাহির হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

৬৫নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।

A NEW BOOK—Just published.

A HISTORY OF EDUCATION IN ANCIENT INDIA.

BY

NAGENDRA NATH MAZUMDER, M. A., B. T.

Professor, Dacca Training College

WITH AN INTRODUCTION

BY

E. E. BISS, I. E. S.

Principal, Dacca Training College.

MACMILLAN & Co.

Calcutta.

Price Re. 1-8.

Sir Gooroodass Banerjea writes :—"The book presents in a well-arranged form and within a short compass much useful information regarding ancient Hindu culture."

Babu Hirendra Nath Dutta, M. A., P. R. S. says :—"I have gone through it (Education in Ancient India) with interest. You have broken new ground and opened up a fruitful and interesting field."

Dr. Brajendra Nath Seal, (George V Professor of Philosophy, Calcutta University) writes :—

I have read with great pleasure Mr. Nagendra Nath Majumdar's "History of Education in Ancient India." As a clear and interesting account of the ideals and practices of the Ancient and Mediaeval Hindus in the sphere of Education, it is eminently suited to serve as an Introduction to the study of the subject.

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শক্তি ঔষধালয়

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড্। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট্‌ ঢাকা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২নং বিডন ষ্ট্রীট্। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন্ রোড্ (হাওড়া পুলের নিকট)
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১৩৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্। (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—
৭১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—৭১ দশাশ্বমেধ ঘাট।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের। দাদমার—৶০ কৌটা। বৃহরের মনী—৷০ শিশি।
(এক দিনে দদ্রু নিশ্চয় আরোগ্য)। (মালীষা, পৃষ্ঠবাত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মহৌষধ)।
পঞ্চতিক্ত ঘৃত—৪৲ সের।
দশন সংস্কারচূর্ণ—৶০ কৌটা।
কামদেব ঘৃত—১৬৲ সের। (সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ) অমৃতারিষ্ট—৷০ আনা শিশি।
(বলবৃদ্ধি যুবক ও ছাত্রগণের সহায়। সারিবাদ্যারিষ্ট ৩৲ সের। (ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত
অশ্বগন্ধা ঘৃত—৬৲ সের)। (রক্তদুষ্টি বাত বেদনার মহৌষধ)। সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ)।

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শক্তি বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি. এ.

ভিক্টোরিয়া এবং জোয়াইন হাইস্কুলের ভূতপূর্ব হেড মাষ্টার

CONTENTS.

His Excellency's Speech at the Foundation-stone Ceremony of the Victory Memorial at Sadar Ghat, Dacca, on 18th August, 1920	... ...	i.
Burma (Journal of the East Indian Society)	Sir Harvey Adamson, K. C. S. I.	61
Modern Conceptions of Art	Dr. Gauranga Nath Banerjee, M.A., PH. D., F. R. S. A. University Lecturer in Ancient History	72
The Ghugrahati Copper-plate Inscription of Samachara Deva and connected question of later Gupta Chronology ...	Nalini Kanta Bhattasali, M. A., Curator, Dacca Museum ...	75
In an old house	Cecil Leigh	88

BANGIYA SAHITYA PARISHAD

সূচী।

১। কৃষ্ণকান্তের উইল	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত [illegible]	[illegible]
২। বেলুচিস্থান	শ্রীযুক্ত [illegible]	[illegible]
৩। স্মৃতি-তর্পণ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত [illegible]	[illegible]
৪। কুশিনগর	শ্রীযুক্ত [illegible]	[illegible]
৫। ব্যর্থ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত [illegible] রায় ...	[illegible]
৬। অপ্রকাশ-প্রেম "	শ্রীযুক্ত কালিদাস [illegible]	[illegible]
৭। মিলন "	শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র [illegible]গুপ্ত	[illegible]
৮। সাহিত্যিক পত্র	... ...	[illegible]
৯। বাদল-রাতে (কবিতা)	শ্রীযুক্তা [illegible] রায় ...	[illegible]

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of:—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

Th Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Sir Henry Wheeler, K. C. I. E.
" Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M. A.
" Sir N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. Donald, C. I. E., I. C. S.
" Mr. W. W. Hornell, C. I. E., M. A.
" Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. G. Cumming, C. S. I., C. I. E.
" F. C. French, C.S.I., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
D. G. Davies Esq., I. C. S.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.SC.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
" Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
" Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
" J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
" J. C. Kydd, M. A.
" W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
" T. T. Williams M. A., B. Sc.
" Egerton Smith, M. A.
G. H. Langley, M. A.
" Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose.

Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagpor, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.
The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.
The " Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
The Hon'ble Sir Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
" Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S
" Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
" Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
" Jatindra M han Sinha, Deputy Magistrate.
" Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
" Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
" Hemendra Prosad Ghose.
" Akshoy Kumar Moitra
" Jagadananda Roy.
" Binoy Kumar Sircar.
" Gouranga Nath Banerjee.
" Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law Principal, Lahore Law College
Khan Bahadur Syed Abdul Latif.

HIS EXCELLENCY'S SPEECH AT THE FOUNDATION-STONE CEREMONY OF THE VICTORY MEMORIAL AT SADAR GHAT, DACCA, ON 18TH AUGUST, 1920.

NAWAB SAHIB, AND LADIES AND GENTLEMEN,

I am glad to have been able to accept your invitation to lay this foundation-stone for more reasons than one. In the first place, I am glad to have been able to render this small service as a mark of my personal esteem for your eminent townsman, the Nawab Khwaja Muhammad Yusuf Khan Bahadur, to whom the town of Dacca owes so much. The Nawab Sahib is a man who set the compass which was to guide him on his course through life when he was still a young man, and from the course which he then set for himself, he has never veered. The loadstone upon which he set the needle of his compass was the welfare of the town and district of Dacca and the betterment of his fellowmen. There is no need for me to dwell in detail upon his public services for they are well known to every one of you. For 27 years he has been a Municipal Commissioner, for 16 years he has been Chairman of that body, and for 34 years he served as a Member of the District Board, during 16 of which he has ably discharged the onerous duties of the Vice-Chairmanship. And from first to last, through fair weather and through foul, unmoved by the shifting winds of popular opinion now biowing fair like the dancing breeze on a smiling sea, now raging fiercely like an angry hurricane over a stormy ocean, he has held firm the helm of his life's barque, wielding the great influence which he rightly possesses by virtue both of birth and character on the side of law and order, counselling a wise moderation at all times and in all places, setting the example himself by following fearlessly the path of the golden mean To do honour to such a man is to do honour to ourselves.

Then again, I am glad to associate myself with the people of Dacca in the raising up of a memorial, to mark the cessation of strife. In the address which has just been delivered, it is stated that the tower which will be raised upon this site is to commemorate the happy event of the

glorious victory of the Allied Powers. That victory is righty described as the "happiest of events," for I shudder to think of the plight of humanity, had Germany and the Powers associated with her triumphed, and the principles for which they stood been vindicated. But if this memorial is to "open a new page in the history of Dacca," as the Nawab Sahib has declared that it will, we must one and all bear ever in mind what exactly it is that we desire to commemorate by it. We desire to commemorate the victory of the Allies. But the victory of the Allies is in grave danger of proving barren unless it brings with it a cessation of strife. We must all, I think, have been grievously disappointed and, indeed, dismayed to find that the peace which we looked for has not yet flowered. What is it that is drying up the sap and withering the blossom upon the tree ? It is, I am, afraid, the wintry wind of suspicion and distrust, the storm of anger, hatred and all uncharitableness, which is raging over a distracted world. It is not even necessary to look beyond the confines of India to see that the sky is lowering and overcast. And in our thoughtful moments we must all of us realize that peace cannot flower until the angry mutterings of the storm are stilled. Is it not time that we made a supreme and united effort to call a halt to the stirring up of strife ? Has humanity become so bankrupt in intelligence—to put it no higher—that she is willing to look passively on while all her activities and aspirations are blighted and brought to nought, in an atmosphere charged with never-ending current of hostility ? At such times as these, a terrible responsibility rests upon those who, whatever their motives, declare themselves by word or deed to be the disciples of a gospel of hate. Not by such means will the pain from which humanity is suffering be alleviated or the evil with which she is afflicted be rooted out. Nothing less than a determined and a united effort on the part of every one to dethrone this fettish of hate from the bad eminence to which it has been raised will be of the least avail. Let, then, this tower of victory be raised up as a tower of victory over hate. Let it commemorate in our hearts a real desire for a cessation of strife. It owes its existence, as the Nawab Sahib has told us, to a body of persons representative of all communities and of every denomination. It is the offspring, therefore, of harmony and a symbol of unity. Let us see in it, when it is raised up

a pledge that henceforth all races, all classes and all creeds will work together for the common good. And let us chisel deep upon its walls, as also upon the tablets of our hearts, these words "this monument is set up by the people of Dacca as a tomb-stone upon the grave of hate and as an abiding witness to the birth of peace and good will among men." Then may the people of Bengal exclaim in the words of a poet of ancient Rome—words which have come ringing gloriously down the chequered flights of human history—"*Exegi monumentum aere perennius*" —"Behold ! we have raised up a monument more lasting than bronze," the monument of a divine impulse manifesting itself in this world of name and form as the spirit of good-will—proclaiming to all peoples the Fatherhood of God and the brotherhood of man.

THE DACCA REVIEW.

VOL. X. JULY, & AUGUST, 1920. No. 4 & 5.

BURMA.

BY SIR HARVEY ADAMSON, K.C.S.I.

When I landed at Bombay in 1877—an Indian civilian on my way, as I thought, to the Northern Provinces—I was considerably perturbed to find on reporting myself at the Secretariat that I was posted direct to Burma. My acquaintances in Bombay were unable to give me any information about Burma, but their countenances betrayed the apprehension that they and I were parting for ever. On my way across India I happened to travel with a knowledgeable officer of my own service. He told me that the mosquitoes in Burma were as large as his fist. He corrected the depressing influence of this remark by assuring me that from an official point of view Burma was the best of all Indian provinces for promotion. "Why?" I asked. "Because," he replied, "no one has ever been known to live five years in Burma." Even at the present day the average Englishman, though he knows very little about Burma, will at least be positive that it is a place with a dreadfully malarious climate. I am happily in a position to tender myself as an exhibit to rebut these inexactitudes about the climate of Burma. I lived thirty-eight years in Burma, was scarcely ever ill, and enjoyed every day of my time there. The truth is that there are unhealthy stations in Burma as in every province of India, but that on the whole the climate is as salubrious as any in the East. In some respects it is less trying than in most parts of India, because the monsoon breaks early and the hot season is shorter and less fierce than in India, and also because at all times of the year one can be assured of a fairly cool night in Burma. A night punka is never a a necessity, though it may often be a welcome luxury.

As for mosquitoes, one soon gets acclimatized to these unpleasant creatures, and in any case there are few places in Burma where they are more offensive than in Calcutta. I grant

that there are a few obscure stations where they are very odious, and these have given a bad reputation to the whole province. I have a vivid recollection of my first visit to Maubin. We had been playing tennis, and were sitting enjoying a peg in the twilight, when Boom-buzz! a sound like an aeroplane invasion, and everyone rushed to the nearest house, which like all houses in Maubin, was built like a meat-safe, with every window, door, and crevice lined with sheets of perforated zinc. The sound came from clouds of mosquitoes which were wending their way across the river from the jungle opposite, a nightly occurrence. Strange to say, Maubin is a very healthy spot, the mosquito not being of the Anopheles variety

Burma was an unknown land in the remote days to which I have referred, and it cannot be said that she has yet emerged into the full blaze of publicity. Happy, they say, is the country which has not a history, but unfortunately a country which has no history does not excite very much interest in other countries. Burma has had to solve many problems, and there are many still to solve in connection with development, irrigation, revenue, education, crime, self-government, and a host of other subjects. But these are all purely domestic affairs of an unexciting nature that do not draw upon her the eyes of the world. I daresay that if Burma had done something desperate—if, for, instance, she had adopted India's chequered course of political agitation—she would have been much better known to the world than she is. But happily her progress in the arts of civilization, though it has not been slow, has been peaceful, and consequently she has not attracted the attention which is due to her merits. As an illustration I may cite your own Association. The East India Association had been in existence for many years, and over a hundred papers on Indian subjects have been read to large audiences. But though Burma forms a considerable slice of East India, being in fact little less in size than the combined areas of Bengal, Behar and Orissa and the United Provinces, only two papers on Burmese subjects have ever been presented. Do not suppose that I am attributing blame to your office-bearers for neglect of Burma. I know from experience how assiduous they are in roping diffident individuals into the service of the Association. The result seems rather to be due to want of self-assertion by Burma itself. There are many retired officers of the services of Burma and many merchants who could find much of interest in their experiences to relate to an audience in this country, but they appear to have imbibed the unobtrusive spirit of the country of their adoption.

Burma is the farthest east of the provinces of the Indian Empire. It stretches from Tibet in the north to far

down the Malay Peninsula in the south, and from Assam and the Bay of Bengal in the west to China and Siam in the east. It has an area of 231,000 square miles, more than three times that of Bengal, but it has only about a fourth of the population of that province. The scenery of Burma is varied and very beautiful. There is a greenness in it which is restful and pleasing to the eye after the parched sombreness of India. The delta is, of course, flat, and its rice plains do not differ in appearance from rice plains elsewhere, except that they are ever and again relieved by picturesque stretches of forest-land. As one proceeds farther north the views become more charming. The rugged mountains, the hills clad with verdure, the broad rivers, the magnificent forests, the glittering pagodas, the cosy villages, and the gaily dressed crowds make most pleasing pictures. The coastal scenery is especially picturesque. There is no prettier spot on the whole earth than the Mergui Archipelago—

Whose islands on its bosom float
Like emeralds chased in gold.

The tourist to the East usually lands in Bombay, travels through the North of India first, and reserves Burma, if he ever visits it at all, for the end of his tour. Consequently he generally experiences some discomfort from heat in his journey through Burma. He is reversing the natural order. He should begin with the south and gradually work north. His best plan, if he desires a good climate at all stages, is to sail from England in November direct for Rangoon—preferably by the Bibby Line, which is as luxurious and comfortable as any P. and O.—and, having seen Burma, to take steamer for Calcutta or Madras and continue his tour northward.

The casual traveller will find much to interest him in Burma. The extent to which he can see the country depends, of course, on the time at his disposal. If he has only a fortnight to spare he can travel by rail from Rangoon to Myitkyina in the extreme north, halting for a couple of days at Mandalay, and return by river, a delightful trip which can be done with every comfort. If he has more time on hand there are many opportunities of leaving the beaten tourist's track and gaining a larger experience of of the country, its villages, and its people. Thomas Cook and Son, Rangoon, will provide him with itineraries. It will repay him to visit Maymyo, that most charming of hill stations, where it is never too hot and never too cold, and where one is not perched on a precipice as in Indian hill resorts, but can drive, ride, and play polo or golf on level ground. If our tourist is a sportsman he can be sure of a good bag of snipe at various points on his route, or if he aspires to big game he may be able to secure an elephant, or a bison, or a saing—a species of wild ox peculiar to Burma—but big-game shooting requires some previous

arrangement. If he is a golfer he should, in passing through Rangoon, visit Mingaladoon, the best golf links in the East. If he has scholarly tastes he can explore the ancient relics of Buddhism at Pagan and other places. If he has no predilection in particular he will find in the bazaars and pagoda fetes and indigenous sports, such as boat, pony, and bullock races, and in the arts of the country, such as silver work, gold work, lacquer work, wood carving, and silk weaving, much that will be new and interesting to him. And above all he will discover the charm of the people of Burma.

Ten millions of a population of twelve millions are pure Burmese. The Burman is nearer to the Chinese than to the Aryan in type. He is short in stature but sturdy and well built, and has a fair complexion for an Oriental. The women are pleasing in figure and features, and although a stranger from the West might hesitate to call them beautiful, he would readily admit that they are comely and animated and attractive, that they know how to dress tastefully, and that they have the manners of a lady.

With a fertile soil and a rainfall that never fails, life is easy for the Burman, and he has no acute struggle for the means of existence. Consequently he is not given to hard work, unless the object interests him. He is generally a good-natured, careless, happy-go-lucky individual who takes no trouble about the morrow. Men and women are well clad, and they delight in gay colours and silk attire. There are few poor and no beggars. On the other hand, there is no aristocracy of wealth. There are no great landlords, no hereditary aristocracy, and no tribal chiefs. One man is as good as another.

It is a common fallacy that the Burman is lacking in courage. The truth is that he is naturally brave, but makes no cult of bravery. He is not ashamed to admit fear or to run away from danger. In the years following the annexation of Upper Burma, when the whole country was in the throes of rebellion, the Burmese fought bravely, amidst every possible discouragement, with flint-lock guns and soft iron swords against rifles and bayonets. It is only during the late war that the Burmese have become soldiers of our army. I have heard from a British officer who was present in Mesopotamia how the Burma Sappers and Miners threw a bridge across the Diala, under heavy fire, with their comrades falling around them, as steadily and skilfully as if it had been an operation of ordinary parade. The Burman is lavish in expenditure, and is not given to hoarding money. Lightly come and lightly go is his fashion. Any wealth that he may have accumulated he spends in charity, builds a pagoda, or a monastery school, or a bridge, or a rest-house, or digs a well, for by works such as these he

believes that religious merit will be credited to him. The amount thus spent every year in Burma is enormous. The Burman gives in charity far more in proportion to his wealth than any other people. Unfortunately he is very conservative in this respect, and cannot readily be persuaded to give for other than this stereotyped religious charities.

The Burmese are Buddhists by religion, and their form of Buddhism is very pure. They have no caste distinctions, no bigotry, and no enmity to other creeds. Religious persecution is unknown. There are no priests properly speaking, but there are thousands of monks, who live in the monasteries outside every village, and may be seen in the early morning begging their food on the streets. These monks are simply a community of anchorites searching for the truth. They never interfere in secular affairs, or in matters of state, or express an opinion on such. The reverence in which they are held by the people is very great. The Burman kneels while he addresses them, or when they pass him on the road.

There are no dark places in the lives of the Burmese as there are in the lives of other Orientals. All is open to the light of the day in their homes and their religion. The women mix freely and openly with the men and take their full share in social and domestic matters, just as their European sisters do. Nothing more free than a woman's position in the married state can be imagined. By law she is the mistress of her own property and her own self. She is gifted with a shrewd common sense, and has a very keen idea of what she can do best, and what things she should leave to her husband. She is an industrious housewife, and an excellent shopkeeper. Speaking broadly it may be said that the retail trade of the country is in the hands of women.

The Burmese are a very adaptable people. They are not hidebound by custom, as many Oriental races are, and they are ever ready to take up new ideas when they think that any practical advantage can be obtained from them. For instance, the co-operative credit system, which was introduced to their notice only a few years ago, has readily gained acceptance, and it is now not rare to find villages which have co-operative banks managed by the cultivators themselves, and very efficiently, too. In Burma, as in England, a man feels no constraint to follow his father's trade. The son of a cultivator may be a cultivator, or a clerk, or a trader, or even a member of the provincial civil service, and need never fear that the lowly origin of his father will be cast up against him.

The monk is the schoolmaster of his village, but this is aside entirely from his sacred profession. Every man has attended a monastery school as a boy, and spent a part of his boyhood as pupil or acolyte. He has lived there with the monks, and learned from them the

elements of education and a knowledge of his faith. There are very few Burmese who cannot read or write. For want of practice the art may be lost, but it has been acquired. The education is not very deep—reading and writing Burmese, very simple arithmetic, and a great deal of religion. Every Burman knows by heart large portions of the sacred books.

But while primary education, such as it is, is almost universal, higher education is very backward. No Burman has yet passed the competitive examination for the Indian Civil Service. Burma has no University, though it is on the eve of obtaining one, and has hitherto been dependent for the higher learning on Calcutta University. It may be doubted whether the total of Bachelorships of Arts acquired by Burmans has yet amounted to four hundred. If the Bar be excepted, the Burmans who have qualified for the learned professions might be counted on one's fingers, and even in the legal profession no Burman has gained any very marked pre-eminence.

In the times of the Burmese kings the central Government was weak, but local government was strong. From the governors in the provinces you came straight down to the village and its headman. Each village was a self-governing community. And so it remains, as far as may be, under British rule. The headman holds his appointment from above as a matter of form, but he is chosen by his fellow-villagers as a matter of fact. Some of the principal taxes are assessed and collected by the villagers themselves. The Government merely fixes the total. The villagers then appoint assessors from among themselves, and decide how much each household should pay. A coolie might pay two rupees and a trader as much as fifty. So well is the assessment made that complaints against the decision of the assessors are unknown

Though there is much to admire in the life and character of the people, the Burmese have all the faults of an excitable and impulsive race. They are inveterate gamblers, and betting is the soul of every sport. They are as fond of a row as the Irish, and they are easily provoked to wrath and too ready to use the nearest weapon, be it a club or a knife, on the slightest provocation. They are especially prone to committing crimes of violence. Dacoity, or gang robbery, is an national failing, and is regarded by the young blood as a form of sport. Some of these dacoities are terrible crimes, involving not only murder, but the torture of old or young, men and women, for their treasure. When a Burman sees red he can be very savage. Another fault in a Burman is his immense conceit. He is willing to yield the palm to a European but regards himself as far superior to any other Oriental. The Burman rustic is credulous and superstitious to a degree. Petty rebellion against the

British Government is not an uncommon event, and it is always based on superstitious credulity. Any daring adventurer, by the exercise of some deceptive sleight of hand which is attributed to magic, by the twisting into a meaning of his own of some obscure prophecy, and by the pretence that he is the reincarnation of a king, can win the confidence of hundreds of ordinarily sensible men who are ready to follow him in any mad enterprise of rebellion, fully persuaded that when the first shot is fired supernatural tigers and elephants will rush from the jungles and ensure victory. This is not an exaggerated picture. I can recall at least three occurrences during the time that I was Lieutenant-Governor of Burma between 1910 and 1915.

With many virtues and not a few vices the Burmese are a most likeable people. I have never met anyone who ived among them who has not felt their fascination. They are full of fun and laughter, and are ever hospitable and kindly. The stranger who visits their homes is always welcomed. I recall many pleasant hours spent under the banyan tree in villages where I was a complete stranger, conversing with the Burmans who sat around me, listening to their gossip and laughter—for there is never a crowd in Burma without laughter—and regaling myself with the milk and honey and cheroots which their hospitality had provided for my entertainment.

I will now turn to a different aspect of my subject—Burma as she appeals to the merchant and capitalist. I have time only to give the briefest review of her rich material resources in agriculture, forests, and minerals. Agriculture takes the first place. The plains of Burma comprise wet zones in the south and north, and a dry zone in the middle. The pre-eminence of Burma as a field for agriculture lies in the fact that the rainfall has never been known to fail. In the wet zones one agricultural year may be a little better than another, but there is never a bad year. In the dry zone the rainfall is more variable, and there are occasional seasons of short crops ; but scarcity amounting to famine which is so common in India, never occurs in Burma.

The annually cropped area of Burma exceeds fifteen million acres. Most of it depends solely on natural rainfall Less than 9 per cent, is irrigated, chiefly by large Government canals in the dry zone. More than two-thirds of the cropped area is under rice. Burma is the chief granary in the world for the export of rice. Burma rice forms the bulk of the Western world's supply ; the annual export approaches three million tons. The methods of cultivation are primitive, and are exacty the same as they were hundreds of years ago. Even the use of manure is almost unknown except in the rice-plant nurseries.

Other agricultural products are sesamum, millet, beans and pulses, ground nut, cotton, maize, wheat, gram, rape,

chillies, sugar, tobacco, betel-nut, fruits of numerous kinds, and rubber. Most of these are capable of large expansion. Rubber is a comparatively new industry, the tapped area scarcely yet exceeding twenty thousand acres. In the south, especially in the Tenasserim division, the soil and the climate are very suitable to its growth, and when the country becomes better provided with means of communication large extension may be expected.

From this brief summary it will be seen that agriculture in the plains of Burma has already made large strides, but that there is ample room for further progress. It is probable that the supply even of rice can be much increased by the use of manure, and the adoption of intensive methods of cultivation ; while other agricultural products have a field open for expansion in area cultivated, selection of seed, introduction of new staples, and improved methods of cultivation. The uplands of Burma, chiefly the Shan States, are still for the most part virgin soil. They are suitable for wheat, potatoes, tea, and other products of a temperate climate, and present a large field for future enterprise.

Next to agriculture in importance come the forests of Burma, which are more remunerative than those of any other Indian Province. They are the storehouse of teak, from which the world's requirements of this valuable timber are supplied. They comprise 30,000 square miles of reserved forests and 120,000 square miles of unclassed forests, and, so far as teak is concerned, they are worked in accordance with the most approved scientific methods. Teak forests are exploited partly by departmental agency and partly by private enterprise. In the latter case the forests are leased to timber firms, which fell and extract trees selected and marked by the forest officer, and use them for the supply of their saw-mills.

During the war timbers other than teak have been exploited on a large scale for military purposes in India and Mesopotamia. There are enormous quantities of such timbers, for which a remunerative market has not yet been found, but which will probably find a sale in Europe when freights have been reduced to a normal rate. Indeed, many of these timbers may be more useful in the West than in the East, because the chief objection to their use in the East is that they are subject to depredation by white ants.

The forests of Burma contain much wealth in minor forest products, none of which has yet been largely exploited except cutch. Among minor forest products may be mentioned bamboos, canes, fibres, barks, wood-oils, cardamoms, myrobalams, and lac. Vast quantities of gums, resins, dye-stuffs, and tanning materials are still waste products. The attention of the Forest Department has hitherto been directed mainly to teak. In other timbers and minor produce a large field is still open

for the development of the forest wealth of Burma.

Burma has also immense mineral resources, much of which is potential, as it is still in the ground.

Will Burma ever become a gold field? It would be rash to predict that it will, but there are indications that it may. Gold is washed down by many streams, and there are some who make a precarious livelihood by extracting it from the silt. Dredging for gold was carried on by a company in the upper reaches of the Irrawaddy, and though commercial success was not attained the company had a vitality of twelve years, and not a few thousand ounces of gold was won. An attempt was made to win gold from quartz, which was abandoned after the extraction of 1,250 ounces, These are indications that there must be much gold in the province, but it has not yet been discovered in remunerative quantities near the surface.

Coal, chiefly of inferior quality is found in many places, but some of it, in localities at present commercially inaccessible, has been reported by the geological survey as being about equal in quality to Raniganj coal.

Tin has for long been worked in the extreme south of Burma, but, unfortunately, it occurs in a locality devoid of means of transport. It is believed that it will some day be worked with commercial success. Jade stone is found in considerable quantities in wild tracts in the extreme north of Burma, and is worked by native methods. It finds an unlimited market in China.

Rubies, spinels, and sapphires of first-rate quality occur at Mogok, where the Ruby Mines Company carries on its work. The introduction of the artificial ruby, which at a short distance is undistinguishable from the real stone, has militated against the company's success. Judging from the quotations of its shares on the Stock Exchange, the company appears to be coming into a new era of prosperity.

Burma has immense wealth in petroleum. The annexation of Upper Burma in 1885 brought into prominence the oil wells of Yenangyaung, which had long been worked by the Burmese by primitive methods that drew oil only from the higher strata. This field and others that have been discovered are now worked by British companies, and give an annual yield of 300,000,000 gallons.

Wolfram is found chiefly in Tavoy district, and before the war the whole supply went to Germany, from which country all tungsten used in England was obtained. The war gave an impetus to its extraction, and in 1917 as much as 4,000 tons was shipped to England. The Tavoy field produces one-third of the world's output.

Silver, lead, and zinc are extracted from the Burma Corporation's mine at Bawdwin, which promises to be one of the big mining propositions of the world.

Of all these mineral products oil is the only one that has yet reached a great commercial success. But other mineral resources are very promising, through they are at present mainly in the prospecting stage of development.

The progress of commercial development in Burma is sorely retarded by the absence of adequate means of communication. Nature has given the province a fair complement of waterways, but to serve an area nearly twice the size of the United Kingdom she has only 1,600 miles of railway. Her deficiency in roads is even more marked. The total length of roads is put down on paper as only 2,000 miles, and most of these are not-worthy of the name and are fit only for bullock-cart traffic. Burma has hitherto been the Cinderella of Indian provinces, uncared for by the distant Government of India, who have turned a deaf ear to her requests that a larger share of her revenues should be devoted to her own development. The first requirement of the province is more railways and an adequate system of roads to carry the produce to the railways and rivers. The lack of transport facilities is a deterrent to the influx of capital, without which the great potential resources of Burma cannot be developed. She may be expected to have a great commercial future when the Government of India wake up to the fact that in a country rich in material resources expenditure on communications is as productive of wealth as any other outlay of capital.

A lecture on Burma confined to a limit of forty minutes must necessarily be an incomplete production. I have been able only to sketch some prominent features of the province and its principal race of inhabitants. My hope is that I may have induced some of you to seek a deeper knowledge of an interesting country and a delightful people. I will conclude with a word on constitutional reform, a subject which is of considerable interest to the province at the present time.

Burma was excluded from the Indian Reform Scheme for the reasons that her people are in a different stage of political development, and that as yet the desire for elective institutions had not arisen. A promise, however, was given in the Montagu-Chelmsford report that Burma should have an opportunity of participating in the reforms so far as they were applicable to her circumstances. This promise awakened the national pride. It was felt that Burma could not be contented to remain in a condition of tutelage while other provinces were obtaining a large measure of independence. It also aroused considerable apprehension. It was feared that if the opportunity were not seized, Burma might come to be ruled by an Indian Government largely controlled by Indian politicians. Perhaps the latter was the more powerful influence, for Burmans have always been strongly averse to having Indians placed in authority over them.

There are not a few reasons why the path to self-government may be expected in the long run to be smoother in Burma than in India. I have mentioned some of these in describing the character of the Burmese. Burma has no caste system and no religious cleavage. Her monastic institutions ensure the diffusion of a limited type of primary education. Her people readily adapt themselves to new conditions, and are not hidebound to custom. Her women are free and untrammelled. The masses are intelligent, and live up to a high standard of comfort. The people are so homogeneous that practically a single language will carry one throughout the country.

Nothwithstanding these favourable conditions, Burma is at present far behind India in fitness for self-governing institutions. In India the demand of the educated classes for representative self-government has been agitated for more than fifty years, which has resulted in a considerable development of political education. In Burma, until the publication of the Reform report, no Burman had ever dreamed of self-government for his country, nor had any indication been given that even the intelligentsia desired it. Political education in Burma is absolutely non-existent. In India the educated classes, though not forming a large proportion of the total population, are numerous. I have already commented on the backwardness of general education in Burma The standard of higher education is much lower in Burma than in India. The educated classes, such as they are, are very few in number, and most of them are in Government service, and therefore ineligible for the field of politics, for almost the sole object of education among the Burmese hitherto has been to obtain an appointment in the Services. There are English newspapers in Burma edited and managed by Englishmen, but the Burman Press has been entirely vernacular. Until constitutional reform was mooted, it confined its attention to religious matters, and contained no criticism of the action of Government. Not even in local public affairs have Burmans hitherto shown any interest. In respect of political development and general education the intelligentsia of Burma are at least fifty years behind the intelligentsia of India.

There are the considerations which the Lieutenant-Governor, Sir Reginald Craddock, had in view when he formulated his scheme for the first step to self-government in Burma. It gives a large measure of local self-government to both urban and rural tracts, provides a legislative assembly, on which all classes, communities, and interests are represented, mostly by election and partly by nomination, introduces all urban ratepayers and almost all rural taxpayers to the vote, and associates the people with the Executive Government by the appointment of nominated non-official chairmen to preside over boards for the conduct of business. The effect

of the scheme, if it comes into operation, will be to give to the representatives of the people a considerable influence, but no greater actual power, in shaping the policy of Government than was given by the Morley-Minto reforms in the most advanced provinces. The popular assembly will, in its first stage, be a school in which the art of politics may be learned, rather than an authority exercising any direct power of self-government. The scheme is a tremendous advance on all that is past. I believe that it satisfies the elders in Burma, but it by no means meets the aspirations of the Young Burma party, who ask for at least as large a measure of reforms as has been given in the most advanced of Indian provinces.

In what shape the scheme will emerge from the Government of India and the Secretary of State has not yet been determined. I do not blame Young Burma for its aspirations. It is in the essence of politics that there can be no progress unless there is an advance party asking for more than can be immediately granted. But wiser heads will reflect that there is danger in inordinate haste. It requires no great measure of education to exercise a vote, but if a party is to be entrusted with powers of government there must be in it a considerable leaven of men who possess general education and political experience. It is in this respect that Burma is at present behind India in its fitness for self-governing institutions. Burma has a hopeful future in the path of reform but she has a long leeway to make up, and the initial pace must necessarily be slower than in India.

MODERN CONCEPTIONS OF ART.

A process of denationalisation is taking place in all the arts. They are becoming internationalised. The theatre is growing cosmopolitan, so also literature. Each country welcomes to the boards of its stage, as to its bookshelves, the works of other nations. And this free-trade is based upon the recognition that the ideas and motives which form the basis of drama and literature of to-day are the common property of the age. Meanwhile the artists of each nation make some peculiar racial contribution to the common thought, which is thereby broadened and deepened.

Everywhere there still persists, with more or less vigour, the Academic or Classical conception of the "Ideal" motive, but it is more or less modified by the prevailing Naturalism. Everywhere the older conception of the Historical motive, as centred on the

history of the past, is yielding to pictures of actual life, which represent the history of the future in the making. A similar motive to render life as the artist sees it and feels it has banished the older form of genre, in which the painter invented humorous or "characteristic" situations, cast his play, trained his actors and staged the whole according to theatrical traditions Similarly it is no longer the fashion to invent landscapes, or to transform nature so as to make it conform to set principles of composition. The artist studies nature intimately, renders her natural appearances and interprets her moods. Equally, formal composition and set display have been eliminated from portraiture. The artist's motive is to seize and portray with straightforward directness the actuality of his subject.

In a word, Naturalism has become the basis of all modern art. On the other hand, artists build variously on this foundation. Some are satisfied to limit their portrayal to the externals of the facts, and do so in one of the two ways: either they will make much of the details of the facts, or they will seek to comprehend the totality of the facts and render the impression as the eye receives it at a single glance. But again, there are others, whose vision extends beyond the facts, who correlate the facts, as Millet did, to some larger issue or to some principle of life, who, in the new use of the word are Realists. And these again, may render their interpretation of life, with a reliance either upon details or upon impressionism. These Realists are practical idealists of the age. Meanwhile there are other idealists, distinguished alike from the latter and from the Academic Idealists, who as Puvis-de-Chavannes did, create a world of their own imagination and people it with creatures of their own spirit. It is a world transfigured, but not transformed; and its inhabitants are not far removed from it in the flesh and may be wholly one in spirit, with us. Puvis's work in the main was decorative, and it is to the decorative treatment of mural spaces that this more abstract rendering of the realities of life is specially adapted. For it thereby fits the peculiar character of architecture, which is abstract in the sense that it is not based, as are painting and sculpture, upon the more or less faithful representation of nature. The primitive builder may have derived certain hints from nature, and later the architect may have gained from the same source the suggestion of certain principles, such as the beauty of repitition, rhythm and so forth. But the art which he gradually evolved has no counterpart in nature; it is the creation of the artist's own imagination, adapting itself to the needs and conditions of life. Architecture being in this sense abstract, it is fit that the embellishments, whether of Sculpture or Painting should also be characterised by a certain abstraction, otherwise there is danger of a conflict of feeling. In a word, decoration should

not be independent of, but subordinated to the whole of which it is a part. These are main motives common to the whole of painting to-day.

In the modern age, the barriers are broken down between the various nations, art has been internationalised. And what is true of motive is no less true of technique. The various processes of painting have become the stock-in-trade of all artists, independently of nationality, for each anywhere to adopt whichever suits his temperament ; and with the knowledge that, should his personality be strong enough to originate a method of his own, it is liable to be adopted by others. In consequence of this free-trade in ideas and methods, the number of painters in recent years has enormously increased.

Thus the modern revival in Italy has for its prophet in Signor Fortuny, and the historical canvas is represented in the art of Francesco Michetti, while Giacomo Favretto and Tito Conti are the most conspicuous exponents of the *rococo*. On the other hand Naturalism, in its treatment of present-day life, is the motive of Ettore Tito and the figure-subjects of Luigi Nono, Telemacho Signorini and Alberto Pasini. But the most brilliant of all his contemporaries is Guiseppi Boldoni. A great deal of modern Naturalistic painting in Italy is characterised by a regard for the accurate representation of details and also by sentimentality.

But during the nineteenth century and after, France became more than ever the artistic leader of the modern world, and Paris, the clearing-house of numerous motives which from time to time asserted themselves as ruling principles. The Naturalistic and Impressionistic motives have been followed in quite recent times by the so-called Neo-Impressionistic. The leader of this departure was Gustave Courbet. He made no secret of his contempt for academic training and exercised a complete freedom from traditional standards in his attitude towards the old masters, Raphael, Botticelli, Giovanni Bellini etc. He asserted that it was ridiculous for a painter to portray a scene that he had not viewed with his own eyes ; that the only true scope of the painter's art was that which he had personally studied. He was followed in this Neo-Impressionistic movement by Meissonier, Lapage, Bavin and Ribot in France, by Millais, Rossetti, Hunt and Burne-Jones in England, and by Adolf Menzel, Wilhelm Liebel, Makart and Knaus in Germany and perpaps by Ravi Barma and Nanda Lall Bose in India.

GAURANGA NATH BANERJEE.

EASTERN BENGAL NOTES AND QUERIES.

EDITED BY

H. E. STAPLETON, I. E. S.

—:o:—

THE GHUGRAHATI COPPER-PLATE INSCRIPTION OF SAMACHARA DEVA AND CONNECTED QUESTIONS OF LATER GUPTA CHRONOLOGY.

BY

NALINI KANTA BHATTASALI, M. A.

(Continued from the previous number).

TOPOGRAPHY.

As already pointed out, Varaka Mandala was the name of the district, as is evident from such expressions as :— *tanniyuktaka Varakamandale Visyapati Pavittruka*, (the district officer appointed by him in Varaka Mandala was Pavittruka) *Varakamandala-visaydhikaranasy* (of the Court of the district of Varakamandala). Mr. Pargiter's conclusion as to the position of Varakamandala on the map is as follows :—

"There would thus have been a large region between the main stream or streams of the Ganges on the west, the Brahmaputra on the east and the sea on the south. Its northern limit was probably Baind ; that region no doubt constituted the Mandala or province of Varaka."

I am in substantial agreement with Mr. Pargiter and I think that he is right in thinking that Varendra is derived from the same root. The word Varaka is to be found in Sanskrit dictionary and it means, obstructing, opposing. I think the word Varaka should be taken to mean, an area of land lying between and separating two rivers ; *Mandala* means a Collection : and a group or collection of small areas lying between rivers would be the district of Varaka Mandala. Varaka may also be taken in the sense of the deltaic land that obstructs and alters the current of a river. Varaka mandala would then be a group of deltaic areas. In whichever sense it is taken, the meaning is the same and Varaka Mandala would be the tract represented by the modern districts of Faridpur and Backerganj, almost indentical with what was anciently known as Vanga.

Where was Navyavakasika, the provincial capital ? It was not in existance in the third year of Dharmmaditya when Sthanudatta was the Governor ; but the next governor Nagadeva had his headquarters at Navyavakasika, which from the very name appears to have been a recently founded town during the reign of Dharmmaditya, in the interval between the plate A and B published by Mr. Pargiter.

Up to the present time, we know of the following old sites, the antiquity of which dates from the time of the Guptas. (i) Paundravardhana, at present known as Mahasthan in the Bogra district. It has been an important place from

the dawn of history in India. As appears from the Damodarapura plates, it was the headquarters of a Bhukti in Gupta times, and the Bhukti continued to be called after Paundravardhana to the end of the Hindu rule in Bengal, though its area seems to have been much enlarged in the latter days. Gupta gold coins have been found from time to time in and about Mahasthan.

(ii) Kotivarsha, variously called Bangad, Sonitapura, Devakot,—known by the last name during the days of the early Muhammadan rulers. It was an old town, situated 14 miles south of Dinajpur. It was a district Head quarters in the Gupta period.

(iii) Kotalipara, which is at present a Pargana in the district of Faridpur. The old settlement was in and about the old mud-fort there, on the vicinity of which the Ghugrahati plate of Samachara Deva was found. Numerous gold coins of the Gupta emperors have been found outside the western *par* or embankment of the fort.

(iv) Sabhar in the Dacca district, containing imposing ruins of a traditional King called Harish Chandra. Numerous gold coins of the 'Imitation Gupta' type have been found from Sabhar. The place contains a fort probably about 300 yds. in length from north to south. A water course branches off from the river Bangsai about 2 miles above where the fort stands and after running behind the eastern part of the site of the old town, turns to the west and reenters the river just below the southern face of the fort. This canal, which is undoutedly in part artificial, is locally called *Katagang*, the dug-out river. The ruins of the royal palaces and temples are situated on the south east corner of this enclosure, outside this Kataganga.

(v) Karnna-Subarnna, capital of Sasanka, at present known as Rangamati or Kansona, about 6 miles south of Behrampur in the Murshidabad district. Gold coins of the Gupta type have been found from time to time from the vicinity, two of which are known to be of Vishnu and Jaya. (R. D. Banerjee. History of Bengal. Part I. P. 69. f.)

The ruins of Navyavakasika, unless it has since been completely diluviated must be identified with one of the five old Gupta settlements we know. *Avakasa* means an opening, an aperture, and its derivative *avakashika* may very well mean a *Khal*, a canal, a water course ; and the whole name *Navyavaka sika* would mean (the place provided with) a new canal. The name of Noakhali, the present head-quarters of the Noakhali district of Bengal, is almost a literal vernacular translation of the Sanskritic Navyavakasika. The proximity of the place to Kotalipara would lead one to suppose that this was the site of Navyavakasika ; but as far as I know, Noakhali is a modern place with nothing of antiquity about it. So we must try the known old sites enumerated above.

The famous sites of Paundravardhana

Kotivarsha and Karnna Subarna cannot be thought of, as they were famous enough in their known names to allow of the supposition that they ever changed their names for Navyavakasika. The head-quarters of the province in which Varakamandala was included cannot, moreover, have been so far away.

We have therefore no other option than to choose between Kotalipara and Sabhar.

Of these two sites, it is easy to prove that Kotalipara is the older one. Below we shall show that the fort at Kotalipara dates from a period previous to the Guptas, but the discovery of the gold coins of the Gupta emperors exclusively from this site and only coins of the Imitation Gupta type from Sabhar tends to show that former is the more ancient of the two. The gold coins discovered at Kotalipara may be noticed here and it should be borne in mind that, the coins that we have come across are only a fraction of those that have actually been discovered.

1. Gold coin of Chandra Gupta II discovered at the village of Guakhola, about three quarters of a mile west of the south-west corner of the fort at Kotalipara, in a field locally known as Sonakanduri. Wt. 127·5 gr. Diameter ·8. Now in the Dacca Museum Presented by Babu Nibaran Chandra Chakravarty.

Obverse:—King nimbate, looking to his right, a bow in the left-hand and arrow held near its head by the right. Standard surmounted by Garuda visible on the back-ground between the arrow and the king. Below the left arm, *Chandra* in letters arranged one above the other.

Reverse:—Goddess, nimbate, seated on a lotus throne, within a circle of dots partly preserved over the head. A flower with a long stalk in her left hand and a noose in the right. On the left margin of the coin, in a straight line, *Srivikramah*.

(2) Gold coin of Skanda Gupta found in the same place as No. 1. Wt. 142·3 Diameter ·86.

Obv. king nimbate, looking to his right; a bow hanging from the left wrist, right hand placed over the point of an arrow, the fingers slightly raised as if assuring *abhaya* (protection) The Garuda standard on his right, from which a banner is floating in the air. Below the left arm, *skanda*. To the right of the face the *y* of *tya* visible On the left margin *(pa)rahitakari (—)o*.

Rev. Goddess nimbate, sitting on a lotus seat, stalked flower in left hand, noose in the right. Legend on the margin, *Kramaditya*.

(Belongin to Babu Ramesh Chandra Sen. Head clerk, Madaripur Municipality)

(3) Gold coin of Skanda Gupta. Wt. 141·5 Diameter ·86.

Found in the same place as No. 1 and 2.

Obv:—Same as No. 2. *tyah* visible

on the right of the king's face. Legend on the left margin *(pa) rahitaka*......

Rev. Same as No 2.

Belonging to Hon'ble Sj. Ambica Charan Mazumdar of Faridpur.

N. B.—Another coin of Skanda Gupta found in the company of the above two was bought by Mr. H. E. Stapleton and is now in his possession.

(4) Gold coin of a king, unattributed. From Kayekha, about a mile east from the Kotalipara police station, at Ghagar. Presented to the Dacca Musem by Babu Madan Mohan Shaha of Tarashi.

Wt. 85·4 Gr. Diameter ·8. Gold much alloyed.

Obv. A circle of dots on the margin. King nimbate, looking to his right, bow in left-hand and an arrowhead or dagger in right. A slanting line in the extreme right of the coin represents the arrow on the coins of the Gupta emperors. The standard in the usual place, rises from a thick pedestal, surmounted, not as Allan supposes by a horse's head, but by a spiral with a hood like an elephant's trunk to the right. Below the left arm of the king, letters very distinct which look like স্ব. It is difficult to say what this curious lettering stands for. The top letter appears to be undoubtedly স *sa* but the addition below complicates the reading. It may be read স্ত, স্ধ, স্থ, সভ, সধ, সথ, স্ত, স্থ, স্হ, স্ব, but it is difficult to propose a definite reading. Greatest stress may be laid on the readings স্থ or স্হ but with very little gain.

The type is a degraded Archer Type of the Gupta coins, but the outlines of the king's figure are remarkably distinct. Some wavy lines denoting the underclothing of the king, and the dots forming the halo round his head are note-worthy.

Rev.:—Within a circle surrounded by a circle of dots, goddess standing with right side to the spectators, looking to her front. Eight armed; holding a tapering fruit on the palm of the natnral right hand, as if offering it to somebody in front. Dots on the two sides of the legs suggestive of a long garland (of skulls?) falling below the knee. On the left margin, badly preserved legend which appears to read Sudhanyá. Only half of the middle letter *dha* appears to have been preserved and it looks like a *ta*.

In J. A. S. B. 1910, P. 143, foot note, Mr. Stapleton notices this very coin or one like it, as having a clear স্থ beneath the king's left arm.

The following coins from Sabhar may also be noticed.

(5) Unattributed gold coin of degraded Archer Type of Gupta coins. Gold much alloyed.

Wt. 87-gr. Diameter ·84.

Obv.:—Very crude execution of the figure of a king looking right. Vestiges of a bow in the left hand. The right hand appears to rest on the hilt of a sword (point of an arrow?) planted on the ground. A miserable standard in the usual place. Circle of dots on the edge. Below the left arm, in very small

and rude letterings, what appears to be *Srikrama*.

Reverse :—The same goddess as in No. 4 above but very rude. Appears to have been struck twice. The king's side however, has the look of being cast. On the left margin scrawls like letterings. Found at Purána Bhatpara near Sabhar.

(6) Unattributed gold coin of very debased Gupta Archer Type. Gold very base, perhaps baser than the foregoing one. Nothing is distinct on the obverse which appears to have been cast. The Reverse shows the same type of goddess as the above two, but she seems to be only six-armed. The garland (of skulls ?) very prominent and hangs just above the ankle. Circle of large dots on both the sides. Wt. 86·9 Dmt. ·93. Found at Rajasan near Sabhar on the mound the south east of Kataganga.

(7) Unattributed gold coin of very debased Gupta Archer Type, but superior in design to No. 6 and like No 5 ; gold much alloyed.

Wt. 75 gr. Dmt. ·74 ; (smaller and lighter than any hitherto met with !)

Obv ; King nimbate looking to his right. The bow hardly touches the left hand. The right hand seems to be offering incense to an altar. The standard surmounted by a curious S-shaped head from which floats a banner. Beneath the right arm, there is a letter which appears to be *Sri*. c/f *Sri* in No. 5.

Rev. Six-armed goddess with garland, the two sides of which descend straight to the earth. The feet of the goddess point to her left. Legend on the left margin of which only the middle letter *dha* is recognisable. Circle of dots on both sides.

Found at Bhatpara to the north of Sabhar.

In order to attempt an attribution of these light-weight coins of Imitation Gupta type, let us take note of the other coins of this class noticed else-where.

ALLAN'S GUPTA COINS : P. 154.

(8) No. 620 Base gold, wt. 86·5 gr. Dmt. ·85. A dagger-like thing in the right hand of the king ; standard spiral-headed like our No 4. But a distinct *sri* to the right of king's face and a horse below his left arm. Eight-armed goddess on the reverse like No. 4. holding a tapering fruit in the natural right hand ; rude legend on the left margin, *Sudhanya*. The horse suggests a claim on the part of the King who issued the coin to universal sovereignty by the performance of a Horse-sacrifice.

(9) No. 621. Base gold. wt. 92·5 Dmt. ·85 ; standard the same as in above; King's right hand plucking at the arrow (or sword-hilt ?) on his right. The same eight-armed goddess on the reverse with the fruit in the natural right hand. The legend on the left margin more distinct and appears to read *Sri Sudhanyaditya*.

(10) No. 622. Base gold. wt. 81·7.

Dmt. ·85 ; similar to the above. Crescent between king and standard. Legend on the reverse *Sudhanya.*

Archaelogical Survey report. 1913-14. Mr. R. D. Banerjee, Notes on Indian numismatics. Page 258.

(11) Imitation Gupta coin of base gold, found with a coin of Sasanka and another coin, of Samachara Deva, as well as some silver coins of the Imperial Guptas near Muhammadpur in Jessore. wt. 83·3 grains Sec. ·9. Exactly like No. 8 above. Legend on the reverse, the same. Suggestive of a horse-sacrifice.

(12) Imitation Gupta coin of base gold found some-where in the Bogra district (in Mahasthan ?) and now in the possession of Babu Mrityunjoy Roy Chaudhury, Zeminder of Sadya puska-rini in the Rangpur district of Bengal. wt. 85 grains, diameter. ·9. The outline of the King's figure rather distinct, the execution of the bow in the King's left hand very good. A letter or monogram appears between the standard and the King's face. Mr. Banerjeee reads it as *pa.* A stroke like *ra* appears between the bow and the King's waist. The figure of the eight-armed goddess, in a circle within the circle of dots. Legend the same, *Sudhanya.*

J. A S. B. April, 1910. Pages 142-143 History and Ethnology of North-eastern India by Mr. H. E. Stapleton.

(13) Imitation Gupta coin of base gold. Found in Maneswar, in the western suburbs of Dacca Wt. 87·6 grains ; diameter ·8. No lettering on the obverse. The same eight-armed goddess on the reverse and apparently the same legend.

(14) Imitation Gupta coins of base gold ; provenance unknown. but probably some-where in the Dacca district. Exactly like No. 8 above. *Sri* between the King's face and standard, and horse below his left arm as in No. 8 and 11. The same eight-armed goddess on the reverse and apparently the same legend. Wt. 88·3 gr. Diameter. ·88.

History of Vikrampura (in Bengali) by Babu Jogendra Nath Gupta. 1st. ed. Page. 69.

(15) Imitation Gupta coin, of base gold. Wt. and measurement, not recorded. Appears to be like our No. (6).

(16) Imitation Gupta coin of base gold. Procured from Sabhar by Babu Birendra Nath Bose. Diamater about ·8 but weight not recorded. Like our No. 6, but a dwarfish figure appears below the King's left arm holding an umbrella over his head. So it is a sample of the 'Chhatra' type. Legend on the reverse similar to No. 6.

Allan (Sec. 127) is of opinion that these are undoubtedly ancient coins. 'These coins are connected by weight and by border of large dots with the coin of Sasanka illustrated on plate XXIV. 2. and must be dated about the middle of the 7th century A. D. We have considerable evidence that these are actual coins which circulated in

Eastern Bengal, probably about the 7th century A. D." Mr. Stapleton also is of opinion that they were Bengal coins of a somewhat later date than Skanda Gupta. (J. A. S. B. April, 1910. P. 143 Footnote).

The following comparative Study of the weight of the coins is interesting.

No. 4.	85·4	grains.
" 5.	87	
" 6.	86·9	
" 7.	75·	
" 8.	86·5	
" 9.	92·5	
" 10.	81·7	
" 11.	83·3	
" 12.	85	
" 13.	87·6	
" 14.	88·3	

It appears pretty clear from the above that these coins were struck on the 50 *rati* or half *Suvarnna* standard of a *rati* of about $1\frac{9}{10}$th grain *i. e.* an an original weight of about 95 grains. From Sasanka's coin referred to by Allan above, which weighs 85 grains and from a coin Kacha (Samudra Gupta) of debased gold, (I. M. C. Vol. I. P. 102. Kacha No. 2. Footnote No. 2) which weighs 87·4, it appears that the standard was not unknown but very seldom used. The coin of Sasanka seems to have been the immediate prototype of these coins. The following facts regarding these coins may be emphasised.

(a) These were undoubtedly Bengal coins, and had circulation only in Bengal.

(b) They are connected by weight, border of large dots on the two sides, and the figure of the eight-armed standing goddess looking to her left, on the reverse ; consequenty they were issued by the same family or in the same period.

(c) They connot be attributed to any of the Imperial Guptas, even to the last kings of the line, or to Samachara Deva or Sasanka. The crude excution and the figure of the goddess on the reverse, the uniform light weight,—all tend to this.

(d) They imitate Gupta coins and were probably issued by a family who had veneration for Gupta traditions and meant to keep them up. The spiral standard in place of the Garuda standard and the substitution of the eight-armed goddess on the reverse show however that the family was altogether different from that of the Imperial Guptas.

(e) They were not issued by the Palas or Senas of Bengal, as. apart from the fact that no coins that can be attributed to them are hitherto known, no one of these coins except the one illustrate in the History of Vikramapura (Found in Rampal. the ancient capital of the Senas) was found near the ancient seats of the Palas or Senas. Moreover it is not probable that these coins are so late.

(f) They cannot be attributed to Harshavardhana, as his coins are known and these coins do not resemble them in any way.

(g) The Horse-sacrifice class of these coins was evidently issued by a king, who claimed paramount power and had celebrated a horse sacrifice.

(h) One of these horse-sacrifice coins was found with both a coin of Sasanka and one of Samachāra Deva, and judging from the debased character of the inscription, it must have been issued by a king who claimed paramount power and who had celebrated a horse-sacrifice *after* the disappearance of Harshavardhana and Sasanka from the political arena.

The only reasonable conclusion that can be deduced from the above points is that the dynasty that satisfies all these conditions is the Gupta dynasty of Magadha whose first king Aditya Sena Deva, rose to paramount power in East India immediately after the death of Harshavardhana and celebrated a horse sacrifice. The Deoghar inscription which mentions this king (Fleet P. 213) though much later in date, is evidently based on a contemporary inscription and appears to record a genuine tradition about him. It says that Aditya Sena was the performer of the Aswamedha and other sacrifices. That he having returned from the Chola country, performed three Aswamedha sacrifices and consecrated a temple at the expense of three lakhs of *tankakas* of gold.

The origin of the Gupta kings of Magadha is traced from one Krishna Gupta in the Apshad Inscription of Aditya Sena (Fleet No. 42). This line had matrimonial alliances with the Vardhana and the Maukhari kings, Prabhakara Vardhana being son of Mahasena Guptā sister of Mahashena Gupta. Mahashena's son was Madhava who threw in his lot with his nephew Harshavardhana and Madhava's son was Aditya Sena. Krishna Gupta, 8th in ascent from Aditya Sena, has been sought to be identified with Govinda Gupta (R. D. Benerjee, History of Bengal Part I. P. 76) second son of Chandra Gupta II ; but except that the name Krisha and Govinda are synonimous and the fact that the time of Krishna Gupta may be pushed back to the time of Govinda Gupta, there is no other ground for the identification.

The Deoghar inscription says that Aditya Sena spent three lakhs of gold *tankakas* in consecrating a temple. The meaning of the word *tankaka*—is given in the dictionary as,—"a stamped coin, especially of silver." "A weight of silver equal to four *mashas*." Four mashas are equal to only 32 *ratis*, or about 56 grains, the standard weight of the punch-marked silver coins of India. The gold coins of the Imitation Gupta type were of course heavier, but the use of the word *tankaka*, ordinarily employed in case of silver coins, in saying that three lakhs of *gold tankakas* were expended, probably shows that the writer tried to denote these light-weight gold coins current during the time of the Guptas of Magadha and

it was, perhaps by this name that these coins were known in contemporary times.

We have tried to ascribe these light-weight imitation Gupta coins to the Guptas of Magadha and the fact that these only and not the earlier issues of the Imperial Guptas are found at Sabhar, makes the site less old than Kotalipara and so it would seem to suggest Sabhar as the place that may be indentified with Navyavakasika. The word Sabhar, a corruption of Sambhara means, Fullness, Wealth, Affluence. A visit to the site will convince any one that it was a well-planned city of very great affluence surrounded by an artificial water-course. The latter might have been the cause of its name Navyavakasika, while its subsequent oppulence and splendour earned for it the name of Sambhara—"Wealth and plenty materialised."

Kotalipara is at present surrounded on all sides by big marshes extending over scores of miles and it is inconceivable that any sane man could think of a royal settlement in such a water-logged area. But, the big fort is there, and brick constructions very often come up unexpectedly from low, water-logged places. The truth has been guessed by Mr. Pargiter and others that the low level of Kotalipara is the effect of subsidence due to earth-quake. It is not difficult to guess when this subsidence took place, when we find a new town springing up during the reign of Dharmmaditya, which does not seem to have existed in the 3rd year of the same King. The presumption is that, about the 5th or the sixth year of the reign of Dharmmaditya, owing to an earthquake, marshes began to form round Kotalipara which had been a flourishing royal settlement for the past two centuries and a half, and necessity was felt for shifting the gubernatorial head-quarters to some new and safer site on more settled land Nothing better could probably be chosen at that time than the site of Sabhar, standing on practically the southern-most limit of red laterite soil, nearest to Kotalipara, and the remains of this new city still excite everybody's admiration. Kotalipara continued as a district Head-quarter, but the value of its land decreased, so much that we find almost a whole village, which is described as having long lain follow in Samachara Deva's plate, given away to a Brahmin for no consideration.

The **land** granted by the Ghugrahati Plate was in a village called *Vyaghra Choraka*. Three Kulya-sowing areas of land were taken away from it and the rest of the hamlet was given to the donee. The boundary indications of the land granted are thus given : on the east, the Goblin-haunted Parkkati tree. On the south, Vidyadhara Jotika On the west, a corner of Chandra Varmma's fort. On the north the boundary of the village Gopendra Choraka.

The mention of Chandra Varmma's

fort which cannot be any other place than the big fort at Kotalipara, helps to locate the exact situation of the land granted to Supratika Swami by the Ghugrahati Plate. Settlement was denser to the south-western corner of the fort, inside and outside the corner, and it is in this locality that the gold coins are found. Land that had long lain fallow cannot be inside the ramparts of the fort, especially when the north-western and the south-western corners appear to have been well-inhabited. So the land must have been outside the ramparts, on the west of either the north-eastern or the south-eastern corners.

The absence of any landmark near the south-eastern corner, and the proximity of the village of Govindapur to the north-eastern corner, at once leads us to decide in favour of the north-eastern corner as the place, outside which land was given to Supratika Swami.

By the courtesy of Mr. J. T. Rankin, I.C.S., Commissioner of the Dacca Division, I had the opportunity of visiting the locality on the 29th June, 1920 and I have gathered the following details. The corner is locally known as *Bujruger Kona* or the Learned man's or the Magician's corner from a certain *Bujrug* who had made the place his residence. The ramparts at this place are about 15 feet high from the surrounding fields and appear still higher from the canal outside. The breadth of the rampart is here as great as 150 yds.

About half a mile to the north-west from the corner, there is an forsaken homestead with a tank, and big trees on its banks, which is called Jatiabadi, or Jatia's house, and it is traditionally remembered to have been the residence of one Vidyadhara and his wife Jatia-Budi (i. e. the old woman with matted locks). The place is notorious among all the villages round as a haunt of ghosts. By the north bank of the tank at Jatiabadi. there runs east-west, two curious parallel embanked roads at a distance of some yards from each other. I asked the villagers the necessity of having two roads close to each other and they told me that one was meant for the King and his officers and the other for the common people. This double road, what-ever may have been its purpose, appears to have been denoted by the term Jotika or two roads placed together. The village of Govindapur begins a little north of this place and this was no doubt the Gopendra Chorka of the plate, the words Govinda and Gopendra being synonimous.

The boundary indications were of course the prominent landmarks on the site, through which straight lines drawn north and south or west and east would be the boundaries. This is plain from the fact that a tree is mentioned as a boundary of a very considerable plot of ground. The land granted to Supratika Swami then appears to have been situated as in the sketch annexed.

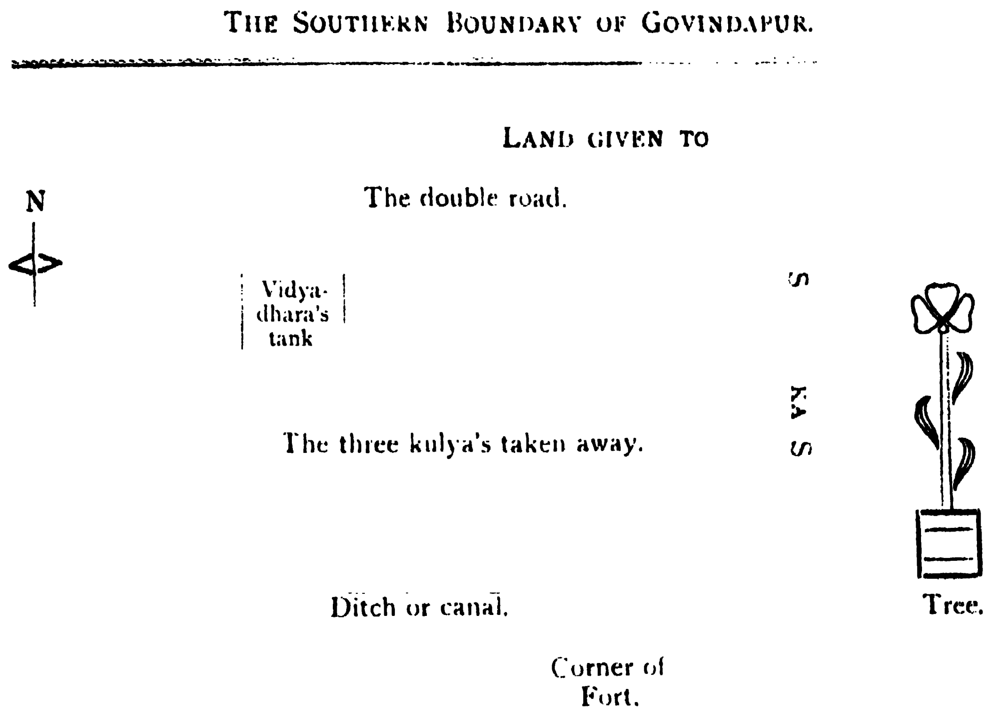

Sketch of the land granted to Supratika Swami by the Ghugrahati plate.

By this arrangement, a portion of the land granted is left without any southern boundary and another portion without any western boundary, but I cannot by any other arrangement account for the Jor Jangal (or the double road,) being north from the corner of the fort. If Jotika could mean a canal, and the canal, going straight east from a little distance south of the corner be connected with Vidyadhara, we could have a clean plot of land with well-marked boundaries.

It may be noted here that the name of Silakunda and Silakunda *grama* occurs in the 1st and the 3rd plate published by Mr. Pargiter. They are evidently the Sailadaha river and the village of Sailadaha on it, some miles to the south of Kotalipara, and now just within the Backerganj district.

The last point in connection with the plate of Samachara Deva is the mention of the fort as that of Chandra Varmman. Who is this Chandra Varmman, who was still remembered in his handi-work, the fort at Kotalipara even in the time of Samachara Deva? This fort, which measures 2½ × 2½ miles, is the biggest earthwork known in Bengal, the next in size being that at Mahasthan which is only 1000 yds. × 1500 yds. Who was this Chandra Varmman who was so powerful as to construct so large a fort, in this low-lying tract, from the vicinity of which coins of Gupta Emperors are constantly discovered? We are at once reminded of the Chandra of the Meherauli pillar inscription who "when warring in the Vanga countries, kneaded and turned back with his breast the enemies who uniting together came against him, and thus wrote fame on his arms by his sword." (Fleet. p. 141) Fleet emphasised the early character of the paleography of this inscription which is not dated, and Allan with his usual insight has rejected the identification of this Chandra with Chandra Gupta II. Finally M. M. Haraprasad Sastri has identified this Chandra with Chandra Varmman, son of Simha Varmman of Pushkarana, of the Susunia Hill inscription,—Chandra Varmman who was finally overthrown by Samudra Gupta about the 3rd decade of the 4th Century A.D. When we see that a most impressive monument in the shape of a great fort, to which Chandra Varmman's name is applied, even in the 6th Century is found at Kotalipara near the heart of old Vanga, we are finally convinced that these scholars are right in identifying the Chandra of the Meherauli pillar inscription who came and warred in Vanga as Chandra Varmman, of whose advent in Bengal we have now tangible proof in the shape of the great fort known after him. Chandra Varmman's campaigns in Bengal and the foundation of the fortified settlement at Kotalipara* may be approximately dated about 315 A.D.

* Kotalipara means the *para* or hamlet founded on the *ali* or ramparts of the *kot* or fort.

Several printing mistakes having occured in the reading of the Ghugrahati plate, as printed in the beginning of this essay, a corrected version in bigger type is printed here.

TEXT.

Obverse.

১। সিদ্ধিরস্তু। স্বস্ত্যাস্যাম্পৃথিব্যামপ্রতিরথে নৃগনহুষযযাত্যম্বরীষ সম

২। ধৃতৌ মহারাজাধিরাজশ্রীসমাচারদেবে প্রতপত্যে তচ্চরণকরল'

৩। যুগলারাধনোপাত্ত নব্যাবকাশিকায়াং সুবর্ণবীথ্যাধিকৃতান্তর

৪। ঙ্গ উপরিক জীবদত্তস্তদনুমোদিতক বারকমণ্ডলে বিষয়-

৫। পতি পবিত্রুকো যতোস্য ব্যবহ'রতঃ সুপ্রতীকস্বামিনা জ্যেষ্ঠাধি

৬। করণিক দামুকপ্রমুখমধিকরণন্বিষয়মহত্তর বৎস

৭। কুণ্ড মহত্তর শুচিপালিত মহত্তর বিহিতঘোষ শূরদ [স্তু]

৮। মহত্তর প্রিয়দাস্ত[6] মহত্তরজনার্দ্দনকুণ্ডাদয়ঃ অন্যেচ

৯। বহবঃ প্রধানা ব্যবহাণশ্চ[7] বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছাম্যহং ভবতা[8] প্রসা[9]

১০। দাচ্ছিরো[10]বসন্নখিলভূখণ্ডলকং বলিচরুসত্র প্রবর্ত্তনায়[11]

১১। ব্রাহ্মণোপযোগায় চ তাম্রপট্টীকৃত্য তদর্হথ প্রসাদকস্তু[12]

১২। মিতি যত এন[13] দত্যার্থনমুপলভ্য শংথো[14] পরিলিখিতা

Reverse.

১৩। স্ত্যৈবর্ব্যবহারিভিঃ সম্মৃত্য[15] সাবটা[16] শ্বাপদৈর্জুষ্টা রাজ্ঞোধর্ম্মর্থ[17] নিষ্ফলা

১৪। যা[18] তু ভোগ্যীকৃতা ভূমি নৃপস্যৈবার্থ ধর্ম্ম কৃ[19] তদস্মৈ ব্রাহ্মণা[20] দায়ত্তামি

১৫। ত্যবধৃত্য করণিক নয়নাগ কেশবাদীন্কুলবারান্প্রকল্প্য প্রাক্তাম্রপট্টী

১৬। কৃত ক্ষেত্রকুল্যবাপত্রয়ং মপাস্য[21] ব্যাঘ্র চোরকো[22] যচ্ছেষং তচ্চতুঃসীমা

১৭। লিঙ্গা[22] নির্দ্দিষ্টং কৃত্বাস্য সুপ্রতীক স্বামিনঃ তাম্রপট্টীকৃত্য প্রতিপাদিত(ং)

১৮। সীমা লিঙ্গানি চাত্রঃ[24] পূর্ব্বস্যাং পিশাচপর্ক্কট্টি দক্ষিণেন বিদ্যা

১৯। ধর জোটিকা পশ্চিমায়াং চন্দ্র বর্ম্ম[25] কোট কোণঃ[26] উত্তরেন[27] গো

২০। পেন্দ্রচোরকগ্রামসীমাচেতি ॥ ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ষষ্ঠিম্বর্ষসহ

২১। স্রানি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা বা তান্যেব নরকে বসেত্

২২। স্বদত্তা[28] ম্পরদত্তাম্বা যো হরেত বসু[29] ন্ধরাং স্ববিষ্ঠায়া[30] কৃমিভূত্বা[31] পিতৃভি[32]

২৩। সহ পচ্যতে ॥ সম্বত ১০ ৪ কার্ত্তি দি ২[33] ॥

IN AN OLD HOUSE.

Did you see them yesternight,
When the moon was shining clear,
Flinging silver ribbons wide
From the earth to Out-o'-sight,
Did you see them,—did you hear
Softest footsteps close beside ?

In the sombre corners dim
Where the shadows group and lie,—
Were they there ?—a company
Never terrible or grim,
Dear dead folk of days gone by.
Did you hear them,—did you see ?

Hush ! the rustle of a skirt !
Hark ! a laugh of merriment
Light and mellow,—then a sigh.
Tender whispers (little flirt !)
Winging through the silence went,
Did you hear them ? So did I !

You may see them any night
When the moon is shining clear,
Flinging silver ribbons wide
From the earth to Out-o-'-sight ;
If you listen you may hear,
Hear them passing close beside.

CECIL LEIGH.

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

১০ম খণ্ড ঢাকা—আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩২৭। ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা।

"কৃষ্ণকান্তের উইল"।

কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রথম নয় পরিচ্ছেদ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' কাগজখানিই উঠাইয়া দেন। এক বৎসর ঐ পত্রিকার প্রচার বন্ধ করিবার পর, উহা সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় পুনঃ প্রচারিত হয়। ঐ সময় হইতে কৃষ্ণকান্তের উইল আবার মাসে মাসে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়া সম্পূর্ণ হয় এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদর্শনের প্রথমপর্য্যায়ে "কৃষ্ণকান্তের উইলের" যে নয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়, গ্রন্থাকারে পুনঃ প্রকাশিত হইবার সময় উহার অনেক অংশ বর্জ্জিত, পুনর্লিখিত ও সংশোধিত হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের প্রায় সবটাই রোহিণীচরিত্রসম্পর্কে। এতৎসম্বন্ধে কয়েকবৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল শাস্ত্রী একটি প্রবন্ধ লিখেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিম রোহিণীচরিত্রে যে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার (রোহিণীর) কলঙ্কিত জীবনের কাহিনীও আমাদের মনে সহানুভূতি জাগাইয়া দেয়। * সংশোধিত "কৃষ্ণকান্তের উইল" রোহিণী যে কাহারও চিত্তে সহানুভূতির উদ্রেক করে বর্ত্তমান লেখকের সে ধারণা নাই, কিন্তু বঙ্গদর্শনে উহার চরিত্রে অনাবশ্যকরূপে মসীলেপন করা হইয়াছিল। পাপীকে উৎকটরূপে বীভৎস করা পুরাণের রীতি—কাব্যের রীতি নহে। বঙ্কিম যথার্থ কাব্যের রীতি অনুসরণ করিয়া পাপের যতটুকু চিত্র দেখাইলে আখ্যায়িকার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ততটুকু দেখাইয়াছেন—রোহিণীর মনের আবরণ যতটুকু উন্মোচন করিলে তাহার স্বরূপ বুঝা যায় এবং তাহার ব্যবহারে পূর্ব্বাপরসামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, তাহার অধিক উন্মোচন করেন নাই। পাপের চিত্রে পরি-

* শরচ্চন্দ্র ঘোষাল শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ শচীশবাবুর "বঙ্কিম জীবনী"তে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মাণাধিক মসী ঢালিয়া দিলে রসজ্ঞ পাঠকের অধস্ততা বাড়ে না, চিত্রকরের রসবোধহীনতাই ধরা পড়ে।

কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রধান বিশেষত্ব উহার রসানুগুণ বস্তুতন্ত্রতা। এই আখ্যায়িকায় কোনও চরিত্রেই কল্পনা-মাত্রগম্য কোনও আদর্শলোক হইতে ধার করা আলোক-ছটা প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করা হয় নাই, তথাপি ইহা কেমন অনবদ্য! কেহ কেহ এই আখ্যায়িকাখানিকে বাঙ্গালী পরিবারের একখানি নিখুঁত ফটো বলিয়াছেন, আমরা তাহা বলি না। ফটো-মাত্র হইলে ইহাকে সুন্দর বলিতাম না। চিত্রশিল্পরূপে ফটো যে সুন্দর বস্তু নয় পরন্তু অতি কুৎসিত বস্তু, আমাদের দেশে চিত্রকলার এই ঘোরদুর্দ্দিনেও আশা করি ইহা অনেকেই বোঝেন। যাঁহারা realismএর বা বস্তুতন্ত্রতার দোহাই দিয়া উপন্যাসে বৈচিত্র্যহীন, রসহীন, প্রাকৃত বা গ্রাম্য বস্তুর অবতারণা করেন তাঁহাদিগের কৃতি নামতঃ বস্তুতন্ত্র হইলেও ফটোর ন্যায় প্রাণহীন, অসত্য, কুৎসিত। রসই চিত্র ও কাব্য উভয়ের প্রাণ, উভয়ের সার-সত্য, সার-সৌন্দর্য্য। রসের অভাবে উভয়ই অসত্য ও কুৎসিত। কৃষ্ণকান্তের উইলের আখ্যানবস্তুতে কোনও অসাধারণ বা অলৌকিক বা অতিরিক্তমাত্রায় কাল্পনিক ঘটনায় সমাবেশ নাই—ওরূপ ঘটনাবলী আমাদের আশে পাশে প্রায় নিত্যই ঘটিতেছে; উহার কোনও চরিত্রে অসাধারণ গুণগ্রামের বা অসাধারণ দোষরাশির সমাবেশ করা হয় নাই, তথাপি পূর্ব্বাপর সর্ব্বত্র সমুন্নত ছন্দস্ততা, পরিমাণসামঞ্জস্য, ভাবব্যঞ্জকতা, রসোদ্বোধকতা-প্রভৃতি গুণের সদ্ভাবে উহা এমন অপূর্ব্বরূপে চমৎকার-জনক হইয়াছে।

বস্তুতঃ idealism ও realism সম্পর্কে সমালোচক-গণের মধ্যে যে কলহ তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে নিতান্ত মূল্যহীন বলিয়া বোধ হয়। সৌন্দর্য্য তথা-কথিত "idealistic" বা "realistic" কোনও পক্ষেরই একচেটিয়া নয়। সৌন্দর্য্যহীন আদর্শ আদর্শনামবাচ্য নহে; উহা যতই চক্‌চকে হউক ঝুঁটা পাথর। সু-রুচিশালী পাঠকের কাছে উহার কৃত্রিমতা, অসত্যতা, সুতরাং কুৎসিততা, সহজেই ধরা পড়ে। আবার realismও চমৎকারিতাবিবর্জ্জিত হইলে অসত্য, গ্রাম্য ও অসুন্দর হয়। কাব্যে বা চিত্রে realism এর জন্যই realism বাঞ্ছনীয় নহে; idealismও কেবল idealএর খাতিরে আদরণীয় নহে, সত্যে ও সৌন্দর্য্যে উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা চাই। অবশ্য সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে সাধারণের রুচি ও সংস্কার যুগে যুগে (পরিবর্ত্তনশীল সমাজের সাময়িক অবস্থাদি দ্বারা অনেক পরিমাণে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরুণ) পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু তথাপি সৎসাহিত্যের ঐকান্তিকতা, যাথার্থ্য, বৈশদ্য, ব্যাপকতা, অন্তর্দৃষ্টিনৈপুণ্য প্রভৃতি কতকগুলি চিরন্তন ধর্ম্ম আছে যাহাদের অভাব হইলে বা রীতিবিশেষের নিষ্প্রতিভ অনুশীলনে বিকৃতি ঘটিলে, কেবল একটা সাময়িক ফ্যাসনের খাতিরে কিছুই আদরণীয় হইতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়।

সে যাহা হউক,—যাহা বলা হইয়াছিল—যাহাকে আমরা পূর্ব্বে idealism নাম দিয়া আসিয়াছি কৃষ্ণ-কান্তের উইলে যে তাহা নাই তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। Idealism এর পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকান্তের উইলে আছে intensity বা তীব্রতা—ভাবের তীব্রতা, রসের তীব্রতা, ঘটনাসমূহের সঙ্ঘটনপ্রক্রিয়ার তীব্রতা বা দ্রুততা। বঙ্কিমচন্দ্র কোনও আখ্যায়িকায়ই চরিত্রের ক্রমবিকাশপ্রদর্শন করা স্বীয় কর্ত্তব্য মধ্যে গণনা করেন নাই; তিনি এমন কতকগুলি পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন যাহাদের রুচি বা চরিত্র পূর্ব্বেই একরূপ গঠিত হইয়া গিয়াছে, তার পর তাহাদিগকে ঘটনাস্রোতে আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা লইয়াছেন, কাহাকেও বা তলাইয়া দিয়াছেন, কাহাকেও ভাসাইয়া রাখিয়াছেন, কাহাকেও বা তলাইয়া যাইতে যাইতে উঠাইয়া লইয়াছেন, এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব অতি স্বাভাবিক ও সুসঙ্গতরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। সেক্ষপীয়রের নাটকগুলিতেও ঐ রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। ম্যাক্‌বেথের চিত্তে গোড়াতেই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ অঙ্কুরিতপ্রায় দেখা যায়, লিয়রকেও গোড়া হইতেই অভিমানী, স্নেহাকাঙ্ক্ষ ও যেন কিছু স্বৈরাচারী দেখিতে পাই, রোমিও গোড়াতেই প্রেমে আত্মহারা। সে যাহা

হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল ও রাজসিংহে ঐ ধর্ম্মগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। শেষোক্ত তিনখানি উপন্যাসে আবার ঘটনাস্রোত বড় দ্রুত ও উহার আবর্ত্ত বড় তীব্র। তন্মধ্যে চন্দ্রশেখরে ঘটনার দ্রুততাই আছে, ভাবগত দ্রুততা তেমন স্পষ্ট নহে; অন্ততঃ ভাবগত দ্রুততা বা তীব্রতা হইতে ঘটনার দ্রুততা সঙ্ঘটিত হয় নাই, বাহ্যকারণপরম্পরায় যেন হঠাৎ ঘটনার দ্রুততার সঙ্গে ভাবের দ্রুততা আসিয়াছে। শৈবলিনী প্রতাপকে বাল্য হইতে ভালবাসে, তাহার জন্য মরিতেও গিয়াছিল, তারপরও তাহাকে বহুদিন দেখিয়াছে। ফষ্টরের পুরন্দরপুর ত্যাগের আদেশ হঠাৎ না আসিলে হয়ত সে সহসা চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাতি করিতে আসিত না, অন্য উপায়ে তাহাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত। ডাকাতি না হইলে শৈবলিনীও হয়ত প্রতাপকে পাইবার দুর্লোভে ফষ্টরের সাথে ঘরের বাহির হইয়া পড়িত না। বাহ্য (রাজনৈতিক) কারণেই ফষ্টরের ডাকাতি; তার পরেও যত ঘটনা সবই ঐরূপ বাহ্য (রাজনৈতিক) কারণেই ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক ঘটনাচক্রই শৈবলিনীকে অমন তীব্রবেগে ঘুরাইয়াছে, দলনীকে নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত করিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে হরলালের সহিত উইলচুরীর পরামর্শে রোহিণীর বৈধব্যের অনুপযোগী মনোভাবের প্রথম পরিচয় পাইলাম, তৎসঙ্গে বঙ্কিম তাহার আরও কয়েকটি দোষের কথা বলিয়া দিলেন। তার পর হঠাৎ একদিন তার বারুণী-পুষ্করিণী হইতে জল আনার পথে কোকিল ডাকিল, সেই দিনই মনে ভ্রমরের প্রতি ঈর্ষ্যা জন্মিল, সেই দিনই সে গোবিন্দলালের মুখে সহানুভূতির কথা শুনিল, সেই দিনই কলসীতে, আর কলসীর জলেতে, আর রোহিণীর বালাতে, আর রোহিণীর মনের মধ্যে পরস্পর কথোপকথনে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, "উইল চুরি কাজটা ভাল হয় নাই।" তার পর যাহা ঘটিল, সবই বড় দ্রুত। তার মরণের চেষ্টা দ্রুত, গোবিন্দলালের মোহসঞ্চার তত দ্রুত না হইলেও কম নয়, ভ্রমরের প্রতি বিরক্তিটা খুবই দ্রুত, ভ্রমরের অবিশ্বাস দ্রুত, অভিমান বড় দ্রুত, বড় তীব্র; বুড়া কৃষ্ণকান্তের অস্থির উইলও বড় দ্রুত। কোন্ ঘটনা দ্রুত নয়?— রোহিণীর মরণ পর্য্যন্ত দ্রুত—অতি ভয়ানকরূপে দ্রুত।

রাজসিংহে যে ভাবগত দ্রুততা তাহাও বাহ্য ঘটনা-পরম্পরাদ্বারা নিয়মিত। ভাবগত তীব্রতাদ্বারা বাহ্য ঘটনাসমূহের দ্রুততা সম্পাদিত হয় নাই। রাজসিংহের প্রতি চঞ্চলকুমারীর অনুরাগ গভীর হইলেও দ্রুত নহে, সে যাহা হউক, দাম্ভিক ও রাজপুতগণের চিরশত্রু ঔরঙ্গজেব ছলনাপূর্ব্বক চঞ্চলকুমারীর পাণিপ্রার্থী না হইলে চঞ্চলের অনুরাগকথা এত দ্রুত রাজসিংহের কাণে পৌঁছিত না। কিন্তু এ বাহ্য কারণের আঘাতে চঞ্চল দ্রুত অবলাসুলভ ব্রীড়া জয় করিয়া রাজসিংহকে চিঠি লিখিল, তার পর যত ব্যাপার তাহাও যেন বাহ্য ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনেই দ্রুত ঘটিতে লাগিল, রাণা দ্রুত আরাবল্লীপর্ব্বতে গুপ্ত অভিযান করিতে বাধ্য হইলেন, নির্ম্মল অতি দ্রুত মাণিকলালের পাছে ঘোড়ায় চাপিয়া বসিল, মবারকও দ্রুত মরিল, বাঁচিল, আবার মরিল। বাহ্য ঘটনার আঘাতেই অত দ্রুত "শাহজাদী ভস্ম হইল।"

কৃষ্ণকান্তের উইলে ভাবগত তীব্রতা প্রায় সকল পাত্রেই লক্ষ্য করিবার যোগ্য। হরলাল গোঁয়ার, দুর্দ্দান্ত, দুর্ম্মুখ; সে অন্যায্য হইলেও একা সমগ্র সম্পত্তির আট আনা চায়, না দিলে বিধবাবিবাহ করিবে বলিয়া পিতাকে ভয় দেখায়। পিতাটিও আবার পুত্রের উপর রাগ করিয়া তাহাকে ত সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিলেনই, পৌত্রটিকে মাত্র এক পাই অংশ লিখিয়া দিলেন। গোবিন্দলালের চরিত্রগত কলঙ্কের কথা কৃষ্ণকান্ত পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও শাসন করেন নাই, সতর্কও করেন নাই, ভ্রমরকেও পিত্রালয় হইতে আনান নাই; হঠাৎ শেষ মুহূর্ত্তে এমন একটা কাজ করিলেন যাহাতে তাহার অভীষ্ট ত মোটেই সিদ্ধ হইল না, পরন্তু গোবিন্দলালের মায়ের মনে ঈর্ষ্যা জন্মিল, গোবিন্দলালের ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে লইয়া পলাইবার একটা ছুঁতা জুটিয়া গেল, ভ্রমরের সাজান বাগান শুকাইল।

রোহিণীর অনেক দোষ, সে মুখরা, নির্লজ্জা, হঠকারিণী, রিপুনির্জ্জিতা। হরলাল তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত জানিয়াই সে উইল চুরী করিতে গেল।

বঙ্কিম তাহার বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি অভ্যাসের কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহার কুপ্রবৃত্তি-গুলি তাহার মনটাকে বহু পূর্ব্ব হইতে বারুদের ঘর করিয়া রাখিয়াছিল, তাই বারুণী পুষ্করিণীর তীরে গোবিন্দলালের একটা সহানুভূতিপূর্ণ কথার স্ফুলিঙ্গে সে বারুদের ঘর জ্বলিয়া উঠিল, কুলশীল নিঃশেষ দগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু কাম প্রেম নহে, তাই কাম্যজনকে আয়ত্ত করিয়াও চরিতার্থতা ঘটিল না। তাই প্রসাদপুরে অপরিচিত নিশাকরের সঙ্গে প্রথম দেখাতেই "তাকাতাকি আঁচাআঁচি" হইয়া গেল। পাপের পথে পতনের নিম্নতম সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই।

রোহিণী দেখিয়াছিল যে নিশাকর রূপবান্—পটোল-চেরা চোক। রোহিণী দেখিয়াছিল যে মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে সে গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাস-হন্ত্রী হইবে না—কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা—আর এ আর এক কথা।* বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়া-ছিল, অনবধান মৃগ পাইলে কোন ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া শ্রেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী তাহাকে জয় করিতে না কামনা করিবে? বাঘ গরু মারে—সকল গরু খায় না। স্ত্রীলোকও পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্য মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়। অনেকে পাখী মারে—কেবল মারিবার জন্য—মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শীকার কেবল শীকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে। জানি না তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেই। †

নদীর ঘাটে নিশাকরের সঙ্গে রোহিণীর সংক্ষিপ্ত কিন্তু নিতান্ত নির্লজ্জ আলাপের কথা আর বিশেষভাবে উল্লেখ করিব না। কেন না সে অবস্থায় তাহার কাছ হইতে কেহ লজ্জা আশা করে না। কিন্তু মোটের উপর নির্লজ্জ-তায় বুঝি রোহিণী মতিবিবিকেও পশ্চাতে ফেলিয়াছে। মতির প্রাণে নবকুমারের প্রতি যথার্থ প্রেম জন্মিয়াছিল, কিন্তু রোহিণী কি গোবিন্দলালকে যথার্থ ভালবাসিয়াছে? অবশ্য উভয়ের অবস্থার প্রভেদ আছে; মতি বহুপুষ্পে সঞ্চরণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া শান্তির আশায় স্বীয় স্বামীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আর গোবিন্দলাল রোহিণী-মধুকরীর প্রথম পুষ্প। সে ভাবিতেছিল আর একটা পুষ্পে নাই বা বসিলাম, কিন্তু পাখাজোড়া যখন আছে তখন তার চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতে দোষ কি? মতির আগ্রা-জীবনে কোনও একটা পুষ্পের উপরে অনুরাগের ভাণ দেখি না। গোবিন্দলাল যখন বাক্স হইতে পিস্তল বাহির করিয়া রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, মরিতে পারিবে?" সে ভাবিল, "মরিব কেন,? না হয় ইনি ত্যাগ করুন।" কিন্তু ইহার পরই যখন সে ভাবিতেছে, "ইঁহাকে কখনও ভুলিব না, ইঁহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাকে মনে করিব সেও ত এক সুখ" তখন সে আত্মপ্রতারণা করিতেছে; নিজের মনে মনে গোবিন্দলালকে ভাল- বাসার ভাণ করিতেছে। তাহার প্রাণের আসল কথা "মরিব না, মারিও না, চরণে না রাখ বিদায় দাও,····· আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না······এখনই যাইতেছি।" হয়ত সে নিজের অন্তরের অন্তরে নিশাকরের সঙ্গে যাওয়ার কথাই ভাবিতেছিল।

রোহিণীর ঐ যে ভালবাসার ভাণ—যাহাকে আত্ম-প্রতারণা বলিয়াছি—তাহা খুবই একটা স্বাভাবিক ভাব। অত বড় বেগবতী মনোবৃত্তিশালিনী নারীর হৃদয়েও উহাতে কেমন একটা অপূর্ব্ব আলোক-আঁধারের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। আঁধারটা অবশ্য অতৃপ্ত ও অতর্পণীয় কামজ মোহের, আলোক—ছায়ামাত্রাবিশিষ্ট ঔচিত্যবোধের। মতিবিবিতে এইটুকু নাই।

* এইরকম যুক্তিদ্বারাই পাপপ্রবণ চিত্ত আত্মপ্রতারণা করে। প্রথমখণ্ড চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে, "হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি — হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও ইত্যাদি প্রার্থনারও কোনও মূল্য নাই, কেননা ঐ পরিচ্ছেদেই দেখা যাইতেছে চিত্তসংযম জন্য রোহিণীর বস্তুতঃ কোনও ইচ্ছা নাই; সে পূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিয়াছে যে সে কিছুতেই হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িবে না, গোবিন্দলালকে দেখিবেই।

† কৃষ্ণকান্তের উইল দ্বিতীয়খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

রোহিণীতে ও হীরাতে কতক সাদৃশ্য আছে। হীরা দাসী হইলেও ভদ্রঘরের কায়স্থকন্যা, বালবিধবা। সেও সুন্দরী,—"উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী পদ্মপলাশলোচনা"। যখন তাহাকে প্রথম দেখি তখন শুনিতে পাই সে "অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করিত এবং বেশবিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল।" সে নাকি "আড়ালে বসিয়া গান করিত" আর—"আতর-গোলাপ দেখিলেই চুরি" করিত। আতর-গোলাপ চুরি ছাড়া অন্য সকলগুলিতেই রোহিণীর সাথে তাহার সাদৃশ্য আছে। ইহা ছাড়া রোহিণী যেমন গোবিন্দলালের প্রেমে মজিবার পূর্ব্বেই ভ্রমরের সুখে ঈর্ষ্যান্বিতা, হীরাকেও আমরা দেবেন্দ্রের প্রেমে মজিবার পূর্ব্বেই সূর্য্যমুখীর সুখে ঈর্ষ্যান্বিতা দেখি। তার ঐ রকম মন লইয়া যেদিন সে দেবেন্দ্রবাবুর বৈষ্ণবীরূপধারণের কারণ আবিষ্কার করিতে গেল,—চোরের ন্যায় জানালার খড়খড়ি দিয়া ভিতরের ব্যাপার দেখিতে ও গুপ্তকথা শুনিতে লাগিল—সেই দিনই কিংবা বোধ হয় তার পর দিন যেদিন মালতীর সাথে "মনের মতন যতন করি তায়" গাইতে গাইতে দেবেন্দ্রের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করিতে গেল, সেই দিন তার নিজের ভাষায়—"বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান" ঘটিল, "পরের চোর ধরিতে গিয়া আপনার প্রাণটা চুরি গেল!"

কি মুখখানি! কি গড়ন! কি গলা! অন্য মানুষের কি এমন আছে? আবার মিন্সে আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে! আর বল্‌তে লোক পেলেন না! মারি মিন্সের নাকে এক কিল! আহা, তার নাকে কিল মেরেও সুখ! দূর হোক ও সব কথা যাক। ও পথেও ধর্ম্মের কাঁটা। এজন্মের সুখদুঃখ অনেককাল ঠাকুরকে দিয়াছি। তাই বলিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে দিতে পারিব না, সে কথা মনে হলেও গা জ্বালা করে *·········

রোহিণীতে যেমন স্বীয় ধর্ম্মরক্ষার বিশেষ কোনও চেষ্টা দেখি না, হীরাতেও তদ্রূপ।

গোবিন্দলাল যখন রোহিণীকে দেশ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাইতে অনুরোধ করেন, তখন তাহার নিকট সে সম্মত হইয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে কাঁদিতে বসিল। তার পরেই প্রতিজ্ঞা করিল,—

* এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না কৃষ্ণকান্ত রায় মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, দেশছাড়া করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে করুক, তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না। যাই ত যমের বাড়ী যাব—আর কোথাও না।

এইরূপ প্রতিজ্ঞার পর সে গোবিন্দলালের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করিতে যাইবার পথে বলিতে লাগিল

"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের সহায় আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও; আর আমায় পোড়াইও না।···আমি বিধবা আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু! হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও।"*

তার এই প্রার্থনা একেবারে যদিও আন্তরিক নয়, তথাপি ইহার পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তির সচেষ্ট সহযোগিতা না থাকায় ইহার কোনও মূল্য নাই। চিরনিরূঢ় সংস্কার সহসা বিলুপ্ত হয় না, মাঝে মাঝে প্রবল প্রতিকূল শক্তিকে ঠেলিয়া ফেলিয়াও আত্মপ্রকাশ করে। রোহিণীর ঐ প্রার্থনা তাদৃশ সংস্কারের সত্তামাত্র সমর্থন করে, তার অধিক কিছু করে না।

হীরাতেও আমরা ঠিক এই ভাব দেখি। হীরার ঘরে দেবেন্দ্র দত্ত যে দিন প্রথম পদার্পন করিলেন, † সেদিন তাহার মধুর কণ্ঠের চিত্তোন্মাদন গান শুনিয়া মোহগ্রস্তা হীরা অসতর্কভাবে মনের কথা মুখে ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। তার পরই তার চৈতন্য হইল, সে একবার দেবেন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিয়া লইল, তার পরে কোমলতর স্বরে স্বীয় মনের দুর্ব্বলতা অস্বীকার না করিয়াও নিজ ধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল। আবার তার পরেই দেবেন্দ্রের স্বভাবের কথা, তার কামুকতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা ও অবিশ্বাসযোগ্যতার কথা

* বিষবৃক্ষ ২০শ পরিচ্ছেদ।

* কৃষ্ণকান্তের উইল প্রথমখণ্ড ১৪শ পরিচ্ছেদ।

† বিষবৃক্ষ ২৪শ পরিচ্ছেদ।

উল্লেখ করিয়া বলিল "যেদিন আপনি আমাকে ভালবাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণসেবা করিব।" কোনও পতঙ্গই বুঝি একবারে ছুটিয়া আসিয়া আগুনে পড়ে না, প্রথম আবেগে আগুনের কাছে আসিয়া পড়ে, তার পর দুই একবার এদিকে ওদিকে লাফাইয়া যায়, শেষে আগুনে ঝাঁপ দেয়।

হীরা দেবেন্দ্রের উপর রাগ করিয়া কুন্দকে বিষ দিয়াছে, রোহিণীতে সে পাপ নাই, ভ্রমর তাহার অযথানিন্দা করিতেছে জানিয়া রাগে কতকগুলি কৃত্রিম গহনা দেখাইয়া তাহাকে ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ করিতে আসিয়াছিল। রোহিণীর চেয়েও হীরা পাপিষ্ঠা, কিন্তু দেবেন্দ্রকে ভালবাসিয়া সে অন্তপুরুষে লুব্ধ দৃষ্টি করে নাই।

রোহিণীকে মারিয়া ফেলা অনেকের মনোমত হয় নাই! বঙ্কিমবাবুর নিকটে রোহিণীর মৃত্যুসম্বন্ধে অনেকে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন,। তদুত্তরে এক্ষম বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছেন, "অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'রোহিণীকে মারিলেন কেন?' অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, 'আমার ঘাট হইয়াছে'। "কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যামাত্র, একথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এসকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।" এখানে কঠিনসমস্যা রোহিণীর জীবনের নয়, ভ্রমরের ও গোবিন্দলালের। হীরাকে মারিবার প্রয়োজন হয় নাই, তাহাকে দিয়া কুন্দকে মারিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা শেষ করিয়া বঙ্কিম তাহাকে উন্মাদগ্রস্তা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। রোহিণীকে মারিয়া গোবিন্দলালকে স্ত্রীহত্যাকারী না করিলে ভ্রমরের দুঃখের ভার কিছু ঊন থাকিয়া যাইত। তাহা ঊন রাখার চেয়ে দুনো করারই প্রয়োজন বেশি ছিল। কেননা গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ এই আখ্যায়িকার প্রধানতম সঙ্কটভূমি (Crisis) নহে, রোহিণীর মৃত্যুই প্রধানতম সঙ্কটভূমি।

গোবিন্দলালের চরিত্রালোচনা বঙ্কিম স্বয়ংই করিয়াছেন, উহার অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। প্রথমে বঙ্কিম গোবিন্দলালকে বারুণীর জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। ভ্রমরের মৃত্যুর পর গোবিন্দলালের মানসিক অবস্থায় আত্মহত্যা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে; হয়ত আখ্যায়িকার করুণরসোদ্বোধকতা (tragic interest) তাহাতে পরিপুষ্টই হইয়াছিল; কিন্তু তাদৃশ অভিজ্ঞতার পর চিত্তবৈরাগ্যই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর পক্ষে অধিক স্বাভাবিক ও হিন্দুসমাজের অধিক আদর্শানুগত মনে করিয়াছিলেন। তাই দুঃখে ও পাপে গ্রন্থ শেষ না করিয়া শান্তিতে ও পুণ্যে তাহার উপসংহার করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরে প্রতাপকে যে কারণে মারিয়াছিলেন, কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দলালকে মারিবার সে কারণ ছিল না। প্রতাপকে মারিয়া তাহার মৃত্যুকালে তিনি এই বলিয়া বিদায় দিয়াছিলেন, "তবে যাও প্রতাপ অনন্তধামে যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই—সেই মহৈশ্বর্য্যময়লোকে যাও, লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালবাসিতে চাহিবে না;" আর এখন মোহমুক্ত, অনুতপ্ত গোবিন্দলালকে না মারিয়া যে প্রেম সকল প্রেমের সারভূত তাহার তত্ত্বোপদেশ করিলেন—ভ্রমরের ছায়ামূর্ত্তি দিয়া তাহাকে বসাইলেন, "আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন?" গোবিন্দলাল "ভগবৎপাদপদ্মে মনঃস্থাপন" করিয়া বুঝিয়াছিলেন, "তিনিই এখন আমার ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

ভ্রমরকে যখন দেখি তাহার কিছু পূর্ব্বে তাহার একটি পুত্র হইয়া সূতিকাগারে নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তখনও সে বালিকা—প্রায় সতের-বৎসরের বালিকা; ফুলটি, পুতুলটি, পাখীটি স্বামীটিতে তার মন। সে স্বামীর আদরে আদরিণী, হাসিতে যত পটু শাসনে তত পটু নহে। রোহিণী কৃষ্ণকান্তের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিল ইহা প্রথমে গোবিন্দলালের বিশ্বাস হয় নাই বলিয়াই ভ্রমরেরও বিশ্বাস হয় নাই। চাকরাণীরা রোহিণীর চুরি সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, তাহাতে ভ্রমরের বিশ্বাস নাই; গোবিন্দলালের মতই ভ্রমরের মত। তার যে একটি পুত্র হইয়া মারা গিয়াছে তজ্জনিত কোনও দুঃখ তখন তাহার দেখি না! পুত্রের জন্ত কি পুত্র প্রিয়? স্বামীর জন্ত পুত্র প্রিয়। তাই যে দিন গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, সেই দিন তার পুত্রকে

মনে পড়িয়াছিল। স্বামী তাহার প্রতি বড় অনুরক্ত বলিয়া তাহাতে যে কিছু গৌরবের ভাব, গর্ব্বের ভাব না দেখি তাহা নহে, ঐ গর্ব্বটুকু না থাকিলে বুঝি তার অভিমান এত উৎকট হইত না। অথচ সূর্য্যমুখী হইতে তাহার স্বামীর মর্য্যাদাবোধ কম বলিয়া বোধ হয় না, ভ্রমর যখন প্রথম শুনিল রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবাসে, তখন সে ক্ষীরীচাকরাণী দ্বারা তাহাকে কলসী গলায় দিয়ে মরিতে বলিয়া পাঠাইল। শুনিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "ছি ভোমরা!" ভোমরা বলিল, "ভাবিও না; সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে সে কি মরিতে পারে?"

এপর্য্যন্ত স্বামীতে তার বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস দেখি না। অবিশ্বাসের প্রথম সূত্রপাত হইল যখন তার হিতৈষিণীগণের মুখে প্রথম শুনিলেন গোবিন্দলাল রোহিণীকে গহনা ইত্যাদি দিয়াছেন; আর যখন পাপিষ্ঠা রোহিণী স্বয়ং আসিয়া তাহাকে কতকগুলি গহনা ও কাপড় গোবিন্দলালের প্রদত্ত বলিয়া দেখাইয়া গেল। পূর্ব্বে অবিশ্বাস মোটে ছিল না, এখন প্রমাণ পাইয়া বড়ই বুঝি অবিশ্বাস জন্মিল—অন্ততঃ বড় রাগ হইল। রাগের মত শত্রু আর নাই। রাগের মাথায় ভ্রমর আপনার পায়ে আপনি কুড়াল মারিল। সে গোবিন্দলালকে লিখিল—

"তুমি জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা; তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তিযোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।

ভ্রমর রাগের মাথায় যাহা বলিয়াছিল ঐ কথাটিকে মূলসূত্র করিয়া একজন বর্ষীয়সী স্বামীপুত্র-সুখে সুখিনী হিন্দুমহিলাকে পর্য্যন্ত গ্রন্থ লিখিয়া বাহবা লইতে দেখিয়াছি। কে বলে এদেশে individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচার করিবার দিন আসে নাই? সে যাহা হউক, ভ্রমরের ঐ কথাটি যে তাহার প্রাণের কথা নহে, রাগের কথা তাহার নিদর্শন আখ্যায়িকার ভিতরেই আছে। গোবিন্দলাল যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া কাশী যাইতে উদ্যত, তখন যে ভ্রমর পূর্ব্বে লিখিয়াছিল "তোমার উপর আমার ভক্তি নাই," সেই বলিতেছে, "দেবতা সাক্ষী! যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব।"

ভ্রমর-চরিত্রে বঙ্কিম একটিমাত্র দোষ সৃষ্টি করিয়াছেন, ভ্রমর বড় অভিমানী। অভিমান সতীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে, অধৈর্য্য নহে; আর যেরূপ অভিমান সতীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহার উপযুক্ত প্রকাশস্থলও এ নহে; যখন সতীর সতীধর্ম্মে বা সতীত্বগৌরবে আঘাত আশঙ্কা হয়, তখনই অভিমানপ্রদর্শনের যোগ্য স্থল। ভ্রমরের অভিমান যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে উহা খুবই স্বাভাবিক হইলেও অনুচিত সন্দেহ নাই। অনুচিত বলিয়া সে স্বয়ং তজ্জন্য পরে অনুতাপও করিয়াছে। ভ্রমর স্বামীকে এত বিশ্বাস করিত, আর তাহার মুখ হইতে একটা কৈফিয়ৎ শুনিবার অপেক্ষা করিল না! ধৈর্য্য সব সময়ে রাখা কঠিন বলিয়া অধৈর্য্য নিন্দনীয় নহে তাহা কে বলিবে? তাই ভ্রমরের তাদৃশ উৎকট উগ্র অভিমান অনুচিত মনে করি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। স্ত্রীপুরুষসাম্যবাদিগণও অসহিষ্ণু হইবেন না, আমি গোবিন্দলালের আচরণ সমর্থন করিতেছি না। কিন্তু ভ্রমরের অবিমৃষ্যকারিতা না থাকিলে হয়ত তাহাকে এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না। কেননা গোবিন্দলাল তখনও চিত্তসংযম একেবারে হারান নাই। ভ্রমর আদর্শ-রমণী কিনা সে সম্বন্ধে বহু তর্ক, বাদ, বিতণ্ডা হইয়াছে। যে সকল পাঠক 'হাসির গানে'র কবির ন্যায় চাহেন—

যা হয় রূপে গুণে অগ্রগণ্যা
অথচ দাত চড় মার লেও কথা কয় না

তাঁহারা অবশ্যই বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন, ভ্রমরকে আদর্শ-রমণী প্রতিপাদন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। বঙ্কিম idealism দূরে রাখিয়া বিশ্ববঙ্গবধূর স্বামিপ্রেম ও অভিমান একত্র সংগৃহীত করিয়া ভ্রমরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শচীশবাবু ভ্রমরসম্বন্ধে বলিয়াছেন, ভ্রমরের স্বামিভক্তি westernised আমরা তাহা মনে করি না। ভ্রমর বঙ্গবধূ intensified.

সূর্য্যমুখীকে বিড়ম্বিত করিয়া বঙ্কিম প্রেমে আত্মাদর-বিসর্জ্জনের শিক্ষা দিয়াছেন—সূর্য্যমুখী সেই শিক্ষার ফলে মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় দীপ্তিলাভ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথে ও গোবিন্দলালে প্রভেদ আছে বলিয়া ভ্রমরের অদৃষ্টে দুঃখের পর সুখ ঘটিল না। নগেন্দ্রনাথের মোহ রূপজ মোহ হইলেও তাহাতে অবৈধতার কলঙ্ক নাই; সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগে তাহার সে মোহও ভাঙ্গিয়া গেল। গোবিন্দলালের প্রণয় অবৈধ, কলঙ্ককালিমাযুক্ত তারপর যখন তাহার মোহ ভাঙ্গিতেছে, সেই মুহূর্ত্তে তিনি সাময়িক উত্তেজনাবশে স্ত্রীহত্যা করিলেন। তিনি নিজেও বুঝিলেন আর ভ্রমরের সঙ্গে দেখা চলে না, আর ভ্রমর যদিও এই সময়ে অভিমান দমিত করিয়া স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষায় হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিল, সেও বুঝিল যে যেদিন গোবিন্দলালের সঙ্গে তার দেখা হইবে সেদিন তার একটা "বিপদের দিন!" কিন্তু ভ্রমর হিন্দুবধূ ত বটে। তাই ভাবিল—

"যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয় তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদে থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।"

কিন্তু গোবিন্দলাল যখন খুনের দায় হইতে মুক্ত হইয়া ভ্রমরের কাছে চিঠিতে সাহায্যভিক্ষা করিলেন, তখন আবার তাহার সমস্ত অভিমান এবং হয়ত স্বামীর কলঙ্কবোধ জাগিয়া উঠিল। তাহার উত্তর বড় কঠোর। তাহার দিন তখন ফুরাইয়া আসিতেছিল—নৈরাশ্য, অভিমান ও স্বামীর কলঙ্কবোধ তাহার জীবনশক্তিকে ক্ষীণতর করিয়া ফেলিল। অবশেষে শেষ দিনে সে অভিমানকে জয় করিয়া যামিনীকে বলিয়াছিল—

আজিকার দিনে—মরিবার দিনে দিদি যদি একবার দেখিতে পাইতাম। একদিনে দিদি সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম।

সতী দেবতা সাক্ষী করিয়া শপথ করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা হইবে কেন? গোবিন্দলালের সঙ্গে তাই তার আবার সাক্ষাৎ হইল। সূর্য্যমুখী মৃতা সপত্নীর প্রতি চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।" ভ্রমর মৃত্যুকালে স্বামীর পদরেণু মাথায় লইয়া সকল অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিয়া নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

ভ্রমর আদর্শবঙ্গনারী হউক বা না হউক জিজ্ঞাসা করি তাহার প্রতি কোন্ পাঠকের সহানুভূতি নাই? কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি তাহার দুঃখে না অশ্রুপাত করিয়াছেন? উপন্যাসে যতদূর যাথার্থ্য ও স্বাভাবিকতার সমাবেশ সম্ভব বঙ্কিম এই চিত্রে তাহা করিয়াছেন। তাহার পতিভক্তি westernised হইলে তাহার প্রতি এত সহানুভূতি হইত না। তাহার দোষগুণ সকলই বাঙ্গালার গৃহে গৃহে নিত্য দৃশ্যমান; বঙ্কিম সেইগুলি কিঞ্চিৎ বৃহৎ কিঞ্চিৎ উগ্র করিয়া, অথচ উভয়ের মধ্যে পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, প্রচুর ঐকান্তিকতা বৈশদ্য, শক্তিমত্তা, ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া তাহা এমন চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আধার হইয়াছে—তাই ভ্রমরের সহিত পাঠকের এত সহানুভূতি হয়, তাই মনে হয় সে চরিত্র বুঝি আদর্শচরিত্র। চরিত্রটি অনুকরণের জন্য আদর্শস্থানীয় নয়; শিল্পরচনারূপে উপভোগ করিবার জন্য ইহা একটি আদর্শ চিত্র বটে।—

শ্রীঅক্ষয়কুমারদত্তগুপ্ত কবিরত্ন।

বেলুচিস্থান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জগতের অনেক পুরাতন সাহিত্যে এদেশের নামের উল্লেখ পাওয়া গেলেও স্বাধীনতার ইতিহাসে বেলুচিস্থানের কোন স্থান নাই। যে দেশের সমগ্র লোকসংখ্যা কতগুলি যাযাবর জাতির জনসমষ্টি সে দেশের লোকেরা যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এরূপ আশা করাও চলে না। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সোণার ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবার জন্য বৈদেশিক বীরেরা যুগে যুগে এদিকে অভিযান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে এদেশের উপর দিয়া বোলান গিরিবর্ত্মের (Bolan Pass) পথে তাহাদের বিরাট-বাহিনী লইয়া যাতায়াত করিতেন তাহার স্পষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান। ইংরেজদের কোয়েটা অধিকারের পর যখন কোয়েটার কেল্লা নূতন করিয়া তৈয়ার করা হয়, সে সময়ে মাটীর নীচে গ্রীক-বীর হারকিউলিসের (Hercules) ধাতু নির্ম্মিত একটি প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়। ইহা গ্রীকবীর সেকেন্দরসার অভিযানের স্পষ্ট পরিচয়। তারপরে মধ্যযুগে গজনীর সুলতান মামুদের এবং পারস্যদেশের নাদির সাহের অভিযানও এই পথেই ধাবিত হয়। বাস্তবিকও পশ্চিম হইতে ভারতে প্রবেশ করিবার জন্য খাইবারের পথ (Khyber Pass) ছাড়া বেলুচিস্থানই একমাত্র অন্যতম পথ। কাজেই ভারতবর্ষ এবং পশ্চিম দুনিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের স্রোতঃও যুগে যুগে এই পথেই চলিয়াছে। বেলুচিস্থানের সমস্ত প্রদেশ ব্যাপিয়া মাটির নীচে নীচে খৃষ্ট পূর্ব্বে চতুর্থ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যুগের বিভিন্ন জাতীয় প্রাচীন মুদ্রা এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বাসন পত্রের (Pottery) ভগ্নাবশেষ প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। তবে বেলুচিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস প্রায় মুসলমান রাজত্বেরই ইতিহাস। আবার অন্ততঃ এক সময়েও যে বেলুচিস্থান হিন্দুরাজত্বের অধিকারে আসিয়াছিল ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। বর্ত্তমানে এদেশে যে অল্পসংখ্যক হিন্দু আছে ইহারা বোধ হয় যুগ পরম্পরায় সে ইতিহাসেরই সাক্ষ্য বহন করিয়া আসিতেছে। এক সময়ে যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবও এ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছিল ইতিহাসে তাহারও উল্লেখ দেখা যায়। বেলুচিস্থানের আধুনিক ইতিহাস মোটামুটী ভাবে এইরূপ। ১৮৬৮ সালে স্যাণ্ডিম্যান সাহেব (Lieutt Robert Sandeman) ডেরাগাজিখাঁর সদরের কর্ত্তা হইয়া আসেন। তখন স্থানীয় বালোচদের অত্যাচারে ডেরাগাজিখাঁর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। মাঝে মাঝে পার্শ্বস্থ প্রদেশ বেলুচিস্থান হইতে আসিয়া মারী এবং বাগ্‌তীরাও ডেরাগাজিখাঁর উপর অত্যাচার করিয়া যাইত। মারী এবং বাগ্‌তীরা কেলাতের প্রজা। কিন্তু কেলাতের খাঁর সঙ্গে বনিবনাও না থাকাতে ইহারা মূল কেলাত রাজ্যের উপরে অত্যাচার করিতেও ছাড়িতনা। এদিকে কেলাতের রাজত্ব ব্রিটিশ রাজশাসনের অধীনস্থ বলিয়া পরিচিত; কিন্তু কেলাতের খাঁ এবং ব্রিটিশরাজের পক্ষ হইতে যিনি রাষ্ট্র অধ্যক্ষ (Political Superintendent) ছিলেন ইহাদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল, অবশেষে কেলাতের খাঁ প্রকাশ্যভাবে ব্রিটিশরাজের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া অধীনস্থ সরদারদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। ফলে সরদারেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

১৮৭৫ সালে ভারতশাসনের মন্ত্রী সভা হইতে স্যাণ্ডিম্যান সাহেব বেলুচিস্থানে আসিবার আদেশ পান। তিনি আসিয়া দেখিলেন, কি উপায়ে কেলাতের খাঁ এবং সরদারদের মনোমালিন্য দূর করিয়া দিয়া আবার বোলানের গিরিবর্ত্ম বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা যাইতে পারে। স্যাণ্ডিম্যান সাহেবের প্রথম অভিযানে কোনও ফল হয় নাই। ১৮৭৬ সালে তিনি আবার আসিলেন। এবারে দেশের সমস্ত বালোচ এবং ব্রাহুই সরদার এবং দলপতিদের সম্মিলিত সভায়—এদেশে ইহাকে জির্‌গা বলে—কেলাতের খাঁ এবং সরদারের বিবাদের বিষয়গুলি

উপস্থাপিত করা হয়। জির্‌গার সভাতে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে বিবাদের মীমাংসা হইয়া গেলে ১৩ই জুলাই এক প্রকাশ্য দরবারে সকল পক্ষেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এক সম্মতি-পত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। স্যাণ্ডিম্যান সাহেব কেলাতের খাঁর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ইহা মস্তাঙ্গের সন্ধি (Mustung Treaty) বলিয়া পরিচিত। এই সন্ধির এক সর্ত্ত ছিল—বেলুচিস্থানে ব্রিটিশ রাজের এজেন্সি (Agency) স্থাপন। এই এজেন্সির প্রধান কেন্দ্র বা রাজধানী হইল কোয়েটা, এবং স্যাণ্ডিম্যান সাহেবই প্রথম এজেণ্ট (Agent) হইয়া আসিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সম্রাজ্ঞী" নাম গ্রহণ উপলক্ষে ১৮৭৭ সালে ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে যে দরবার হয়, সেখানে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের সহিত আসন গ্রহণ করিবার জন্য কেলাতের খাঁও (His Highness the Khan of Kalat) আসিয়া হাজির হইলেন।

১৮৮৩ সালে কেলাতের খাঁকে সর্ব্বসাকল্যে বার্ষিক ২৫,০০০, টাকা খাজানা নির্দ্ধারিত করিয়া ইংরাজেরা সমস্ত কোয়েটা উপত্যকার অধিকার গ্রহণ করেন। পরে বোলান গিরিবর্ত্মের উপর দিয়া বাণিজ্যের অবাধ অধিকার গ্রহণ করিলে তাহার জন্য কেলাতের খাঁকে বার্ষিক আরও ৩০,০০০, টাকা করিয়া খাজনা দেওয়া হয়।

এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এক বৎসের মধ্যে আফগানিস্থানের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। বর্ত্তমানের শিবি (Sibi), ডুকি (Duki), পিশিন (Pishin) ইত্যাদি তহশিল সমূহ এপর্য্যন্ত আফগান রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আফগান যুদ্ধের উপলক্ষে ইংরাজেরা এইস্থানগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। এদিকে স্যাণ্ডিম্যান সাহেবের কার্য্য প্রণালী এবং ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া দেশের লোকেরা তাহাকে এত শ্রদ্ধা করিত যে ভিন্ন ভিন্ন তহশীল এবং পরগণা হইতে বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা তাহাদিগকেও ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য আবেদন করিল।

এইরূপে বেলুচিস্থান এখন তিন ভাগে বিভক্ত (১) খাস ব্রিটিশ-বেলুচিস্থান, (২) এজেন্সি সাম্রাজ্য এবং (৩) স্বাধীন প্রদেশ সমূহ। যে সকল দেশ আফগান রাজ্যের হাত হইতে ব্রিটিশের অধিকারে আসিয়াছে সেটুকুই ব্রিটিশ-বেলুচিস্থান আর সে সকল প্রদেশ নিজেদের ইচ্ছায় ব্রিটিশের হাতে আত্মসমর্পন করিয়াছে সেগুলি এজেন্সি সাম্রাজ্য। স্বাধীন দেশ বলিতে এখন কেলাত এবং লাস্‌-বেলাই (Las Bela) অবশিষ্ট আছে। ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনে কেলাতের খাঁই স্বাধীন দেশগুলি শাসন করিয়া থাকেন। আর ব্রিটিশ-বেলুচিস্থান এবং এজেন্সি সাম্রাজ্য একাকার করিয়া তহশীল, জেলা বা পরগণা হিসাবে বিভক্ত হইয়াছে।

শাসন বিষয়ে ভারতবর্ষের তুলনায় বেলুচিস্থানে বেশ একটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। ইহার মূলে যে একটি কীর্ত্তিমান পুরুষের সমদর্শী রাজনীতিজ্ঞতা এবং উদার সহানুভূতি পূর্ণরূপে জাজ্বল্যমান তাহারই পুণ্যময় নামে ইহা স্যাণ্ডিম্যান সাহেবের রাজ্যশাসন-নীতি (Sandeman Policy) বলিয়া পরিচিত। স্যাণ্ডিম্যান সাহেব আসিয়া দেখিলেন দেশে প্রাচীন যুগের সেই দল-শাসন প্রথাই প্রচলিত, সেই প্রাচীন নীতি অনুসারেই দেশটা শাসিত হইতেছে। তিনি দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের চক্ষু লইয়া একবার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেশের লোক চরিত্রও তিনি ইহারই মধ্যে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। এই উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এক অভিনব শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি পুরাতন নিয়মের কোন ব্যত্যয় করিলেন না। প্রাচীন প্রথা, প্রাচীন রীতি নীতি সমস্তই অব্যাহত রহিল। শুধু শাসন যন্ত্রটা ইংরেজের অধীনে আনা হইল। এখন এক এক দলের দলের বিচার এবং শাসনের কাজ দলপতিদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ব্যাপার একটু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইলে অথবা দুই কিম্বা ততোধিক দল সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলে 'জির্‌গা' বসান হয়। ইহাতে দলের প্রধান প্রধান মাতব্বর লোকদিগকে মন্ত্রনার জন্য আহ্বান করা হয়। যে সব স্থলে ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়ায় অথবা ভিন্ন জেলা বা পরগণা সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে সে সকলের বিচার ভার "সাহী জির্‌গা'র জন্য মুলতুবী রাখা হয়। এই সাহী জির্‌গা বৎসরে দুইবার মাত্র বসে—শীতের সময় শিবিতে একবার, আর গ্রীষ্মকালে কোয়েটাতে একবার।

এই জির্গাতে যথাসম্ভব দেশের সকল সম্প্রদায়ের দল-পতিরাই (সরদার) আসিয়া যোগ দিয়া থাকেন।

দলের কোন লোক অপরাধ করিলে তাহাকে বিচার সমক্ষে আনিবার জন্য উহারাই দায়ী। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসামীকে হাজির না করান হয় তবে সমস্ত দলের উপর এক জরিমানা নির্দ্ধারিত হয়। নিজ নিজ দলের রাজস্ব আদায়ের ভার দলপতির উপরেই ন্যস্ত এবং নিজের মধ্যে পুলিশের কার্য্যভার ও উহাদিগকেই গ্রহণ করিতে হয়। শুধু জেলা, তহশীল, বাজার, ক্যান্টনমেণ্ট এবং রেলওয়ে ষ্টেসন এসব স্থলেই ইংরাজের পুলিশ আছে। নিজ নিজ দলের মধ্যে নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য অনেক স্থলে সরকারের পক্ষ হইতে সরদার দিগকে বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। দেশের সনাতন শাসন পদ্ধতি যাহাতে আরও উন্নত হইয়া উঠে কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগের মধ্যে অনেকের সে দিকে মনোযোগ দেখা যায়। যেখানে বিচারের শেষ সূত্র ইংরাজদের হাতে আসিয়া পড়ে সে সব স্থলেও ভারতীয় আইন শাসননীতির চেয়ে দেশীয় প্রথা এবং দেশীয় রীতিনীতিই সমর্থন করা হয়। এইরূপে দেশটা সমগ্রভাবে ইংরাজ শাসনের অধীনে থাকিলেও ভারত বর্ষের তুলনায় এই প্রায় জ্ঞানালোক বঞ্চিত বেলুচিস্থানেই স্বায়ত্তশাসনের দৃষ্টান্ত বেশ স্পষ্ট রূপেই পরিলক্ষিত হয়।

বেলুচিস্থানের আসল নাম বালোচিস্থান। কারণ সপ্তম শতাব্দী অথবা প্রায় সেই সময়েই পারস্য দেশ হইতে 'বালোচ' নামক একজাতি এখানে আসিতে আরম্ভ করে এবং তাহাদের নামেই এদেশের নাম করণ হয়। এখন বালোচেরা সংখ্যায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় কম, কিন্তু বালোচিস্থান "বেলুচিস্থান" নামেই পরিচিত রহিয়া গিয়াছে।

বেলুচিস্থান প্রকৃতিক হিসাবে তিন ভাগে বিভক্ত; পার্ব্বত্য প্রদেশ, সমতল প্রদেশ এবং মরু প্রদেশ। আরব সাগরের উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া ৪০০।৫০০ মাইল পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তটাই মরুরাজ্য। মাঝে মাঝে কতকগুলি পাহাড় পর্ব্বত এদিক ওদিক বিস্তৃত। মরুভূমির কোন কোন জায়গায় কাল কাঁকর বিস্তৃত, আর সবদিকেই বালুকারাশির সীমাহীন বিস্তার। এই বালুভূমির মধ্যে মধ্যে অনেক বালুর পাহাড় দেখা যায়। শুধু পাহাড় বলিলেই যথেষ্ট হয় না, এই বালুর পাহাড় ও অনেক জায়গায় পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মরুভূমি ছাড়া সমতল ভূমি বলিতে শিবির দাক্ষণে কাচি (Kachi) করাচী উপকূলের সন্নিকটে 'লাস্ বেলা' (Las Bela) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আরব সাগরের উপকূলে দস্ত (Dasht) নদীর প্রধাবিত দেশটুকুই বুঝায়। আর মধ্য প্রদেশ এবং উত্তর দিকের সমস্তটাই পার্ব্বত্য প্রদেশ। এই পর্ব্বতের মধ্যে মধ্যে উপত্যকা এবং আধিত্যকাও আছে; যেমন, কোয়েটা, হারনাই (Harnai) খবাস্ (Khwash) ইত্যাদি। এসব জায়গায় ভূমি খুবই উর্ব্বরা, সামান্য মাত্র কর্ষণে এবং জলসেচনেই প্রচুর পরিমাণে ফলফুল উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত পর্ব্বত ভূমির উচ্চতর প্রদেশগুলিকে স্থানীয় লোকেরা খোরাসন (Khorasan) বলিয়া অভিহিত করে।

পর্য্যটকেরা বলেন সাধারণ ভাবে বেলুচিস্থানের দৃশ্য অনেকটা ইরানের মালভূমির (Iranian Plateau) মত। এদেশের শুষ্ক, কর্কশ, বন্ধুর তৃণপত্র বর্জ্জিত পর্ব্বত সমূহ এবং 'তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে' প্রথম দর্শনে যেন একটা ব্যর্থতার আভাষই জাগাইয়া তোলে। কিন্তু প্রকৃতির এ রুদ্রমূর্ত্তিও যে একেবারেই আভরণ বিহীন, এমন কথা বলা যায় না। এই মরুপাহাড়ের মধ্য হইতেও স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিনী বাহির হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আবার গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এই নির্ঝরিনীর দুইধারে অতি গাঢ় সবুজের আস্তরণ স্তরে স্তরে ফুটিয়া ওঠে। কোথাও বা উইলো (Willow) গাছের সারি শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভাবর্দ্ধন করে। দক্ষিণে মেক্রান (Makran) মরুভূমির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ লোকবসতির আশেপাশে খেজুরের বাগানগুলি দেখিতে বেশ চমৎকার। মরুভূমির মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে কতকগুলি বদ্ধহ্রদ মধ্য এশিয়ার বিশিষ্ট ভাবেরই অনুরূপ দৃশ্য।

আমাদের দেশে নদী বলিতে আমরা যাহাবুঝি এ দেশে সেরকম নদী একটীও নাই। এখানে যেগুলিকে

নদী বলা হয় সেগুলি প্রায়ই জলনির্গমনের পথমাত্র। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই এ সকল প্রবাহ-পথে সামান্য জলই চলিয়া থাকে। অনেক জায়গায় এ সামান্য জলপ্রবাহও বালুভূমিতে অথবা শিলাময় ভূখণ্ডে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। নদীপথ যেখানে পাহাড়ের মধ্যদিয়া আসিয়াছে সেখানে অতি সঙ্কীর্ণ, দুইদিককার পাহাড় খাড়াভাবে অনেক উচ্চে উঠিয়াছে। নদীপথ এত সঙ্কীর্ণ হওয়াতে বর্ষার জল হঠাৎ অত্যন্ত তীব্রবেগে নামিতে আরম্ভ করে। সেই সময়ে যদি কোন হতভাগ্য ব্যক্তি অতর্কিত ভাবে সেই বন্যার সম্মুখে পড়ে তবে সে বেচারার আর রক্ষা থাকে না। কোয়েটার নিকটেও একটি রীতিমত নদী দেখিয়াছি সে নদী এত প্রশস্ত যে আমরা একলাফে পার হইতে পারি নাই। যেখানে বৃষ্টির পরিমান বৎসরে ৭।৮।১০ ইঞ্চি সে দেশে যে নদীর অবস্থা এরূপ হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

বেলুচিস্থানে জল বৃষ্টির অভাবে অনেকটা জায়গা মরুভূমি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সেখানে যে চাষবাস হয়না এমন কথা নয়। তবে আমাদের বাংলা দেশের মত এখানে প্রকৃতির দানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলে না। এজন্য রীতিমত মানুষের হাত লাগাইয়া কাজ করিতে হয়। যেখানে নদী নালার জল পাওয়া যায়না সেখানে বৃষ্টির জল ধরিয়া সঞ্চয় করা হয় তুষার পাতে ও জমি ভিজাইয়া অনেক স্থলে বৃষ্টির কাজ করে। এখানে কতকগুলি 'আর্টিজিয়ান কূপ' (Artesian well) খনন করা হইয়াছে সেগুলিও বেশ কার্য্যকরী। আর এক রকম বন্দোবস্ত আছে, তার স্থানীয় নাম 'ক্যারেজ' (Karez)। ক্যারেজের ব্যবস্থা এইরূপ—পাহাড়ের নিকট হইতে ক্রমশঃ নীচের দিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কতকগুলি বেশ গভীর কূপ খনন করা হয়, আর সবগুলি কূপ একত্র সংযুক্ত করিবার জন্য মাটীর নীচে নীচেই এক নালা করা হয়। উপর হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে যাইতে জমি যতটা ঢালু, সেই অনুপাতে নালার গড়ানে তার চেয়ে কম। কাজেই কতকদূর অগ্রসর হইলে সেই নালা জমির উপরে আসিয়া দেখা দেয়। এইরূপে দূরে যেখানে মাটীর অনেক নীচের স্তরে না পৌছাইলে জল পাওয়া যাইত না, সেখান হইতে জলের স্রোতঃ আসিয়া জমির উপরে বাহির করা হইয়াছে। পরে আবশ্যক মত এদিকে ওদিকে এই জল সরবরাহ করা হয়। এইরূপ ক্যারেজের উপর নির্ভর করিয়া অনেক স্থানের কৃষি-কার্য্য চলিয়া থাকে, এবং ইহারই আশ্রয়ে এক একটী গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে। কিন্তু ঘন ঘন ক্যারেজের প্রতিষ্ঠা করিলে ব্যাপার এই হয় যে ক্রমে ক্রমে ভূগর্ভস্থ প্রথম স্তরের জল নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন জল পাইতে হইলে, হয় এ স্থান একেবারেই ত্যাগ করিতে হয় নতুবা কূপ এবং নালার গভীরতা বাড়াইয়া আরও নীচের স্তরে জলের সন্ধান করিতে হয়। তার ফলে এই হয় যে ক্যারেজের নালা পূর্ব্বেকার অপেক্ষা আরও দূরে লইয়া যাইতে পারিলে তবেই জলের স্রোতঃ ভূগর্ভ হইতে উপরে আনিয়া ফেলা যায়। তখন আগেকার বাস্তভূমি ছাড়িয়া এই নূতন নালার মুখের কাছে আসিয়া আবার নূতন করিয়া কর্ম্মভূমি গড়িয়া তুলিতে হয়—এখানেই আবার গ্রামের পত্তন হয়। এইরূপে লোকের কর্ম্মকেন্দ্র এবং দেশের গ্রামসমূহ যেন দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর একদিকে দেশের নদীগুলিরও ঐ অবস্থা। এই জন্যই লোকে বলে যে বেলুচিস্থান এক আজগবি দেশ। সেখানে নদী আছেত নদীতে জল নাই বনভূমি আছে কিন্তু সেখানে গাছপালা বড় একটা দেখা যায় না, আর গ্রামের আস্তানা আছে কিন্তু সেখানে লোক বসতি নাই।

এদেশে কৃষিকার্য্যের জন্য এতটা কাণ্ডকারখানা করিতে হয় সত্য, কিন্তু ফল-ফসলও জন্মে নানাপ্রকার। গমের ফসল হয় বৎসরে দুইবার—শীতে এবং শরতে। সাধারণতঃ সমতলভূমিতে বীজবপনের সময় জুলাই আগষ্ট মাসে। কারণ স্থানীয় নদনদীর যেটুকু জল সম্বল তাহা এই সময়েই আসিয়া বহিয়া যায়। আর পর্ব্বতপ্রদেশে বীজ বোনা হয় প্রায়ই শীতকালে (ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত)। কারণ এখানকার আকাশের যত বৃষ্টি যেন শীতকালের জন্যই জমা থাকে

এবং তুষার পাতও এই সময়েই হয়। শস্য এ দেশে অনেক প্রকারের হয়, বেশীর ভাগ পাহাড়ের উপরেই জন্মে। শরতের প্রধান শস্য নীচে জোয়ার, পাহাড়ে ভুট্টা। নীচে মুগ, তিল, সরিষা ইত্যাদি এবং পাহাড়ে তামাক এক তরমুজ কর্ষিত ক্ষেত্রের অনেক স্থান অধিকার করিয়া আছে। অন্যান্য ফসলও আছে, যথা—যব, ছোলা, শিম, করাই শুটি, চাউল, তুলা এবং নীলের চাষও আছে। তরমুজ, খরমুজা এবং সর্দার (ফুটি জাতীয়) চাষ প্রচুর পরিমাণে হইতেছে। কাবুল ও কান্দাহার হইতে বীজ আনিয়া এবং চাষের উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিয়া তরমুজের এবং সর্দারে ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতা বাড়িতেছে।

এ দেশের পাহাড়গুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মিয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রধান ফসল আঙ্গুরের। এখন বিদেশে রপ্তানির দরুণ দাম অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আগে শুনিয়াছি কোন কোন জায়গায় এক টাকায় এক গাধার বোঝা আঙ্গুর পাওয়া যাইত। এখন প্রায়ই চার আনা ছয় আনার কমে একসের পাওয়া যায় না। আঙ্গুর অনেক প্রকারের আছে—লাল, কাল এবং সাধারণ (ফিকে সবুজ); স্থানীয় নাম লাল, সাহিবী, কিশমিশ। আমাদের দেশে অনেকেই হয়ত জানেন না যে কিশমিশ এবং মনকা আঙ্গুর শুকাইয়া তৈয়ার করা হয়। পীচ, জরদালু, পেস্তা, বাদাম, আনার, আপেল, চেরী (Cherry) মালবেরী (Mulberry) এসবও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এক আঙ্গুর ছাড়া আর প্রায় সব রকম ফলই কোয়েটাতে প্রায় কলিকাতার দরেই বিক্রয় হয়। দক্ষিণ দেশে মেক্রানে (Makran) প্রচুর পরিমাণে খেজুর জন্মে। শুধু পরিমাণ নয় উৎকৃষ্টতায়ও তাহারা প্রসিদ্ধ। কতকগুলি খেজুর এমন ভাল হয় যে আরবেরা পর্য্যন্ত স্বীকার করে যে এ খেজুর বসোরার খেজুরের চেয়েও উৎকৃষ্ট। আলু এ দেশে বেশ ভালই হয় এবং চাষও ক্রমেই বাড়িতেছে। বিলাতী শাক সব্‌জী প্রায় সব রকমই পাওয়া যায়।

কোয়েটার নিকটে এক সরকারী বাগান আছে। সেখান হইতে বেলুচিস্থানের ফল-ফসলের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এ দেশে বায়ুর আদ্রতা খুবই কম, সেই অবস্থোপযোগী "Dry cultivation" এর মতে ফসল উৎপাদনের চেষ্টাও হইয়াছিল—চেষ্টা ফলদায়ক হইয়াছে। এই বাগান হইতেই তরকারী-সব্‌জী বিশেষভাবে শুকাইয়া ইষ্টকাকারে প্রস্তুত করিয়া বিদেশে পাঠানের উপযোগী করার বন্দোবস্ত হয় এবং এই উপায়ে যুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়া এবং সিস্তানে (Sistan) সৈন্যদের জন্য তরকারী রসদের অধিকাংশই এখান হইতে সরবরাহ হয়।

বেলুচিস্থানের পর্ব্বতগুলিও অধিকাংশই পাষাণমূর্ত্তি। যেখানে পাহাড়গুলি আর কোনও উচ্চতর পর্ব্বতের আড়ালে রহিয়াছে সে স্থলে কোন কোন পাহাড়ে গাছ পালা আছে। দেশের অধিকাংশ বন জঙ্গলই মধ্য ব্রাহুই পর্ব্বত (Central Brahui Range) আশ্রয় করিয়া আছে—এই পর্ব্বত শ্রেণী কেলাতের রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উত্তর পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত। এইরূপ কতকগুলি বনপ্রদেশ সরকারী আদেশে সংরক্ষিত (Reserved)। এসব বন ভূমিতে কোথাও বা পেস্তার (Pistacio) গাছ, কোথাও (Juniper), আর কোন কোন স্থলে অন্যান্য নানাপ্রকারের গাছ। দেশের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ——বাড়ী ঘর তৈয়ার করিবার এবং জ্বালাইবার—প্রায়ই সিন্ধু প্রদেশ এবং পঞ্জাব হইতে আনীত হয়। সংরক্ষিত বনভূমি রাখা হইয়াছে অতি দুর্ঘট অভাবের সময়ের জন্য। বনবিভাগ (Forest deptt) হইতে কিছু কিছু কাঠ এবং খরি মাঝে মাঝে বিক্রয় হয়। ফোর্ট স্যাণ্ডিম্যানে (Fort Sandiman) ঘর বাড়ী তৈয়ার করিবার জন্য দেবদারু কাঠ (Pine) এবং জিয়ারতে (Ziarat) Juniper, ব্যবহৃত হয়। গ্রাম্য লোকদের মধ্যে বাদাম, জরদালু, মালবেরী ইত্যাদি সকল প্রকার গাছের কাঠই প্রচলিত।

বেলুচিস্থানের লোকসংখ্যা খুবই কম। সমগ্র প্রদেশের আয়তন ১৩১,৮৫৫, বর্গমাইল, গ্রামের সংখ্যা ২৮১৩

এবং লোকসংখ্যা ৯১৪,৫৫১।* (ব্রিটিশ বেলুচিস্থান ৪৬৬৯২, স্বাধীন দেশসমূহ ৭৮০৩৪ এবং মারী এবং বাগ্‌তী প্রদেশ ৭১২৯)। কোয়েটা- পিশিন জেলায় লোকের জনতা সব চেয়ে বেশী। সেখানকার লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ১৭ জন, চাগাইতে (Chagai) ১, কেলাতের কাচিতে (Kachi) ১৬, খারান (Kharan) ১, মেক্রানে (Makran) ৩, এবং মারী ও বাগ্‌তী প্রদেশ (Marri and Bagti) যথাক্রমে ৬ এবং ৫। সমগ্র দেশের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৫, ব্রিটিশ বেলুচিস্থানে ৭, কেলাত প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যে ৭।

সমস্ত লোকে সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই গ্রামের অধিবাসী। গ্রামের সংখ্যা ২৮১৩ অর্থাৎ প্রতি ৪৭ বর্গ মাইলে ১টী করিয়া গ্রাম। গ্রামের অবস্থাও অতি-হীন। কোন কোন জায়গায় গ্রাম বলিতে কয়েকটী মাটির ঘরের সমষ্টিমাত্র বুঝায়। শতকরা বাকী ৫ জন সহরের অধিবাসী। সহরের মধ্যেও দেখি এক কোয়েটা। আর বাকী যে গুলিকে সহর বলা হয় সে স্থলে শব্দার্থের যে যথেচ্ছ অপব্যবহার হয় তাহা বেশ নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। সহরে আবার বিদেশের লোক এত বেশী যে এসব স্থানে থাকিলে আমরা যে বেলুচিস্থানে আছি এটা ভাবিয়া লইতে হয়। সহরের অধিবাসীদের মধ্যে হাজারে ১৫৮ জন মাত্র দেশীয় ভাষায় কথা বলে।

স্থানীয় লোকেরা প্রধানতঃ তিন জাতিতে বিভক্ত :—(১) আফগান—ইহারা পাঠান নামে পরিচিত, (২) বালোচ—ইহাদিগকে আধুনিক ভাষায় বেলুচী বলা হয়, আর (৩) ব্রাহুই। ধর্ম্ম হিসাবে ইহারা সকলেই মুসলমান বলিয়া পরিচিত, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান খুব কম লোকেরই আছে। সে জন্ম কাহারও বড় একটা আগ্রহও দেখা যায় না। বরং ভূত প্রেতে বিশ্বাস (Animistic belief) এবং নানাবিধ কুসংস্কারের প্রচলন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আবার কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে মোল্লাদের আধিপত্য একেবারে অব্যাহত।

অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন এদেশে আবার কতকগুলি হিন্দুও আছে—সংখ্যায় প্রায় ৪০,০০০। ইহারা বলিতেগেলে মুসলমানদের সঙ্গে সমন্বয়ের সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মুসলমানদের হাতে জল খাইতে ইহাদের আপত্তি নাই, আবার কেহ কেহ বাড়ীতে মুসলমান চাকরও রাখে। ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ অনেকটা বেলুচীদের মত। আচার ব্যবহারেও ইহারা অনেক বিষয়ে মুসলমানদের সঙ্গে একভাবাপন্ন। তবু হিন্দু নামটি বজায় রাখিয়াছে। কেলাত স্বাধীনরাজ্যের রাজধানী কেলাত নগরে একটি কালী বাড়ীও আছে। লাস্‌বেলা (Las bela) প্রদেশের দক্ষিণাংশে সমুদ্রের অনতিদূরে হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান হিঙ্গলাজ বা হিঙ্গোলা দেবীর মন্দির। শুধু তীর্থস্থান বলিলে যথেষ্ট পরিচয় হয় না। ভারতীয় হিন্দুদের ৫১টি পীঠস্থানের মধ্যে ইহাও একটি। এ নিভৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে মন্দিরের অবস্থানটিও বেশ। ভারতবর্ষ হইতে এখানে আসিতে হইলে করাচীর পথই অধিকতর সুগম। করাচী হইতে যাত্রা করিয়া দিনের পর দিন উষ্ট্রপৃষ্ঠে মরুভূমি অতিক্রম করিতে হয়। যাত্রাতে তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডাদের সাহায্য পাওয়া যায়। পথে যাত্রীদের নিকট হইতে পথকর আদায় করা হয়, কিন্তু যাত্রীদের মধ্যেও কুমারীরা এ কর হইতে নিষ্কৃত। প্রাচীনকালে হিন্দুসাম্রাজ্য যে অন্ততঃ এ পর্য্যন্তও বিস্তৃত ছিল এই তীর্থক্ষেত্রের অবস্থান তাহারও একটি অকাট্য প্রমাণ। এই হিন্দুরা কিন্তু এখানকার স্থানীয় অধিবাসী। বিদেশী লোকদের মধ্যে অবশ্যই হিন্দু, খৃষ্টান, শিখ, মুসলমান সবই আছে।

পাঠান, বেলুচী এবং ব্রাহুই, এই তিনটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে আবার নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহারা সকলেই প্রায় সেই প্রাথমিক যুগের মত দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আদর্শ এবং উপলক্ষ ধরিয়া বিশিষ্ট প্রকার দল গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই প্রাথমিক যুগের মতই নিজ নিজ দলপতির কাছে সকলেই নতশির।

উপরোক্ত তিন জাতির মধ্যে পাঠানেরাই সবচেয়ে

* Census of 1901 and estimate made in 1903 for Makran, Kharan and Western Sinjrani.

সংখ্যায় বেশী। ইতিহাসে যতদূর জানা যায়, অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাঠানেরা ইহাদের বর্ত্তমান অধিষ্ঠান স্থানের ধারে ধারেই বাস করিয়া আসিতেছে। পুরাকাল হইতেই ইহাদের প্রধান কেন্দ্র সুলেমান পর্ব্বতের উত্তর সীমানার ধারে। হিউয়ান্ সঙ্ (Hiuen Tsang) বৃত্তান্তে পাওয়া যায় যে এই স্থান হইতেই ইহাদের কোনও কোনও দল ধন এবং রাজ্য আকাঙ্খা করিয়া ভারতবর্ষের দিকে চলিয়া যায়। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণে মুলতান পর্য্যন্ত ইহাদের বিস্তৃতি দেখা যায়। এই মুলতানেই ইহারা গজনীর মামুদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। পরে এই পাঠানদেরই দুইশ্রেণী হইতে—লোদী এবং সুরী বংশ—দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকৃত হয়। যদিও ইহাদের বিশ্লিষ্ট দল সমূহ এদিক ওদিক চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইহাদের মূলকেন্দ্র আবহমান কাল হইতে প্রায় এক জায়গায়ই অধিষ্ঠান করিয়া আসিতেছে। এখনও পাঠনের অধিকাংশই বেলুচীস্থানের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বসবাস করিয়া আছে।

বালোচদের নিজেদের পুরাণ হিসাবে উহাদের আদিম বাসস্থান ছিল আলেপ্পো (Aleppo)। 'বালোচ' শব্দের অর্থই 'যাযাবর'। এখনও উহারা নিজেদের জাতীয়শব্দের অর্থ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে দেখা যায় ইহারা মেক্রানের (Makrán) ধারে ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহারা যেখানে যেখানে অধিষ্ঠান করিয়া আসিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত উহাদের শ্রেণীবিশেষের নামের মধ্যে সে সকল স্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়। পরে ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহারা কাচিতে (Kachi) আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্ব প্রদেশের মারী এবং বাগ্‌তী শ্রেণীও এই বালোচ জাতীয়ই অন্তর্ভূত।

ব্রাহুইদের আদিম ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যেই এ বিষয়ে মতভেদ আছে। রিজলী সাহেবের মতে, পাঠান, বালোচ এবং ব্রাহুই, ইহারা মূলে সকলেই ইরাণবংশীয় (Turko-Iránians)। এখন কেলাতের সমস্ত রাজ্য ব্যাপিয়াই ব্রাহুইদের আধিপত্য। কেলাতের খাঁ স্বয়ং ইহাদের দলপতি।

পাঠানেরা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং কর্ম্মক্ষম। শরীরের গঠনও বেশ সুসমঞ্জস। ইহাদের শরীরের দৃঢ়তাব্যঞ্জক অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভুরু অত্যন্ত মোটা হওয়াতে ইহাদের চেহারায় স্বতঃই একটা হিংস্র কঠোরতার ভাব প্রকাশ পায়। ইহাদের চালচলনও শরীরের উপযোগী দৃঢ়তাব্যঞ্জক—প্রায় গর্ব্বিত। সাহসই ইহাদের মধ্যে প্রধান গুণ বলিয়া পরিচিত। এদিকে আবার ইহারা দয়ামায়া বিবর্জ্জিত। জিঘাংসা অত্যন্ত প্রবল। লোভও বেশ আছে। বালোচেরা চেহারায় অপেক্ষাকৃত খাট, চালচলনে নির্ভিক, অনেকটা সত্যবাদী এবং স্বভাবে সরল। ইহাদের মধ্যেও সাহসিকতার আদর আছে, আবার আতিথেয়তাও অবশ্যকরণীয় পবিত্র কার্য্য বলিয়া গণ্য। ইহারা অশ্বারোহণে পটু, অস্ত্রচালনায় নিপুণ এবং যুদ্ধকার্য্যে পারদর্শী। 'ব্রাহুই'রা মাঝারি চেহারার লোক, কিন্তু তবু হৃষ্টপুষ্ট এবং শক্তিশালী। ইহারা কর্ম্মক্ষম, কষ্টসহিষ্ণু এবং যাযাবর প্রকৃতিবিশিষ্ট, কিন্তু বালোচদের মত যুদ্ধে পারদর্শিতা ইহাদের নাই। চরের কার্য্যই ইহাদের উপযোগী। বালোচদের মধ্যে যেমন গানে এবং ছড়ায় স্বজাতীয় বীরত্বের কাহিনী শুনা যায় ব্রাহুইদের মধ্যে তেমন কিছুই নাই। ইহারা অত্যন্ত অলস এবং কৃপণস্বভাববিশিষ্ট; ইহাদের অজ্ঞতা প্রবাদে পরিণত।

ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে এদেশে ধনসম্পত্তি মোটেই নিরাপদ ছিল না। বীজ বপন করিয়া লোকে শস্য ঘরে আনিতে পারিলেই লোকে সৌভাগ্য মনে করিত। এমন কি নিজ নিজ জীবন সম্বন্ধেও লোকে নিঃসংশয় হইয়া থাকিতে পারিত না। শুনিয়াছি কোনও লোক সকালে বাহির হইয়া সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া না আসিলে বন্ধুবান্ধবেরা তাহার আশা ত্যাগ করিত। এখন সে সব অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দেশের লোকেরাও তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া থাকে।

বেলুচীস্থানের উপর দিয়া সভ্যতার স্রোত যুগে যুগে অনেকবারই যাওয়া আসা করিয়াছে, কিন্তু দেশের লোকের উপর উহার কোনও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার হইয়াছে এমন দেখা যায় না। ইহারা অনেকদিন পর্য্যন্ত আদিমযুগের লোকের মতই জীবনযাপন করিত। দেশে কাঁহারও স্থায়ী বাসস্থান প্রায় ছিল না। সকলেই যাযাবরের মত দিকে দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। কৃষিকার্য্য এবং পশুপালন বরাবরই দেশে জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল। এখনও সেই ভাবই চলিয়া আসিতেছে। দেশে শান্তিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যের আদর বাড়িতেছে এবং বিস্তৃতিও হইয়াছে। পাঠান এবং বালোচেরা সাধারণতঃ নিজেদের চাষবাস নিজেরাই করিয়া থাকে। ব্রাহুইরা সেটা পছন্দ করে না। তাহারা বরং পশু চড়াইতেই ভালবাসে। জমিজমা যেটুকু থাকে প্রজা রাখিয়া সেটুকু চাষ করাইয়া লয়। ইহাদের মধ্যে দাস জাতীয় কতকগুলি লোক আছে (সংখ্যায় প্রায় ২২০০০)। তাহাদের মধ্যে পুরাতন দাসত্ব প্রথারই নিদর্শন দেখা যায়; কিন্তু এখন আর উহাদের উপর তেমন অত্যাচার হয় না—ইহারা মোটের উপর একরকম সুখশান্তিতেই দিন কাটাইয়া দেয়। কোনও কোনও শ্রেণীর লোকেরা কৃষিকার্য্য এবং পশুপালন দুই কার্য্যই করিয়া থাকে। মারী বাগ্‌তী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা শুধু পশুচারণের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যেই কৃষিকার্য্য, পশুপালন, পশুচারণ ইত্যাদি সকল কাজেই স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

দেশের আর্থিক অবস্থা অতি হীন, লোকের ঘরবাড়ী এবং থাকিবার ব্যবস্থা দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। সাধারণ লোকেরা হয় চেটাইয়ের ঘর করে আর না হয় লম্বা একটা দণ্ডের উপর কাল কাল কম্বল খাটাইয়া তাবুর ঘর বানাইয়া লয়। অনেক স্থলে দেওয়ালগুলি মাটীর গাথুনীতে পাথরে তৈয়ারী করে। ঘরগুলি খুব বড় বড়—বিশ পচিশ হাত পর্য্যন্ত। মাঝখানে একটা কিছুর সীমানা দিয়া ঘরের জায়গাটা দুইভাগ করিয়া ফেলে—একদিকে পরিবারের সকলে থাকে, আর বাকীটা পশুগুলির জন্য রাখে। সমতল ভূমিতে অনেক জায়গায় শুধু একচালার নীচেই অনেকে বাস করে। লাস্‌বেলা অঞ্চলে ঘরগুলি প্রায়ই কাষ্ঠের তৈয়ারী।

দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হওয়াতে বিবাহের জন্য বরের পক্ষ হইতে পণ দিতে হয়—পাঠানদের মধ্যে এই পণের পরিমাণ ৪০০।৫০০ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। সকল জাতির মধ্যেই যথাসম্ভব শীঘ্র বিবাহ করিবার চেষ্টা থাকে, কিন্তু এই পণ প্রথার দরুণ অনেকের ভাগ্যেই অধিক বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করা ঘটিয়া উঠে না। আবার বহু বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষাও সকলেরই আছে, কিন্তু সে সৌভাগ্য অতি কম লোকের অদৃষ্টেই ঘটে। বালোচ এবং ব্রাহুইদের মধ্যে প্রথম লক্ষ্য থাকে সাক্ষাৎ মামাত, মাসতুত, পিসতুত, খুড়তুত এবং জেঠাতুত ভাই বোনের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া। পাঠানদের মধ্যে পণের পরিমাণ দেখিয়া মেয়ের বিবাহ দেওয়া হয়—তাহাতে ভাই-বোনের সম্পর্ক থাকুক বা নাই থাকুক। বাল্য-বিবাহের প্রচলন খুব বেশী নাই। হিন্দুর চেয়ে মুসলমানদের মধ্যে আরও কম। পাঠানদের কাকার (Kakar) শ্রেণীর মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা দেখা যায়। তাহারা বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলেই ভাবী স্বামী-স্ত্রীতে সহবাস করিতে পারে। পাঠান এবং ব্রাহুইদের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রী স্বামীর ভ্রাতার অধিকারে আসিয়া পড়ে। দেশে পত্নী ত্যাগের প্রথা বর্ত্তমান থাকিলেও দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা যায়। বালোচ এবং ব্রাহুইদের মধ্যে ব্যাভিচারের শাস্তি উভয় পক্ষের মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু পাঠানেরা ঐ সব ক্ষেত্রে টাকা অথবা অন্য কোনরূপ পাওনা দেনাতে রফা করিয়া লয়।

দেশে বিভিন্নপ্রকার ভাষার প্রচলন আছে, তন্মধ্যে পস্তু (Pashtu), ব্রাহুই এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বেলুচীই প্রধান। পস্তু এবং বেলুচী আদিম ভারতীয় আর্য্য-ভাষারই শাখা, আর ব্রাহুই ডাক্তার গ্রিয়ারসন্‌ সাহেবের (Grierson) মতে দ্রাবিড়ীয় ভাষা হইতে উৎপন্ন। পশ্চিম বেলুচীতে—মেক্রানে কথিত হয় বলিয়া ইহাকে মেক্রানী ভাষাও বলে—অনেক পার্শী শব্দ ও অন্যান্য ভাষার সংমিশ্রন

আছে। এই ভাষাতে অনেকটা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। খাস্ বেলুচীস্থানে পস্তু ভাষাই প্রচলিত। জনসাধারণের সাহিত্য স্থানীয় ঘটনা, যুদ্ধের কথা এবং প্রণয়কাহিনী আশ্রয় করিয়া মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে।

দেশে ব্যবসাবাণিজ্য অতি সামন্যই ছিল। শিল্পের অবস্থাও তদ্রূপ। বর্ত্তমানে যে শিল্পের কাজ চলিতেছে, তাহাও বাণিজ্যের উপযোগী হইয়া উঠে নাই। কাজের মধ্যে হস্তশিল্পই চলে। তাহাও বেশীর ভাগ মেয়েরাই করে। তবে বিশেষত্ব এই যে মূল দ্রব্যজাত সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত সবই ইহারা নিজের হাতে করে। বেলুচীস্থানের সকল প্রকার শিল্প কার্য্যেই পারস্যের ছায়াপাত দেখিতে পাওয়া যায়। সূতার কাপড় এখানে ওখানে অনেক যায়গায়ই হয়; কিন্তু রেশমের কাজ হয় শুধু মেক্রানেই। পূর্ণিয়া এবং চট্টগ্রামের তৈয়ারী কাপড়ের সঙ্গে এখানকার কাপড়ের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সূচ এবং সেলাইয়ের কাজ খুবই প্রচলিত—বিশেষতঃ ব্রাহুইদের মধ্যে। একাজ বেশ উৎকৃষ্ট এবং অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। 'বেলুচীকম্বল' বলিয়া যাহা সাধারণের নিকট পরিচিত, তাহা খাটি বেলুচীস্থানের জিনিষ নয়—প্রায়ই আফগানিস্থানের আমদানি। দেশে সাধারণ রকমের কার্পেট তৈয়ারী হয়। পশমের কাজও কিছু কিছু আছে। দেশের লোকেরা রংএর কাজ খুব জানে। কোয়েটাতে পঞ্জাবের খোজারা সাধারণ পারস্য জাতীয় গোলাপ হইতে গোলাপজল এবং গোলাপের আতর তৈয়ারী করে। ক্রমেই দেশে শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে। রেশমশিল্প নিয়া পরীক্ষা চলিতেছিল, চেষ্টা বেশ ফলপ্রদ হইয়াছে—কোয়েটার রেশম উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। দেশে বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায় কেলাত রাজ্যে দ্রব্যের যাতায়াতের উপর শুল্ক। রেলের কথা ছাড়িয়া দিলে দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রধান বাহন উট। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যের কর্ত্তা সাধারণতঃ হিন্দুরা কান্দাহার হইতে মুসলমান বণিকেরা আসিয়া থাকে। সমুদ্রের ধারে ধারে খোজাদের সংখ্যাও কম নয়। অন্তর্বাণিজ্যে সব সময়েই যে মুদ্রার আদান প্রদান হয়, এমন নয়, দ্রব্য বিনিময়ও বেশ চলে। ভারতবর্ষ ছাড়া আর বাকী স্থলবাণিজ্য চলে পারস্য ও আফগানিস্থানের সহিত। কিন্তু ঐসব দেশে নানা প্রকার বাধাবাধি থাকার দরুণ বাণিজ্য তত প্রসার লাভ করিতে পারে না। আফগানিস্থান হইতে গম, ঘি এবং ঘোড়ার রপ্তানি একেবারে নিষিদ্ধ—এ নিষেধের যে একেবারেই লঙ্ঘন হয় না এমন নয়। আবার বাদাম রপ্তানিতে রাজ্যের একাধিপত্য, কিন্তু আমদানির উপর প্রভুত পরিমাণে শুল্ক নির্দ্দিষ্ট। 'নুষ্কি'র (Nushki Extension Railway) রেল হওয়াতে পারস্যের সঙ্গে বাণিজ্যের খুবই সুবিধা ছিল, কিন্তু ওদিকে মেশেদের (Meshed) উপর দিয়া কাস্পিয়ান রেলে (Trans-caspian Railway) রুষিয়ার দ্রব্যজাত আসিয়া পড়াতে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত; কিন্তু তবু মোটের উপর বাণিজ্যের প্রসার বেশই বাড়িতেছে। জলপথে এদিকে বম্বে, করাচী এবং পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, আরব দেশ এবং আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল পর্য্যন্ত বাণিজ্যের গতি চলিতেছে। দেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ভেড়া, ছাগল, অপরিস্কৃত পশম, কার্পেট, ফল, ভেষজ দ্রব্য এবং মেক্রান হইতে খেজুর ও মাছ। আমদানির মধ্যে প্রধান জিনিষ চাউল, চিনি, কাপড়চোপড়, বাসনপত্র ইত্যাদি।

শ্রীসত্যভূষণ সেন।

স্মৃতি-তর্পণ।*

হে দেব! বাণীর শ্রেষ্ঠভক্ত, লহ অন্তর-বন্দনা,
ভুলি নাই মোরা কীর্ত্তি তোমার, ভুলি নি গীতি মূর্চ্ছনা।
সন্তান-করে অপমান লভি ছিল যেই বাণী লাঞ্ছিতা,
করিলে যে তাঁরে সাধনার ধন, করিলে যে চির-বাঞ্ছিতা।
ছিল এক কোণে আঁখি অপমানে মলিন-বসন পরিয়া,
হৃদয়ের কমল-শুভ্র-আসনে নিলে তাঁরে তুমি বরিয়া।
প্রচারিলে তাঁর কীর্ত্তি ভুবনে, ঘুচাইলে ক্ষত যন্ত্রণা,
ধন্য বাণীর শ্রেষ্ঠভক্ত, লহ সবাকার বন্দনা।
জননীর গলে শোভিছে তোমার 'চিন্তা'-কুসুম-মালা,
সৌরভে তার মত্ত ভুবন,—দীপ্তিতে হৃদি আলা।
আজ বীণাপাণি মাতৃভাষা বাণী জগজন-প্রাণবন্দ্যা,
নহে দীনাহীনা মলিন-ভূষণা, সে যে আজ চিরানন্দা।
নবনব সুরে দিগ্‌দিগন্তে উঠিতেছে বীণা ঝঙ্কারি,
সঙ্গীতে ভরি বিশ্বভুবন, কোটি প্রাণে আশা সঞ্চারি।
তুমি জ্বালাইলে যে জ্ঞান-প্রদীপ উঠিয়াছে সে যে উজ্জ্বলি,
হিরণ বরণ-কিরণ তাহার চৌদিকে পড়ে উচ্ছলি।
প্রাণে প্রাণে আজ চলে যে যজ্ঞ তুমি দিলে তার মন্ত্রণা,
হে বাণী-পূজার মহা-পুরোহিত, লহ অন্তর-বন্দনা।
মিলিয়াছে হেথা ভক্তবৃন্দ করিতে শ্রদ্ধা অর্পণ,
এ স্মৃতি-বাসরে এস দেব এস, লহ সবাকার তর্পণ।

*　　*　　*　　*

ভারতীর শত উপাসক সনে এ জ্ঞান-প্রেমের তীর্থে—
যে মিলিল আজ রাজ-অধিরাজে, তাঁহারে এ কবি বন্দে।
রচিল যাঁহারা এ স্মৃতি বাসর—শ্রদ্ধার পারাবার,
তাঁহাদের সবে আজিকে আমরা জানাই নমস্কার।

*　　*　　*　　*

হে দেব! তোমার পুণ্য-আত্মা লউক সবার অর্চ্চনা,
সার্থক হউক পূজা-আয়োজন, ধন্য হৃদয়-বন্দনা।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

* পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজের উদ্যোগে বর্দ্ধমানাধিপতি মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে ঢাকা নগরীতে পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয়ের স্মৃতি-সভায় পঠিত।

কুশিনগর।

যে পবিত্রধামে গৌতমবুদ্ধ মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান ধর্ম্মতীর্থ। পালিভাষায় লিখিত প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই পবিত্রভূমি কুশিনারা (কুসিনারা) নামক রাজ্যের অন্তর্গত ও কুশিনারা নগরীর প্রান্তে স্থিত। বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে (jataka 5-3) জানা যায়, ওক্‌কক (ইক্ষাকু) পুত্র কুশ কুশাবতীর রাজা ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ এই কুশাবতী হইতেই কুশিনারা বা কুশিনগরের উৎপত্তি। গৌতম বুদ্ধের সময় কুশিনারা বারাণসী কিংবা শ্রাবস্তীর ন্যায় প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধিশালী ছিলনা। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে কুশিনারাকে জঙ্গল পরিপূর্ণ ক্ষুদ্রনগর (উজ্জঙ্গলনগরক, কুড্ডনগরক) বলা হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান এবং হুয়েন-সিয়াং উভয়েই গৌতমের নির্ব্বাণভূমি দর্শন করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন, উক্ত রাজ্যকে এবং রাজধানীকে যে নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহা কুশি-নগর বা কুশনগর (kiu-shi-na-kie-lo) নামে উক্ত হইয়া থাকে। পালিগ্রন্থোক্ত কুশিনারা এবং চীন-পরিব্রাজকদ্বয়োক্ত কুশিনগর এক অভিন্ন স্থান কিনা এবিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইতে পারে। যদি কুশিনারা এবং কুশিনগর দুইটি বিভিন্ন স্থান হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে চীনপরিব্রাজকদ্বয়কে যে স্থানটি স্থানীয় লোক দ্বারা গৌতমের নির্ব্বাণভূমি বলিয়া দেখান হইয়াছিল তাহা পালি গ্রন্থোক্ত স্থান নহে। যদি শেষোক্ত স্থানই প্রকৃত নির্ব্বাণভূমি হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে তাঁহারা একটা 'নকল' নির্ব্বাণভূমি দর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই প্রকার সন্দেহের কোন কারণ নাই। কুশিনারা এবং কুশিনগর একই অভিন্ন স্থান। ফা-হিয়ান গৌতমবুদ্ধের মৃত্যুর এক হাজার বৎসরে পরে এবং হুয়েনসিয়াং আরও দুইশত বৎসর পরে চীনদেশ হইতে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তখনও ভারতে তাঁহার ধর্ম্মের জলন্ত শিখা নির্ব্বাপিত হয় নাই, তখনও বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণভূমির প্রকৃত অবস্থিতিক্ষেত্র ভুলিয়া যায় নাই। কুশিনারার কোন স্থানটায় তথাগত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কোথায় কুশিনারাবাসিগণ কর্ত্তৃক তাহার শবদেহ ৭ সাত দিন পর্য্যন্ত পূজিত হইয়াছিল এবং কোন স্থানটায় দাহ করা হইয়াছিল ইত্যাদিরমহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে (Digah Nikoya vol II P. T. S edition) উল্লেখ আছে। হুয়েন-সিয়াং কুশিনগর দর্শন করিতে গিয়া এই সকল পবিত্র স্থানের বিবরণ এবং যে প্রকার চিহ্ন দ্বারা ঐ স্থান সকল তৎকালে নির্দ্দেশিত ছিল তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পুণ্যভূমি ভারতের বর্ত্তমান কোন জায়গাটা প্রাচীন কুশিনারা বা কুশিনগর, তাহা জানিবার জন্য স্বতঃই ধর্ম্মপিপাসুপ্রাণে তীব্র আকাঙ্খার উদয় হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাচীন পবিত্র ভূমি কালগর্ভে বিলীন রহিয়াছে। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিৎগণ গত ৭০ কিংবা ততোধিক বৎসর যাবৎ গভীর গবেষণা এবং অনুসন্ধান ও খননকার্য্যের বলে ভারতের অনেক অনেক প্রসিদ্ধ প্রাচীন লুপ্ত স্থানের উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে দেশবিখ্যাত স্যার আলেকজন্দর কণিংহাম সাহেবের নাম প্রথম উল্লেখ যোগ্য। তিনি সর্ব্বপ্রথম উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গোরক্ষপুর জিলায়স্থিত বর্ত্তমান কশিয়া গ্রাম বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানকে চীন পরিব্রাজক বর্ণিত কুশিনগর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং ১৮৭৬ সালে তাঁহার সহকারী কার্য্যকারক কারলিলি সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত কশিয়ার নিকটবর্ত্তী ধ্বংসাবশেষে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা কণিংহাম সাহেবের উক্ত ঘোষণা নির্ভুল সত্যরূপে কয়েক বৎসর যাবৎ গৃহীত হইয়াছে। হুয়েনসিয়াং কুশিনগর তীর্থে গমন করিয়া তদ্দৃষ্ট যে সকল প্রাচীন বস্তু তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কতকগুলি ১২০০ বৎসর পরে কশিয়ার বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। কারলিলি সাহেবের প্রধান বিস্ময়-জনক আবিষ্কার হইয়াছে হুয়েনসিয়াং বর্ণিত নির্ব্বাণ

মন্দিরের এবং তৎস্থিত মুমূর্ষু বুদ্ধের শয়ান মূর্ত্তির। হুয়েনসিয়াং তাহার ভ্রমণ কাহিনীতে নিম্নোক্ত প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন :—

"The capital of this country (kingdom of Kusinara) is in ruins and its towns and villages waste and desolate. The brick foundation walls of the old capital are about 10 b in circuit (I. e. 1$\frac{2}{3}$ mile). There are few inhabitants and the avenues of the town are deserted and waste. At the north-east angle of the city gate is a stupa which was built by Asoka Raja...........To the north west of the city 3 or 4 li (I. e. $\frac{1}{2}$ or $\frac{2}{3}$ mile) crossing the Ajitabati ('o-shi-to-fa-ti) river, on the western bank not far, we come to a grove of Sala trees..... ....where Jathagata died. There is here a great brick vipara in which is a figure of the Nirvana of Jathagata. He is lying with his head to the north, as if asleep. By the side of this vipara is a stupa built by Asoka Raja; although in a ruinous state, yet it is some 200ft in height. Before it is a stone pillar to record the Nirvana of Jathagata..........To the north of the city after crossing the river and going 300 paces or so there is a stupa. This is the place where they burnt the body of the Jathagata ....To the South west of the relic-dividing stupa going 200 li or so (about 34 miles) we come to a great village; here lived a Brahman of eminent wealth and celebrity...... Going 500 li (I. e. 84 miles) through the great forest we come to the kingdom of P'o-to-nisse (Baharas)" [Records of Western countries vol II pages 31—43]

কাশিয়ার বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষে যে উচ্চভূমি খণ্ড (mound) এখন স্থানীয় লোক দ্বারা "মাথা কুঁয়র কা কোর্ট" (Fort of matha kuar) নামে অভিহিত তাহা একটি প্রকাণ্ড স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কারলিলি সাহেব কশিয়া-স্থানে যাইয়া স্থানীয় অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া এই ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন স্তূপকে হুয়েনসিয়াং কথিত বিহার পার্শ্বস্থিত অশোক-রাজার স্তূপরূপে ভাবিলেন; ইহার পার্শ্বেই হুয়েনসিয়াং; বর্ণিত শয়ানবুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যাইবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি পার্শ্বস্থিত উচ্চ ভূমির একটি অংশের খনন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে দশফুট গভীর খনন করা হইলে একটি বিরাট শয়ান বুদ্ধমূর্ত্তি বাহির হইল এবং ক্রমশঃ আরও গভীর খনন কার্য্যের পর একটি মন্দির বাহির হইয়া পড়িল। কারলিলি সাহেব এই প্রকার আশানুরূপ আবিষ্কারে আপনাকে সফলকাম মনে করিলেন। তিনি আবিষ্কৃত মন্দিরটিকে হুয়েন-সিয়াং-উক্ত 'নির্ব্বাণ মন্দির' বলিয়া স্থির করিলেন। ইহারই ভিতর বিরাট শয়ান বুদ্ধমূর্ত্তি সিংহাসনোপরি প্রতিষ্ঠিত ছিল। শয়ানমূর্ত্তি এবং মন্দির মেরামত করাইয়া কারলিলি সাহেব সযত্নে রক্ষিত করিলেন এবং শয়ান মূর্ত্তির পিছনে প্রাচীরে একটি শিলাখণ্ড বসাইয়া তদোপরি ইংরাজিতে এই কয়েকটি কথা লিখাইয়া দিলেন :—This famous statue and temple of the Nirvana of Buddha were discovered and along with the adjoining stupa, excavated and the stutue which was found broken and scattered into numberless fragments, was entirely reconstructed, repaired and restored, and the temple also repaired and roofed in by—

	A. C. CARLLEYLE.
Kusnagara March 1877.	Asst. Archeological Surveyor
	Archeological Sarvey of India.

এই অভাবনীয় আবিষ্কারে বর্ত্তমান কশিয়ার এবং প্রাচীন কুশিনগরের অভিন্নত্বে কারলেলি সাহেবের এত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে তিনি তাঁহার স্থাপিত উক্ত শিলালিপিতে আবিষ্কারের স্থানকে কশিয়া না বলিয়া কুশিনগর বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে অভিন্নত্বে কণিংহাম সাহেবের যে একটু সন্দেহ ছিল তাহা এখন সম্পূর্ণভাবে দূর হইল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখিলেন :

"Mr. Carlleyle's great work of the season was the complete exploration of the ruins

at Kasia which I had already identifeid with the ancient city of Kusianagara, where Buddha died.........By his patient and methodical explorations at Kasia Mr. Carlleyle has fixed its identification without doubt. On the west side of the great stupa, he discovered the famous Nirvana statue of Buddha, just as it was described by the Chinese pilgrim Hiouen Tsiang. "It is quite certain that this statue is the same that was seen by the pilgrims, as there is an inscription on the pedestal......of two lines in characters of the Gupta period, etc. etc." (Preface to vol XVIII of the Aacheological Survey Reports.)

শয়ানমূর্ত্তির উক্ত লিপিটি সংস্কৃত ভাষায়, ইহা হইতে জানা যায়, যে ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি নির্ব্বাণপ্রাপণোম্মুখ শয়ানমূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন তিনি একজন মহাবিহার স্বামী (Superintendent of a Mahavihara) এবং তাহার নাম হরিবল। মূর্ত্তির নির্ম্মাতার নাম কালপ্রভাবে লিপিতে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। লিপিটি হইল এই প্রকার :—

"দেয়ধর্ম্মোয়ং মহাবিহার স্বামিনো হরিবলস্য।
প্রতিমা চেয়ং ঘটিতা দিনে ..মাথরেণ।"

(Vide Fleet's Gupta Inscription ; No 69)

লিপিতে কোন বৎসর তারিখ দেওয়া নাই কিন্তু যে অক্ষরে লিখিত তাহা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর অক্ষর অর্থাৎ হুয়েনসিয়াং এর ভারতভ্রমণের দুইশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে উক্ত বুদ্ধমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল।

যাহা হউক এই আবিষ্কারের দ্বারা এবং অন্যান্য উপায় দ্বারা (যথা জ্ঞাত স্থান হইতে কুশিনগরের দূরত্ব ও দিকের নির্দ্দেশ) বর্ত্তমান কশিয়াকেই চীনপরিব্রাজকদ্বয়োক্ত কুশিনগর বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। আধুনিক বৌদ্ধজগৎ এই সিদ্ধান্ত একপ্রকার নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিল এবং বর্ত্তমান যুগের বৌদ্ধভিক্ষুগণ কশিয়াস্থানে আসিয়া ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন কুশিনগর দেখিতে লাগিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক ভিনসেণ্ট এ, স্মিথ সাহেব তীব্র ভাষায় এই প্রকার সিদ্ধান্তের প্রথম প্রতিবাদ করিলেন। তিনি কশিয়াকে কুশিনগর বলিয়া একেবারেই গ্রহণ করিলেন না। তিনি ইহার প্রতিকূলে নানা যুক্তিতর্ক দেখাইলেন। হুয়েনসিয়াং এর (এবং পালিগ্রন্থের) উল্লেখানুসারে নির্ব্বাণভূমি কুশিনগর রাজধানীর উত্তর পশ্চিমে অজিতবতী (হিরণ্যবতী) নদীর পরপারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'মাথা কুয়র কা কোট' (Fort of the dead Prince" as rendered by Cunningham) 'কশিয়া নামক গ্রামের উত্তর পশ্চিমে নহে কিন্তু 'অনরুধবা' নামক অন্য একটি নিকটবর্ত্তী গ্রামের উত্তর পশ্চিমে। স্মিথ সাহেব বিশেষভাবে স্থানীয় অনুসন্ধান করিয়া অনরুধবা গ্রাম ও 'মাথা কুয়র কা কোটের মধ্যবর্ত্তী কোন প্রাচীন নদীর চিহ্ন পান নাই; পক্ষান্তরে ঐ মধ্যবর্ত্তী স্থানটি শক্ত উচ্চভূমি; তিনি চীনপরিব্রাজক-বর্ণিত প্রাচীর বেষ্টিত নগরের কোন চিহ্ন কিংবা উহার উত্তরে এবং উত্তর পশ্চিমে স্মৃতি-মন্দির ও স্তম্ভাদির ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন কিংবা রাজধানীর উত্তরপূর্ব্ব দ্বারে স্তূপের কোন চিহ্ন একেবারেই পান নাই; হিয়ানসিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কুশিনগরের উক্ত প্রকাণ্ড স্তূপটিকে ২০০ ফুট (উচ্চ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; স্মিথ সাহেব বলেন, বর্ত্তমান কশিয়ার ধ্বংস-প্রাপ্ত স্তূপটি কোন সময়েই ৮৫ ফুটের অধিক উচ্চ ছিল না; সুতরাং 'মাথা কুয়র-কা কোটের' স্তূপ কখনই কুশিনগরের স্তূপ হইতে পারে না; কশিয়াকে 'কুশিয়া লিখিয়া নামের সাদৃশ্য দেখানের চেষ্টা ভাষার উপর দৌরাত্ম্যের পরিচায়ক; বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষ গুলির সহিত কশিয়া গ্রামের কোন সম্পর্ক নাই বলিলেও হয় কারণ ইহারা কশিয়া হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত; হুয়েন-সিয়াং কুশিনগর হইতে বারাণসীর পথ দুর্গম ও দস্যুহিংস্রজন্তু সমাকুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কশিয়া হইতে উক্ত পথ তৎকালে তদ্রূপ হইতে পারে না। এবম্প্রকার আপত্তি উত্থাপিত করিয়া স্মিথ সাহেব কশিয়ার এবং কুশিনগরের অভিন্নত্ব খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

চীন পরিব্রাজকদ্বয় গন্তব্য স্থানে যাইয়া পরিত্যক্ত স্থান হইতে তাহার দূরত্ব এবং দিক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন

এই দূরত্ব এবং দিক্‌নির্দ্দেশের উপর বিশেষরূপ নির্ভর করিয়া স্মিথ সাহেব কুশিনগরের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফাহিয়ান এবং হুয়েন-সিয়াং গৌতমের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রাম হইতে এক পথেই ভ্রমণ করিয়া কুশিনগরে পৌঁছিয়াছিলেন। অশোক রাজাস্থাপিত 'রুম্মিনদেই শিলাস্তম্ভ' আবিষ্কৃত হইবার পর প্রাচীন লুম্বিনী গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থান সম্বন্ধে এখন কোন সন্দেহ নাই। ফা-হিয়ানের উল্লেখ মতে লুম্বিনী গ্রাম হইতে রামগ্রাম পূর্ব্বদিকে এবং ৩ যোজন; রামগ্রাম হইতে ছন্দকের প্রত্যাবর্ত্তন স্থান পূর্ব্বদিকে এবং ৫ যোজন; ছন্দকের প্রত্যাবর্ত্তন স্থান হইতে "ভস্মস্তূপ" ("Charcoal or Ashes stupa") পূর্ব্বদিকে এবং ৪ যোজন; ভস্মস্তূপ হইতে কুশিনগর পূর্ব্বদিকে এবং ১২ যোজন; উক্ত পথে লুম্বিনী হইতে কুশিনগরের দূরত্ব মোট ২৪ যোজন হইল। হিয়ানসিয়াং এর উল্লেখমতেও দূরত্বের পরিমাণ প্রায় সমান; তিনি যোজনস্থলে "লি" ব্যবহার করিয়াছেন (৪০লি = ১ যোজন) এবং তিনি ভস্মস্তূপ হইতে কুশিনগরের দূরত্ব উল্লেখ করেন নাই, কেবল দিকের নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই পথকে দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল বলিয়াছেন। ফাহিয়ানের দিক্‌ নির্দ্দেশে একটা গোলমাল আছে। তিনি কেবল পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ এই চারটি প্রধান দিকের উল্লেখ করিয়াছেন: তাঁহার পূর্ব্বদিক ঠিক পূর্ব্বদিক্‌ কিংবা দক্ষিণ পূর্ব্বদিক্‌ কিংবা উত্তর পূর্ব্বদিক্‌ এই তিনের একটা বুঝাইতে পারে; অন্য প্রধান তিন দিক্‌ সম্বন্ধেও এই প্রকার। হিয়ান-সিয়াং এর নির্দ্দেশমতে ভস্মস্তূপ ছন্দকের প্রত্যাগমন স্থান হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে এবং কুশিনগর ভস্মস্তূপ হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে; তাঁহার দিঙ্‌নির্দ্দেশই অপেক্ষাকৃত নির্ভুল।

স্মিথ সাহেব দেখাইয়াছেন যে চীনপরিব্রাজক দ্বয়ের উপরিকথিত লুম্বিনীগ্রাম হইতে দূরত্ব ও দিক্‌নির্দ্দেশানুসারে বর্ত্তমান গোরক্ষপুর জিলাস্থিত কশিয়া গ্রাম কিংবা নিকটবর্ত্তী কোন স্থান প্রাচীন কুশিনগর হইতে পারে না (Smith's article in J. R. As., 1902) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'রুম্মিনদেই শিলাস্তম্ভ' (Rammindic Pillo) আবিষ্কৃত হইবার পর প্রাচীন লুম্বিনী গ্রামের নির্দ্দিষ্টতা সম্বন্ধে এখন আর কোন মতদ্বৈধ নাই। মায়াদেবী লুম্বিনী উদ্যানে গৌতমকে প্রসব করেন। ৩০০ বৎসর পরে রাজা অশোক তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া এই পবিত্র স্থানে আসিয়াছিলেন; তাঁহা দ্বারা একটি শিলাস্তম্ভ এখানে প্রথিত হয় এবং উহাতে একটি লিপি উৎকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। বহু বৎসর মানবগোচরের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া এই শিলাস্তম্ভ বর্ত্তমান রুম্মিনদেই নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তম্ভটি এখনও দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে কিন্তু বজ্রপ্রহারে বিভক্ত; তৎপৃষ্ঠে লিখিত লিপি এখনও খুব স্পষ্ট ভাবে আছে। ইহার ভাবার্থ এই:—"প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) রাজ্যাভিষেকের বিংশতি বর্ষে স্বশরীরে আসিয়া পূজাদান করিয়াছিলেন এবং যেহেতু শাক্যমুনি বুদ্ধ এখানে প্রসূত হইয়াছিলেন সেইহেতু একটি শিলাস্তম্ভ উত্থিত করা হইল।" এতদ্বারা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যে স্থানে উক্ত স্তম্ভ এখনও দণ্ডায়মান সেই স্থানই প্রাচীন লুম্বিনী গ্রাম অর্থাৎ বর্ত্তমান রুম্মিনদেই ও প্রাচীন লুম্বিনী অভিন্ন, উভয় নামের সাদৃশ্য ও এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে। ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত বস্তিজিলার উত্তর হিমাদ্রির নীচে তিলাওনদীপারে রুম্মিনদেই অবস্থিত। স্মিথ সাহেব চীনপরিব্রাজকদ্বয়ের লুম্বিনী বা রুম্মিনদেই হইতে দূরত্ব ও দিক্‌নির্দ্দেশানুসারে বর্ত্তমান ধর্ম্মৌলি এবং চাম্পারণ জিলাস্থিত বিহার গ্রাম ও লৌড়িয়ানন্দনগড়কে (Lauria-Nandangarh) যথাক্রমে তাঁহাদের কথিত প্রাচীন রামগ্রাম "প্রত্যাবর্ত্তনস্থান" এবং ভস্মস্তূপস্থান বলিতে চান এই তিনটি স্থানেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সোমেশ্বর পর্ব্বতমালার উত্তর নেপালরাজ্যে অচিরবতী ও অজিতবতী নদীর সঙ্গম স্থানে (Junction of the Little Rapt with the Gandak) কুশিনগরের অবস্থান ছিল এই মত তিনি স্থাপন করিতে চান; কারণ লৌড়িয়ানন্দগড়ের (ভস্মস্তূপ) হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিকে এই স্থানে আসিতে হইলে বন ও পাহাড়ের উপর দিয়া যে দুর্গম আটাপথ আছে সেই পথটি ৮০।৯০ মাইল অর্থাৎ ফাহিয়ানের ১২ যোজন।

স্মিথ সাহেবের এই মতের বিরুদ্ধে কতকগুলি অকাট্য আপত্তি আছে। তিনি নিজেই নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। প্রথম আপত্তি এই যে কুশিনগর হইতে ফা-হিয়ান প্রাচীন বৈশালীর (modern Vasra) দিক (দক্ষিণ পূর্ব্ব) ও দূরত্ব (১৭ যোজন) নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নেপালস্থিত কুশিনগরের অনুকূলে নহে কিন্তু কশিয়ার বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের অনুকূলে; দ্বিতীয় আপত্তি—হুয়েনসিয়াং কুশিনগর হইতে বারাণসী প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তাঁহার উল্লেখ মতে বারাণসী কুশিনগর হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ৭০০ লি দূরে (১৩০ মাইল)

কিন্তু নেপালে কল্পিত কুশিনগর হইতে বারানসী নগরী হাটাপথে আরও অধিক দূর। ইদানীং ডাক্তার ভোগেল (Dr. Vogel) সাহেবের অনুসন্ধানে 'মহাপরিনির্ব্বাণ বিহারের' ও 'মকুটবন্ধ বিহারের' চারিশতাধিক শীল (Seals) কশিয়ার নিকট পাওয়া গিয়াছে। উক্ত দুইটি বিহার কুশিনগরের বিহার বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত; মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে বলা হইয়াছে যে 'মুকুটবন্ধের' নিকট তথাগতের শব দেহের দাহ করা হয়; ডাক্তার ভোগেল সাহেবের এই আবিষ্কার দ্বারা কনিংহাম সাহেবের মতই সমর্থিত হইতেছে; স্মিথ সাহেব ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন সম্ভবতঃ কশিয়াস্থানের সহিত নেপালস্থিত কুশিনগরের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অর্থাৎ প্রথমটি দ্বিতীয়টির অধীনস্থ একটি তীর্থস্থান ছিল; প্রধান তীর্থ (কুশিনগর) হইতে অধীনস্থ শাখা তীর্থে শীলযুক্ত বহু পত্র ও পার্শেলাদি প্রেরিত হইত। ইহাই হইল কশিয়াস্থানে উল্লিখিত ভগ্নশীল গুলি পাইবার কারণ।

স্মিথসাহেব কশিয়াস্থানকে পালি গ্রন্থোক্ত প্রাচীন 'বেঠদীপ' (বিষ্ণুদ্বীপ) বলিতে চান; কশিয়াতে বেঠদীপের শীল মোহর (Seal-die) আবিষ্কৃত হওয়াতে তিনি এই মতের পক্ষপাতী। কিন্তু এই Seal-die অন্যস্থান হইতে কশিয়াতে আনীত হইতে পারে। ১৯১১ সালে ডাক্তার ভোগেল সাহেব কর্ত্তৃক কশিয়ার ধ্বংসাবশেষ খনন কার্য্যের ফলে পূর্ব্বোক্ত শয়ান বুদ্ধমূর্ত্তির সংলগ্ন স্তূপে একটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে: ইহা দ্বারা স্মিথ সাহেবের মত আর টিকিতেছেনা। লিপিটি সংস্কৃত ভাষায়; কোন বৎসর তারিখ দেওয়া নাই, কিন্তু ইহার সহিত সম্রাট্ কুমার গুপ্তের কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া যাওয়াতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে লিপিটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর; এই তাম্র পত্রের দাতা হইলেন হরিবলের পুত্র ভিক্ষু ধর্ম্মানন্দ; হরিবল লিপিতে বিহারস্বামিন্ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই লিপির হরিবল এবং ১৮৭৫ খৃঃ আবিষ্কৃত পূর্ব্বোক্ত শয়ান মূর্ত্তির লিপির হরিবল যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লিপির শেষে এই কয়টী পদ আছে যথা, "নির্ব্বানচৈত্যে তাম্রপট্ট ইতি"; নি—অক্ষর এবং রেফটি লিপিতে দৃষ্ট হয় হয় না, কিন্তু শব্দটি 'নির্ব্বাণ' ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহাদ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে স্তূপে তাম্রপত্র রক্ষিত ছিল তাহাকে নির্ব্বানস্তূপ বা "নির্ব্বাণচৈত্য বলা হইত; বর্ত্তমান যে স্থানে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই স্থান প্রাচীনকালে (৫ম শতাব্দীতে) তথাগতের নির্ব্বান ভূমি বলিয়া গণ্য হইত (Pargiter's article in J. R. A. S. 1911)। স্মিথ সাহেব ইহার অস্বীকারে বলেন, সম্ভবতঃ বিষ্ণুদ্বীপ ও তাহার মতে বর্ত্তমান কশিয়া স্থান মহানির্ব্বাণ-চৈত্য বলিয়া পরিচিত ছিল।

যাহা হউক এবম্প্রকার অবস্থায় কুশিনগরের স্থান এখনও নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। প্রাচীন পালি-গ্রন্থের সাহায্যদ্বারাও কিছু নির্ণয় করা যায় না। দীঘনিকায়ের পূর্ব্বোক্ত সূত্র হইতে জানা যায় যে তথাগত বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে বেসালী (বৈশালী) হইতে কুশিনারার দিকে যাত্রা করেন; এই পথে যে সকল স্থান দিয়া তিনি গিয়াছিলেন তাহাদের কতকগুলির নাম পাওয়া যায়; যথা ভণ্ডগাম (ভণ্ডগ্রাম), হত্থিগাম (হস্তীগ্রাম) অম্বগাম, জম্বুগাম, ভোগনগর ও পাবা; ককুত্থা (ককুস্থা) নদী পার হইয়া কুশিনারাতে পৌঁছিয়াছিলেন এবং হিরণ্যবতী নদীতে অবগাহন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্থানগুলির বর্ত্তমান অবস্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করার চেষ্টা সুদূর পরাহত। তবে পালিগ্রন্থ হইতে বুঝা যায়, পথটি বৈশালী হইতে উত্তর দিকেই অর্থাৎ নেপালের দিকেই

ছিল। প্রাতঃস্মরণীয় Rhys Davids সাহেব বলেন,—চীনপরিব্রাজকদিগকে বিশ্বাস করিলে বলিতে হইবে যে মল্লবংশীয়দের কুশিনারা ও পাব রাজ্য শাক্যরাজ্যের পূর্ব্বদিকে বৈশালীর উত্তরে পার্ব্বত্য ভূমিতে অবস্থিতছিল।

শ্রীকুঞ্জলাল দাস।

ব্যর্থ

সবাকার কাছে লাঞ্ছিত হয়ে
এসেছি তোমারি দ্বারে,
মরম-ব্যথার সান্ত্বনা লাগি
কি রেখেছ মম তরে?
কত যুগ গেল পারিনি রচিতে
অর্ঘ্য মনের মত,
মরমে জড়িত বেদনা-পীড়িত
দুঃখ যাতনা যত;
নীরব বেদন, নীরব রোদন
লুকায় নীরব প্রাণে,
নয়নের জল নয়নে মিশায়
নিশিদিন অভিমানে।
হল না আমার পূজা-আয়োজন,
ফুলদলে উপচার,
তোমার চরণে দিতে অঞ্জলি,
পরাতে কণ্ঠহার।
এসেছে ঘনায়ে সাঁঝের আঁধার,
নামিয়া আসিছে রাতি,
পরে বল মোর দিবসের কাজ,
কেমনে জ্বালাব বাতি?
মনের হরষ, অধরের হাসি
হারায়ে গিয়েছে কোথা;
অপূরিত সাধ বিফল সাধন,
পরাণে রহিল গাঁথা।

শ্রীআশুতোষ রায়।

স্বপ্রকাশ-প্রেম।

সে মহাপ্রেমের অনলে যখন
জ্বলে উঠে সব প্রীতি
সে কথা কারেও ডাকিয়া বলা'র
নাহি কোনো দিন রীতি।
সবার দৃষ্টি করে তা' উজল
সবার আঁখিতে দেয় নববল,
সকল হৃদয়ে দূরে করে সে যে
গহন তামস ভীতি॥
রবি শশীসম তেজো গৌরবে
মাণিসম দীপনায়
কুসুমের সম নিজ সৌরভে
পরকাশে আপনায়।
পরকাশে সে যে ভাবে ভঙ্গিতে
সকল বচন কাজে ইঙ্গিতে
সে নহে গর্ব্ব, সে প্রেমোল্লাসে
ইহাই নিত্যনীতি॥

শ্রীকালিদাস রায়।

মিলন।

তোমার সনে আমার মিলন
চিরদিন এ হৃদয় মাঝে!
তোমার সুরে হৃদয় ভরা
তোমারি গান্ প্রাণে বাজে!
নিত্য সকাল সন্ধ্যাবেলা,
তোমার সনে আমার খেলা,
হেমন্ত কি শীত বসন্তে
তুমি আমার কাছে কাছে।
'শিশির' হয়ে চোখে থাক,
'শীতের হাওয়া' বুকে মাখ,
তোমার হাওয়া মলয় হয়ে
চিরদিন এ হৃদে রাজে!
তোমার সনে আমার মিলন
চিরদিন এ হৃদয় মাঝে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

সাহিত্যিক পত্র ।

(স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি. আই, ই, মহোদয়ের নিকট লিখিত । তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত) ।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের পত্র ।

16 Dec. 1895.

My dear Kali Prasanna Babu.

Your letter of the 1th Dec. has reached me out here in camp, and I have written to my publishers to send you thirty copies of Hindu Sastra as desired.

I have derived much pleasure from the perusal of your excellent book * which I have brought out with me in camp. I have not quite finished it yet but like it as far as I have read. Your style, need I tell you is delightful ?

I remain,
Sincerely yours
R. C. Datt.

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পত্র ।

33. Balaram Bose's Ghat Road
Bhowanipur, the 5th Assin 1301.

সবিনয় নিবেদন—

আপনার অনুগ্রহ লিপি ও অমূল্য উপহারদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া যে কি পর্য্যন্ত অনুগৃহীত হইলাম তাহা বলিতে পারি না। বঙ্গের শীর্ষ স্থানীয় লেখক যদি আপনাকে অপরিচিত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তদপেক্ষা দেশের দুর্দশা আর কি হইতে পারে ? কিন্তু এটি আপনার ভ্রম। প্রাসাদ হইতে কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আপনার যশঃসৌরভ বিস্তৃত, আপনি হয়ত তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সে কথা আপনাকে লেখা ভাল দেখায় না।

আমি পুনর্ব্বার প্রভাতচিন্তা ও নিভৃতচিন্তা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এ বিষয়ে শীঘ্রই আপনাকে পত্র লিখিব।

আমি এক সময়ে "বঙ্গের কবিগণ" নাম দিয়া এক খানি পুস্তক সংগ্রহ করিতেছিলাম। মহাশয়ের নিকট তাহার প্রথম কয়েক ফর্ম্মা পাঠানও হইয়াছিল। আপনি সে সময়ে তাহা দেখিয়া আমাকে টীকা সমেত সমগ্র বিদ্যাপতির পদাবলী মুদ্রিত করিতে বলেন, বোধ হয় আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। এতদিনে আমি আপনার সেই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইলাম। আমার বিদ্যাপতি মুদ্রিত হইতেছে। প্রকাশিত হইলে যদি পাঠ করেন তাহা হইলে পরম অনুগৃহীত হইব। ভরসা করি আপনি কুশলে আছেন।

বিনয়াবনত
শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

পুঃ নিঃ। আপনি কি হিতবাদী পাঠ করেন ? ঐ পত্রের উন্নতি কল্পে আপনার ন্যায় বিজ্ঞ বিচক্ষণ ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য লোকের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে নিতান্ত উপকৃত হইব।

স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র ।

শ্রীহরিঃশরণম্ ।

নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।
১৫ই আষাঢ় ১৩১৭ ।

কল্যাণবরেষু—

আপনার গত ১১ই আষাঢ়ের প্রীতিপূর্ণ পত্র ও শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত "মা-না মহাশক্তি" নামক পুস্তকখানি যথাসময়ে পাইয়াছি, এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। পুস্তক খানি পরম আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি, তবে এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিবার যে অনুরোধ করিয়াছেন সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ এই যে, এ পুস্তক (আপনার কথাই প্রয়োগ করিতেছি) "আবেগ বিহ্বলা ভাব ভক্তির অন্ধবিশ্বাস অথবা ঈষদুন্মাদিত কল্পনার আকস্মিক উচ্ছ্বাস" প্রণোদিত বাক্য নহে। ইহাতে আপনার পবিত্র হৃদয়ের গভীরভাব আপনার অসামান্য পরিমার্জ্জিত শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা পরিশোধিত হইয়া আপনার তেজস্বিনী অথচ মধুর ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে কাব্যের

---

* [illegible]

সৌন্দর্য্যের সহিত দর্শনের গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব মিলন লক্ষিত হয়। এরূপ পুস্তক এক নিশ্বাসে পড়িতে ইচ্ছা হইলেও ধীরে ধীরে না পড়িলে চলে না।

জগতের আদি কারণ যে মহাশক্তি, তাহা যে জড়শক্তি নহে একথা আপনার এই পুস্তক অতি বিশদ ভাবে দেখাইয়া দিতেছে। এবং এই পুস্তক পাঠে সেই জগন্ময়ী শক্তি যে জীবের অপূর্ণতাজনিত দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায় তাহাতেও সন্দেহ থাকে না। সেই শক্তির সহিত অভেদতাবোধ কি জ্ঞানী কি ভক্ত উভয়েরই চরমলক্ষ্য। সুতরাং জ্ঞানীর অদ্বৈতবাদ ও ভক্তের দ্বৈতবাদের বিরোধ পরিণামে কেবল কথার বিরোধ মাত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ উভয়েরই চরমলক্ষ্য এক। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্র।

শ্রীশ্রীকালী সহায়—

৯ই বৈশাখ, ১৩১২।

পরম কল্যাণবরেষু—

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষঃ—

নববর্ষসমাগম উপলক্ষে আপনার আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ পত্র প্রাপ্তে আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দানুভব করিলাম তাহা বাক্যাতীত।

অকৃত্রিম আন্তরিক সৌহার্দ্দ্যভাবপ্রণোদিত হইয়া আপনি যে আমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করিয়াছেন তাহাতে আমি যারপর নাই কৃতার্থবোধ করিলাম এবং অন্তরের অন্তস্তল হইতে আমার শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলাম। তবে যে আপনি আমার শতমুখে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন তাহাতে আপনি কেবল নিজ স্বভাবসুলভ সৌজন্য ও শীলতা মাত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আপনার ন্যায় সাহিত্যিক যশোমণ্ডিত সহৃদয় সজ্জন সুধীবিদ্যোর প্রীতি ও প্রশংসাভাজন হওয়া [illegible] ও গৌরবের বিষয় নহে। তবে আমি সে প্রশংসার কতদূর যোগ্য পাত্র সে স্বতন্ত্র কথা। আপনার প্রতি আমিও যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও আপনার গুণগ্রাম আদরজনিত সৌহার্দ্দ্যভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকি, বোধহয় মধ্যে মধ্যে অমৃত* বাবুর পত্রে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়া থাকিবেন। লিপিকুশলতায় আপনার ন্যায় আমার কৃতিত্ব নাই, নতুবা উপযুক্ত ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিতাম।………………কি বক্তৃতায়, কি লিখিত [illegible] গবেষণাময় জ্ঞানগর্ভ ও মার্জ্জিত অথচ [illegible] ভাব, আপনার স্বভাবসুলভ বিনীত ও উদারতামিশ্রিত অমায়িক ব্যবহার এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত আপনার মধুময় চিত্তাকর্ষক আলাপাদি কখনই বিস্মৃত হইবার নহে। * *

আপনি এ বয়সে যে পরিমাণ পরিশ্রম করেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়; কেবল আধ্যাত্মিক বলেই তাহা সম্ভাবপর বলিয়া বোধ হয়। কলির ব্রাহ্মণের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ যদি কিছু সুফলদ হয় তাহা হইলে প্রার্থনা করি দৈবক্রিয়া আপনার পক্ষে দ্বিগুণ ফলবতী হউক। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ আপনি স্বয়ং গ্রহণ করিবেন এবং "বান্ধব-কুটীর"স্থ আপনার পরিবারবর্গের প্রত্যেককে জ্ঞাপন করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক ও চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন শর্ম্মা ঠাকুর।

* দার্জ্জিলিঙ্গ ইত্যাদি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

বাদল-রাতে।

বাদল-রাতে কে এল গো
হৃদয় মাঝে মোর,
কার পরশে বাঁধন টুটি
ছুটল নয়ন-লোর?
হে অজানা বন্ধু আমার—
অন্ধকারের আলো,
নীরবে আজ আঁধার প্রাণে
আলোর শিখা জ্বালো।
যেদিন ছিল বাসন্তী রাত—
ছিল চাঁদের ভাতি,
সুখের দিনে দাওনি দেখা
দুঃখরাতের সাথী।
আজকে আমার নাইক কিছুই
ভুলেছি সব সঙ্গীতে,
ব্যর্থ হবে বন্দনা মোর
গাইতে গানের ভঙ্গীতে।
অচিন্ পথের যাত্রী আমার,
হে মোর চির-বন্দিত,
নয়ন জলের অঞ্জলিতে
করব তোমায় নন্দিত।

শ্রীভক্তিসুধা রায়।

VOL. 10. No. 6 & 7.

SEPT. & OCT., 1920.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY
RAI SHAHEB,
BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,
AND
SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) Rs. 5-8-0
Single Copy 0-8-0

REGINUS

To sufferers from bodily fatigue, nervous prostration, loss of memory, energy and manly spirit, constipation, loss of appetite sleeplessness, and other troubles, Reginus acts like magic. Bot. Re. 1 each.

DIABETES—the troublesome symptoms are quickly relieved. Excessive urination with discharges of Saccharine matter, high specific gravity, and all other troubles, are successfully combated. Bot. Rs. 3 each.

ASTHMA—with dry cough, hard breathing, with sticky phlegm, tightness of chest, heavy perspiration, sleepless night, periodical fits, etc. Cured completely with our specific remedy. Bot. Rs. 5 each.

Ranaghat Chemical Works,
Ranaghat, Bengal.

Edwards Tonic

The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.

Sole Agents :—**B. K. PAUL & CO.,** *7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.*

Cytogen — AN IDEAL DIGESTIVE TONIC WINE Invaluable in CONVALESCENCE from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c., Extremely useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite Indigestion, Acidity &c.,

INDISPENSABLE AFTER PARTURITION

Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.

B. K. Paul & Co.,
CALCUTTA.

Branch Sovabazar Street.

Head office :—7 & 12 Bonfield's Lane Calcutta. The Research Laboratory —18 Sashi Bhuson Sarker's Lane.

লুপ্ত-রত্নের পুনরুদ্ধার!

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'!

'বঙ্গদর্শন' আবার বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করুক! যে 'বঙ্গদর্শন' নব-যুগের নূতন বঙ্গ-সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, যে 'বঙ্গদর্শন' নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন শক্তিতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, আমরা সেই 'বঙ্গদর্শন' পুনর্মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছি। বাঙ্গালীর পক্ষে সুসংবাদ নহে কি?

রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

"বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা, তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়-রবিরশ্মি-সমুজ্জ্বল তুষার-কিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। * * * রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এতসত্বর এমন দ্রুত পরিণত লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।"

"বঙ্গদর্শন"ই বঙ্গসাহিত্যের সেই তুষার কিরীট।

চারি বৎসরের চারি খণ্ড 'বঙ্গদর্শন'

আমরা প্রকাশিত করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবর্ত্তিত ও সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' নিতান্ত দুর্লভ, এক সেট 'বঙ্গদর্শন যদি বা দৈবাৎ পাওয়া যায়, তাহাও

১৫০৲ দেড় শত, ২০০৲ দুই শত টাকা মূল্যে

কিনিতে হয়! এমন বাঙ্গালী পাঠক নাই, যিনি 'বঙ্গদর্শনে'র নাম শুনেন নাই। কিন্তু কয়জন চোখে দেখিয়াছেন? সাহিত্যের যে মন্দাকিনীধারায় বাঙ্গালা নব-জীবনে সঞ্জীবিত, 'বঙ্গদর্শন' যে তাহার গঙ্গোত্রী, তাহা আজ কে অস্বীকার করিবে? সেই সুদুর্ল্লভ 'বঙ্গদর্শন' আমরা অত্যন্ত সুলভ মূল্যে আপাততঃ কেবল

'সাহিত্যে'র গ্রাহকগণকে

দিবার ব্যবস্থা করিলাম; কিন্তু এই দুর্ম্মূল্যের দিনে কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই প্রভৃতির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির সময়ে তাঁহাদের পক্ষে

প্রথম বৎসরের মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র

নির্দ্দিষ্ট হইল। 'বঙ্গদর্শনে'র বার্ষিক মূল্য ছিল—তিন টাকা ছয় আনা। এখন তাহা অমূল্য। অসম্ভব মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না।— **সেই 'বঙ্গদর্শন' 'সাহিত্যে'র গ্রাহকগণ দুই টাকায় পাইবেন।**

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যে আকারে, যে অক্ষরে, ছাপা হইয়াছিল, আমাদের সংস্করণও ঠিক সেইরূপ ছাপা হইবে। অর্থাৎ, ইহা—**Fac-similie** সংস্করণ।

এ বৎসর "সাহিত্যে"র উৎকর্ষবিধানের যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে।—প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উপন্যাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির ছোট গল্প "সাহিত্য"কে আরও সমৃদ্ধ করিবে।

যাঁহারা তিন টাকা দিয়া চৈত্র মাসের মধ্যে 'সাহিত্যে'র গ্রাহক হইবেন, অর্থাৎ 'সাহিত্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের মূল্য দুই টাকা, মোট পাঁচ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারাই এই অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন—

ম্যানেজার, সাহিত্য।

২।১, রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

পাঠের ও উপহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।

মূক ও বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক
শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন প্রণীত

নল-দময়ন্তী

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কয়েকখানি বহুবর্ণের চিত্র ভূষিত। বেগুণি রংএর সাটীন কাপড় মনোরম প্যাড্ বাঁধাই—তদুপরি একখানি তিন রংএর চিত্র পরিশোভিত। বাঙ্গালা ভাষায় উপহার দিবার এমন সরল সুন্দর মধুর পুস্তক আর একখানিও নাই।

মালঞ্চ সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত
এম, এ প্রণীত

ভারতনারী

সিল্কের কাপড়ে প্যাড্ বাঁধাই মূল্য ১৷৷০
সাটীন কাপড়ের শোভনরাজসংস্করণ—মূল্য ২৲
বহু চিত্র ভূষিত অদিতি, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সতীলক্ষ্মী আর্য্যনারীগণের চিরপূজ্য আদর্শ কাহিনী। বাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই নিত্য পাঠ্য।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ সম্পাদিত

(বঙ্গদেশের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক স্কুলসমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত এবং কলিকাতা ইউনিভারসিটী কর্ত্তৃক মহিলাদিগের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট)

কাশীদাসী মহাভারত (সচিত্র) মূল্য ৩৷৷০

কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সচিত্র) মূল্য ২৷৷০

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চিরসমাদৃত—বাঙ্গালী জীবনের চিরমধুময়—চির নবীন রূপ কথা!

ভূতপূর্ব্ব শিশু সম্পাদক শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ঠাকুরমার ঝোলা বা বাঙ্গালীর রূপকথা

যেমন সুন্দর কাগজ—তেমন সুন্দর নির্ভুল ছাপা—তেমনি সুন্দর ঝকঝকে বাঁধা আবার তেমনি সুন্দর সুন্দর রাশি রাশি ছবিতে ভরা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

Amrita Bazar Patrika says, "AN INIMITABLE PRODUCTION."

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয় বলেন—"...ইহাতে বাল্যৈশব পরিচিত সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর কথা, ডাইনী রাক্ষসীর কথা,...পিঠে গাছের কথা ত আছেই আবার পুষ্পকুমার, শঙ্খরাণী প্রভৃতি সুকোমল নামের ও ততোধিক সুকোমল প্রকৃতির নায়কনায়িকার কথা সরল ভাষায়, সুন্দর ভঙ্গীতে, কল্পনার তুলিকায় কবিত্বের উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে......।"

সত্য বাবুর নূতন পুস্তক—অভিনব শিশু উপন্যাস

মূল্য ৸০] **দগোবার্ট** [মূল্য ৸০

ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লিখিত প্রভুভক্ত কর্ম্মবীরের অলৌকিক কাহিনী। এরূপ ছেলেদের উপন্যাস আর বাহির হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
৬৫নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।

A HISTORY OF EDUCATION IN ANCIENT INDIA.

BY

NAGENDRA NATH MAZUMDER, M. A., B. T.

Professor, Dacca Training College

WITH AN INTRODUCTION

BY

E. E. BISS, I. E. S.

Principal, Dacca Training College.

MACMILLAN & Co.

Calcutta.

Price Re. 1-8-

Sir Gooroodass Banerjea writes :—"The book presents in a well-arranged form and within a short compass much useful information regarding ancient Hindu culture."

Babu Hirendra Nath Dutta, M. A., P. R. S. says : "I have gone through it (Education in **Ancient** India) with interest. You have broken new ground and opened up a fruitful and **interesting** field."

Dr. Brajendra Nath Seal, (George V Professor of Philosophy, Calcutta University) writes :- **I have** read with great pleasure Mr Nagendra Nath Majumdar's "History of Education **in** Ancient India." As a clear and interesting account of the ideals and practices of the **Ancient** and Mediaeval Hindus in the sphere of Education it is eminently suited to serve as **an** introduction to the study of the subject.

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শক্তি ঔষধালয়

ঢাকা — চক্রবর্ত্তী — হিন্দু কেমিষ্ট ও ফিজিসিয়ান

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১২নং ?ডন ষ্ট্রীট। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হ্যারিসন্ রোড্ (হাওরা পুলের নিকট) শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ ১৩৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—১১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—৭২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের।	দাদ্‌মার—৵০ কৌটা।	বহরের ননী—৸০ শিশি।
———	(এক দিনে দক্র নিশ্চয় আরোগ্য)।	(নালীঘা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহৌষধ)।
পঞ্চতিক্ত ঘৃত—৪৲ সের।	———	
———	দশন সংস্কারচূর্ণ—৵০ কৌটা।	———
কামদেব ঘৃত—১২৲ সের।	(সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ)।	অমৃতারিষ্ট—৸০ আনা শিশি।
স্মৃতিশক্তি বৰ্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায়।	সারিবাদ্যারিষ্ট ৩৲ সের।	(ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত ও
ব্রাহ্মীঘৃত—৬৲ সের।	(রক্তদুষ্টি বাত বেদনার মহৌষধ)।	সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ।

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শক্তি বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি. এ.

হিন্দুকেমিষ্ট এবং বোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Sir Henry Wheeler, K. C. I. E.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M.A.
„ Sir N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. Donald, C. I. E., I. C. S.
„ Mr. W. W. Hornell, C. I. E., M. A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. G. Cumming, C. S. I., C. I. E.
„ F. C. French, C.S.I., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
D. G. Davies Esq., I. C. S.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur, M.A.
„ Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
„ J. C. Kydd, M. A.
„ W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
„ T. T. Williams M. A., B. Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
G. H. Langley, M. A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc.
Debendra Prasad Ghose

Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagpor, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.
The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.
The „ Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
The Hon'ble Sir Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
„ Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S.
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Hirendra Nath Dutt, M. A., B. L.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra.
„ Jagadananda Roy.
„ Binoy Kumar Sircar.
„ Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law
Principal, Lahore Law College
Khan Bahadur Syed Abdul Latif.

CONTENTS.

Rhythm in Nature	F. W. Flattely	89
Lost in the Desert	...	97
Sabhar; and its King Harischandra (Eastern Bengal Notes and Queries No. III) ...	H. E. Stapleton, M.A., B. Sc., N. K. Bhattasali, M.A., H. N. Ghose, B.A. and J. T. Rankin, I.C.S. ...	105
The Romance of the Smyrna Fig ...	Charles Ray, (Chambers' Journal) ...	117

সূচী

১।	গান	৺ রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি-আই-ই	৭৭
২।	বাঙ্গালায় অন্যার্থক ধাতু	শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্, এ, ...	৭৮
৩।	লক্ষ্মীপূর্ণিমায় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ	৮১
৪।	দক্ষিণাপথ ভ্রমণ	মাননীয় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কেটি, সি, এস্, আই	৮১
৫।	শাক্তপূজা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্. এ, বি এল্, ...	৮১
৬।	পলাতক (গল্প)	শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ...	৮৫
৭।	মোহানার পথে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ, ...	৮৭
৮।	জমাখরচ	৺ রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি-আই-ই	৮৯
৯।	গুপ্তবংশ	শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	৯৫
১০।	শিল্পীর প্রতি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি, এ, ...	১০৫
১১।	সাহিত্যিক পত্র	... ...	১০৬
১২।	আশার কুহক (কবিতা)	শ্রীযুক্তা ভক্তিসুধা রায়	১১০
১৩।	ভাইফোঁটা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ কর	১১১

BANGIYA SAHITYA PARISHAD

THE DACCA REVIEW.

VOL. X. | SEPT. & OCTOBER, 1920. | No. 6 & 7.

RHYTHM IN NATURE.

BY F. W. FLATTELY,

Senior Assistant in Zoology, University, Aberdeen.

That so many phenomena in Nature should be of a recurrent or periodic type is not surprising when we consider that the earth on which we live forms part of a rhythmic universe. From the biological point of view, however—and it is with the biological aspects of rhythm that the writer is concerned—these phenomena, though possibly all of the same nature fundamentally, must, for practical purposes, be regarded as of two distinct kinds.

We have, in the first place, the numerous cases of periodic behaviour in response to, or imposed by, external factors of a cosmic nature, such as the alternation of night and day, the regular and ever-recurring sequence of the seasons, the ebb and flow of the tides, and so on. Here the mainspring of the rhythm is obviously external. In contrast to this, however, are the cases of the second type in which the rhythm is not dependent on the environment, but is of an intrinsic or vital nature, and corresponds to something inherent in the organism.

The periodicities of this latter type may all be regarded as identical except as regards the time factor. They are of the nature of *age-cycle.*

In temperate countries, where the difference between the seasons is very marked, the periodical phenomena of plants and animals take place at about the same time in all species. With us, in consequence, the seasons have come to typify the chief stages in the life-cycle of plants and animals. Not-withstanding this, the phenomenon of an age-cycle must be regarded as something intrinsic in the organism and not merely as the result of environment, the synchronising of the stages of the age-cycle with the seasons being of a secondary nature. "In Europe," says Bates,[1] "a

1. Bates, H. W., *The Naturalist on the Amazons.*

woodland scene has its spring, its summer its autumnal aspects. In the equatorial forests the aspect is the same or nearly so every day in the year: budding, flowering, fruiting, and leaf-shedding are always going on in one species or other. The activity of birds and insects proceeds without interruption, each species having its own separate time; the colonies of wasps, for instance, do not die off annually, leaving only the queens as in cold climates; but the succession of generations and colonies goes on incessantly. It is never either spring, summer, or autumn, but each day is a combination of all three."

The age-cycle, with its sequence of birth, growth, maturity, decay, and death is the most typical and most inevitable phenomenon in Nature. It is not only the normal sequence in the organism as a whole, but the phenomena of senescence and rejuvenescence are continually being repeated *within* the organism. These internal periodicities are of essentially the same character as the age-cycle of the organism, except as regards the time factor. "In cells" says Child,[1] where function is accompanied by extensive accumulation and discharge of substances, such, for example, as the gland cells, storage cells, etc., the cycles of activity and morphological change are essentially age-cycles—that is to say the period of loading of the cell is a period of decreasing metabolic activity, of senescence, and the period of discharge one of increasing activity, of rejuvenescence, which makes possible a repetition of the cycle." In the pancreas of the toad for example, the cells, when ready to secrete, are loaded with granules, and in this condition are only very slightly active metabolically. As the cell secretion is discharged, the granules gradually disappear to a point when they are practically absent. In this condition, the cell is again capable of a high rate of metabolic activity; if nutrition is present, the process of loading occurs once more. This cycle of changes, which may occur within a few hours, and which may be repeated within a single cell, Child believes, is not fundamentally different from the age-cycle of organisms. It exhibits all the essential features, up to a certain point, of senescence and rejuvenescence. The cell undergoes changes similar to those of the age-cycle, though their period is short. At the same time, as Child says, the gland cell may be undergoing senescence in the stricter sense—that is to say, changes in the more stable framework of the protoplasm may be occurring which are not wholly compensated by the functional cycle.

According to Benjamin Moore,[2] the living cell may be regarded, from the physico-chemical point of vew, as a

1. Child, C. M., *Senescence and Rejuvenescence.* (University of Chicago Press, 1915.)

2. Benjamin Moore, *The Origin and Nature of Life.* (London: Williams and Norgate, 1920.)

peculiar energy transformer: chemical energy in the living cell being converted by the colloidal structure into biotic energy, this latter being convertible into mechanical energy, electrical energy, heat energy, or chemical energy. Like all energy transformers, living cells have their phasic periods or revolution time in which they pass through a cycle or oscillation, the period varying from one type of cell to another.

The contraction of the heart is an example of a vital rhythm which can escape nobody. The series of movements taking place in the heart during one complete beat constitutes what is know as a "cardiac cycle." This again, is essentially an age-cycle, although the rapid recovery after fatigue tends to obscure its real nature. Disregarding the immediate causes underlying the repetition of the cycle, the point to notice is that, rhythm is associated with efficiency. The rhythmic method represents the best means of accomplishing a purpose, and may, in fact, be regarded as an evolutionary goal towards which all life processes are tending. To take a concrete example: It is certain that the circulation in vertebrates is both a more orderly, and a more efficient process than the flow of blood in an animal, let us say, like an earthworm. The correctness of this view of coupling rhythm with efficiency is supported by the phenomenon of the disordered and and arhythmical action of the heart and lungs in disease. The loud "bourdon" of the engines at a power-station conveys a most distinctly rhythmic impression, and a practised ear can readily detect the smallest of functional troubles by the modification of the normal rhythmic note.

We now turn to cases of periodicity of the external type.

It is well known that not a few diseases, particularly those like malaria, produce markedly periodic symptoms. It is an interesting fact, however, that not only does the malarial parasite itself show regular development cycles within the organism, but the mosquito, the carrier of the parasite, is markedly periodic in its habits. Some interesting observations have been made on the flight of the mosquito in the course of the construction of the Panama Canal.[1] Gatun, about seven miles south of Colon, is one of the largest settlements in the Canal zone. Between January and March 1913, more mosquitoes were found there than in any settlement since the beginning of work on the Canal. The weekly catch of *Anopheles* was from 7,000 to 20,000 Just to the south of Gatun is a lake which seemed a likely breeding-ground for mosquitoes, but it was soon found that they did not have their origin here. To the west of Gatun across a part of the old French canal there was some flat land into which sea-water and mud from the American

1. Le Prince, J. A. and Orenstein, A. J., *Mosquito Control in Panama.* (London. Putnam, 1916.)

canal were being pumped. This land was so located that, to reach the settlement, adult mosquitoes would have to, fly from half a mile to a mile across, or at right angles to, the stiff breezes which prevail at Gatun. It was eventually discovered "that a regular purposive flight of mosquitoes towards the town took place in the evenings before nightfall from 6. 30 to 7 p. m. After dark the flight was reduced to practically nothing. During the period of flight, the observers were bitten continuously. After the flight ceased, the observers were bitten only once or twice in an hour's time. A return flight began at 6 a. m. and took place with extraordinary rapidity. As daylight became stronger, the speed of the returning *Anopheles* increased. The termination of both forward and return flights was remarkably abrupt. One observer said the flight stopped with almost mechanical precision when there was too much daylight or too much darkness."

Willey[1] records an interesting example of periodic habit occurring among crows and so called "flying foxes" (really fruit-eating bats) on the coast of Ceylon. At one place, a small lighthouse islet off the coast of Ceylon, they congregate in the palm-trees alternately by night and by day. "At sundown," says Willey, "the passage of immense flocks of crows and flying foxes in opposite directions across the strait which divides the island from the mainland can be witnessed, the former bound for the island to rest for the night, the latter speeding their way to the mainland intent upon their nocturnal forage......The reverse passage —namely, the matutinal flight—takes place towards sunrise, the bats returning from the mainland to rest for the day suspended in rows from the midribs of the palms-leaves, the crows crossing over on their daily quest for garbage." As a result of these markedly periodic habits, the two classes of animals are able to make their homes in the same trees, without in the slightest degree interfering with each other.

The effect of external periodicities on the organism and its behaviour is nowhere better seen than on the seashore. The case of *Convoluta roscoffensis* is perhaps too familiar to need much description. *Convoluta roscoffensis* is a minute, elongated flat-worm covered with cilia, and containing green algal cells living with it symbiotically. Its habitat is a narrow strip of sandy beach on the coasts of Normandy and Brittany situated at the level reached by highwater at the slackest of neap-tides. Though of very small size, the worms occur in such enormous numbers as to form at low tide great patches of green scum. As the tide laps the edges of the colony the green patches disappear, the worms remaining beneath the surface till the next ebb-tide. Twice during 24 hours the zone occupied by the colonies is submerged and the animals

1 Willey, A., *Convergence in Evolution.* (London : Murrary, 1911.)

live in darkness under ground, and twice the zone is uncovered and the animals rise to the surface. The burrowing reaction is due to the necessity of avoiding extermination by wave-shock, the upward movement is determined by the presence of the algal cells and their light requirements. The egg-laying of *Convoluta roscoffensis* is also periodic, and is related in a remarkable way to the rhythm of the tides. Egglaying begins with the onset of the spring tides and continues for a week. The reason for this is as follows: In the summer, the time of year when these observations were made, the low-water of spring tides at Roscoff occurs about midday and midnight.[1] When, however, the zone occupied by the Convolutas is uncovered during the night-time, the animals in the absence of light do not rise to the surface. Hence, during the spring tides, the worm has an uninterrupted period of some 18 hours in which to lay its eggs. Experiments in the laboratory have shown that egg-laying reaches its maximum when the animals are not obliged to come to the surface twice in 24 hours—that is to say, when they can have the longest possible spell of darkness; in other words, the conditions most favourable to egg-laying occur when the moon is full or new—a remarkable example of the effect of the tides on the habits of shore animals.

Shore animals like the common periwinkle, for instance, are submitted to a double periodic influence: the rhythmic ebb and flow of the sea and the alternation of day and night. The existence of periwinkles comprises regularly alternating periods of active life in the water or moist air (at high tides) and periods of suspended animation within their shell. This constant reaction to the tidal rhythm is not without a profound influence on the functions of the organism. For instance, inert periwinkles, even in a dry environment, can be reactivated by shaking; but, according to Bohn, the reactivation occurs much more readily at certain times and hours. Bohn[2] states that if a collection of these molluscs has been isolated for a certain length of time in a laboratory, it is easily demonstrated that, at periods of low tide, one has to shake much longer to produce the reactivation than when the tide is high. That is to say, the periods of inertia in the laboratory correspond to the periods of desiccation on the shore.

The impress of the external rhythm on the organism is, of course, not permanent, but becomes gradually weaker with the passage of time. Numerous similar cases occur, both in plants and animals, but the above are sufficient for our purpose.

1 Keeble, F., *Plant-Animals*. (Cambridge: University Press, 1910.)

2 Bohn, Georges, *Institut Psychologique: Travail du Groupe d'Etude de Psychologie zoologiqu. Memoire I: Attractions et Oscillations des Animaux marins sous l'influence de la lumiere*. (Paris, 1905.)

It is common knowledge that in many animals the colour is not fixed, but varies according to the hue of their surroundings. This power of colour change has been investigated most minutely in the case of the Æsop prawn (*Hippolyte varians*).[1] The colour of this crustacean is extremely variable, the change in coloration being brought about by the expansion or contraction of masses of pigment. The cells in which the pigment is situated are very irregular in form, with branched processes. On appropriate stimulation, the pigment flows out along these branching spaces in such a way that what was a mere pin-point of pigment becomes spread out over a wide surface. The result is a change in coloration. The Æsop prawn owes its colour to three pigments—red, yellow, and blue. In the daytime, the many changes of colour, in response to varying surroundings, are due entirely to the red and yellow pigments. At nightfall the colour of Hippolyte, whatever it may happen to be at the time, changes to a transparent azure blue, this blue colour being replaced at daybreak by the prawn's diurnal tint. The Æsop prawn thus exhibits rhythmic colour-change corresponding to the transition from light to darkness and vice versa.

So far the cases we have been considering of rhythmical behaviour are all of a clear-cut and simple kind, being directly due to the succession of the seasons, the regular alternation of night and day, the ebb and flow of the tides, etc.; moreover, the nature of those latter phenomena is also well understood. On the other hand, the causes underlying the now well-established cyclical changes of climate are not only themselves decidedly complex, but there is still a great deal to be learned about their effects in relation both to animals and mankind.

The first type of climatic change, and the best known, is that of the Glacial Period. It is now known that the Glacial Period was not a continuous period of intense cold, but was punctuated by epochs in which the weather was much warmer, and when the retreat of the ice-sheet allowed many animals and plants to regain, temporarily at any rate the ground they had been obliged to cede. These fluctuations of climate are believed to have affected the whole world simultaneously, and it is certain that the whole of the Northern Hemisphere was affected.

The second type of climatic change is less familiar, having been only recently established. Brickner, Clough, and and others consider that the whole world passes through a climatic cycle once in every thirty-six years. At one end of the cycle the climate of continental regions for a period of years is unusually cold and wet, with relatively frequent storms; at the other the climate is warmer and drier, with high barometric pressure and few storms. The extremes

[1] Keeble, F. and Gamble, F. W., *Phil. Trans. Roy. Soc.*, B, vol. cxcvi. (London, 1904.)

of low temperature are ascribed, somewhat paradoxically it may seem, to periods of maximum solar activity as shown by the number of sun-spots and the rapidity with which they are formed.

The Swedish hydrographer, Petersson has published data showing the importance of these climatic cycles to the study of hydrography, and thence to the study of fish-migrations.[1] Increased solar activity results in oceanic circulation being more intense. As a result of this, the Baltic, the water of which is normally distinctly brackish, receives a greater quantity of salt water from the Atlantic. Owing to the increased oceanic circulation outside, large quantities of water are pumped into the Baltic through the narrow neck between the Skager Rack and the Kattegat. As a result of the increased salinity of the Baltic, the herring shoals are enabled to extend their migrations to this sea, which is normally closed to them owing to their intolerance of water with a low salt content. The times of the appearance of herring in the Baltic thus correspond to the periods of increased solar activity ; in other words, the appearance of herring in the Baltic is a regularly periodic phenomenon.

A recent American expeditron to Turkestan has brought to light regular cycles of wet and dry climate in this region. One of the most convincing pieces of evidence of these climatic cycles is furnished by the changes of level which can be traced in the water of the Lop Nor basin, a huge enclosed area about three times as large as the British Isles, situated in the heart of the Asiatic Continent. Ths periods of drought result in periods of famine which cause the nomadic races, which live on lands too dry for agriculture, to migrate and so come into conflict with the peoples of more favoured regions. The wave so started, say in the centre of Asia, propagates itself in ever-widening ripples, the most remote of which may even be the cause of a commerical crisis as far away as the United States. Anyone who has lived for a few years in Southern Italy cannot fail to marvel how the old Romans could ever have achieved so much if the climatic conditions were as enervating as they are now. But evidence is forthcoming to show that such was not the case.

The historien, Gibbon,[1] mentions two remarkable facts which tend to show the climate of Europe in Roman Imperial times was much colder than it is now. The Rhine and the Danube were frequently frozen over and capable of supporting the most enormous weights, a thing unparalleled in modern times. In the time of Cæsar, the reindeer, now confined to the area around the Poles, was a native of the Herecynian

[1] Petersson, Otto, *Der Fischerbote*. III, Nr 7, 8, 9. (Hamburg, 1911.)

[2] Ellsworth Huntington, *The Pulse of Asia*. (London : Constable, 1907.)

[1] Gibbon, E., *Decline and Fall of the Roman Empire*, chap. I.

forest which then covered a great part of Germany and Poland. To quote Mr. Huntington: "Apparently the climate of the earth is subject to pulsations of very diverse degrees of intensity and of varying length. The Glacial Period as a whole represents the largest type of pulsation; upon it are superposed the great pulsations known as glacial epochs, each with a length measured probably in tens of thousands of years; their steady progress is in turn interrupted by smaller changes of climate such as those of which evidence has been found during historic times in Central Asia; and, finally, the climate of the world pulsates in cycles of thirty-six years."

In spite of the undoubted influence of climate, it would seem that the growth and decay of successive civlisations is in great part a biological phenomenon analogous to the age-cycles referred to above, although the matter is evidently far too complex to allow one to generalise with safety.

According to Prof. Flinders Petrie,[2] as quoted by Spurrell,[3] "there have been eight distinct periods of civilisation in Europe, from the earliest dawn of civilisation in Egypt, the duration of each period tending to be longer than its predecessor; and the intervals are marked by an inrush of barbarian races and an interlude of destruction and admixture of blood." Prof. Petrie founds his analysis of civilisation on sculpture, on the grounds that sculpture is available over so long a period and is so easily presented to the mind. In the sculpture of every period can be seen the same sequence of growth and decay. The archaic stage, in spite of crudity, is invariably marked by boldness and vigour. Next, the treatment loses its archaic character and becomes more free, the details being more skilfully subordinated to the whole. From this point the period of highest achievement is soon reached: all traces of archaism have disappeared, inspiration is still powerful, and workmanship wellnigh, sometimes entirely, perfect. After this the treatment tends to become over elaborate, the inspiration is lost, and a period of unintelligent copying ensues, followed by one of degradation and ultimate decay.

Civilisation is an intermittent phenomenon, its growth and fall being comparable to summer and winter in Nature. Prof. Petrie shows how this analogy was familiar to the ancients under the guise of the "Great Year," the Etruscans speaking of the Great Year as the period of each race of men that should arise in succession. He makes the following quotation from Plutarch's *Life of Sulla*, which refers to the close of the Etruscan's own period of 1,100 years, in 87 B.C.: "One day, when the sky was serene and clear, there was heard in it the sound of

[2] Flinders Petrie, W. M., *The Revolutions of Civilisation*. (London: Harper, 1912.)

[3] Spurrell, H. G. F., *Modern Man and His Forerunners*. (London: Bell, 1918.)

a trumpet, so shrill and mournful that it frightened and astonished the whole city. The Tuscan sages said that it portended a new race of men, and a renovation of the world, for they observed that there were eight several kinds of men, all differing in life and manners; that Heaven had allotted to each its time, which was limited by the circuit of the Great Year; and that when one race came to a period, and another was rising, it was announced by some wonderful sign from either earth or heaven. So that it was evident at once to those who attended to these things, and were versed in them, that a different sort of man was come into the world, with other manners and customs, and more or less the care of the gods than those who had preceded them.... . Such was the mythology of the most learned and respectable of the Tuscan soothsayers."

From the foregoing examples it becomes evident that life, in its main aspects, is essentially a rhythmic phenomenon. The essence of rhythm being order, it seems, indeed, inevitable that, with the progress of time, all biological pheuomena of importance, whether concerned with the inner functioning of the organism or with its behaviour in relation to the outside world, should tend to become increasingly rhythmic in character.

Finally, it should be evident that the sense of rhythm, which forms so large a part of the pleasure conveyed by all the higher forms of art, results from the successful expression by man of his appreciation of the order and measured flow so characteristic of his own nature and of the world about him.

LOST IN THE DESERT.

A FRONTIER INCIDENT.

The desert of which I write is part of that vast area of aridity which lies almost like a concentric zone within the great parts of the inhabited world. If one looks at a map of the world one will see that many or most of the countries of the globe which are designated desert are contiguous and form a single area only slightly demarcated into separate entities. This band runs through the north of Africa comprising the Shahara, Egypt, and the Sudan, Arabia, Persia, and the westernmost portions of India such as Sind and Baluchistan. Throughout there are many features which are common, sand rock, and stones, a sparse vegetation, absence of great rivers and lakes, rainlessness, and a scanty population of nomadic habits of life. It was in the extreme west of the last named of these countries, immediately where it conjoins with Persia and Afghanistan, that my adventure befell.

It was the Christmas season, and we were on our way back into India, after spending six months in one of the dreariest regions of the world. When

we came out, it was through a desert fiercely hot; the sun was so powerful that we could travel by night alone, pushing off usually about sundown and jogging along on our camels till near the dawn, when we spread our tents and took what rest we could through the heat of the day. Now a change had been wrought indeed, and one could scarcely believe it was the same country which winter had made his own.

We were delayed at the outest by a blizzard which converted all the passes and *nullahs* into roaring waterfalls. Little or no rain had fallen for two years, and it seemed as if all arrears were to be made up in a week. When we finally got away all went well for two days, and we encamped for the second night under shelter of a great cliff that projected like a headland into the sea of stones and sand. The stars shone out with an intensity I have seen nowhere else, as though they had been the points of thousands of icicles hung from a great vault of ice. The sepoys lay about under the cliff rolled up in their blankets; the camel-men slept snuggled up against their great beasts; we white men—there were three of us—occupied an old mud bungalow.

THE LOST CAMEL.

It was a picturesque sight to see the fires dotted about beneath the cliff, to catch the reflection of them on the swarthy faces of our men, and the vague hump-like shadows of the camels as they lay there patient and immovable in the cold.

Before dawn all the camp was roused, packs and saddles were adjusted on the camels, the men fell in, and the whole column moved away. It was freezing hard, and the ground was like iron. We officers had a cup of cocoa each, and then prepared to mount and follow on our camels. We had a riding camel apiece. Unfortunately I could not find mine, and my camel-man had gone on ahead thinking I was following on foot with the column. Owing to the cold I had done a great part of our marches in this way, and I believe I had told him that I would do the first part of the journey on foot again.

Be that as it may, my camel had disappeared, and in the dark, while I was hunting for it, the other two officers went on and left me. This was somewhat awkward, as I had delayed so long that it would have been no easy matter to catch up with the column on foot, and I was a little perturbed till I saw one of the batmen, an attenuated gentleman from the Quetta bazaar, in the act of riding away on one of the beasts that carried our cooking stores. I hailed him and bade him halt and take me abroad. To mount a camel is not the work of a minute, or even of two minutes, on a cold morning and having, as he thought, got going, he wanted a good deal of persuasion to stop and kneel down again,

DAWN.

At last I got up on the seat behind my freind from Quetta and urged him to hurry up and overtake the rest. We had delayed so long that we found ourselves left entlrely alone. For something like half-an-hour we padded on under those cold unwinking stars, following what appeared to be a track. Still no sound of our jingling column reached my ears and I began to feel some alarm. The night was so still that the march of men and certainly the rattle of the tools and machine guns carried on the mules ought to have been audible for a mile or two. I struck matches and, leaning over, tried to make out the track by the feet of our beast. A track of sorts there was ; it was very faint, but with the ground so hard I did not expect to see much. I told Rudhi Khan to push on again, and once more with long strides we went swinging over that terrible plain. In another half-hour the dawn broke. It came like the partial unrolling of a great curtain right ahead of us showing a long pearly rift bordered by thick clouds. As it grew lighter we came to a halt by common consent and looked about us. We were evidently lost. We were in the centre of a wide plain which rolled away on either side of us to a line of jagged monntain peaks.

The plain was covered with scraggy bushes about a foot high. which resembled heaps of herring-bones rather than any known from of vegetation, There was not a soul in sight ; not the vestige of a hut or house. The prospect was of immense extent ; the plain itself was several miles wide and extended indefinitely in front of us. For all its size, it was a veritable prison. I dare not approach nearer to the mountains ; to penetrate into their gloomy passes would have meant certain death after days of hopeless wandering. Their very barrenness and starkness sent a chill through one, for there did not appear to be a single blade of grass on all their slopes and pinnacles.

A VITAL DECISION.

I was now confronted with what I have since felt to be the most vital decision of my life, whether I should go straight on towards the east in the hope of cutting across the route of the column or of overtaking them, or whether I should go back and try and find our late camp, with a view to picking up the trail from there. I told myself subconsciously that this was a question in which there must be no muddle-headedness. My life and my companion's undoubtedly hung on it. To go back meant a serious loss of time. And then, if I could not pick up the trail I was wrose off than before. Yet after five minutes' cogitation I resolved to go back. I may here interject that it was as well I did so.

Had I gone on, I should have been hopelessly lost ; the best fate I could

have expected would have been to have fallen into the hands of some of those Persian brigands to overawe whom had been one of the occasions of our presence in that neighbourhood. They would have given me short shrift to a certainty, but it would have been quicker than the desert. As a matter of fact,the track I was on led nowhere. It had probably been made by the nomads who drive their goats from nullah to nullah in the hot season. Had I been able to follow it, it would have led to nowhere but the sea coast, though long before I could have reached that I should have been dead.

I reckoned we had about seven miles to go before reaching our last camp. Once there I resolved, if I could not pick up the trail, to try and get back to our old mud fort where I should at least find the Beluchi levies with whom I could live until I could get a caravan going back into India. I was much disturbed by the promise in the sky of a fresh blizzard. Everywhere it was overspread with a cold leaden pallor. In the far distance rose the great white dome of the Koh-i-Taftan, a peak of 13,000 feet which dominates the land for hundreds of miles around.

POWINDAHS.

At that time it was the refuge of a great band of brigands, numbering some 2,000, who terrorised all the country round. I had some fear that some of them might be even now watching me unseen from some of those peaks that bordered the plain.

Being hungry I turned to my haversuck with a sense of sore misgiving. I had learnt a few lessons in my wanderings, and one was, whatever the seeming needlessness might be, always to carry something in the way of eatables. On this occasion the lesson was a lost one. I had nothing but a few crumbs of gingerbread. The contents of my haversack were some pieces of string, a box of matches, a candle-end, a stump of pencil, and a few pieces of paper. I had also in an inner pocket a revolver and some cartridges. It was very discouraging. It must be hours and hours before I could catch up the column, and I had already a painful ache beneath my waistcoat.

In the end the three of us drifted back to the old camp, where to my delight, I found the track of the column plainly marked by the hobnailed boots of our sepoys, and droppings of machine-gun mules. They had turned up the entrance of a nullah past which we had ridden. About a mile down the nullah we had our first stroke of luck. We came on an encampment of Powindahs. They were halted along with their camels in the entrance to a small side nullah. They had women and children with them and a number of goats. These people are a curious tribe who do much of the trafficking from Afghanistan into India. They

are not Afghans. No people, indeed could in lineaments be more dissimilar. Whereas the typical Afghan has a hard-cut Hebraic cast of countenance, the Powindah has a flat square race of Mongol type. His complexion, too, is fair and suffused with a rosy blush. It looks almost ridiculous to see a tall, well-grown man with the fair skin and chubbiness of a baby. Yet such these men are. They are peaceable and kindly folk, and thanks to the useful functions they perform, are not over-much bullied by their Afghan country-men. I explained to the tribe my pre-dicament, and asked them if they could find me a guide for the remainder of the way. They were very unwilling at first, not so much from unfriendli-ness as from disinclination to detach themselves from their caravan. It is not a country for stragglers. At last I bargained with them to find me one as far as a certain mud fort which I knew lay on our route, and which our column must have passed. From the fort I would easily get one of the Baluchi levies to act as guide until I could catch up with the troops.

MY NEW GUIDE.

Once again we set off, and at a good swinging trot swept on down the track which ran through nullah after nullah in a maze of intricacies, The chikor and sisi (hill partridges) ran in front of us, or often, suddenly scared as we rounded some corner, took flight with a great whir of wings into the hills. The Powindah ran alongside, keeping pace with us without any apparent effort. He kept up a constant chatter all the way.

"Your honour will give me money" he asked for the hundredth time.

"Yes, yes, have I not told you so" ?

"Much money ?"

"Surely, much money."

"You will make me a rajah ?"

"Yes, a maharajah, if you like."

He had a pair of boots which he carried one in each hand. His naked feet with their curious cherry flush looked uncomfortably cold as he trotted along. I asked why he did not wear the boots. He gave a cunning smile.

"No," said he, "I am not going to wear them out on this hard ground."

We emerged from the labyrinth of *nullahs* among the rocks and hills, and came out up the edge of another of those far-stretching plains which are a feature of the country. They are the beds of old lacustrine depressions and often show efflorescence of salt, white as hoar frost. In the far distance, and girding it in all round, rose up the eternal walls of mountain peaks. This region is the home of the famous onager or wild ass, the shiest and fleetest of all wild creatures, Across these plains his vision can range for miles, and at the most distant approach of man he flies like the wind. I had seen their hoof-marks, but only once had a very distant glimpse of the beasts themselves.

The mouths of the big *nullahs* and passes which break down into these plants are thresholded by "fans" of detritus, borne down by floods. It was at the apex of such a "fan" we emerged. About a mile away on a slight rise of barren ground beyond the edge of the "fan", I saw the fort of which I was in search.

It stood out as a single isolated building in the blank waste, and I well knew what the inside would be like, a menagerie of all creeping things, scorpions, tarantulas and centipedes and the lesser things on which they battened. Yet never did any building appear so desirable. I paid my guide and sent him back to regain his tribe. Ten minutes later I found my luck " out " once more. The fort was empty of all human beings save a half-crazed dwarfish fellow supposed to have been left in charge. He told me the others had gone across to the Afghan border to seek one of the *dak* camels which had gone astray after throwing its rider on the sand. I knew the fort to be in charge of a great red-bearded man.

REVOLVER PERSUASION FAILS.

This man the Indian Government, with a foresight and wisdom which is hid from philanthropists, had elected to rule, and in that wild region no better choice could have been made. He may have been after the camel, or, the caravan having safely passed the fort and left it behind, he may have thought it an opportune moment for wiping out some border score ; but what concerned me was that the guide I counted on would not be forthcoming, and I was sadly disappointed at finding nothing to eat. The crazy idiot, who was not so crazy as he pretended, would give me no help at all. I threatened him with my revolver, but he knew I did not mean it and ignored the weapon.

I had again to make a difficult decision, whether to strike on across the great plain and trust to finding the trail all the way, or go back to the friendly Powindahs. I decided I would go on this time, the more so as the day had cleared and the sun was shining. Before I left I found hanging in a corner the carcase of a goat, and I insisted on breaking off a couple of ribs and stuffing them into my haversack. I had overcome the pangs of hunger and felt I could go on easily till nightfall, by which time I ought to have reached our camp; but in case of any accidents I resolved to be on the safe side and have the wherewithal to stay ourselves for a little from starvation. The idiot protested fiercely and even caught my arm and tried to hold it.

AGAIN ON THE TRAIL.

For half a mile it was easy to follow the trail ; then it crossed a drift of loose sand and sandhills, where it became very indistinct. I got on the camel and made Ruddhi Khan do the same, much to his disgust ; but the beast was tired

and I was afraid it would break down, for I knew we had a long way still to go. That journey for the column happened, I knew, to be one of the longest, a matter of twenty-eight miles. We had all that to do and in addition we had done another fourteen at our false start. The day wore on and we went on stumbling blindly over long tracks of loose rocks and shingle, over the most disheartening ranges of sandhills where it was all up one hillock and down again to the next until I began to fear that it was all up with us after all.

I remember climbing in desperation to the top of one particular high sandhill to stare out over the vast plain around us. I hoped against hope to see human forms ; but there was nothing. The vast plain of sand and stones rolled away naked and barren to the same inevitable wall of mountains, and there did not seem to be so much as a fly crawling on it. I think the very fear of becoming exhausted kept me from exhaustion. In a dreamy way I kept on saying to myself : "We must go on, there must be no giving in." If we were not to make some disastrous mistake every faculty had to be kept on the alert.

ANXIOUS MOMENTS.

It is not easy, perhaps, for one not knowing the country to realise how very easily a mistake could be made. The sun had gone in and the sky resumed that depressing monochrome of leaden grey which it had worn in the morning. After a while we got across this great plain and entered again a range of rocky hills. The track zig-zagged up and down through intricate gorges, but though it was hard going it was more clearly defined, and I came on some definite signs that we were without any further doubt on the right trail.

My mind relieved of the acute anxiety which had been torturing it all day, I now began to feel the natural exhaustion consequent on our exertions and deprivation of food. I began to look out for the camp, or at least the great plain in which I knew it to be at the top of every rise, and was very disappointed when I saw each time only another rise of sandy track, limited by the projecting rocks. Evening had set in by the time I first made contact with our column. It was while staggering along up a prolonged slope of sandy ground that I came on first one, then several of our sepoys, lying on the ground utterly done up. Some of them were asleep, some just sat there and stared at me stupidly.

I came to the top of the rise ; the ground dipped in front of me and through the portals of the pass showed me one of the great plains to which I have referred. In the midst of it, about a mile and a half away, I saw the camp with the tents and bivouacs run up and the camels wandering about on the outskrits, cropping the dry

herring-bone bushes. I was soon there and was received in an embarrassing silence. When I reflected on the fright I had given them I could not blame them. With the men in the exhausted condition they were it would have been impossible to get up a search party.

An Afghan gentleman attached to us for political reasons told me gravely how he had known of whole caravans going astray in those regions and being heard of never never again. Truly, while I was engaged in this adventure I had not allowed my mind to dwell on our peril, but for a long while afterwards the recollection of it made me shudder. I suppose there could hardly be a death more awful than that which would overtake one alone and starving in those solitudes. Their drifting sands cover and uncover in the long years countless bones of beasts and men lost to view as irrevocably as those committed to the great deep itself.

ARTHUR WALTHAM HOWLETT, in the *Empire Review*.

IMPERIAL DELHI.

BY MRS. SAROJINI NAIDU.

Imperial City, dowered with sovereign grace,
To thy renascent splendour still there clings,
The sumptuous tragedy of ancient things
The regal wars of many a vanquished race.
And memory s tears are cold upon thy face
E'en while thy heart's returning gladness rings,
Laid on the sleep of thy forgotten kings,
The alien lovers in thy sweet embrace.

The changing kings and kingdoms pass away,
The gorgeous legends of a by-gone day,
But thou lost still immutably remain
Unwearied symbol of great histories,
Unageing priestess of old mysteries
Before whose shrine the spells of Death are vain.

EASTERN BENGAL NOTES AND QUERIES.

(Second Series : No. III.)

EDITED BY

H. E. STAPLETON, I. E. S.

SABHAR; AND ITS KING, HARISH CHANDRA.

INTRODUCTION.

For some years prior to the outbreak of the recent war, my attention had been directed to the archæological possibilities of the site of Sabhar in the Dacca district. Gold coins of a peculiar type resembling those of the Guptas were reported to have been found there, and a small excavation undertaken on one of the mounds at the place known as Rajasan resulted in the discovery of a number of large bricks ornamented with images of Buddha in different postures. These bricks are now in the Dacca Museum, as well as a gold coin discovered on the same spot. The war prevented further investigation, but on my return to Dacca early this year enquiries were resumed, and several other coins of the same sort have been brought to light. (1)

Through the kindness of Mr. Rankin, Commissioner, Dacca Division, an opportunity was afforded last June to make another personal survey of the site, and one result of our visit was the discovery of the complete text of an alleged *Math* inscription, some *slokas* from which had previously been obtained from the local people. Mr. Rankin brought with him on the trip all the notes that he had made in connexion with the history and antiquities of the locality 15 or 20 years ago, when he was Collector of Dacca, and amongst these I discovered an elaborate note on the antiquities of Sabhar, and on the legendary local King Raja Harish Chandra, by the well known antiquarian Babu Ganga Mohan Laskar.

As little material of any serious value has hitherto been published on Sabhar, I suggested that this should be published, supplemented by notes giving the results of our own observations. Mr. Rankin willingly agreed, and Ganga Mohan Babu's most interesting paper now at last appears in print duly annotated. Its value is further enhanced by Babu Nalini Kanta Bhattasali's discussion of the historical value of the supposed *Math* inscription of Raja Harish Chandra's son, as well as some comments on the same subject kindly supplied by Mr. Rankin after reading the proofs of this month's *Notes and Queries.*

Nalini Babu was at first inclined to regard the inscription as a genuine document, but apart from the improbability of the descendants of a powerful King allowing an inscription, which

(1) *Vide* paper by Babu Nalini Kanta Bhattasali in the May-June and July-August 1920 numbers of the *Dacca Review.*

proclaimed the extremely modest limits of their Kingdom Bhabalina, to be placed in the heart of their town, it is opposed to the fact that local tradition denies that Harish Chandra had any son. (He is said to have been succeeded by Damodar, or Damu Raja, son of his sister, Rajeswari or Raji Devi) (1). The description of Harish Chandra as a Buddhist King residing in sequestered *Maths* and temples decorated with the figures of the Buddha proves, however, that the inscription—if a forgery—is not of recent date, as before 1912 or 1913 the existence of a Buddhist capital in this part of the Dacca District was unknown. I may add that a possible site for the *Math* for which the inscription may have been intended is *Mathbari*, a mound of old bricks that still exists about a mile from the modern village of Sabhar, in a direction slightly east of north

I am not in a position to discuss Nalini Babu's translation of the text as an expert: but Rai Sahib Dinesh Chandra Sen, to whom the note was submitted, has suggested that the date might be read Saka 1297, taking নৈত্র to be 12 instead of 1, and reading the words from left to right instead of *vice versâ*. This would bring the date of the inscription to 1375 A. D., and th Rai Sahib is thus enabled to identify Bhima Sena, great-grandfather of Harish Chandra with a Bhima Sena who is mentioned in Ananda Bhatta's *Ballala Charita* (written in 1510 A. D), as the Chief Minister of Ballal Sena who was King of Bengal in the 12th century.

I am not altogether convinced from the subsequent correspondence that the Rai Sahib has made out a good case for his contention, which he is perhaps not unwilling to argue in favour of, as the inscription, if genuine, would constitute a very strong piece of evidence in support of the Vaidya claim that Ballala Sena belonged to their caste. The reference to *Ballala Charita* has, however, suggested to me that a possible date for the writing of the supposed inscription may be about the time of Ananda Bhatta when the whole caste system was in a state of flux, and every caste was endeavouring to prove that it was derived from a higher ancestral stock than popular Hindu opinion then conceded. The social strife that arose about the 15th century has not even yet subsided, as any one acquainted with the castes of Eastern Bengal will admit.

Comments on the historical value of the inscription, or further authentic information on the antiquities of Sabhar will be welcomed by the Editor. Mr. K N. Dikshit, Officiating Superintendent of the Archaeological Department, Eastern Circle, has recently visited Sabhar and there is some hope that his Department may be induced to undertake a careful survey of the site, with a view to subsequent excavations.

H. E. S.

(1) Bose and Ray Choudhury, *Dacca Review*, September, 1913, pp. 190 and 193.

Notes on Raja Harish Chandra of Sabhar. By the late Ganga Mohan Laskar, M. A., Deputy Magistrate, Dacca.

Raja Harish Chandra's Palace:—At a village called Masjidpur [a mile to the East of Sabhar] is a place slightly raised above the surrounding level of the country, which is shown as the site of Raja Harish Chandra's palace. No buildings or walls are now to be found above the ground, many bricks having been removed from the place by the zemindars for building purposes. But the place still abounds with bricks, and if some excavation is made, many more bricks and, I believe, some broken walls, might still be discovered. The site of the palace is overgrown with dense jungle which is, I was told by my guide, inhabited by small tigers. So I dared not to reach the centre of the Raj-bari (palace site). (1)

To the south-east of the Sagar-Dighi tank and separated from it only by a few paddy fields (1) is a village called *Rajasan*. I think this name was anciently applied to the whole neighbourhood including the site of Harish Chandra's palace.

Sagar Dighi:—A few yards to the east of the palace-site is a large tank which is called *Sagar Dighi*. Parts of

(1) Most of the jungle has now been cleared and during our visit we found a high mound (still called *Burj* or Fort by the local people) which stands slightly apart from the rest of the low mounds and tanks that make up the traditional site of the Raj-bari. We were told that a gold coin (said to be in the possession of some one at Sadapur) was discovered here by one Eku Bepari (now deceased). This *Burj* is situated 100 yards or so to the west of Sagar Dighi, and just to the south of the traces of a canal that apparently ran westward from the *Baid* (see next note), along the northern face of the Rajbari A quarter of a mile to the south west of this *Burj* is a N. x S. tank called *Dui Shatini Dighi* (The tank of the two co-wives). Across the Local Board road which runs along the northern bank of the canal the land is called *Burir Bagh*, and contains a tank called *Burir Dighi*. The whole area of Masjidpur (*alias* Majídpur and Majúdpur) ought to be surveyed in detail. Ed.

(1) These few paddy fields is the *Baid*, or *khal* shown in the map published in the September, 1913, number of the *Dacca Review*. It is evidently an old formation. No actual village of Rajasan exists, but a few *bashas* are scattered about a locality called Rajasan Near the high bank are 4 *bhitas* (slightly raised mounds), and when, in 1913, Babu Harendra Nath Ghosh was commissioned by me to do some excavation in likely spots the furthest *bhita* from the bank was chosen for the first excavation. The result of cutting a couple of trenches at right angles to one another along the exterior of the mound was the discovery of the walls of a building 72' square, richly ornamented on the southern exterior with large bricks stamped with Buddhas in high relief. A gold coin of the later Gupta type now in the Dacca Museum (*vide* description by Babu Nalini Kanta Bhattasali in the July and August number of the *Dacca Review*), was picked up sometime afterwards on one of the other mounds closer to the *Baid*. Half a mile to the north-east of the four *bhitas* is a tank called *Chaubachkha* (Reservoir) which is said to have been used for sacrifices, and a little beyond, to the East, is a long mound partly surrounded by a square moat. Ed.

it are now dry and cultivated by agriculturists. The tank has high banks on three (?) sides. Many bricks are found on the west bank, where, I was told by the villagers, there was the *pucca ghat* of the Raja. A young Muhammadan boy pointed out a place to the north-east corner of the tank and said that there stood Raja Harish Chandra's *Masjid* (temple; place of worship). A man 60 years old belonging to the neighbouring village of Karnapara told me that an excavation was made some 10 years ago in the dry parts of the tank and a brass *parat* (large circular plate), a pair of idols and a stone used in the kitchen were found. I enquired as to the particulars of the excavation, and as to the whereabouts of the finds, but he could not say anything in answer. As to the plate, he said that it had suffered so much from corrosion that it broke into pieces as soon as the diggers handled it.

Rajasan :—(Lit. the royal seat) The village in which the Palace-site is situated is inhabited by a few Muhammadan families and is now called Masjidpur (a name given by the Muhammadans).

Rajghat :—Rajghat is another village within two miles from the palace-site. It is believed to be an old name and to have been the *landing place* of the King.

Fulbaria :—This is a village at the junction of the Dhaleswari and the Bansai rivers. An educated gentleman of the village, aged 61 years, told me that about 42 years ago he had heard from an old Pundit of the village Karnapara that Fulbaria (lit. "flower-garden house") marks the site of Raja Harish Chandra's garden. The position of the village on the banks of the river and the alluvial nature of the upper layers of the soil of Fulbaria would support the above information.

Raj-Guru's Tank :—About a mile to the north of Fulbaria is the village of Karnapara on the banks of the *Bansai* river (i. e., the river of Sabhar) To the east of this village is a tank called *Raj-Guru pukur* (Lit. "the tank of the King's preceptor"). This tank is said to have been given by Raja Harish Chandra to his spiritual preceptor. Chandra Acharya, a man 60 years old, of the village of Karnapara, and another old man, told me that there had been a *pucca ghat* on the east bank of the tank, which had now sunk underground but could be found out by excavations.

Tambulbari :—There is an earthen mound about 25 feet high in the village of Karnapara. Chandra Acharya said that this represented the Tambulbari of Raja Harish Chandra and that in the course of excavations that had been made there *Chhilams*, (earthern pots used for keeping tobacco in, etc.) were found. Another old gentleman told me that Raja Harish Chandra used to play the game of chess on this hill. This is very near the river. It was an artificial hill, which Raja Harish Chandra used as a pleasure resort in the evening, and where he sat in the evening to enjoy the evening breeze from the river and

played the game of chess with his companions and enjoyed the pleasure of chewing betel-leaves (*Tambul*), &c. (1)

Jiyas Tank :—("Life-giving tank"). This is a tank very close to the *Raj Guru* tank. Women whose children die at an early age offer *pujas* here for securing the longevity of their progeny.

Kot-bari or *Anda-bari* :—This is at Sabhar and is connected with Harish Chandra's name. It is also called *Pathan-bari*. (2)

(1) At present this tower is exactly opposite the junction of the Dhaleswari and Bansai and probably was a look-out tower against enemies coming down what was then the main stream of the Ganges. Ed.

(2) Pathan-Bari is 100 yards to the south-west of the same corner of the Kotbari, on the opposite side of the artificial water course called the Kataganga, which here serves as the southern moat of the fort. The Kataganga enters from the Bansai about 2 miles above the fort and after running for a mile or so south-east first turns south and then due west till it again runs into the Bansai between the Kotbari and the present village of Sabhar. The local people told us that near the group of 4 or 5 *Tal* palms in the centre of the Kotbari, an apparition used to be seen guarding the Raja's treasure. The Fort is formed of red earthen walls 10 yards broad, which enclose an area 240 yards long from north to south, and 185 yards from east to west.

In the middle of Pathan-bari there is a cluster of trees called *Josai Gachh*, consisting originally of 5 trees (Banyan, Aswatta, Nim, Tomal, and Haritaki), which are said to have been planted 60-70 years ago by Guru Charan Kabiraj Only the first 3 trees can be seen at present. Nothing but the name now shows that Pathans ever lived there. Possibly they were an outpost of the Pathans who settled in the 16th century at Dhamrai, which is a few miles away, to the north-west.

A mound :—Within half a mile from the *Niramish pukur* is found a small earthen mound, on the top of which is a deep well. (3)

Harish Chandra's tanks :—It is said that Raja Harish Chandra caused 12½ gandas (*i. e.* 50) of tanks to be excavated during the space of a single night. (4) Ed. A large number of tanks is still to be found in the jungly neighbourhood of Harish Chandra's palace-site, *i. e.* within a distance of 2 miles from it. Some of these tanks were shown to me by Chandra Acharya. These are named :—

(1) Sagar Dighi.
(2) Raj Guru's tank.
(3) Chhota Khuda.
(4) Bara Khuda,
(5) Kumaira Tank.
(6) Dakaitmara tank.
(7) Jor pukur.
(8) Niramis pukur.
and (9) Kodaldhoya pukur. (5)

(3) This isolated mound, which stands on the western bank of the Kataganga about 1½ miles north-east of Sabhar, is locally known by the name of *Burj* (Tower) or *Nahabat Khana*. (Musicians' Gallery.) Possibly it was a look-out tower for enemies coming from that direction It is now so covered with jungle that we were unable to verify the story that there was a well on the top of the mound, though one of the local people said he had once seen it.

(4) A Muhammadan of Masjidpur told us that the number was 7½ gandas *i. e.* 30. Ed.

(5) The names of other tanks we heard of or saw during our visit (these can only be probably traced during the rainy season, a they hav

Niramish Pukur :—(lit. the fishless tank). This is to the east of Sabhar. Chandra Acharya said this was excavated by Raja Haris Chandra for his mother. I am told that fish will not grow in a tank if pots full of mercury are buried under its bed.

The *Kodal-Dhoya* or the "spade-washing tank" :—This was the last of the fifty tanks of Harish Chandra, and in its water the workmen washed their spades on the completion of their work. It is noticeable that at Rampal in Bikrampur is shown a *Kodal dhoya* tank, where, it is said, the workmen washed their spades on completing the excavation of the great *Rampal Dighi*, which work also is said to have been done in the course of a single night.

All the remains which are connected with the name of Raja Harish Chandra are within a distance of two miles from each other and are near the village of Sabhar. Nobody could give me any information about the predecessors and successors of this King, nor about the dynasty to which he belonged. His age too is quite unknown, and in spite of my repeated enquiries I could not find any clue for tracing out his date. I am told that some low-caste men of the neighbourhood have written a pamphlet called *Mahisya Vivriti* in which they claim Harish Chandra as their predecessor. But the old men of the neighbourhood say that it is a vain attempt to glorify their origin, and very few believe in their statements. With this we may compare the attempt of the Suvarna Vaniks to explain the lowness of their present social status by ascribing it to some injustice on the part of Ballal Sen. (1)

November 22nd/1904.

silted up and are dry during the winter months are :—

(10) Dui Shatini pukur (*vide* note 1, p. 1)

(11) Jalori pukur.

(12) Ban pukur. (Forest tank : Birendra Babu, *op. cit. infra*, states this and the preceding tank are situated in Badda *mauza*).

(13) Chhobamara pukur (*i. e.* Tank in which utensils were cleaned with ½ a cocoanut husk)

(14) Lal pukur.

(15) Satpukuri pukur.

(16) Chaiyla pukur (Tank with temporary sheds on it, or with shady banks)

(17) Jaleswari pukur ('Tank of the Water Goddess')

(18) Pitkila pukur ('Tank with the Pitkila tree,)

(19) Choti mara pukur (Shoe beating Tank)

(20) Andar pukur.

(21) A second Kodaldhoya pukur (100 yards east of the Kotbari. The other one is at Rajasan on the bank of the *Baid*, and near the Kumaira pukur)

(22) Burir Bagh pukur.

(23) Mora pukur.

The local people told us that ghosts were employed to dig all the 30 tanks in one night, and had to disappear before dawn. There are probably far more than 30 (or even 50) tanks in the vicinity, as Babu Birendra Nath Bose in his *Purbba Bange Pal Rajagan* enumerates nearly 100, and a few of those given above cannot be traced in his list. Ed.

(1) On this point, a note kindly supplied by Rai Sahib Dinesh Chandra Sen may be quoted.

The Math inscription of Mahendra, Son of Harish Chandra of Sabhar.

Babu Harendra Nath Ghose B. A., Headmaster, A. C. H. E. School, Sabhar, published an article in the August and September, 1914 number of the "Dacca Review" on the traditional King Harish Chandra of Sabhar. In this article, he quoted some Sanskrit *slokas*, which purported to give certain information about Harish Chandra which was altogether new. Harendra Babu, however, did not record anything in that article to show where he had obtained the *slokas*, though he admitted that he had made some changes in the reading as he could not decipher satisfactorily the old writing from which the *slokas* were taken.

In the course of a trip to Sabhar in June last, in which I had the privilege of accompanying Mr. J. T. Rankin, I. C. S. and Mr. H. E. Stapleton, I. E. S., and in which Harendra Babu was our guide, Harendra Babu told us the circumstances under which he had come by these *slokas* regarding Harish Chandra. The story is best told in his own words which I quote below from a letter of Harendra Babu of the 16th July 1920.

"Anent the circumstances of the Sanskrit *slokas*, collected by me, I beg to state that when I was very zealous in examining the physical aspect of the place during March and April, 1913, it so happened that in one of my excursions through so-called Rajasan, a brick of peculiar shape at a place (shown to you on the 23rd June 1920) struck me and I selected the place for excavation.

As the result of the excavation, some bricks with Buddha images and fragments of peculiar shape and make of a building were discovered (*vide* "The Herald" of the 12th April 1913.)

"Regarding the claims of the Kaivartas, (Mahisyas) who declare that Harish Chandra lbeonged to their caste, I do not see any reason to discredit the statement altogether. I am prepared to support it partially. During the 12th and 13th centuries, the Buddhists were greatly persecuted in Bengal and held in contempt by the Hindu Society, and it was quite probable that Harish Chandra and his son Mahendra, failing to get brides and bridegrooms from the Vaidya community intermarried with lower castes. The Kaivartas were very powerful in those days aud in all probablity these were the people with whom the Sens of Savar afterwards identified themselves. Such instances are furnished by the examples of Sangram Shah (a Kshatriya) and others, who, in the fourteenth century, intermarried with Bengalis of different castes, failing to secure girls and lads from their own kinsmen. The Buddhists were never strict observers of caste-rules, and the Rajas, especially, married wherever they liked without any consideration of caste. Though the Sens of Sabar originally belonged to the physician caste, driven from home by their own kith and kin who disowned them, they were in a manner ostracised and out-casted so that they mixed with those who were in power in the locality irrespective of all caste considerations. The tradition is that the royal sceptre of Savar passed from the hands of the descendants of Harish Chandra and to those of their nephews who belonged to the Kaivarta caste."

Being encouraged with the finds, I began to collect information about Raja Harish Chandra whose name has been handed down to us through the channel of tradition.

At that time I collected the Sanskrit *slokas* in the book in which they were taken down by one Sj. Ambica Charan Chowdhury, some 20 or 25 years back, under the following circumstances.

The gentleman went to Dacca on business and while returning to Sabhar in a steamer, he met with the renowned Kabiraj, the late Amritananda Gupta of Matta in Manikganj. The Kabiraj *mahashay* was a first class passenger but there being no cabin for such passengers in that steamer, a stretcher was procured for him through Sj. Ambica Charan Chowdhury's intersession with the Serang. This gave the occasion of their familiarity and both passed the time together in conversation on various subjects till they reached Sabhar.

While thus conversing, the name of Raja Harish Chandra was incidentally mentioned. The Kabiraj *mahashay* then said that he had a book in his possession about the traditional Raja and cited the said *slokas* from memory. Sj. Ambica Charan Chowdhury took them down at his dictation in the book secured by me.

I sent one Rajendra Chandra Deva Bhowmik to Matta in March or April 1913, with a view to collect any book or information from any one of the living members of the Kabiraj family, but to no purpose. Then I opened correspondence and I got two letters in reply from one of the grandsons of late Amritananda Kabiraj, but that also proved futile.

I tried then to understand the *slokas* myself by putting a right reading as far as I could and used some of them in my article in the "Dacca Review", August and September number, 1914.

Sd. Harendra Nath Ghose.

When we were coming away from Sabhar last June, Harendra Babu handed over to me the *khata* full of litigation notes in which Sj. Ambica Charan Chowdhury had taken down in pencil the *slokas* dictated by the late Amritananda Kaviraj. Somebody had tried to bring out the lettering by tracing them in ink, and thus in places spoiling the reading that was originally correct. On a close study of the *slokas*, I found that the whole composition was the copy of an inscription on a *Math* dedicated by Mahendra, son of Harish Chandra. Harendra Babu had only utilised part of the composition, the rest of which was also of unusual interest.

Mr. Rankin thereupon undertook to find the original of these *slokas* and through the aid of Mr. J. N. Roy I.C.S, and Mr. A. C. Sen, I. C. S. at last succeeded in getting into touch with Babu Protap Chandra Gupta, grandson of Amritananda Kaviraj. Protap Babu ransacked the papers of his grandfather, and after much search succeeded in

finding the required *slokas* written in violet ink in the Kaviraj's own hand on a piece of paper only 4″ × 8″ in size and handed it over to Mr. Rankin. On one side of the paper is seen a transcript in which many slips had occurred and on the reverse the transcript is copied correctly.

I shall give below an exact copy of the *slokas* and a translation.

COPY OF THE MANUSCRIPT LEFT BY THE LATE AMRITANANDA GUPTA OF MATTA.

নমঃ সুগতায় ।

যো জাতো বীরবরমহিতাদিন্দুবংশোষধেশাৎ
ধীমন্তো ধীরবরমুকুটাৎ ভীমসেনান্নৃপেন্দ্রাৎ ।
সোদর্য্যৈর্বৈ দশবলরতস্থাপ্বিরাঙ্কঃ স গেহাৎ
আয়াতিস্মাদ্রিবনলশিতে[1] ভাবলীনে প্রদেশে ॥ ১ ।
বংশাবতীব্রহ্মসুতপ্রবিষ্টং
দক্ষেণ গাঙ্গং স চ ভাবলীনং ।
ধীমন্তসেনঃ সহ সৈন্যযোধৈ
রাক্রামতিস্মাপ্রবলাৎ কিরাতাৎ ॥ ২ ।
ধীমন্তপুত্রো রণধীরসেনঃ
সংগ্রামজেতা ইব কার্ত্তিকেয়ঃ ।
হিমালয়ব্যাপ্তদেশান্ বিজিত্বা
সম্ভারপুর্য্যামবসৎ প্রবীরঃ ॥ ৩ ।
হরিশ্চন্দ্রো মহারাজঃ রণধীরস্য পুত্রকঃ ।
ধর্ম্মেশ ইব ধর্ম্মাত্মা ধনাঢ্যঃ কুবেরাধিকঃ ॥ ৪ ।
নৃপেন্দ্রবংশমার্ত্তণ্ড হরিশ্চন্দ্র ইবাভবৎ ।
প্রশাস্তি লোকান্ সর্ব্বান্ সঃ অথবা ইব রাঘবঃ ॥ ৫ ।
যমলাত্রাসিনী[2] তীরে বৌদ্ধাঙ্কমঠমন্দিরে ।
বিজনে চ স রাজর্ষিঃ ধর্ম্মার্থং স্মাবতিষ্ঠতে ॥ ৬ ।
ভিষক্কুলে চেম্মলিনঃ শশাঙ্কঃ
সমুজ্জলঃ কিন্ত্বিব পূর্ণচন্দ্রঃ ।
রাজর্ষিণা কণ্টকশাখিশৈলা
সুবসিতা বৈ মলয়দ্রিজেন ॥ ৭ ।
হরিশ্চন্দ্রস্য পুত্রেণ মহেন্দ্রেণাপ্যয়ং মঠঃ ।
মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতো[3] দত্তঃ ক্ষপণং বৈ মহেশ্বরং ॥ ৮ ।
প্রণম্য সুগতং দেবং রচিতা শাসনী ময়া ।
কবীন্দ্র শিবদেবেন ভিষগ্‌মাধব সূনুনা ॥ ৯ ।

শকাব্দাঃ ।

(1) Read লশিতে or ললিতে (2) Read যমুনাতটিনী । (3) Read স্থিতো

TRANSLATION.

'Salutation to Sugata !

"Dhimanta, who was born in the race of the Moon, the lord of plants, of the great King Bhima Sena, the greatest among the great heroes and the most steady among the coolest men, came from his own home to the tract of Bhablina adorned with hillocks and forests, owing to a difference with his brothers in consequence of his devotion to Dasabala (*i. e* the Buddha) (1).

This Dhimanta Sena, with soldiers and warriors, invaded and conquered from the powerful *Kiratas* the tract of Bhabalina which lay (lit. ran) between the Brahmaputra and the Bangsabati, and south of which was the Ganges (2).

The great hero Ranadhira Sena, son of Dhimanta, who was a conqueror in battle like the god Karttikeya, after conquering the country up to the Himalayas, fixed his residence in the city of Sambara (3)

Maharaja Harish Chandra, son of Ranadhira was as religiously minded as the lord of religion, and as rich as the lord of riches. (4)

He ruled all people (with justice) and became like Harish Chandra, the sun of the race of great Kings, or like Rama(5)

Though Sasanka (the moon) is by nature with blemishes, this saintly King of the race of physicians was like a full moon all resplendent (*i.e.* without blemishes), and he resided for earning religious merit in sequestered *Maths* and temples decorated with the figures of the Buddha by the sides of the river Jamuna (or on the banks of the Yamalatrasini).(6)

By Mahendra the saintly King, son of Harish Chandra, who had perfumed these hills full of thorny trees by (the plantation of) Sandal trees, this *Math* was dedicated in the current year (indicated by) Fish, Figures, and Hill. (7 and 8).

Making obeisance to the great Ascetic, the great Lord, the Divine Sugata, this dedicatory piece was composed by Siva-deva, lord of poets, son of the physician Madhava. (8 and 9)—

Sakabda—

These *slokas*, as already noted, appear on a close reading to be the transcript of an inscription attached to an ancient *Math* dedicated by Mahendra, son of Harish Chandra. The composition, however appears to be of a very unpractised hand ; but if it is not a clever forgery to glorify some descendant of the physician Madhava or someone else, it has all the characteristics of a genuine inscription. It is well-known however, that some Mahisyas as well as some people of the Barui class claim Harish Chandra of Sabhar as their ancestor. The present inscription may be only the reminiscence of an earlier attempt on the part of some Vaidyas to claim Harish Chandra as belonging to their own caste.

The inscription however is extremely interesting. It takes note of the fact that Harish Chandra was a Buddhist. It gives the correct boundary of Bhawal,

or Bhabalina, and furnishes us with the important information that it was reclaimed by Dhimanta Sena from the occupation of the powerful Kiratas. This supports the statement of the *Yogini Tantra* that Pragjyotisha *i. e.* Kamrup or Assam at one time extended up to the confluence of the Lakshya and the Brahmaputra. The Ganges is said to be flowing below Bhowal and thus this statement furnishes proof of the current tradition that the Ganges used to flow in olden times through the Dhaleswari channel, or even further north, along the course of the present Buri-Ganga, to Dacca.

The date given is indicated by *Mina*, *Amka* and *Adri*. *Mina* or Fish is probably equal to one, a Fish being the first incarnation of Vishnu. *Amka* is equal to 9. There is some doubt about *Adri* or 'mountain'; which is sometimes equivalent to 7 and sometimes 8. In view of the fact that properly *Kuladri's* are 8 in number and ordinary *Adri's* are enumerated as 7 in number, I think 7 is meant here and not 8. The date therefore of the alleged dedication of the *math* by Mahendra becomes 791 '*Sakabda* as numbers travel to the left. (অঙ্কস্য বামাগতিঃ). 791 *Sakabda* is equivalent to 869 A. D.

If any confidence can be placed on the *slokas*, it would seem that Harish Chandra's forefathers carved out a principality in and around Sabhar immediately after the fall of the line of Kings known as the Guptas of Magadha whose first King was Aditya Sena. Harish Chandra's ancestors would therefore appear to have flourished in the period of anarchy following the fall of the Guptas of Magadha. Bengal then became divided into a number of principalities constantly at war with one another and this state of the country is described in the Khalimpur grant of Dharmapala as a period of *Matsyanyaya* (anarchy, lit. "Law of fishes"—the large devouring the small) to remove which the public of North Bengal accepted Gopala as their ruler. Harish Chandra's successors were in all probability swept away by the rise of the Palas.

Siva Deva who composed the *Prasasti* styles himself a *Kavindra*, or lord of poets, but he appears to have been a versifier of the lowest order and his composition is hardly of any merit. The name of his father Madhava reminds one of another Madhava, the reputed author of the *Nidána*, an authoritative treatise on the *Kaviraji* system of treatment, who according to Rai Sahib Dinesh Chandra Sen, flourished in the 8th century.

How the renowned Amritananda Kaviraj of Matta came by these interesting *slokas* is a question which well merits further investigation.

N. K. B.

Note on the preceding Article.

Some 18 or 19 years ago, on one of my cold weather visits to Sabhar, I was discussing Raja Harish Chandra with

some of the old men of the place, when one of them told me of an inscription which he said had been found on a *Math* in Assam. He quoted to me the following words :—

ভাবলীন প্রদেশের অন্তর্গত বংশাই নদীর তীরে সম্ভার নগরীতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী ছিল।

As the language was Bengali I did not believe that it could be a genuine inscription. But on recent reflection, in view of the discovery of the Sanskrit verses edited above, I believe that the old man (who was speaking in Bengali throughout) intended to give me what, according to his recollection, was the purport of the inscription.

I was assured that the inscription had been noticed in the now defunct paper called the *Ananda Bazar Patrika*, and it would be of great assistance if any reader could verify this.

The only suspicious circumstance about the verses in question is that they were found in the house of a physician and Raja Harish Chandra is described in them as of the race of physicians. But the old Kabiraj's family claim descent from the composer and not from Raja Harish Chandra.

As for the date, the reading of Babu Nalini Kanta Bhattasali appears to be correct. This, moreover, fits with other historical facts. In the first place, it was easy at that time for a bold adventurer to carve out a kingdom for himself out of this part of Kamrupa, as at this time (the end of the 9th century) the Stambha dynasty was being ousted by Pralambha, and on the other hand the Pal kings of Northern Bengal were not powerful enough here to resent the establishment of a new kiugdom. In the next place, the coins found at Sabhar are all imitations of the later Gupta coins and it is hardly conceivable that Harish Chandra would have had such coins, if the interval between him and the last of the later Guptas had been excessive.

It has been hinted by the Editor that the mention of the modest boundaries of Bhowal is suspicious : but he assumes that the inscription came from Sabhar. I have stated that I was told that it was discovered in Assam. If that is so, there was every excuse for describing Bhowal.

Finally, I think it is unsound to endeavour to refute the verses by local tradition. We all know how traditions of the Sen Kings differ from known facts. If the verses are genuine, the facts gleaned from them are true notwithstanding local tradition. If the verses are spurious, they must be proved to be so on grounds other than local tradition.

J. T. R.

THE ROMANCE OF THE SMYRNA FIG.

BY CHARLES RAY.

Man's conquest of the plant world is a romance than which nothing more thrilling could be written; and of the wonderful stories that make up that romance none illustrates more strikingly the triumphant persistence of the human mind than the establishment of the Smyrna fig in the United States of America. It is a romance of modern times, and shows the thoroughness with which our kinsmen across the Atlantic carry out any task on which they set their hearts.

It is scarcely necessary to give a reminder of the prominent part that the fig has played in human history. Its abundant growth in the old cradles of civilisation, and its high nutritive value, have always rendered it an object of desire and a symbol of fruitfulness. It was in this latter sense that Cato used it when, denouncing Carthage before the Roman Senate, he plucked fresh figs from the folds of his toga and exclaimed, 'This fruit has been brought from Carthage — so near to us is a city so strong and prosperous. Carthage must be destroyed.'

History and literature are full of references to the fig, as when the wife of Nabal appeased David with a gift of figs, and Lycurgus decreed that figs should be one of the principal articles of food at the common meals of the Spartans. Curiously enough, we have a reminder of its early importance in our word *sycophant*, which means literally 'an exposer of figs.' This fruit was considered of such value by the Athenians that they prohibited its exportation from Attica. Many persons, however, found the illicit trade in figs exceedingly profitable, and a class of informers grew up known as sycophants, from two Greek words meaning 'a fig' and 'to show,' who denounced the smugglers for gain. Informers are never popular, and the word soon came to be a term of contempt, and has survived as such to the present day.

It is not, however, with the ancient history of the fig that we are here concerned, but with the most modern development in its culture, and the story of how fig-rearing became one of the settled industries of the New World, after successive failures extending over three hundred years or so. Of course, the Spaniards, after their conquests in America, took the fig-tree across the ocean, and the French also carried it to their colonies; and for several hundred years it flourished and bore fruit of a kind. But while the figs that were produced could be eaten green, they could not be dried so as to compare in appearance, size, and flavour with the well-known and luscious Smyrna figs. They were shrunken and sour and had no seeds, and although horticulturists and botanists spent much time in study-

and experimenting, nothing could be done to remedy this defect.

It must be explained that the pear-shaped objects which appear on the fig-tree in summer are not fruits at all, but flowers. Their curious form may perhaps best be explained by comparing them to a sunflower or a daisy, the florets or rays of which, instead of being spread out flat in a disc, are gathered up and made to meet. This construction give the fig-blosson its fruit-like appearance and we may see the florets by cutting open any fresh fig that has formed on a tree in a British garden. The blossoms, when fully grown may he eaten ; but as they are unfertilised, they do not form seeds or mature into fruits and so are deficient in the sugar that is essential if they are to be dried and preserved.

How could the blossoms be fertilised was the great problem that the American horticulturists set themselves to solve about the year 1880, and it took twenty years of hard work and careful experimenting before success crowned their efforts.

So far back as the time of Pliny, the Roman naturalist, it was known that the wild fig, or capri-fig, as it is called, was necessary to the fertilisation of the cultivated variety, and that in this work a tiny insect was concerned, though exactly what it did Pliny could not say. As a matter of fact, it has taken nearly two thousand years to get at the actual truth, and to the perseverance of our American kinsfolk we owe the knowledge that we now possess of the life-stories of the fig and the fig-wasp.

The method of fertilisation followed from time immemorial in Asia and North Africa is to grow a certain proportion of caprifig-trees—that is, wild fig-plants—in the plantations where the edible or Smyrna figs are cultivated, and then when the Smyrna fig blossoms appear, to tie on the bough above them branches of the wild fig-tree bearing caprifigs. The fig insect, which is really a small wasp, leaves the wild fig, where it has been hatched, and, covered with pollen, penetrates the cultivated fig, after which the latter swells and becomes the rich and luscious fruit that we know so well in its dried form.

Now, in 1880 a Californian fruit-grower, having determined to produce Smyrna figs in the United States, took over from the Old World cuttings of plants, which by care and attention he reared, so that they produced figs. But these would not ripen, and while still small dropped off the plant. The attempt had proved a failure. Nothing more was done for about eight years, and then Mr. George C. Roeding, a planter of Fresno, California, went over to Asia and himself selected choice Smyrna plants. He used the utmost care in choosing these, thinking that possibly the previous failure had been due to the supply of cuttings being from inferior stocks. He also took with him to America some capri-fig cuttings.

The plants took kindly to the new soil, and in two years both Smyrna and capri-fig trees bore figs. Mr. Roeding believed in the necessity of fertilisation, and so collected pollen from the capri-figs, and introduced this into the Smyrna figs by means of a quill. There was great jubilation when, as a result of all these costly efforts, four ripe figs were obtained. The next year the process of artificial fertilisation was extended, and a glass tube was used, with the result that one hundred and fifty ripe figs were produced. It had taken nearly a dozen years to obtain these, and there was much satisfaction at the measure of success that had been obtained. At the same time, it was realised that if the Smyrna figs were to be produced in large quantities on a commercial basis, the slow, laborious, and costly method of mechanical fertilisation would have to be replaced by natural methods.

In the Old World this was evidently carried out by the tiny fig-wasp, *Blastophaga grassorum*, as it is called, which was hatched inside the capri-figs. But on the young cuttings of capri-fig-plants which had been imported there were, of course, no figs, and therefore no wasps. The next step was to introduce the fig-wasp into America; but before this could be done a thorough study had to be made of the life-history of the insect.

American men of science came over to the Old World and gave their unremitting attention to the subject. They found that the caprifig of the Mediterranean regions has three crops—one in the spring, another in the summer, and a third in the autumn, which last remains upon the trees through the winter. It is in the figs of this autumn crop that the little wasp spends the winter, living upon the substance of the fig, and coming into the light of day during the spring. It finds the spring caprifigs already forming, and, creeping into them, lays its eggs. Then, having done its duty of propagating the race, it dies. The eggs soon hatch out, the insects live upon the spring caprifigs, and then, when they have exhausted the supply of foods, go in search of further nutriment.

These spring caprifigs are full of pollen, and when the wasps emerge they are covered with it. Now, it is the branches brearing the spring caprifigs that the natives of Asia and Africa take and tie upon their Smyrna fig-trees in order to bring about fertilisation. What really happens is this. The wasps come out of the spring caprifigs, covered with pollen, and in the ordinary course enter the summer caprifigs and there lay their eggs, which in turn hatch out, the wasps eventually emerging and entering the autumn caprifigs, and remaining inside for the winter. The people of Asia and Africa, however, have learnt that they can deceive the little insect and make it work for them. They take the branches with the spring caprifigs and tie them to their Smyrna trees, and when the wasp comes out it

is deceived into thinking the edible figs are caprifigs, and goes into them to lay its eggs. But the edible figs are constructed differently from the wild figs, and the wasps are unable to find comfortable positions in which to operate. They therefore blunder about for a time, discover their mistake, and eventually come out and fly elsewhere in search of caprifig. While they were in the Smyrna figs, however, they were rubbing much of the caprifig-pollen off their bodies, and this in due time fertilises the Smyrna figs, which swell up, produce seeds, and ripen.

So much, then, the American entomologists discovered by infinite patience and perseverance. It was clear that the wasp was essential to the production of ripe Smyrna figs suitable for drying, and therefore they decided that the wasp must be introduced into California and acclimatised there. The first attempt was made in 1891, when boxes of autumn caprifigs were packed in North Africa, and carried across the Atlantic Ocean and the North American continent to California where they were unpacked and placed under a caprifig-tree in the plantation of Mr James Shinn of Niles. The season, however, was too far advanced, and the experiment proved a failure. The Americans were not to be beaten. The United States Department of Agriculture had taken up the investigation as a matter of national importance and after several further attempts at last in 1899 success was attained.

Caprifigs, with the hibernating wasps inside, were taken to America from Algeria, and placed beneath a caprifig-tree in the orchard of Mr. George C. Roeding, and the tree was covered very carefully, so that the wasps, when they emerged from the figs could not escape. In the autumn it was found that the tree was loaded with fruit, and that the caprifigs were full of wasps ready to settle down for the winter. One or two wasps had escaped through the covering and had fertilised Smyrna figs in other parts of the orchard, while a few had gone into caprifigs on adjacent trees, there to spend the winter.

Here was the promise of success, and great excitement prevailed among the entomologists and fruit-growers of California. The original caprifig-tree that had been covered and two others were found to have on them about a thousand figs containing wasp. They were carefully covered with canvas houses so as to be protected from frost, and then everybody settled down to wait for the spring, which would tell whether success had been achieved or not. At the beginning of spring special experts from the United States Department of Agriculture visited the orchard to spend their days watching for results. At last, at the end of March, the wasps woke up from their winter sleep and began to come out to see what the world looked like.

The caprifig-trees were producing their spring crop, and into the caprifigs

the wasps went to lay their eggs. The swelling of the wild fruit showed that the eggs were hatching out, and in the early days of June, having eaten up the insides of these spring caprifigs the wasps began by ones and twos to emerge. Now had arrived the really exciting moment, the climax of the experiment. Would the wasps go into the Smyrna figs as they did in the Old World, and change them into the rich and luscious fruit so much sought after? It all depended on what happened during the next few days.

Parties of workers gathered the caprifigs containing the wasps and carried them to a building in the orchard, where they were tied in bunches and hung across long poles. Then these poles bearing the caprifigs were taken into the orchard, and the figs were suspended on the branches of the Smyrna fig-trees. It was strange to see these bunches of wild figs hanging on the edible fig-trees up and down the rows in the orchard.

The watchers—entomologists, Civil servants, and fruit-growers—almost held their breath as they kept their eyes on the caprifigs to see what the little wasps would do. Would they come out; and, if so, would they go into the Smyrna figs? At last all doubt was set at rest. The wasps began to emerge, and after looking about for a time, entered the edible figs. It was a great moment for the men who had spent years in trying to establish the Smyrna fig in America. The insects remained inside some time, and then, coming out once more into the light of day, sought for caprifigs, into which they crawled and laid their eggs. The Smyrna figs were now carefully watched, and soon they were seen to swell—the sure sign that they had been properly fertilised, that seeds were forming, and that they were ripening with plenty of sugar to preserve them and render them palatable when dried. The American fruit-growers and entomologists had scored one of their greatest triumphs. That season about fifteen tons of fine Smyrna figs were produced. They were dried, packed in boxes, and when examined later were found to be equal, if not superior, to the Smyrna figs imported from Asia and Africa. Three years after the crop had increased to sixty-five tons, and now very large quantities of Smyrna figs are grown and dried in California, and they will no doubt eventually supplant the figs of Asia and Africa on account of greater cleanliness exercised in their packing.

The fig, it may be added, when dried is, weight for weight more nourishing than bread, and a pound and a half eaten per day would supply fourth-fifths of the total amount of nutriment required. The fig contains nearly as much gluten as wheaten bread, and is 16 per cent. richer in starch and sugar.

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

১০ম খণ্ড | ঢাকা—ভাদ্র, আশ্বিন ১৩২৭। | ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

গান।*

(১)

হায় হায় কেন কাঙ্গালের প্রাণ
চকোরের মত তোমা পানে ধায়।
হেন মনে লয় সুখ সুধাময়
আছে কিছু তব প্রেম-জ্যোছনায়।

(২)

ভব অন্ধকারে ভুবন ভারত
ভ্রমের বিপাকে ভুলে ছিল পথ,
প্রেমের শশী তুমি হলে প্রকাশিত
হরিধ্বনি হল সহস্র জিহ্বায়।

(৩)

চন্দ্রোদয়ে সিন্ধু উথলে যেমন,
তোমায় দেখে হায় হইল তেমন।
জীবের প্রাণসিন্ধু উঠিল উথলি
বহিল অনন্ত নয়ন ধারায়।

(৪)

তরতর বেগে তরঙ্গ ছুটিল,
কঠিন পাষাণ পরশে দ্রবিল,
মরুভূমে চারু কুসুম ফুটিল
ভুবন মোহিল তব মহিমায়।

(৫)

হরিনাম জীবের মহামোক্ষ ধাম,
ত্রিলোক উছলে শুনিলে সে নাম,
সে নাম বিলাইয়া জগত ভুলাইয়া
কাঁদাইলে সবে প্রেমের লীলায়।

(৬)

প্রেমাবেশে তুমি ভাসি নয়ন জলে
আচণ্ডাল সবে তুলে নিলে কোলে;
তরাইলে পাপী জুড়াইলে তাপী
জয় জয় হল প্রেমের নদীয়ায়।

৺ কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর।

* (স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি-আই-ই, মহোদয়ের রচনা। তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।)

বাঙ্গালায় অস্ত্যর্থক ধাতু

সংস্কৃতে প্রধানতঃ দুইটি অস্ত্যর্থক ধাতু ছিল "অস্" ও "ভূ"। কিন্তু "অস্" ধাতুটির লটের রূপও যেমন অসম্পূর্ণ তেমনই ইহা সব লকারে ব্যবহৃত হইত না। তাহার কারণ বোধ হয়, ইহা অনেক লকারের বিভক্তির অংশরূপে ব্যবহৃত হইত। ভবিষ্যৎকালের স্যতি, স্যতঃ প্রভৃতি বিভক্তিগুলি দেখিলে মনে হয় ইহাতে "অস্" ধাতুর "অ" লোপের পর অবশিষ্টাংশ আছে। অতীতেও 'সাস' প্রভৃতি যোগে যখন রূপ হয়, তখনও মনে হয় এই 'অস্' ধাতুই সংযোগে কাজ করিতেছে। লাটিনেও ঠিক এইরূপ দুইটি ধাতু ছিল 'এস্' (es) ও ফু (fu)। ইহার মধ্যে প্রথমটি অনেক ধাতুর রূপেই যোগ হইত। সংস্কৃতের 'অস্তি' লাটিনের 'এস্ত' (est) লাটিনের এই 'এস ধাতু হইতেই ইংরাজীর ইজ্, ওয়াজ্ (is was) প্রভৃতি আসিয়াছে।

বাঙ্গালাতে হ্, থাক্, রহ্, ও আছ্ এই চারিটি অস্ত্যর্থক ধাতুই প্রধান। তন্মধ্যে থাক্ ধাতুটি দেশজ, প্রাকৃতে ইহার রূপ ছিল "থক্"। ইহা সংস্কৃতের স্থা ধাতুর অনুরূপ। এই 'থাক্' ধাতুর প্রয়োগ হিন্দী ও বর্ত্তমান মৈথিল ভাষায় আছে কিন্তু তাহার অর্থ "শ্রান্ত" হওয়া। ইহার কেবল কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ দেখা যায় যথা—

মৈঁ থক্ গয়া (হি)—আমি শ্রান্ত হইয়াছি।

কিন্তু আমরা যে অর্থে এখন 'থাক্ব' ধাতুর প্রয়োগ করি প্রাচীন মৈথিলে একদিন ঠিক সেই অর্থে ইহার প্রয়োগ ছিল, যথা—

গরুআ কুম্ভশিরে, থির নাহি থাকএ (বিদ্যাপতি)

বাঙ্গালায় 'থাক্' ধাতুটি কিছু অসম্পূর্ণ; আছ ও থাক্ এই উভয় ধাতু মিলিয়া তবে সমস্ত কালের সর্ব্ববিধ রূপ পূর্ণ হয়, ইহা পরে দেখাইতেছি, মেদিনীপুর জেলাও দক্ষিণ পশ্চিম অংশের কথিত ভাষায় 'থ' ধাতুর সমস্ত রূপই পাওয়া যায় যথা—থইল (ছিল অর্থে) থাইতে (থাকিতে)। সম্ভবতঃ বাঙ্গলায় অন্যান্য স্থানে প্রচলিত 'থাক্' থার 'ক' লোপে এই 'থা' ধাতুর জন্ম। সংস্কৃতের 'স্থা' ধাতুর সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই।

'রহ্' ধাতুর প্রয়োগ এখন গদ্য সাহিত্যের ভাষায় একবারে বিরল হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের' কথিত ভাষায় যে যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োগ আছে, তাহাও হ-লোপের পরে। যথা,—'যা রয় সয়', 'শূন্য খাঁচা পড়ে রৈল' ইত্যাদি; যেখানে বিহারের সহিত বাঙ্গলার সীমাসংযোগ ঘটিয়াছে, সেখানে হ-এর পূর্ণমূর্ত্তি, শুধু 'রহ্' বলিয়া নহে, সর্ব্বত্রই বিরাজমান থাকে। হিন্দিতে 'রহ্' ধাতুর প্রয়োগ খুব বেশী, ইহা সহায়ক ধাতুরূপে বাঙ্গলার 'থাক্' ধাতুর স্থানে ব্যবহৃত হয়। যথা—

বাং—করিতে থাক।

হিং—কর্‌তে রহো।

আবার বাঙ্গলায় আমরা যেখানে 'আছ' ধাতু সহায়ক ক্রিয়া রূপে ব্যবহার করি হিন্দীতে সেখানে 'রহ্' ধাতুর প্রয়োগ হয়। যথা—

বাং—আমি যাইতে ছিলাম।

হিং—মৈঁ যাতা রাহো বা যাতা থা।

মৈথিল ভাষায় এখন 'রহ' ও 'আছ' এই উভয় ধাতুই ইচ্ছামত ব্যবহৃত হয়। এই 'রহ্' ধাতুর মূল কি? সংস্কৃতের 'রভ্' ধাতুর সহিত রূপে সাদৃশ্য আছে কিন্তু অর্থে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। আমার মনে হয়, সংস্কৃতের 'রক্ষ' ধাতু হইতেই কোন রকমে 'রহ' ধাতুর জন্ম। আমরা যাহা 'রাখি', তাহাই 'রহে'। 'রহ্' অকর্ম্মক 'রাখ' প্রেরণার্থক সকর্ম্মক।

'হ' ও 'আছ্' ধাতু বাঙ্গলায় সহায়ক ধাতুরূপে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। যথা—

অসম্পন্ন—(১) বৃষ্টি পড়িতেছে (২) বৃষ্টি পড়িতেছিল।

সম্পন্ন—বৃষ্টি পড়িয়াছে। পরোক্ষ—বৃষ্টি পড়িয়াছিল।

'কর্' ধাতুর মত হ-ধাতু যেন পেটেণ্ট ঔষধ। বিশেষ্য বা বিশেষণের পরে ইহার কোন একটা বসাইয়া দিলেই বাঙ্গলায় নূতন ধাতুর জন্ম হয়, কর্-ধাতুর যোগে সকর্ম্মক কর্ত্তৃবাচ্যের ক্রিয়া হয় আর হ ধাতুর যোগে কর্ম্ম বা ভাববাচ্যের ক্রিয়া হয়। যথা—

(১) আমরা ঘর করি (২) আমরা লোককে শ্রান্ত করি। কিন্তু

(১) ঘর হয় (২) লোকে শ্রান্ত হয় (৩) আমাদের শোওয়া হয়। ইত্যাদি

সংস্কৃতে অস্ ও ভূধাতুর অর্থ প্রায় এক ছিল। রাজা আসীৎ বা রাজা বভূব—উভয়ই একার্থবাচক। কিন্তু বাঙ্গলায় হ-ধাতু ও আছ-ধাতুর এক অর্থ নহে।

সংস্কৃতের 'ভূ' হইতে পালিত 'হো' ও 'ভব্' এই দুইটি ধাতু হইয়াছিল। প্রাকৃতে কেবল এক 'হো' ধাতু দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পশ্চিমের প্রাচীন হিন্দীতে একটা হ্বে-ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা চলে যে, হয় প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা এক দেশদর্শী ছিলেন, নয় প্রাকৃতের সাহিত্যে এই হ্বে-ধাতুর প্রয়োগ ছিল না অথচ জন সাধারণ যে, এই 'হ্বে' ধাতুর প্রয়োগ করিত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রাচ্য হিন্দী ও বিহারী ভাষায় ইহার এখনও প্রয়োগ আছে। বাঙ্গালার ব্রজবুলীর যে সকল পদ আছে তাহাতে 'ভইল' ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ আছে। এখনও হিন্দী ভাষায় অতীতকালে 'ভয়া' (হইল অর্থে) ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে।

হিন্দী মৈঁ হুয়া হুঁ

বাঙ্গলা আমি হইয়াছি।

ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে, হিন্দীর 'হুয়া' আর 'হুঁ' এক ধাতু জাত নহে। হুয়া—সং ভূত, হুঁ—সং অস্মি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত ভূ-ধাতু হইতে হিন্দীর হুয়া ক্রিয়া বা হো-ধাতুর জন্ম আর সংস্কৃত অস্-ধাতু হইতে হিন্দীর হুঁ ও বাঙ্গলার—ছি বাছি ক্রিয়ার জন্ম। অর্থাৎ অস্-ধাতুর স্ পশ্চিম ভারতে হ্ হইয়াছে আর পূর্ব্বভারতে ছ্ হইয়াছে।

বাঙ্গলায় যেমন—ছ বা আছ ধাতু সহায়ক ক্রিয়ারূপে বহুল ব্যবহৃত হয় সংস্কৃতেও সেইরূপ অস্ ধাতুর প্রয়োগ ছিল ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পালি ও প্রাকৃতেও সেইরূপ ইহার বহুল প্রয়োগ ছিল। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে শেষে শুধু এক "অত্থির" প্রাকৃতরূপ "অস্থি"র যেখানে সেখানে প্রয়োগ দেখা যায়। শৌরসেনী প্রাকৃতে সুতরাং মাগধী প্রাকৃতেও অস্‌ধাতু স্থানে 'আছ' আদেশ হইত। কথাটা তলাইয়া দেখিলে দাঁড়ায় এই—'অস্তি' কথাটা বোধ হয় পূর্ব্বভারতে 'অৎসি' (স্থিতি পরিবৃত্তি বা বর্ণবিপর্য্যয় নিয়মে) হইয়াছিল পরে যেমন 'বৎসর' স্থানে বচ্ছর এবং 'মৎস্য' স্থানে মাছ হইয়াছিল সেইরূপ 'অৎসি' স্থানে 'অচ্ছি' হইয়া থাকিবে। আবার যেমন মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে সর্ব্ববচনে সর্ব্বপুরুষে 'অত্থি' হইত তেমনই এই অচ্ছি ক্রিয়াটা পূর্ব্বভারতে প্রথমে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত পরে বিভিন্নপুরুষে বিভিন্নকালে বিভিন্নরূপে ধরিয়াছে। প্রাচীন মৈথিলে বোধ হয় এই 'অচ্ছি' রূপ খুব একদিন প্রচলিত ছিল। "নেপালে বাঙ্গলা নাটকে" (পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত) সর্ব্বত্র 'বচ্ছ' বানান দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় মনে করিয়াছেন ইহা নেপালীদের লিখিবার দোষ। বর্ত্তমান মৈথিল ভাষায় যেরূপভাবে এই 'অচ্ছি' ক্রিয়া স্থানে স্থানে উচ্চারিত হয় তাহাতে মনে হয় যেন তাহারাও 'ছ' উচ্চারণ না করিয়া 'চ্ছ' উচ্চারণ করিতেছে।

হিন্দীতে এই 'আছ্' ধাতুর প্রয়োগ একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কচিৎ কখনও প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যে দু এক স্থানে পৃথক ক্রিয়ারূপে প্রয়োগ দেখিয়াছি। বিহারের পশ্চিমপ্রান্তেও ইহার কথ্যভাষায় প্রয়োগ নাই কিন্তু পূর্ব্বপ্রান্তে ঠিক বাঙ্গালারই মত 'আছ্' ধাতুর প্রয়োগ আছে। ওড়িয়ায় কোথাও কোথাও 'আছ্' ধাতুর 'ছ'র স্থানে 'থ'র প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

বাং—দেখিতেছি উৎ—দেখু আছি বা দেখুছি

বাং—দেখিতেছিলাম উৎ—দেখুথিলি

বিদ্যাপতির পদাবলীতে 'আছে' এই অর্থে 'অথিক' ক্রিয়া প্রয়োগ পাইয়াছি। *

নেপালের গুরখাভাষায় তাহারা "ছিল" এই অর্থে 'থিয়ো' বা 'থিয়ে' হয় আবার বর্ত্তমান কালে সহায়ক ক্রিয়ারূপে 'ছ-র' প্রয়োগ আছে।

* ১৩২১ আশ্বিনের পত্রিকায় মল্লিখিত "চ-বর্গ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গলার নানাজেলার কথ্যভাষায় "নাহি বা নহে" কথাটার বিভিন্নরূপে "অস্"-ধাতুর স-স্থানে হ হওয়ার প্রমাণ আছে। সাহিত্যেও ইহার প্রয়োগ আছে। আর পশ্চিমভারতে অস্-ধাতুর স-স্থানে সর্ব্বত্র হ হইয়াছে। অস্-ধাতুর প্রাকৃতরূপ "অথি" হইতে ইহার উৎপত্তি একথা মানিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। সেদিন একজন বিহারের পশ্চিমপ্রান্তের দাড়োয়ান "রাস্তা" কথাটা বলিতে "রাহতা" বলিতে ছিল। স উচ্চারণ করিতে জিহ্বার অগ্রভাগকে যতটা নাড়াইতে হয় দাড়োয়ানের জিহ্বা ততটা পরিশ্রমে অভ্যস্ত নয়। তাই সে যেমন প্রথমে "রাস্তা" কথাটা সম্প্রসারণ করিয়া স স্থানে হ উচ্চরণ করিল, সেইরূপ প্রাকৃত-ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ একটা জাতি কোনযুগে "অস্তি" বলিতে "অহতি" করিয়া ছিল পরে তাহা হইতে "অহই", "অহৈ", ক্রিয়া তুলসীদাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন। ক্রমে দ্বিতীয় বর্ণে জোর দিতে বর্ত্তমান হিন্দীর "হৈ" (উচ্চারণ-হ্যায়্) করিয়া ছিল। * বাঙ্গলা দেশে আমরার "আছিল" স্থানে সেইরূপ কোথাও কোথাও "ছিল" ব্যবহার করি। কিন্তু মাড়োয়ারী ভাষায় অস্-ধাতু জাত ক্রিয়ার আদিস্বরের লোপ হয় নাই।

হিন্দীর "তু হুয়া হৈ" (তুই হইয়া ছিস্) এই বাক্যের "হুয়া" কথাটা সংস্কৃতের ভূ-ধাতু জাত এবং "হৈ" কথাটি অস্-ধাতু জাত। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বাঙ্গলায় আছ্-ধাতু ও থাক্-ধাতু উভয়ে মিলিলে সর্ব্বকালিক ক্রিয়া হয়। যথা—আছে (বর্ত্তমান), থাকে (নিত্যপ্রবৃত্ত)। ছিল (অতীত), থাকিবে (ভবিষ্যৎ)।

আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙ্গলা দেশের মধ্যে কেবল মেদিনী-পুরের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অস্-ধাতুর একটা নূতনরূপ আছে যাহা উত্তর ভারতের আর কোথাও নাই। বাঙ্গলায় যেখানে "মরিতেছি বা মরছি"। এই অঞ্চলের ভাষায় সেখানে "মরিঠি"। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, "অথি"র "থি" স্থানে "ঠি" হইয়াছে। মতা "থ" সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ী প্রভাবে ধ-ধাতু ধরিয়াছে। তাহা হইলে মনে হইতেছে একদিন পূর্ব্বভারতে উড়িষ্যা ও মিথিলায় এক-দিন অথি ও অছি এই উভয়রূপই বর্ত্তমান ছিল।

ইংরেজীতে এক অস্ ধাতুর রূপ দিয়া সমস্ত কাজ চালান হয় এবং অস্-ধাতুর প্রয়োগের অভাবে বাক্য অশুদ্ধ হয়। যথা রাম কলিকাতায় আছে, রাম যাদবের পুত্র। ইহার ইংরেজীতে উভয় স্থলে। অস্-ধাতুজাত ক্রিয়া দিতে হইবে। হিন্দীতেও একই অস্-ধাতুজাত ক্রিয়া উভয় স্থলে দিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় ২য় বাক্যে কোন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। জোর দিতে গেলে আমরা কখনও কখনও বলি "রাম হচ্ছে যাদবের পুত্র।" বাঙ্গলায় "আছ্" ও 'হ' ধাতুর অর্থের পার্থক্য দাঁড়াই-য়াছে। "রাম সেখানে আছে"। বলিলে রামের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে। আর প্রায় অবস্থা পরিবর্ত্তনে হ-ধাতুর প্রয়োগ হয়। যথা—তিনি শ্রান্ত হইলেন। অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বে শ্রান্ত ছিলেন না এখন হইলেন। বাঙ্গলার ভূ-ধাতু জাত হ-ধাতুটি সম্ভবতঃ গোড়ায় ছিল (এইরূপই স্বাভাবিক)। এখনও আমরা "হইবে" ক্রিয়া "হোইবে" উচ্চারণ করি কিন্তু জানিনা কেন ইহা "হইবে" বলিয়া লেখা হয়।

অত্যাৰ্থক্ এই ৪টি ধাতুভিন্ন প্রাকৃতে আর একটি ধাতুর খুব ব্যবহার ছিল। সেটা সংস্কৃতের বৃৎ-ধাতু জাত ক্রিয়া। সং বর্ত্ততে প্রাং বট্টই। কেবল ভোজপুরী ভাষায় (আরা ও ছাপরা জেলা) "বাটে" (আছে অর্থে) ক্রিয়া এখনও প্রচলিত আছে, আর বাঙ্গালায় ইহার রূপ "বটে"। "বটে"র ব্যবহার রাঢ়ে বেশী, সেখানকার কোন গানে "কে বটহে" এমন রূপও পাইয়াছি। রাঢ়ের কোন কোন লোক "আমি দরিদ্র বটে কিন্তু—" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে কেবল সন্দেহস্থলে "বটে" কথার প্রয়োগ আছে। যথা "বটে? আচ্ছা দেখিব"। কিংবা সর্ব্বকালেও ইহার প্রয়োগ হয়। যথা "যথা বটে, আচ্ছা দেখা যাবে।"

শ্রীরাখালরাজ রায়।

---

* বীমস্ সাহেব তাঁহার Comparative Grammar of the Aryan Languages পুস্তকে এই কথা প্রথম বলেন। (১) গ্রিয়ার্সন্ সাহেবের Linguistic survey of India পুস্তক হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছি।

* ইংরাজীতে এরূপ স্থলে become কথার প্রয়োগ হয়।

লক্ষ্মী-পূর্ণিমায়।

হৃদয়-লক্ষ্মী বিদায় নিয়েছে,
আঁধার নিয়েছে আলোক হরি;
ধরার সুষমা অন্তর মোর
আর ত হরষে দেয় না ভরি।
প্রাণের পিয়াসা মিটাই কেমনে
মরুভূ যে এই ধরণী-তল,
চারিদিকে তার উল্কা ছুটিছে—
সারা বসুধায় নাহি যে জল।
লহরীর পর লহরী তুলিয়া
নিখিল ধরার মর্ম্মশ্বাস,
লুটিয়া পড়িল হতাশ-হৃদয়ে
বিশ্বরাজের চরণ-পাশ।
তাঁরি করুণায় জ্যোছনার ধারা
ঝরিল ধরার বক্ষমাঝ,
শতেক কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল
এসেছে লক্ষ্মী এসেছে আজ।

ওরে ও অবোধ জেগে দেখ্ আজি
ধরায় এসেছে সে কোন্ ভাতি,
বিশ্বরাজের করুণা এসেছে—
নিতে হবে তারে হৃদয় পাতি।
খুলিয়া গিয়াছে প্রেমের উৎস,
টুটিয়া গিয়াছে মর্ম্মদ্বার;
ঝর ঝর ঝর অম্বরে ঝরিছে
সে মধু—সে প্রেম ঝরিছে তাঁর।
পথভুলে আজ অতিথি এসেছে—
সুধা ঝরে তাঁরি চরণ-ছায়,
ওরে ও নিঃস্ব ভখেনে সে সুধা—
এ সুখ রাত্রি বৃথা না যায়।
জ্যোছ্‌না সুরায় পিয়ালা নে ভরি,
প্রাণ ভরে নে রে রূপ্-ছায়ায়;
রূপ সাগরের পিরীতির বানে
হিয়া যেন আজ ভাসিয়া যায়।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

দক্ষিণাপথ ভ্রমণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কাল রাত্রে মান্দ্রাজ পৌঁছিয়াছি। শুক্রবার সকাল-বেলা তাঞ্জোরের রাজবাড়ীর পুরাতন লাইব্রেরী দেখিতে যাই। ২৮০০০ পুরাতন পুঁথি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এই সকল অমূল্য পুঁথি। যদিও যত্ন করিয়া রাখিয়াছে, তবু অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন আরও নষ্ট হইতেছে। দুই তিনজন লোকদ্বারা পুঁথি নকল করা হইতেছে, কিন্তু তাঁহারা সুপণ্ডিত নহেন। ইংরাজী পুরাতন পুস্তকও অনেক আছে। এখন কমিটির হাতে লাইব্রেরীর ভার; সাধারণে উহা ব্যবহার করিতে পারে। পুণার ভাণ্ডারকার-ইন্‌ষ্টিটিউটে মহাভারতের নব নব সংস্করণ প্রস্তুত চেষ্টা হইতেছে, সেখানকার লোক আসিয়া এখানকার পুরাতন সংস্করণ দেখিয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদের সুন্দর পুঁথি আছে, তাহাতে সোণালী রংএর নানা প্রাচীন চিত্র আছে।

লাইব্রেরীর সম্মুখেই রাজাদের প্রকাণ্ড উঠান ও রাজদরবার। মদুরার রাজাদের বাড়ীর অনুকরণে এখান কার রাজদরবার বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে।—

প্রকাণ্ড থাম, প্রকাণ্ড খিলান, প্রকাণ্ড দালান, প্রকাণ্ড উঠান।

দালানের মাঝখানে প্রকাণ্ড বেদী,—১৮ ফুট লম্বা ১৬ ফুট চওড়া, একখানা মোটা পাথর-বেদীর উপর। তাহার উপর ভূতপূর্ব্ব রাজা মহারাজ সরফোজীর পূর্ণকায় মার্ব্বেল-মূর্ত্তি। মূর্ত্তির পাগড়ী এত বড় ও এত ভারী যে,তাহা মূর্ত্তির উপর বসাইবার উপায় না থাকাতে নীচে রক্ষিত হইয়াছে। সোনার পাগড়ী করিয়া মূর্ত্তির উপর দেওয়া হইয়াছে। পুরাতন রাজাদের রাজ্য কোম্পানী ১৮৫৭ সালে বাজেয়াপ্ত করেন। সেই সময় বহুমূল্য আসবাব ও অন্য সব বিক্রয় বা স্থানান্তরিত হইয়াছে। সামান্য কিছু মাত্র পড়িয়া আছে। জমীজমা কতক রাজ পরিবারকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে, তাহার মূল্য প্রায় কোটি মুদ্রা। তাহা লইয়াই মোকদ্দমা চলিতেছে।

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ রাজপুত্র পার্টি দিলেন। তাঞ্জোরের গণ্যমান্য বিস্তর লোক উপস্থিত ছিলেন। জজ, উকীল, সিভিল্ সার্জ্জন প্রভৃতি ছিলেন। মালা, তোড়া, খাওয়া ও বক্তৃতা সব দস্তুর মত হইল। কলিকাতায় কি তাঞ্জোরে পার্টি হইতেছে বুঝিবার জো নাই।

রাজবাড়ী হইতে কাকী কামাখ্যার মন্দির দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, প্রকাণ্ড গোপুরং, সোনার মূর্ত্তি। মৃগনাভী দিয়া মুখ কাল করিয়া রাখিয়াছে। কিম্বদন্তী এই যে, এই মূর্ত্তি কাকীতে ছিল; মুসলমান দিগের হাত হইতে রক্ষার জন্য ভক্তেরা বসন্তে মরা ছেলে বলিয়া ঢাকা দিয়া মূর্ত্তি লইয়া পলাইয়া আসে। মন্দির লইয়া মোকদ্দমা চলিতেছে। মন্দির রিসিভারের হাতে। রিসিভার স্বয়ং অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

তাঞ্জোরের রাজ পুরোহিতের বাল-সরস্বতী নামক অপূর্ব্ব বীণাবাদন বড় রাজপুত্রের পার্টিতে হইয়াছিল। তাঞ্জোরের প্রধান হরিকথা-কথক অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার নিজবাটীতে লইয়া গিয়া অপূর্ব্ব হরিকথা শুনাইয়াছিলেন। সঙ্গীত ও কথা তামিল ভাষাতেই হয়। আমাদের জন্য সংস্কৃত গান অনেক করিলেন। মানুষের এমন সুন্দর গলা প্রায় শোনা যায় না। যতদূর উচ্চ হইতে পারে গলা উঠে, আবার সেই রকম নামে। গানের পর মালা বন্দন ও কাফির ধূমধাম হইল। অনেক গণ্যমান্য লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ইহাত একটা পার্টির মত হইয়া গেল।

শনিবার সকাল বেলা কোথাও গেলাম না। বিস্তর লোক দেখা করিতে আসিলেন। হোমরুল-লীগের সূর্য্যনারায়ণ আসিয়া কথা কহিলেন। তাঁহাকে বুঝাইলাম ও তিনিও বুঝিলেন যে, হোমরুল লীগ যে প্রণালীতে কাজ করিতেছেন ইহাতে দেশের কাজ হইবে না। তিনি উকীল ছিলেন এখন শিক্ষা কার্য্যেই সময় দিতেছেন।

বেলা ১২॥০ টার সময় তাঞ্জোর হইতে বিদায় হইলাম। বাজার লোকজন, মোটর, সব পাইলাম। ষ্টেসনেও মালার ছড়াছড়ি।

২॥০ টার সময় কুম্ভকোণমে পৌঁছিলাম। বিস্তর উকীল আদালত কামাই করিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। আবার মালার ছড়াছড়ি। প্রধান উকীল কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের মোটর উপস্থিত ছিল, তাহাতেই সমস্ত সহর দেখা হইল ও তাঁহার বাড়ীতে যাওয়া হইল। পরিশেষে কুম্ভকোণম্ ক্লাবের পার্টিতে গেলাম। টাউন হলে বিস্তর ভদ্রলোক উপস্থিত। আবার মালার ছড়াছড়ি হইল। মাদ্রাজ পৌঁছিয়া অবধি বোধ হয় কুড়ি পাঁচশ গাছা সুন্দর মোটা গোলাপের গড়ে মালা লাভ হইল, কিন্তু একটিও বাড়ী লইয়া যাইতে পারা গেল না।

ক্লাবের সভাপতি সুন্দর অভ্যর্থনা করিলেন। ৪০ মিনিট ধরিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার উত্তরে বক্তৃতা হইল। কুম্ভকোণমে ভাল কালেজ আছে, কাবেরীর ধারে সুন্দর বাড়ী। কাবেরীর খরস্রোতে কালেজের ছেলেরা নৌকার বাচ দেয়। সকল প্রকার ইংরাজী খেলাই প্রচলিত আছে। এদেশে প্রসিদ্ধি এই যে, মাদ্রাজের সকল বড়লোকই হয় কুম্ভকোণম্ কালেজের ছাত্র, না হয় এই জেলার লোক। প্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পরলোকগত রামানুজ এইখানকার লোক। তিনি তখন সেইখানে অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন। ক্লাবের বক্তৃতার পর কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার নিজে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। যদিও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৫০০ পাউণ্ড বাৎসরিক বৃত্তি

দিতেছিলেন, রামানুজ সামান্য সাদাসিধা অবস্থায় স্ত্রী ও মার সঙ্গে ছোট একটা বাড়ীতে ছিলেন। সামান্য চারপায়ের উপর এক চাদর পাতা। ময়লা কাপড় ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি একখানা ফরসা কাপড় পরিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ দেখিতে পাইলাম। চিকিৎসা হইতেছিল না, কারণ তাঁহার ধারণা তাঁহার কোন অসুখ নাই। দেখিয়া মনে হইল যেন পাগলের মত হইয়া আছেন। অসুখ গুরুতর। মান্দ্রাজের সকল বন্ধুকেই সেকথা বলিয়া তাঁহার উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করিলাম। ইদানীং ভারতবর্ষে এতবড় অঙ্কশাস্ত্রবিৎ আর জন্মগ্রহণ করে নাই। ইঁহার অকাল-মৃত্যুতে দেশের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের বাটী সুন্দর সাজান। তাঁহার পুত্র নানারকমের সোণারূপার কাজ ও শাড়ী দেখাইলেন। এসকল কাজের জন্য কুম্ভকোণম্ প্রসিদ্ধ। কুম্ভকোণমে বিস্তর মন্দির আছে, সকল মন্দির দেখা সম্ভবপর হইল না। মোটর ছিল বটে, কিন্তু সময় ছিল না।

রামেশ্বরের মন্দিরে কালপাথরের থামের কাজ যাহা দেখিয়াছি, এমন সূক্ষ্ম সুন্দর কাজ কখনও দেখি নাই। কুম্ভেশ্বর শিবের মন্দিরও প্রকাণ্ড, ইহার গোপুরং, উঠান, সবই প্রকাণ্ড। কুম্ভেশ্বর কুম্ভের আকারে গঠিত, বেলে পাথরের মূর্ত্তি। জলের অভিষেক হয় না, সুগন্ধ দ্রব্য ও কখনও কখনও তেলের অভিষেক হয়।

এখানকার প্রধান মন্দির—শার্ঙ্গপাণি বিষ্ণুমন্দির। মহালক্ষ্মী বা মহাদেবী এখানে অবস্থিতা। গরুড়-ধ্বজ গোপুরং প্রকাণ্ড। মন্দিরের ফটক হইতে মন্দির পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড উঠান যেন শেষ হয় না। প্রকাণ্ড অনন্তশায়ী বিষ্ণু,—কালপাথরের মূর্ত্তি।

নরসিংহের মূর্ত্তিও এখানে প্রসিদ্ধ। কুম্ভমেলায় হরিদ্বার ও প্রয়াগের মত এখানেও প্রকাণ্ড মেলা হয়। স্নানের জন্য সুবিস্তীর্ণ বাঁধান দিঘী আছে; তাহার জল যেমন পবিত্র, প্রসিদ্ধ, তেমনই সবুজ, ময়লা ও নোংরা। কুম্ভকোণমের স্বাস্থ্য ভাল নয়; ধান জমীর মধ্যে অনেকের বাড়ী।

রাত ১২৷৷০ টার গাড়ীতে মান্দ্রাজ যাইবার জন্য গাড়ীতে ভিড়ের জন্য প্রথম খানিক কষ্ট হইয়াছিল।

ভোরে চিঙ্গলপট্ট ষ্টেসনে পৌঁছিয়া সেখান হইতে দ্বিতীয় ট্রেণে কাঞ্চী বা কাঞ্জীভরম্ গেলাম। অরুণ সেনের সঙ্গে দেখা হইল। সে মহাবলীপুর বা মহাবলেশ্বরম্ নামক স্থানে পুরাতন মন্দির দেখিতে যাইতেছে। প্রায় ৬০ মাইল গরুর গাড়ীতে যাইতে হয় বলিয়া এ তীর্থে আমাদের যাওয়া হইলনা। পথে চিদাপুরম্ নামে মহাতীর্থও ত্যাগ করিতে হইল। বড় অসময়ে সেখানে ট্রেণ পৌঁছে। এই কারণে পক্ষীতীর্থ বলিয়া তীর্থও দেখা হইলনা। প্রসিদ্ধি এই যে, ৫০০ বৎসর বয়সের দুই প্রকাণ্ড চিল কাশী হইতে প্রত্যহ এইখানে আটা প্রসাদ খাইতে আসে এবং একজন পূজকের হস্ত হইতে তাহা লইয়া উড়িয়া যায়। দুইটি পক্ষী প্রত্যহ এইরূপে যথা সময়ে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট পূজকের হস্ত হইতে প্রসাদ গ্রহণ করে, ইহা সকলেই দেখিয়াছে, তাহার ফটোগ্রাফ্ পর্য্যন্ত আছে। তবে বয়স কত, কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, তাহা নির্দ্ধারণ কে করিবে? দক্ষিণ মান্দ্রাজে এইরূপ বিস্তর তীর্থ আছে। সব দেখিবার সময় ও সামর্থ্য ছিল না।

কাঞ্চী পৌঁছিতে প্রায় ৯টা বাজিল। এখানেও অনেক প্রসিদ্ধ মন্দির। শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, সহরের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল "প্রবাসী" কিংবা "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রে কাঞ্চী সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেইজন্য আর বিস্তৃত বিবরণ লিখিলাম না। শিবমন্দির পুরাতন ও ধ্বংসপ্রায়। ১০ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ভিতরের মন্দির মাত্র সংস্কার হইতেছে। সংস্কার স্থলে অনেক পুরাতন কীর্ত্তি নষ্ট হইতেছে, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। পাথরের উপর প্রাচীন তামিল ভাষায় যে সকল লিপিশাসন আছে, তাহার পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। সরকারী লোক কোন কোন অংশের প্রতিলিপি উঠাইতেছে। তাহা কালীর সাহায্যে উঠাইতে গিয়াও লিপিশাসন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। শিবের নাম একাম্রেশ্বর, শক্তির নাম কাঞ্চী কামাখ্যা। এখানেও গোপুরং, উঠান, ফটক

সবই প্রকাণ্ড। মন্দিরের বন্দোবস্ত এখানে বড় খারাপ পাণ্ডাদের হাতে ভার, অতএব গোলমাল, অত্যাচার, অশান্তি, এখানে অনেক। পূর্ব্বে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীর মধ্যে বিবাদ, মারামারি বিস্তর হইত। এখনও শিব ও বিষ্ণু উপাসকগণের মধ্যে দেষাদ্বেষি যথেষ্ট।

বিষ্ণুমন্দির শিবমন্দির অপেক্ষাও বৃহৎ ও সুন্দর। গোপুরং, নাটমন্দির, ভোগমন্দির, গরুড় মন্দির ও কাল-পাথরের সুন্দর শতস্তম্ভ যুক্ত হল সবই প্রসিদ্ধ। গরুড়ের যাত্রা মহোৎসব হইতেছিল, তাহা দেখিয়া নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এই মূর্ত্তি নীচের তলায়। দোহলার উপর প্রকাণ্ড মন্দির ও দালান। উৎসবের সময় বড় ভিড় হয় বলিয়া দালানের গায়ে চিত্রমূর্ত্তি দেখাইয়া অনেক যাত্রীকে বিদায় দেওয়া হয়। রামানুজ এখানে বহুদিন সাধনা করিয়া পরে শ্রীরঙ্গে যান, এইরূপ প্রসিদ্ধ। কুম্ভ-কোণমের শাঙ্গপানি মন্দিরে বিস্তর আচার্য্য ও ছাত্র রামানুজ-প্রবর্ত্তিত ভাষ্যের আলোচনা করিতেছিলেন দেখিয়াছিলাম, কাঞ্চীতে তাহার পরিবর্ত্তে পাণ্ডারকচ্‌কচি।

এখানেও, লক্ষ্মীর নাম মহালক্ষ্মী বা মহাদেবী।

১২টার মধ্যে দর্শন শেষ করিয়া ষ্টেসনে খাওয়া দাওয়া করিয়া সন্ধ্যার পর মান্দ্রাজ পৌঁছিলাম। চারদিন মান্দ্রাজে অবস্থান করিলাম। দুইটি প্রধান মন্দির এখানে আছে, প্রথম, কপালেশ্বর শিব ও খর্পরকালী দেবীর। প্রকাণ্ড মন্দির, গোপুরং, দালান, প্রাচীর, বাঁধান দিঘী প্রভৃতি সবই আছে! ইহা দেখিয়াই মান্দ্রাজ হইতে ফিরিলেও যথেষ্ট হইত। ইহার দশ অংশের এক অংশ সুন্দর মন্দিরও বাঙ্গালা দেশে নাই। এই মন্দির আমাদের বাসার নিকটেই।

দ্বিতীয়টি বিষ্ণুমন্দির। পার্থ-সারথী বিষ্ণু, হৃদিলক্ষ্মী তাঁহার হৃদয়েই লগ্না। পার্শ্বেই রুক্মিণী প্রভৃতি মূর্ত্তি রহিয়াছে। স্বতন্ত্র মন্দিরেও লক্ষ্মীমূর্ত্তি আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথী হইয়াছিলেন, এই মূর্ত্তি সেই বেশ। বাণে বাণে মূর্ত্তির মুখ ক্ষতবিক্ষত, স্থির ধীর চিত্তে সেই সকল ক্ষতব্রণ ধারণ করিতেছেন,—অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! মানুষকে শিখাইবার মূর্ত্তি এই শিক্ষা শিখাইবার জন্যই যীশুখৃষ্ট ক্রুশে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি দেখিয়া জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা, অপমান ও ক্ষতব্রণ যে সহ্য করিতে না পারে তাহার ধিক্ জীবন, ধিক্ তাহার তীর্থযাত্রা!

পাঁচ মাইল দূরে, আরও এক প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। আমরা মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু উহা খোলা পাইলাম না।

মান্দ্রাজের তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলিবার নাই। একখানা নিযুক্ত মোটর ছিল, তাহা ছাড়া স্যার শিবস্বামী আয়ার, নটেশন, রামস্বামী প্রভৃতি বন্ধুগণ তাঁহাদের মোটর পাঠাইয়া, আত্মীয়তা করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন। মোটরে মোটরেই কয়দিন কাটিয়াছে। একবার খাইতে বাড়ী ফেরা হইত মাত্র।

সমুদ্রের ধারে সুন্দর রাস্তায় বেড়াইয়া আশা মিটে না। সহরের ভিতরে গরম বটে, কিন্তু সমুদ্রের ধারে আসিলেই শরীর জুড়াইয়া যায়।

মান্দ্রাজের প্রধান দ্রষ্টব্যস্থানের অধিকাংশই দেখা হইয়াছে। স্যার শিবস্বামী আয়ার নিজে ট্রেণিং কলেজ, মেয়েদের কলেজ, এ্যাডায়ারের থিওজফিষ্ট দিগের প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী ও হল্, মন্দির, বাটী দেখাইয়া আনিলেন। গোখলে হল্ ও নটেশনের আফিসেও তিনি সঙ্গে ছিলেন। মান্দ্রাজ মিউজিয়মে মেয়েদের লইয়া গিয়াছিলাম। প্রাচীন চিত্রকলা ও স্থাপত্যের নিদর্শন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। ভিক্টোরিয়া টেক্‌নিকেল্ ইন্‌ষ্টিটিউটে জিনিসপত্র কিছু কেনা হইল। সাউথ্ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল কোম্পানী নামক স্বদেশী দোকানেও কিছু জিনিস কেনা গেল। লাটসাহেবের বাড়ীর খাতায় নাম লেখাও হইল। পার্টি, বক্তৃতা, অভ্যর্থনা, কিছুই বাদ গেল না। এসকল বৃত্তান্ত বিস্তারিত লিখিলাম না। 'হিন্দু' 'নিউ ইণ্ডিয়া' 'মান্দ্রাজ মেল' 'মান্দ্রাজ টাইম্‌স' প্রভৃতি কাগজে বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হইয়াছিল। মান্দ্রাজ মেলের সম্পাদক লোক পাঠাইয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন যে, আমার মান্দ্রাজ আসিবার কথা তিনি পূর্ব্বে জানিলে তাঁহার কাগজে এ সম্বন্ধে আরও কথা লিখিতে পারিতেন। কিন্তু, এ সকল কথা প্রচার করিয়া বেড়ান আমার কাজ ও অভ্যাস নয়।

শুক্রবার রাত্রি হইতে ভয়ানক বৃষ্টি হয়, সকালবেলা পথঘাট উঠান এক হাঁটু জলে পরিপূর্ণ। এইজন্য মান্দ্রাজের ট্রামওয়ের রাস্তা হইতে বহুসংখ্যক উচ্চে বেশি কোন কোন রাস্তায় করিতে হয়। অধিকাংশ বাড়ীর প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড্। সহর বড় ছড়ান,—এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে বিস্তর সময় যায়। মোটরের সাহায্য না হইলে এত শীঘ্র সকল জায়গায় যাওয়া ও সকলের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হইত না।

খাওয়া দাওয়া একয়দিন মান্দ্রাজী ধরণেই হইয়াছে। মাছ মাংস নাই। নানা রকমের নিরামিষ তরকারী, দাল, "রাবং" নামক দালের ঝোল, সাতলান ঘোল (ধনে-পাতা দিয়া সুন্দর গন্ধ করে,) আর অপর্য্যাপ্ত 'কাফি' "পোঙ্গল", "ইদলী," "গণ্ডু" "ভাজ," বড়া প্রভৃতি নামের বিস্তর মিষ্টান্ন ও "লবণান্ন" পাওয়া যায়। লুচী ভাজা, দাল ভাজা, পাঁপর, "পাকৌড়ী" লাড্ডু, জলেবা ভাজা, দেয়। ভাত পাতে বাটী বাটী "ঘী" অর্থাৎ ঘি সবাই খায়। লঙ্কার ধুম খুব, বলিয়া দেওয়াতে আমাদের কম দিত। রাঁধুনীর দৈনিক বেতন ৫৲ টাকা, অথচ লুচী রুটী করিতে জানেনা। আটা ময়দা পাওয়া যায় না। নারিকেল তেলের অধিকাংশ রান্না, কিন্তু গন্ধ পাওয়া যায় না। তিলের তেলের চলন আছে।

মেয়েরা ১৮ হাত কাপড় কাচা করিয়া পরে, পুরুষেরা গামছা-গোছ ধুতি পরিয়াই কাটাইয়া দেয়। হাইকোর্টের কোন কোন উকীল এবং জজও শুধু পায়ে ধুতি পরার উপর গাউন পরিয়া কাজ করেন।

সকল জিনিসই বিষম দুর্ম্মূল্য। অল্পবিস্তর ইংরাজী অনেকেই কয়। হিন্দুস্থানী কথা প্রায় কেহই বলে না, আকার ইঙ্গিতে অনেক কাজ সারিতে হয়।

শুক্রবার পাঁচটার সময় মান্দ্রাজ মেলে রওনা হইলাম। ষ্টেসনে উকীলরা ও রাজার লোক আসিয়াছিলেন। আবার গোলাপ পড়ে ও তোড়া লাভ হইল। রাজার লোক জগদীশ আইয়ার কি যত্ন সেবা করিয়াছে বলিতে পারি না।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

শক্তি-পূজা

শরতের প্রভাত ভরিয়া ফুটিয়াছে আনন্দের হাসি,
আনন্দময়ীর পদতলে বিকশিছে শেফালীর রাশি।
জননীর কৃষ্ণ কেশভার পৃষ্ঠ ঝাপি' উড়িছে আকাশে,
আশীর্ব্বাদ-পূত স্বর্ণাভ ধান্যক্ষেত্রে দুলিছে বাতাসে।
শিশিরের শুভ্র মুক্তামালা পত্রে পত্রে শোভিছে ঝলিয়া
নন্দনের আনন্দ হইতে বিন্দু যেন পড়েছে গলিয়া!
গ্রামে গ্রামে উৎসবের রোল, মা'র পূজা সম্বৎসর পরে,
যূপকাষ্ঠে বদ্ধ ছাগশিশু ভাবি যাকে আতঙ্কে শিহরে!

ওরে মুগ্ধ ভক্ত বঙ্গবাসী, এখনো কি দিতে হবে বলে'
পশুরক্তে তুষ্ট নন্ মাতা, হৃদয়ের শোণিত নহিলে?
'আপনার নীলনেত্র দিয়া রামচন্দ্র পুজেছিলা যারে;
পূজা চাই সেইরূপ, যদি সিদ্ধি চাও, আত্মবলি দিয়ে।
নিশ্চেষ্ট ভীরুর বাহ্যপূজা গ্রাহ্য নাহি করেন ঈশানী
কাপুরুষ পারেনা পূজিতে বীরপূজ্যা শক্তি স্বরূপিনী!

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

পলাতক।

(গল্প)

প্রসন্ন ওপাশের বাড়ীর প্রীতিলতার অনিন্দনীয় রূপের প্রভায় মুগ্ধ হইয়া গেল।

সাজি ভরা ফুলের মাঝ হইতে যেমন একটী মাত্র ফুটন্ত গোলাপকে অনায়াসে বাছিয়া তুলিয়া লওয়া যায়, প্রসন্ন ঠিক তেমনি আশে পাশের সবারি মধ্যে সাজি ভরা ফুলের মধ্যে একটী গোলাপ। এতদিন এ ধনী যুবককে কলেজের পুস্তক রাশির কাব্য রসে মসগুল করিয়া রাখিয়াছিল। কোন এক ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তে প্রেমের বিদ্রূপ বাণ কি ভাবে আসিয়া পতিত হইল, ইহারি তাড়নে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় বিশাল বারি বিস্তারের মধ্যে তার নৈরাশ্যপূর্ণ জীবন বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল।

জীবন অতৃপ্তবাসনার অনন্ত শৃঙ্খল, এ সত্য অস্বীকার করা চলে না। ইহারই ফলে প্রসন্ন উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির হুতাশনে জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল।

পিতার আশা ভরসার মূল, বংশের চির আদুরে দুলাল, প্রসন্ন অবশেষে প্রীতিকে বিবাহ করিয়া বসিল। সর্ব্বক্ষণ মাতার মুখভার, পিতার মর্ম্মান্তিক গাম্ভীর্য্য, ভাই বোনদের চঞ্চলতা কিছুতেই তার একণ লক্ষ্য ছিল না। তার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্ত বাসনার স্রোত ভাদ্রের ভরা নদীর ন্যায় দুকূল প্লাবিত করিয়া ছুটিতেছিল; তাহারি মাঝে প্রসন্নের রূপদগ্ধ হৃদয় টুকু স্রোতের মুখে বেতসলতা।

প্রসন্নের শ্বশুর লালমোহন বাবু দীন দরিদ্র। বাল্য বয়স হইতেই প্রসন্নের প্রাণখোলা অযাচিত সাহায্য দীন হীনকে ভরপুর করিয়া আসিতেছিল। ইহাতে স্বার্থান্ধ লালমোহন বাবুর পিপাসার তীব্রতা ক্রমশঃই তীব্রতর হইতে অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। এ ভীষণ অঙ্কুর এমনি সময়ে প্রস্ফুটিত হইল, যখন রাশিকৃত পুঞ্জীভূত ঋণ রাশি দশ সহস্র মুদ্রায় আসিয়া দাঁড়াইল। ইহারি আলোড়নে প্রসন্নের মহৎ প্রাণ খানা চৈত্রবায়ুতাড়িত হইয়া সংসারের কোন্ এক প্রান্তে যাইয়া পড়িল।

সাঁঝের বেলা প্রসন্ন স্ত্রীর চিন্তাজড়িত শুষ্ক মুখখানা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহারি পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ প্রীতি রমণীসুলভ লজ্জা হারাইয়া তাহার অন্তরতম প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিল, অর্থের দায়ে পিতার জেলে পচিয়া মরার বিভীষিকা চিত্র তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। পিতাকে অর্থ সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিল।

প্রসন্নের রূপের মোহ আজ এই মুহূর্ত্তেই কাটিয়া গেল। স্বচ্ছ বারিরাশির মধ্য দিয়া নিকটের জিনিষও যেমন আবছায়ার মত দেখা যায় স্ত্রীর ভালবাসাকেও সে এমনি ভাবে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া ফেলিল। প্রাণ ভরিয়া সে ভালবাসা কেবলই দিতে চাহে ও তেমনি প্রতিদান পাইতে চাহে, স্বার্থের জড়তা যে এর মধ্যে অসহ্য; আজ তাহা বুঝিয়া তার সারা প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

সে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল; এমন একটা কিছু করিয়া বসিবে যাহাতে এ কালপরিণয়ের চরম শাস্তি হইয়া যায়। প্রতিনিয়ত কি একটী অসহ্য যন্ত্রণা তার সারা অন্তরে বিঁধিতেছিল। কি সুন্দর, কি মধুর, কি পবিত্র একখানা ফুটন্ত গোলাপতুল্য মুখ সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেছিল, হৃদয়ের নির্ম্মলতা দিয়া তাহারি পূজা করিতেছিল। সেই সৌন্দর্য্যের, সে মাধুর্য্যের, সেই রূপরাশির মিথ্যা খোলশ আজ খসিয়া পড়িয়াছে! তাইতো আজ উন্মত্ত নেশার ঘোম্‌টা টুটিয়াছে! সে বুঝিল, মনোমুগ্ধকর এত সৌন্দর্য্য যদিও আনন্দদায়ক তবুও সুন্দরী সৌদামিনীর পশ্চাতেই মৃত্যুস্তম্ভ বজ্র লুকায়িত থাকে। এবার সে হৃদয়জোড়া আকাঙ্ক্ষা, জীবনের গর্ব্ব অহঙ্কার, আরও কত কিছু পদদলিত করিয়া ফেলিতে চাহিল।

গভীর রাত্রে পিতার শয়নকক্ষে প্রসন্ন ঢুকিয়া লালমোহন বসুর সাহায্যে তাঁহার দুয়ার খুলিয়া দশহাজার টাকার এক গাদা নোট বাহির করিয়া আনিল। আবার তখনি সেগুলা শ্বশুরকে বুঝাইয়া দিয়া প্রসন্ন আজ এই

সুপ্ত রজনীতে যথেচ্ছা চলিয়া গেল। স্বার্থান্ধ লালমোহন বাবু ধারণাও করিতে পারিলেন না যে, তাহার দক্ষিণ হস্ত পঙ্গু হইয়া গেল। এখন তিনি এতগুলা নোটের তাড়া সাম্নে রাখিয়া রঙ্গীন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

ভোর বেলা প্রীতির সংজ্ঞাশূন্য দেহ খানা দেখিয়া বাড়ীর সবারি জ্ঞান হইল। কাহারও বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। মাতার কাছে আজ পুত্রের অভাবে সারা বাড়ীখানা যেন "উৎসবগত কক্ষের মত" পড়িয়া আছে। পিতা তাঁহার একমাত্র মাণিকের অতর্কিত পলায়নে দমিয়া গেলেন। তাঁহার অর্থের মোহ এক নিমেষেই ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি যে যক্ষের মত এত বিত্তবিভব আগ্‌লাইয়া আসিতেছিলেন তাহা আজ বিষবৎ বোধ হইতেছিল। পুত্রকে আবার নিজের স্নেহের অঞ্চলে ফিরিয়া পাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার হৃদয়শোণিতসিক্ত আকুল-আবেদন প্রত্যেক সংবাদ পত্রের স্তম্ভে ব্যথার মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল,—

"Return, my darling,
Forgive and forget the last."

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মোহানার পথে।

এ পালা সাঙ্গ আজি, এখন নূপুর খুলতে হবে
যে মাঝি উঠ্‌লো হাওয়া নজর আজি তুলতে হবে
এবারে নূতন পথে
হবে যে পথিক হতে,
এবারে সুনীল জলের গভীর তলে দুলতে হবে।

২

কি খরধার হয়েছে আজকে নদী
ছুটেছে তীরের মত নিরবধি।
এজলে ঢেউ খেলে না,
এজলে বাঁও মেলে না,
এপথে বটের ছায়া তটের মায়া ভুলতে হবে।

৩

সুদূরে চক্রবালার চেলীর খুঁটে,
লুটে ও গঙ্গাসাগর উথলে উঠে
কোথা সে ভরাট বেলা,
কোথা যে বিরাট মেলা,
পথেতে সন্ধ্যা এলে সন্ধানেতেই চলতে হবে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

জমাখরচ।

(সাহিত্য সম্রাট্ স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি-আই-ই, মহোদয়ের রচনা।)

অনেক ভাবিলাম, কিন্তু তথাপি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের জন্য একটি শ্রুতিমধুর, প্রাণস্পর্শি ও রসপূর্ণ নাম খুঁজিয়া পাইলাম না। যে দেশের বক্তা ও শ্রোতা, লেখক ও পাঠক সকলেই রসের সমুদ্রে দিবারাত্রি হাবুডুবু খাইতেছে,—যে দেশে পথ্য-পাচন ও কটু-কষায় ঔষধাদির বিজ্ঞাপনেও কাব্যের নবরস উছলিয়া পড়িতেছে, সে দেশে এইরূপ 'নীরস নিঠুর' জমাখরচের কথা যে কাহারই চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবে না, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারি। কিন্তু বুঝিয়াও যে নিবৃত্ত হইলাম না, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। সেই কারণ এই যে,—জমাখরচের কথা বাহিরে যতই কঠোর হউকনা কেন, ভিতরে উহা বড় মধুর। যাঁহারা একটুকু ধৈর্য্য, একটুকু সহিষ্ণুতা মাত্র অবলম্বন করিয়া এই বিশ্বব্যাপী গভীর তত্ত্বের বাহিরের আবরণটি অতিক্রম করিতে পারিবেন, আমি শপথপূর্ব্বক বলিতে পারি, তাঁহারা ইহার অভ্যন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় রসের আস্বাদ পাইয়া চরিতার্থ হইবেন। কারণ স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতি, সমাজের উন্নতি ও অবনতি, রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান এবং এই বিশ্বযন্ত্রের নিত্য বিবর্ত্ত, এই সমস্তই জমাখরচের কথা। আমার এই সিদ্ধান্ত সত্য কি মিথ্যা, এসব ক্রমে ক্রমে আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি।

প্রথমতঃ স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতি এই তিনটি দ্বারাই পরীক্ষা করিয়া লও। এই তিন নামতঃ পৃথক্ হইলেও পরস্পর বড় ঘনিষ্ঠ। সুতরাং ইহাদের কথা লইয়া একসঙ্গে বিচার করিলে বিচার শৃঙ্খলায় কোনরূপ বিপর্য্যয় হইবার শঙ্কা নাই।

স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতি এই তিনের সহিত জমাখরচের কোন সম্পর্ক আছে কি? চিকিৎসক বলিবেন,—আছে। কেননা, তিনি শত সহস্র পরীক্ষায় দেখিয়াছেন যে, যাহার জমা অপেক্ষা খরচ বেশী, সে ঋণগ্রস্ত; যে ঋণগ্রস্ত, সে চিন্তায় জীর্ণ এবং যে চিন্তার আগুণে চিরজীর্ণ, সে ঔষধের অসাধ্য। সুতরাং স্বাস্থ্যভঙ্গের সহিত তাহার সুখ-ভঙ্গ এবং সুখভঙ্গের সহিতই তাহার জীবনের নিত্য কিংবা নৈমিত্তিক গতির ক্রমভঙ্গ। ঘরের গৃহিণীও বলিবেন আছে। কারণ, তিনি দেখিয়াছেন যে, ঘরে যখন খাবার না থাকে,—কোলের শিশু যখন অন্নের জন্য লালায়িত হয়, এবং প্রাপক যখন তাহার খাতাপত্র লইয়া প্রহরীর মত দ্বারে বসিয়া চীৎকার করে, তখন সিদ্ধৌষধ সুবাসিত তিল তৈলেও গাত্রদাহ শীতল হয় না,—রসের কথায়ও মুখে হাসি ফোটে না এবং বসন্তের সমীর, ভ্রমরের গুঞ্জন, অথবা বাসন্তী পূর্ণিমার বিলাসময়ী জ্যোৎস্না ইহার কিছুতেই তখন শরীর কি মন স্নিগ্ধ রাখিতে পারে না। স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতির সহিত জমাখরচের যে অতি নিকট সম্পর্ক আছে, আরও অনেকে অনেক প্রকারে এ কথায় সাক্ষ্যদান করিতে পারেন। কারণ জমার অঙ্ক খরচ অপেক্ষা অধিক না হইলে, হাতে অর্থ থাকে না। অর্থ না থাকিলে স্বাস্থ্যরক্ষা কিংবা সুখের উপযোগী প্রয়োজনীয় বস্তুরও আহরণ হয় না—শরীরে ও মনে সামর্থ্য থাকে না, সমাজ-শক্তির সঞ্চালন বিষয়ে ক্ষমতা রহে না, স্নেহ মমতা ও দয়া প্রভৃতি মনোবৃত্তিনিচয় ফুটিবার অবকাশ পায়না, এবং জীবনের স্রোত সুনীতির সুখাবহ পথে প্রবাহিত হইতে পারে না। এ সকল কথা সকলেই জানে, সকলেই বুঝে, সকলেই পরকে বুঝায়। কিন্তু স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের সহিত জমাখরচের ইহা অপেক্ষাও নিগূঢ়তর সম্পর্ক আছে। আমি পাঠককে সেইটিই সংক্ষেপে বুঝাইতে যত্নবান্ হইব।

স্বাস্থ্য কি? বিজ্ঞান বহু শতাব্দীর পরীক্ষায় ইহা জানিতে পারিয়াছে যে, জীবনীশক্তির জমাখরচের সাম্যের নাম স্বাস্থ্য। এবং এ বিষয়ে যাহার জমাখরচে মিল আছে, সেই সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ। যখন ক্ষুধা লাগে, তখন আমরা খাই; যখন তৃষ্ণা বোধ হয়, তখন আমরা পান করি, এবং শরীর যখন নিদ্রায় আলস্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন আমরা চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকি। কিন্তু কেন আমাদের ক্ষুধা লাগে,—কেন আমরা আহার

করি,—কেন তৃষ্ণাতুর হইয়া জলপানে জীবন জুড়াই,—কেন বিশ্বের সকল সুখ ও সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া ছায়াময়ী নিদ্রার ক্রোড়ে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিবার জন্য অধীর হই, তাহা আমরা বুঝি কি? বুঝিলে আমরা প্রতিক্ষণেই অনুভব করিতাম যে, এ সকল কার্য্য জীবনগত জমাখরচের প্রকৃত প্রক্রিয়া, সুতরাং কোন মতেই অবহেলার বিষয় নহে। তুমি হাসিতেছ অথবা কাঁদিতেছ,পায়ের জোড়ে আস্ফালন করিতেছ; দুর পথ হাটিয়া যাইতেছ,—নাচিয়া গাইয়া দিন কাটাইতেছ, অথবা গভীর নিশীথে দীপালোকের সম্মুখে বসিয়া বর্ণের সহিত বর্ণ যোজনা দ্বারা বিনা সূতে হার গাঁথিতেছ। ইহার প্রত্যেক কার্য্যেই তোমার তহবীল হইতে অল্প বা অধিক পরিমাণ খরচ হইতেছে। আবার তুমি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শীতল হইতেছ, পানভোজনে পুষ্টিলাভ করিতেছ, অথবা প্রিয়সমাগমে পুলকিত হইয়া জ্যোৎস্নায় বসিয়া প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্য ধ্যান করিতেছ। ইহার প্রত্যেক কার্য্যেই তোমার তহবীলে অল্প বা অধিক পরিমাণে জমা হইতেছে। এইরূপে তোমার জীবনের খাতায় জমা ও খরচের কার্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে ও প্রতিক্ষণে কিরূপ অবিরত ও অব্যাহত চলিতেছে তাহা ভাবিয়া দেখ।

প্রাচীনেরা এই সকল কথার অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং এজন্যই তাঁহাদিগের মধ্যে প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি যোগ এবং সংযত জীবনের এত আদর। কিরূপে শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এবং মনের প্রত্যেক বৃত্তিকে সংযমের অধীন করিয়া অতিক্রিয়া ও অতিক্ষয় হইতে বিনিবৃত্ত রাখা যায়, তাঁহারা অশেষ প্রকারে ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহারা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থভাবে দীর্ঘজীবী হইয়া জীবনের চরম সময়েও সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার ও নানাবিধ সারগর্ভ সন্দর্ভ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারাই তাঁহারা তাঁহাদিগের শক্তি-সাম্যের পরীক্ষা দিয়াছিলেন। যাঁহারা আধুনিক আয়ুর্ব্বিদ্যার প্রধান অবলম্বন, তাঁহারাও এই তত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই (moderate living) সংযত সংখ্যা ও নিয়মিত জীবনের ফল ব্যাখ্যায় তাহাদিগের এত উৎসাহ ও এত আদর। তাঁহারা স্বাস্থ্য সুখ ও জীবন রক্ষা বিষয়ে নানারূপ দৃষ্টান্ত ও নানাবিধ উদাহরণ যোগে যাহা কিছু লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন তাহার সারকথা জমাখরচ। তাঁহারা আমাদিগকে জমাখরচের হিসাব বুঝাইতেই প্রাণপণে প্রয়াসপর রহিয়াছেন। কিন্তু আমরা কদাচিৎ কখনও বুঝিতে বুঝিলেও, কার্য্যতঃ সেই জমাখরচের নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলি কি? আমরা প্রবৃত্তির দুর্নিবার বেগে এক ঘণ্টায় এক দিনের জীবন এবং সুতরাং একমাসে দুই বৎসরের জীবন অতিবাহিত করিয়া তর তর বেগে ধাইয়া যাইতে ইচ্ছা করি এবং জীবনী শক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণে ও আহারাদির পরিশোষনে আমাদিগের তহবীলে যাহা কিছু উপচয় হয়, আমরা আকাঙ্ক্ষার আবেগে তাহার বিশগুণ বল অপচয় করিয়া আমাদিগের জমা অপেক্ষা খরচ বাড়াইয়া অচিরেই ফেইল হইয়া পড়ি। স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের গতির সহিত জমাখরচের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, বোধ হয় পাঠক এক্ষণ তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, সমাজের উন্নতিও অবনতিরও সার কথা জমা ও খরচ। গৃহস্থের যেমন গৃহস্থালী, সমাজের তেমন সামাজিকতা। একজন লইয়া আত্মতত্ব, সমাজ লইয়া সমাজতত্ব। একজনের স্বতন্ত্র জীবনেও যে বিধি ব্যবস্থা, সমাজের সম্মিলিত জীবন লইয়াও আয় ও ব্যয় অথবা সামাজিক শক্তির উপচয় ও অপচয় সম্পর্কে সেই বিধি ব্যবস্থা। সমাজের তহবীলে স্বাস্থ্য চাই, সুখ চাই। ধন-বল, জন-বল, বাহু-বল, বুদ্ধি-বল, জ্ঞান-বল ও ধর্ম্মবলে নিত্য নূতন সঞ্চয় চাই। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই সমাজের এ সমস্ত শক্তির আংশিক অপচয় হইতেছে, সুতরাং প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তেই যদি সমাজের তহবীলে এ সমস্ত শক্তির আংশিক উপচয় না হয়, তাহা হইলে ক্রমে সমাজ দুর্ব্বল ও কালে সমাজ দেউলিয়া হইয়া পড়ে এবং যাহারা দেউলিয়া হইয়া পড়ে তাহারা যেমন হয় কাহারও গলগ্রহ হইয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করে, না হয় একবারে উচ্ছন্ন যায়, দেউলিয়া সমাজও হয় কোন প্রবলতর সমাজের পদানত হইয়া কোন প্রকারে জীবিত থাকে, না হয় পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে একবারে বিলুপ্ত হয়।

ভারতীয় আর্য্যসমাজের তহবীলে যাহা কিছু বুদ্ধিবল ও বাহুবল ছিল, ভারতপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাহা প্রায় নিঃশেষ খরচ হয়। ইহার পরিণাম-ফল বীর-প্রসবিনী ভারত বক্ষে মুসলমানের বিজয়-পতাকা। আবার ইংরেজ যখন লালফিতা, লাল সূতা ও লাল রঙের নানাবিধ কাচের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া এবং হাতে টুপি, কাঁধে ব্যাগ, চ'খে মিষ্ট চাহনি এবং মুখে মিষ্ট কথার মধু লইয়া এদেশে বাণিজ্য করিতে আইসে, তখন ভারতবাসী মুসলমান সমাজ সামাজিক তহবীলের সমস্ত শক্তি ভোগ বিলাসের রসোল্লাসে লুটাইয়া দিয়া প্রায় ফেইল হইয়া বসিয়া আছে। ইহার পরিণামফল পলাসির যুদ্ধ অথবা পাঁচশত ইংরেজের নিকট পঞ্চাশত সহস্র মুসলমানের পরাভব।

সমাজের পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ লইয়াও জমাখরচের এই কথা। এ দেশের ব্রাহ্মণ সমাজের তহবীল যখন জ্ঞানে, গুণে ও ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ, তখন ব্রাহ্মণই এ দেশের সর্ব্বতঃ প্রতিষ্ঠিত প্রভু এবং সর্ব্বময় কর্ত্তা। তখন বনে রহিয়া বাকল পরিয়া এক আহারে, ব্রাহ্মণ জীবন যাপন করিয়াছে; তথাপি সমগ্র দেশের সামাজিক জীবন তাহারই আদেশে গঠিত, চালিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়াছে;—রাজা মহারাজ ও মহারাজাধিরাজ রাজেন্দ্র সগুণ ব্যক্তিরা তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে, স্বয়ং বাসুদেবের বক্ষ ভৃগু পদলাঞ্ছনে শোভা পাইয়াছে। এইক্ষণ সেই ব্রাহ্মণ দেউলিয়া পড়িয়া, ব্রহ্মণ্য তহবীলের সকল ধন খোয়াইয়া, কোথাও পাচক কোথাও যাচক, কোথাও ভণ্ড স্তুতি পাঠকের কদর্য্য বৃত্তি অবলম্বনে কষ্টেসৃষ্টে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে এবং হায় কি ছিলাম,—হায় কি হইয়াছি, ব্রহ্মগায়ত্রীর এই নীরব বিলাপে বিষাদ ও কলঙ্কের নীরব গীত গাইতেছে। পক্ষান্তরে যজ্ঞী কর্ত্তৃক পদতলে দলিত হইলেও যাহাদিগের গৃহপ্রবেশ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল, তাহারা ধন-বলে বলীয়ান্ হইয়া এক্ষণ সমাজের উপর প্রভুত্ব করিতেছে এবং কোন শাস্ত্রে যাহাদিগের অধিকার ছিল না, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়া সমাজ-শক্তির উপর সোওয়ার হইয়া বসিয়া আছে, সমাজের উপর বিধিব্যবস্থা চালাইতেছে; জমাখরচের নিয়মই এমন অলঙ্ঘনীয়। মধু থাকিলেই মাছি জোটে। যেখানে মধু নাই, মাছির কথা দূরে থাকুক, পিপড়াও সেখানে ভুলিয়া পদচারণা করে না।

রাজ্য ও সাম্রাজ্যাদির উত্থান ও পতন যে প্রায়শঃ জমাখরচের কথা ইহা বুঝাইবার জন্য কোনও ক্লেশ পাইতে হইবে না। যাঁহারা ইউরোপীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহা জানেন যে, ইউরোপ যে কয় টি রাষ্ট্রবিপ্লবে বিকম্পিত হইয়াছে, ইতিহাস যে সকল রাষ্ট্র বিপ্লবের কথা লইয়া অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের ন্যায় সুদীর্ঘ বীর সঙ্গীত গাইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তেরই আদি মূল জমাখরচের অসাম্য।

প্রথম চার্লস্ অনেক বিষয়েই অতি চারুচরিত্র পুরুষ ছিলেন। যাঁহারা রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাঁহাদিগের গার্হস্থ্য জীবন প্রায়শঃই নানারূপ গর্হিত আচারে কলঙ্কিত হয়। কিন্তু চার্লস্ এ বিষয়ে সর্ব্বাংশেই তদানীন্তন রাজ-সমাজের রীতি বহির্ভূত রমণীয় রত্নস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার জীবন পতি-পত্নীর পবিত্র প্রেমের দৃষ্টান্তস্থল। রাজমহিষী হেন্‌রিয়েটাকে তিনি যেরূপ প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন, অনেক দুঃখীও তাহার দুঃখ সঙ্গিনীকে সেরূপ ভালবাসিতে পারে না। বন্ধুতায় তিনি চিরদিনই দৃঢ়ব্রত, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং বিশ্বাস পরায়ণ ছিলেন। যাহাদিগকে একবার তিনি বন্ধু বলিয়া জানিতেন, বন্ধু বলিয়া সম্মান করিতেন, সম্পদে, বিপদে, সুখে দুঃখে সকল সময়ে এবং জীবনের সকল অবস্থাতেই তিনি তাহাদিগের সম্পর্কে বন্ধুতার ধর্ম্মরক্ষা করিতেন। ইহাতে যদি ঘোরতর বিঘ্ন বিপত্তির শঙ্কা থাকিত, তাহাও তাঁহাকে ভীত কিংবা বিচলিত করিতে পারিত না। তাঁহার প্রকৃতিতে একদিকে যেমন রাজোচিত গরিমা ছিল, আর একদিকে তেমনই মনুষ্যোচিত মাধুরী ছিল। তাঁহার গরিমাও তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ মাধুরীর মিশ্রণে সকল সময়েই মধুর বলিয়া প্রতিভাত হইত। যে তাঁহার সন্নিহিত হইত, সেই তাঁহার প্রিয় সম্ভাষণে পুলকিত, এবং তাঁহার প্রীতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া চিরদিনের

ভয়ে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিত। তাঁহার পার্শ্বের ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে পিতা মাতাও পরম সুহৃৎজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু একাধারে এত গুণের সমাবেশ সত্ত্বেও তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার রাজলক্ষ্মী, তাঁহার জীবন ও জীবনের সকল আশা ও সকল ভরসা রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ঙ্কর কোলাহলে কল্‌কালায়মানা রক্তগঙ্গায় ভাসিয়া গেল কেন? ইতিহাস তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে এই প্রশ্নের এই উত্তর করিয়াছে যে তাঁহার জমাখরচে মিল ছিল না। তিনি তাঁহার ভালমন্দ সকল আকাঙ্ক্ষারই সন্তর্পণ করা আবশ্যক মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার সমুদ্রতুল্য ভাণ্ডারও নিত্য শোষণে শুকাইয়া গেল। অভাবে পড়িলে যে আত্ম শাসন ও আত্ম সংযম করিতে হয়, ইহা শৈশবে কেহ তাঁহাকে শিখায় নাই, যৌবনে কেহ তাঁহাকে জানাইতে সাহস পায় নাই। সুতরাং অভাবও যতই বাড়িতে লাগিল, তাহার প্রকৃতি ও নীতিও ততই উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। আর অসীম রাজশক্তিরও যে একটা সীমা আছে, ইহা স্বপ্নেও তিনি জানিতেন না। তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে বলেন নাই, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীও তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া একথা বলিতে পারিতেন না। সুতরাং তিনি তাঁহার অন্যায় ও অবৈধ অভাব পূরণের জন্য প্রজার উপর অত্যাচার করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহার প্রথম ফল পার্লেমেন্টের সহিত বিরোধ, তারপর প্রজার বিদ্বেষ ও প্রজা-বান্ধব দেশ-হিতৈষীদিগের বিরাগ, তারপর রাষ্ট্রবিপ্লব ও ক্রমওয়েলের অভ্যুদয়, তারপর যুদ্ধ বিগ্রহ ও পরাভব,—তারপর প্রজার দরবারে রাজার বিচার এবং সেই বিচারে রাজার প্রাণ-দণ্ড! প্রথম হইতে শেষতক কারণের সহিত কার্য্যফল স্তরে স্তরে গ্রথিত, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অনুস্যূত।

আমি যে কথা চার্লসের জীবন চরিত হইতে বুঝাইতে যত্ন করিলাম, শোচনীয় কীর্ত্তি ষোড়শ লুইর চরিত-সমালোচনে তাহা অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। ষোড়শ লুইর ইতিহাস ও ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস প্রায় একবথা। তদীয় ইতিবৃত্তে ইহা শুধু অনুমিত নহে, কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত ও রক্তাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে যে, যাহা এক সময়ে রাজকীয় জমাখরচের গোলযোগ বলিয়া উপেক্ষিত রহে, তাহাই কালে জন-ভয়ঙ্কর ও জন-বিপ্লাবক রাষ্ট্রবিপ্লবে পরিণত হয়, এবং মনুষ্য যত কেন সাধু, সুশীল ও সুনীতি পরায়ণ হউক না, তাহার জমাখরচে যদি বৈষম্য ঘটে,—তাহার খরচ যদি জমার হিসাব উল্লঙ্ঘন করিয়া উপরে উঠে, তাহা হইলে পরিণামে তাহার যথাসর্ব্বস্ব ও জীবন লইয়াই টানাটানি পড়ে।

মনুষ্য বলিয়া বিচার করিলে, কোথায় কয়টি মনুষ্য আছে, যাহাদিগকে ষোড়শ লুইর সহিত তুলনায় সমান করিতে পারি? তাঁহার স্নিগ্ধমধুর প্রশান্ত চরিত্র চিন্তা করিলে, বস্তুতঃই তাঁহার প্রতি হৃদয়ে প্রগাঢ় স্নেহের সঞ্চার হয়। ক্রোধ কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না, এবং তিনি কখনও কাহাকেও কটু কিংবা কদাক্ষর বলিয়া নিপীড়িত করিতেন না। তাঁহার হৃদয় পরের সুখে হাসিত ও পরের দুঃখে কাঁদিত। তিনি পরার্থে প্রাণত্যাগও শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যারপর নাই আশ্রিত বৎসল ছিলেন। তাহার অনুজীবীদিগের মধ্যে কেহ কদাচিৎ কোনও রূপ উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে, তিনি তাহার জন্য অশ্রুজলে আপ্লুত হইতেন এবং তাহার শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া স্বজনের ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। তাঁহার প্রকৃতিতে স্বার্থপরতা ও স্বসুখানুবর্ত্তিতার গন্ধমাত্র ছিল না। রাজপুত্রেরা প্রায়শঃই ভোগ-বিলাসী হইয়া থাকে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীরা বিলাস-সুখের সপ্ত সমুদ্র শোষণ করিয়াও চিত্তে তৃপ্তিলাভ করেন নাই। কিন্তু, তিনি সংযতমতি বিবেকীর ন্যায়, অত্যল্প সুখেই পরিতৃপ্ত রহিতেন এবং সেই সামান্য সুখও যাহাতে অপরকীয় অসুখ অশান্তি অবমাননা, কিংবা মনঃক্ষোভের কারণ না হয়, সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই নিতান্ত সাবধান রহিতেন। রাজার এক ধর্ম্ম ন্যায়পরতা। ষোড়শ লুই তাহাতে রাজসমাজের পূজন স্থানীয় ছিলেন। তিনি তাঁহার দুঃখদগ্ধ জীবনে কোনদিনও কাম, ক্রোধ কিংবা লোভ মোহাদির অধীন হইয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই এবং যে ন্যায়ের

মাথ লইয়া তাঁহাকে শাসন করিয়াছে, সে মর্ম্মঘাতিনী তিক্ত কথা বলিলেও তিনি কস্মিন্‌কালে প্রত্যুত্তরে তাহাকে তিক্ত বলিতে উন্মুখ হন নাই। রাজার আর এক ধর্ম্ম প্রজারঞ্জন এবং বোধহয় ইতিহাসের বর্ণবিচিত্র চিত্রপটে এ বিষয়ে ষোড়শ লুইর উপমাস্থল অতি অল্প আছে। তিনি প্রজাকে প্রায় তাঁহার আত্মন পুত্রের সমান জানিতেন, এবং প্রজার চিত্তরঞ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনাভোগও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। প্রজা তাঁহার মাথায় এক সময়ে প্রীতির পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছে আর এক সময়ে বিদ্বেষের ধূলি বর্ষণ করিয়াছে। তিনি উভয়ই সন্তানের আবদার বলিয়া অবিচলিত চিত্তে মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। কিন্তু হায়! যিনি এক শরীরে এত গুণের আধার ছিলেন, তাঁহার আশার তরণী পরিশেষে আঁধারে ডুবিল কেন? যিনি প্রাণান্তেও কাহাকে কটু বলেন নই, তাঁহাকে প্রথমতঃ সশরীর দৃশ্য জীবনে তারপর অশরীর ঐতিহাসিক জীবনে এত কটূক্তি সহিতে হইয়াছে কেন? যিনি ন্যায়ের কঠোর শাসনে ও রাজধর্ম্ম বিধানে এক ফোঁটা রক্তপাত করিতে হইলেও শতবার শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইতেন সেই শান্ত সুস্থির সৌম্য পুরুষের ছিন্ন গ্রীবা হইতে শেষে অজস্র ধারায় রক্তবৃষ্টি হইয়াছিল কেন? ইতিহাসের উত্তর—জমাখরচ।

ঐতিহাসিকেরা ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের অনেকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সেই কারণ পরম্পরার মূল-কারণ ফরাশি রাজ্যের ঋণ। ষোড়শ লুই নিজে অতি মিতব্যয়ী ছিলেন। অপব্যয়ের যে সকল জলৌকা বিলাসীদিগের তৃষার্ত্ত শরীরে সুশীতল তুষার খণ্ডের ন্যায় সংলগ্ন হইয়া প্রথমে রক্ত, তারপর মাংস, তারপর কলিজা ধরিয়া টান দেয়, তাদৃশ কোন কিছুই তাঁহাকে কোন দিন শোষণ করে নাই। কিন্তু প্রসিদ্ধনামা চতুর্দ্দশ লুইর সময় হইতে রাজ্যে ও রাজ সংসারে এতপ্রকার অপব্যয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল, এবং ষোড়শ লুইর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা তাঁহার বৃথাভিমান, বৃথা পৌরুষ ও বিকৃত ভোগ-তৃষ্ণার পরিতর্পণের জন্য ঋণের উপর ঋণ করিয়া ফরাশি রাজ্যকে এমনভাবে ডুবাইয়া গিয়াছিলেন যে, ষোড়শ লুই কিছুতেই আর শেষে চক্ষে পথ দেখিলেন না। তিনি স্বভাবতঃ যেরূপ শান্ত ও সুশীল ছিলেন, যদি কার্য্যে সেইরূপ অচল অটল ও দৃঢ়ব্রত হইতেন, তাঁহার প্রকৃতিতে একদিকে যেমন কমনীয় কোমলতা ছিল যদি আর একদিকে সেইরূপ বজ্রকল্প কাঠিন্য থাকিত, যদি শুধু নিরুপদ্রব শান্তি সুখের জন্যই লালায়িত না হইয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রের কণ্টক জ্বালা সহিয়া লইতেও শিক্ষালাভ করিতেন,—তিনি লোক রঞ্জন করিতে যেরূপ উৎসুক ছিলেন, রাজনীতির কঠোর ব্রত পরিরক্ষণেও যদি তদনুরূপ দীক্ষিত হইতেন,- যার হাতে যখন পড়িলেন, তারই তখন মনোরঞ্জন করিতে হইবে, এই বাসনা যদি তাঁহাকে একবার উত্তরে একবার দক্ষিণে, একবার পূর্ব্বে, একবার পশ্চিমে দোদুল্যমান না রাখিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার আয় ব্যয়ের সাম্য স্থাপন করিয়া তাঁহার পিতামহ ও প্রপিতামহের পাপার্জ্জিত ঋণ পরিশোধ ও রাজ্যরক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাতে এ সকল গুণের অণুমাত্রও সম্পর্ক ছিল না। তিনি ভাল মানুষটির মত ভালবাসিতে-জানিতেন, ভাল কথা কহিতে পারিতেন, কিন্তু ভারবহন ক্ষম পুরুষের মত প্রতিজ্ঞার উপর দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না। স্তুতি নিন্দা এবং যশ ও অপযশের অতি মৃদু-মন্দ সমীর সঞ্চালনেই তিনি দণ্ডে দণ্ডে এক এক দিকে ঢুলিয়া পড়িতেন। ইহার প্রথম ফল আয় ব্যয় ঘটিত নীতির নিত্য নূতন ব্যবস্থা, তারপর নিত্য নূতন লোকের উপদেশ গ্রহণ, তারপর তদনীন্তন ফ্রান্সের ত্রিমূর্ত্তি* জাতীয় সভার উদ্বোধন ও অধিবেশন,—তারপর বিশ্বত্রাসি রাষ্ট্রবিপ্লব এবং মেরাবো, মেরা, ডেণ্টন ও রবিস্পিয়র প্রভৃতি বিপ্লব নায়কদিগের ক্রমিক অভ্যুদয়, তারপর ঝঞ্ঝাবাত, রক্তবৃষ্টি, ভূকম্প ভূবিকার,—তারপর প্রমত্ত প্রকৃতির উন্মাদ নৃত্য, তারপর প্রজার দরবারে

* The states General composed of the three orders. Viz the Nobles, the clergy and the commons.

রাজার বিচার,—তারপর সগোত্রবান্ধবে, সপরিবারে সপুত্র ষোড়শ লুইর শিরশ্ছেদ। আহা কি কষ্ট! আহা কি পরিণাম! কিরূপ ক্ষুদ্র বীজে কি বৃহৎ ফল। কিরূপ অল্পারম্ভে কি ভয়ঙ্কর অবসান। কিন্তু কার্য্যকারণের এমনই সম্বন্ধ। সৃষ্টির একদিক যদি উলটিয়া যায় তথাপি কার্য্যকারণের অতি সূক্ষ্ম সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হয় না। বাইবেলের একস্থলে এইরূপ উপদেশ আছে যে, এক পুরুষে যেসকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তাহার পরিণামফলের ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু ষোড়শ লুইর জীবনকাহিনীতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এক পুরুষের কর্ম্মফল ক্রমশঃ চতুর্দ্দশ পুরুষের দুঃখ-দুর্ভোগেও পর্য্যবসিত হয় না। কারণ, যেমন অতি দর্পে লঙ্কার অধঃপতন, অতি দানে বলির বন্ধন এবং অভিমানে দুর্য্যোধনের নিধন, সেইরূপ অতিব্যয়ে অতিচারে এবং শক্তি সমৃদ্ধির অতি ক্ষয়ে আধুনিক বসুন্ধরার ভূষণ-সদৃশ বোরবন, বংশের সমূল ধ্বংশ ও রাজ্য নাশ। বোরবনেরা এক সময়ে লঙ্কার রাবন সদৃশ ছিল।

পুরাতন ইতিহাসের দুইটি পরিচ্ছেদ বলিলাম, এক্ষণে নূতন ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ অতি সংক্ষেপে সমালোচনা করিব। বঙ্গীয় পাঠকবর্গের মধ্যে সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, যে মিশর দেশ লইয়া এত হঙ্গাম এত যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সপ্তকাণ্ড রামায়ণের এত নূতন অভিনয় হইতেছে, সেই মিশর দেশ এক সময়ে শস্যসম্পদ্ ও সুখ-সমৃদ্ধিতে পৃথিবীতে মধুর ভাণ্ডার ছিল। সেই মিশরের ললাটে এইক্ষণ এত যে লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা ঘটিতেছে ইহার কারণ কি?—কোথায় মিশর আর কোথায় বৃটন! কি জাত, নীতি, কি ধর্ম্ম অথবা কর্ম্মপদ্ধতি কিছুতেই এই দুইয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই, তথাপি বৃটনই এক্ষণ মিশরের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধী। সম্বন্ধ নাই, তথাপি মৈশরদুর্গমালা বৃটনসেনায় পরিপূরিত, মৈশরী শস্যভূমি বৃটনের পদতলে বিদলিত। এ দুর্ভোগ ও দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ কোথায়? আরবি পাশা স্বজাতির নিকট স্বদেশহিতৈষী ও স্বজাতিবৎসল বলিয়া সম্মানিত ছিল। কি কারণে সে নির্ব্বাসিত হইল? গর্ডনপাশার ন্যায় উদারমতি ও তেজস্বী প্রকৃতি বীর কি কারণে মেহ্দীর কোপাগুণে পুড়িয়া মরিল? উত্তর মিশরে এতদিন যাহা হইয়াছে এখনও যাহা হইতেছে এবং মিশর উপলক্ষে অবস্থার শাসনে ও প্রয়োজনের নিপীড়নে ভবিষ্যতেও যাহা হইবে, তাহার একমাত্র কারণ মিশরাধিপতির জমাখরচের উচ্ছৃঙ্খলা। মিশরের খেদিব আর পাঁচ প্রকারে ভাল মানুষ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি জমাখরচের হিসাবে নিতান্তই অকৃতী, অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য। এই হেতু কতকগুলি ইংরেজ ও কতকগুলি ফরাসি বণিকের নিকট তাঁহার ঋণ হয়। এই ঋণের সূত্রে তাঁহার এক মুরুব্বী ইংরেজ ও আর এক মুরুব্বী ফরাসি! কেননা যে যাহার মহাজন, সে সকল দেশে ও সকল স্থলে স্বভাবতঃই তাহার কর্ত্তা, তাহার প্রভু, তাহার অভিভাবক ও মুরুব্বী বলিয়া পৃষ্ঠের উপর সোয়ার হইয়া বসে। কিন্তু যেহেতু ইংরেজের নিকটই খেদিব অধিকতর ঋণী, অতএব ইংরেজই তাহার শ্রেষ্ঠতর মুরুব্বি। খেদিবের রাজশ্রী এক প্রকার তালুকদারী এবং তাহার প্রকৃত জমিদার ও প্রকৃত অভিভাবক তুর্কের সুলতান। কিন্তু তুর্কের সুলতান সৈন্য সমৃদ্ধিতে অতি বড় পরাক্রান্ত হইলেও তিনি ঋণের দুর্ব্বহভারে জরাজীর্ণ হইয়াছেন। ইউরোপে তিনিই এক্ষণ (The sick man)) অর্থাৎ রুগ্নপুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি এইক্ষণ পরকে আর কি রক্ষা করিতে পারিবেন? তাঁহার আত্মরক্ষাই সুকঠিন। সুতরাং তিনি তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া মিশর রাজ্যের উপর তাঁহার যে চিরপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন মুরুব্বিয়ানা ছিল, তাহা ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; এবং দেখ চাহিয়া ইংরেজ মিশর রাজ্যের উপর এই কয়বৎসর ধরিয়া কিরূপ মুরুব্বিয়ানা করিতেছেন!

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এবং সংসারের গতিনীতি পর্য্যালোচনা করিয়াই, আমি বৃদ্ধ আজি বৎসরের অবসান সময়ে সুখী দুঃখী, সবল দুর্ব্বল, অধন নির্দ্ধন সকলকে প্রীতির নির্ভরে সমস্বরে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছি,—হে সৌম্য, হে সমৃদ্ধ, হে সুবোধ, হে সুধীর, সময় বড় দ্রুতগতি বহিয়া যাইতেছে, সময় থাকিতে

একবার আপনার জমাখরচ দেখ। তুমি কি সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ রহিয়া পৃথিবীতে সুখ-শান্তির দীর্ঘজীবন যাপন করিতে ইচ্ছা কর? তাহা হইলে জমাখরচ দেখ। তুমি রাজা, রুশের জার,—তোমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। হয় লোভে, না হয় মনঃক্ষোভে তোমার ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ভেরীর ভৈরবনাদ তোমার সিংহনাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া দিগন্ত নিনাদিত করিতেছে। পৃথিবী সৈনিকের পদ-ভরে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, অস্ত্র শস্ত্রের ঝনৎকারে চিত্ত চমকিয়া উঠিতেছে চক্ষে ধাঁধা লাগিতেছে। তোমার পরাক্রমের আর সীমা নাই। কিন্তু অতি বিনীতভাবে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি তোমার জমাখরচ খুলিয়া দেখিয়াছ কি?—যাহারা জমাখরচ না দেখিয়া যুদ্ধে যায়, শুনিয়াছি তাহারা পরিশেষে নিভৃত নিবাসে বসিয়া শান্তিশতক পাঠ করেন। সুতরাং না দেখিয়া থাকিলে তোমার এই বেলাই দেখিয়া লওয়া উচিত। আর তুমি ভোগপিয়াসী বিলাসী,—তোমাকেও প্রিয়ভাবে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে তোমার ছয় দাঁড়ের লালডিঙ্গী দৌড়াইয়া সারি গাইয়া যাইতেছ—তৃষ্ণার তাড়নে তটস্থ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সখের ডিঙ্গায় সুখের পাল উড়াইতেছ, তুমি তোমার জমাখরচ দেখিয়াছ কি?—যদি জমাখরচ না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে এই বেলা কূলে ফিরিয়া আইস, এবং জমাখরচ যাচাই করিয়া আপনার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ কর। তুমি মান চাও, মহত্ত্ব চাও, সুখ চাও, সখ চাও, অথবা প্রীতি ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি বৃত্তির পরিতৃপ্তি চাও, ইহার সকলের সহিতই জমাখরচের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তুমি আপনার চক্ষে আপনি ধূলি নিক্ষেপ করিতে পার, কিন্তু তাঁহাতে জগতের চক্ষে, জগদালোক সূর্য্য অন্ধীভূত হইবে কেন? আমি তোমার ইতিহাস হইতে দুই একটি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। তোমাকে লইয়া বিজ্ঞানের আলোচনা করি নাই। কিন্তু যদি তুমি বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইতে তাহা হইলে দেখিতে পাইতে যে, প্রকৃতির এই বিশ্বভাণ্ডারের সমস্ত বিভাগই জমাখরচের সূক্ষ্মসূত্রে সূত্রিত, জমাখরচের অটল ভিত্তির উপর বিন্যস্ত। এই শিথিল সংসারে অনন্তের অনন্ত শক্তি যে অনন্তভাবে লীলা করিতেছে যোগ বিয়োগের অলঙ্ঘনীয় বিধিই তাহার জীবন। ফুলটি যে ফোটে, ফলটি যে পড়ে তাহাও জমাখরচ অর্থাৎ উপচয় ও অপচয়ের নিয়মাধীন।

৺ কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর।

গুপ্তবংশ

২২৫ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র-পশ্চাৎ অন্ধ্র বংশের বিলোপ সাধিত হইয়াছিল; সুবিস্তীর্ণ মগধ, তৈলঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের কিয়দংশে এই বংশীয়গণ আধিপত্য করিতেন। এই সময় অন্ধ্র বংশের সমসাময়িক কাশ্মীর ও পঞ্জাবের অধিকারী শকবংশীয় কুশান নরপতিদেরও ধ্বংস হয়। এই দুই প্রবল পরাক্রান্ত বংশের শেষ হইলে তাহাদের আধিপত্যাধীন দেশ সমূহে যে সকল বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহার বিবরণ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে।

অন্ধ্র বংশ এবং কুশান বংশের ধ্বংসের ন্যূনাধিক একশত বৎসর পর গুপ্তবংশের অভ্যুদয় হয় এবং এই বংশের অভ্যুদয় হইতে ভারতবর্ষে নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। আমরা সে নূতন যুগের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

এরূপ অনুমান হয় যে, অন্ধ্র ও কুশান বংশের ধ্বংসের পর যে অরাজকতা আরম্ভ হয়, তাহার সুযোগে অজাতশত্রু কর্তৃক হৃততেজা লিচ্ছবিগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করেন এবং দক্ষিণ-মগধ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়া পাটলিপুত্র অধিকার করিতে সমর্থ হন। মহারাজ গুপ্তের পৌত্র এবং ঘটোৎকচ গুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত * উত্তরাধিকার সূত্রে মগধের একটি ক্ষুদ্র অংশের সামন্ত অধিপতি ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি-বংশীয়া কুমারী দেবীকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই বিবাহ তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত করে। তিনি বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে পাটলিপুত্রের অধিকার লাভে সমর্থ হন এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যকুলকে বশীভূত করেন। সৌভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপায় চন্দ্রগুপ্তের রাজশক্তি ক্রমশঃ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তিনি "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি রাজমুদ্রায় স্বীয় নামের সহিত আপন রাজমহিষী এবং লিচ্ছবি বংশের নাম সংযোজিত করেন; তদীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী সমুদ্র গুপ্ত অনেক সময় সর্ব্বসংকারে আপনাকে লিচ্ছবি দৌহিত্ররূপে পরিচিত করিতেন। এজন্য প্রতীত হয় যে, লিচ্ছবিদের প্রভাবই তাঁহার বংশের সৌভাগ্যের প্রস্রবন স্বরূপ ছিল।

* চন্দ্রগুপ্ত প্রতিপত্তিশালী হইয়া আপন বংশের নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় রাজ্যাভিষেকের সময় ৩২০ খৃঃ অব্দ হইতে গুপ্তাব্দ নামক একটি নূতন অব্দের প্রবর্ত্তন করেন (১)। এই নূতন অব্দের প্রবর্ত্তন তাঁহার প্রবল ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। বস্তুতঃ তিনি সমগ্র মগধ, অযোধ্যা এবং প্রয়াগ ভূমের অধিকারী ছিলেন।

এই ক্ষমতাশালী নরপতির রাজত্ব মাত্র ছয় বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। অতঃপর তদীয় পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অসামান্য ক্ষমতা বলে এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। পুরাকালে যে সকল নরপতির অভ্যুদয়ে ভারতের মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়াছিল, তন্মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত পরিগণিত রহিয়াছেন।

সমুদ্রগুপ্ত অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্যশালী ছিলেন, তিনি রাজপদলাভ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে বিজয় নিশান উড্ডীন করিতে সংকল্প করেন। তিনি সংকল্প সাধনে নিরত হইয়া প্রথমতঃ আপন অধিকারের নিকটবর্ত্তী অনুগাঙ্গ প্রদেশের রাজন্যগণের বিরুদ্ধে স্বীয় বীরবাহু উত্থিত করেন। এই সকল রাজ্য বিজিত ও অধিকৃত হইলে তিনি দক্ষিণ ভারতাভিমুখে অভিযান করেন। তিনি অদম্য উদ্যম ও সাহস সহকারে বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের শেষসীমা পর্য্যন্ত সসৈন্যে উপনীত হন। দক্ষিণ ভারতের একাদশ জন নরপতি তাঁহার দুর্ব্বার পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মস্তক অবনত করেন; তাঁহাদের সমস্ত ধনরত্ন বিজেতার পদতলে অবলুণ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সকল রাজ্যের দূরত্ব এবং স্বীয় শাসন-যন্ত্রের অপটুত্ব বশতঃ সমুদ্রগুপ্ত

এহ্রিবেশের প্রশস্তি, (Fleet's Gupta kings)

*Early History of India (Vincent. A. Smith)

(১) Ancient India (R. C. Datt)

তৎসমুদয়ে স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিতে অসমর্থ হন। তিনি বিজিত রাজন্য কুলের বশ্যতা স্বীকার ও ধনরত্ন প্রদানেই সন্তুষ্ট হন। তাঁহার উত্তর ভারতের বিজয়ফল এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। উত্তরভারতের নবজন নরপতি বিজিত এবং তাঁহাদের রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীন হইয়াছিল। উত্তরও দক্ষিণ ভারতব্যাপী দিগ্বিজয় অন্তে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন হইয়া ভারতবর্ষের চক্রবর্ত্তী নরপতির পদ গ্রহণ করেন। *বস্তুতঃ ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষ মাত্র দুইবার একচ্ছত্র হইয়াছিল; প্রথমবার মহারাজ অশোকের সময়ে এবং দ্বিতীয়বার, মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সময়ে।

তাদৃশ প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজার খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বহির্ভাগে ছড়াইয়া পড়ে। গান্ধার ও কাবুল, মধ্য এসিয়া এবং সিংহলের রাজন্যকুল তাঁহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার অভিপ্রায়ে দূত প্রেরণ করিতেন।

সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বের প্রারম্ভেই তাঁহার সহিত সিংহল দ্বীপের অধিপতি মেঘবর্ণের মিত্রতা সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা সে বিবরণ এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। বৌদ্ধ রাজা মেঘবর্ণ হীরক সিংহাসনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং বোধিদ্রুমের সমীপবর্ত্তী অশোকনির্ম্মিত বিহার পরিদর্শন জন্য দুইজন শ্রমণকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং রাজভ্রাতা ইঁহাদের অন্যতর ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে সিংহলদেশীয় শ্রমণদ্বয় ভারতবর্ষে সাদর আতিথ্য লাভে বঞ্চিত হন এবং স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া তদ্বিষয়ে রাজা মেঘবর্ণের নিকট অভিযোগ করেন। রাজা তাঁহাদের বাক্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া ভারতীয় তীর্থ দর্শনাভিলাষী স্বীয় প্রজাবৃন্দের অসুবিধা দূরীকরণ অভিপ্রায়ে তাহাদের আশ্রয় স্থান জন্য একটি বিহার নির্ম্মাণ করিতে সংকল্প করেন। তিনি এই সংকল্প সাধনোদ্দেশ্যে সিংহলজাত মুক্তা এবং অন্যান্য মহার্ঘ দ্রব্য সহ সমুদ্রগুপ্তের সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত এই উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় প্রীত হন এবং তৎসমুদয় রাজকর বিবেচনা করিয়া ভারতভূমিতে একটি বিহার নির্ম্মাণজন্য আদেশ প্রদান করেন। অতঃপর বোধিদ্রুমের উত্তর পার্শ্বে একটি সুদৃশ্য ত্রিতল বিহার নির্ম্মিত হয়। এই বিহারের কারুকার্য্য মহার্ঘবর্ণে বিচিত্র নৈপুণ্য সহকারে চিত্রিত হইয়াছিল। তদভ্যন্তরস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত এবং মণিমুক্তা শোভিত ছিল। চতুর্দ্দিকস্থ বুদ্ধদেবের অবদান-স্মারক স্তূপসকল ও এই সুদৃশ্য বিহারের পার্শ্ববর্ত্তী হইবার উপযুক্তরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন্‌থ-সঙ্গ বুদ্ধ গয়ায় উপনীত হইয়া এই বিহার দর্শন করেন. তৎকালে মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত স্থবিরমতাবলম্বী এক-সহস্র শ্রমণ তথায় বাস করিতেন, সিংহলের যাত্রিগণ তথায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেন।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় শেষ হইলে তাঁহার গৌরব রবির মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হয়, সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাকে সম্রাটরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, ক্ষমতায় বৈভবে প্রতাপে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এজন্য সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণভারত হইতে প্রত্যাগত হইয়া আপনার চক্রবর্ত্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞার্থ উদ্যোগী হন। সমুদ্রগুপ্তের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে পুষ্পমিত্র একবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তারপর উত্তরাপথে এই উৎসব আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। বিপুল আড়ম্বরে সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল; যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা এবং সুবর্ণখণ্ড দক্ষিণাস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল যজ্ঞকুণ্ডের পার্শ্বে দণ্ডায়মান অশ্বমূর্ত্তি অঙ্কিত এবং যথোচিত শ্লোক খোদিত কতিপয় সুবর্ণ পদক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর অযোধ্যায় প্রাপ্ত এবং লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত একটি অশ্বের প্রস্তরমূর্ত্তি সম্ভবতঃ সমুদ্র গুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের স্মৃতিবহন করিতেছে।

মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত ভারতবর্ষের বিজেতা এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ছিলেন, এই দুই কীর্ত্তি তাঁহাকে কীর্ত্তিমন্দিরে স্থান প্রদান করিয়াছে। কিন্তু তিনি আর নানা হেতুতে লোকের বরেণ্য হইয়াছিলেন। তিনি নিজে কবিতা রচনায় পারদর্শী, সঙ্গীতপটু এবং সংস্কৃত সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি সংস্কৃত

*Early History of India (V. A. S.)

সাহিত্যের উন্নতি সাধন জন্য মুক্তহস্তে ধন বিতরণ করিতেন। গুপ্তবংশের অনুগ্রহ-পুষ্ট একজন কবি সংস্কৃত পদ্যে তাঁহার কীর্ত্তিগাথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই কীর্ত্তিগাথায় ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান সম্রাটের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, এজন্য ইহা ঐতিহাসিকের নিকট সাতিশয় মূল্যবান; সংস্কৃত পণ্ডিতের নিকটও ইহার মূল্য কম নয়। "সন্ধি বিগ্রহিক কুমারামাত্য মহাদণ্ড নায়ক" প্রভৃতি উপাধি বিভূষিত কবি হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যে প্রশস্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রয়াগস্থিত অশোক স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ হইয়া একদিকে তাঁহার ইষ্টনরপতির মহিমা বিঘোষিত করিতেছে, অন্যদিকে রচনার অভিনবত্বে এবং পারিপাট্যে তাঁহার নিজের নামও স্মরণীয় করিয়াছে।

আমরা হরিষেণের প্রশস্তির বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি।*

'যাঁহার সুখমন প্রাজ্ঞদের সঙ্গ করিতে অভ্যস্ত ছিল, যিনি শাস্ত্রতত্ত্বার্থের সমর্থক ছিলেন, যিনি গুণীগণের সম্মিলিত প্রজ্ঞা দ্বারা সৎকাব্য-শ্রীর বিরোধ নাশ করিয়া (এখনও) বিদ্বন্মণ্ডলীতে কবিতাকীর্ত্তি এবং সরল অর্থের যশঃ উপভোগ করিতেছেন।

যাহাকে পিতা (তুমিই) উপযুক্ত বলিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে গভীর ভাবের নিদর্শন স্বরূপ আলিঙ্গন এবং স্নেহ-ব্যাকুল হইয়া বাষ্পপূর্ণ ও গুণবুদ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নিখিল ধরা (পালন করিতে) আজ্ঞা প্রদান করেন, যাহাকে সমজাতগণ (রাজপদে মনোনীত হইতে অসমর্থ হইয়া ঈর্ষ্যাকুলভাবে) ম্লানবদনে দর্শন করিয়াছিলেন এবং (যাহার নির্ব্বাচনে) সভাসদগণ (কোন অনুপযুক্ত পুত্রের উপর ভার ন্যস্ত হইবার আশঙ্কা দূর হওয়াতে) দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। †

যাহার অদ্ভুত অনেক কর্ম্ম দর্শন করিয়া কতলোক সাতিশয় হর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক—স্নেহ সহকারে আস্বাদন করিতে (অভ্যস্ত ছিল) এবং যাহার বীর্য্য কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া অন্য কত লোক বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক আশ্রয় প্রার্থনা করিত।

যাহার একমাত্র উদ্বেল-ভুজবীর্য্য-বলে অচ্যুত এবং নাগসেন উন্মূলিত হইয়া ছিলেন, যাহার আদেশে সৈন্য কর্ত্তৃক কোটবংশজাত (অধিপতি) বন্দী হইয়াছিলেন এবং যিনি পুষ্প নামক (নগরে) আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

যিনি বিবিধ শত সমরে অবতীর্ণ হইতে দক্ষ ছিলেন, যাহার স্বীয় প্রখর ভুজ বলই একমাত্র বন্ধু ছিল, যিনি প্রখর ভুজবীর্য্যের জন্য প্রখ্যাত ছিলেন, যাহার অতি মনোহর দেহ পরশু, শর, শঙ্কু, শক্তি, প্রাস, অসি, তোমর, আরাচ, ভিন্দিপাল এবং বৈতস্তিক আদি প্রহরণের শত আঘাত চিহ্ন দ্বারা শোভান্বিত হইয়াছিল।

যাহার মহাভাগ্যের সহিত কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কেরলের মণ্ডরাজ, পিষ্টপুরের মহেন্দ্র (১), পর্ব্বতস্থিত কোত্তুরের স্বামীদত্ত (২) এরণ্ড পল্লের দমন; কাঞ্চির বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তের নীলরাজ, বেঙ্গীর হস্তীবর্ম্মণ (৩), পাল্লকের উগ্রসেন (৪) দেবরাষ্ট্রের কুবের (৫) কুস্থলপুরের ধনঞ্জয় এবং দক্ষিণাপথের অন্যান্য সমস্ত রাজাকে প্রথমতঃ বন্দীকরণ এবং তারপর সানুগ্রহ মুক্তিদান জনিত প্রতাপ মিশ্রিত হইয়াছিল।

যাহার মহৎ-প্রভা উদ্বৃত্ত ছিল, যাহার সে মহৎপ্রভা রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মণ, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্ম্মণ এবং আর্য্যাবর্ত্তের আর অনেক রাজাকে বল পূর্ব্বক সমূলে বিনষ্ট করায় বৃদ্ধি-

*Fleet's Gupta Kings.

† This verse seems to indicate that Chandra Gupta I specially selected Samudra Gupta from among several brothers to conquer the land and to succeed him on the throne.—Fleet.

(১) পিষ্টপুরের বর্ত্তমান নাম পিঠাপুরম, গোদাবরী জেলা; পিষ্টপুর প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানী ছিল। (২) কোত্তুর রাজ্য কোলাইর হ্রদের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। (৩) কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যে বেঙ্গীরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। (৪) প্রাচীন পলক্করাজ্য সম্ভবতঃ নেলোর জেলায় অবস্থিত ছিল। (৫) দেবরাষ্ট্র মহারাষ্ট্র।

প্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি আটবিক (জঙ্গল) প্রদেশের সমস্ত অধিপতিকে পরিচারক হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

যাহার প্রচণ্ড শাসন প্রত্যন্ত-সমতট, ডাবক, কামরূপ, নেপাল আদি রাজ্যের অধিপতিগণ এবং মালব, আর্জ্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর, প্রার্জ্জুন, সনক কানিক, কাক, খরপরিক প্রভৃতি জাতি সকল কর্ত্তৃক সর্ব্ব (বিধ) কর প্রদান, আদেশ পালন এবং বশ্যতা জ্ঞাপন জন্য আগমন দ্বারা সম্যক্‌রূপে পরিতুষ্ট হইয়াছিল।

যাহার নিখিল ভুবনব্যাপী শান্ত যশ অনেক ভ্রষ্ট এবং রাজ্যোৎসন্ন রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা অর্জ্জিত হইয়াছিল; যাহার প্রসর ভুজবীর্য্য কর্ত্তৃক (সমগ্র) ধরণীর একত্র বন্ধন দৈবপুত্র, সাহি, সাহানুসাহী শক এবং মুরুণ্ড ও সিংহলবাসী এবং সর্ব্বদ্বীপবাসীদের আত্ম-নিবেদন, কন্যাদান, গরুড় অঙ্ক (প্রদান), স্ববিষয়ভুক্তি (পরিত্যাগ) এবং শাসন যাচন আদি সেবা দ্বারা সাধিত হইয়াছিল; যিনি পৃথিবীতে অপ্রতিরথ ছিলেন; যিনি শত সুচরিত-অলঙ্কৃত অনেক গুণের আধিক্যবশতঃ অন্য নরপতিগণের কীর্ত্তি চরণতলে প্রমৃষ্ট করিয়াছিলেন; যিনি অচিন্ত্য বলিয়া সতের উদয় এবং অসতের প্রলয়ের হেতু ছিলেন; যিনি অনুকম্পাপূর্ণ বলিয়া মৃদু হৃদয় ছিলেন; যাহার মৃদু হৃদয় কেবল ভক্তি ও অবনতি গ্রাহ্য করিত; যিনি শত সহস্র গোদান করিয়াছিলেন। যাহার মন দুর্দ্দশাগ্রস্ত, দীন, অনাথ এবং আতুরজনের উদ্ধার ও দীক্ষা আদির জন্য উপগত থাকিত; যিনি লোক-অনুগ্রহের বিগ্রহ ছিলেন; যিনি (দেবতা) ধনদ, বরুণ এবং ইন্দ্রের তুল্য ছিলেন; যাহার অমাত্যবর্গ তাঁহার নিজের ভুজবল-বিজিত অনেক নরপতির সম্পত্তি প্রত্যর্পণ জন্য নিত্য ব্যাপৃত থাকিতেন।

যিনি ত্রিদশপতির গুরু (বৃহস্পতি) তুম্বুরু এবং নারদ (১) ও অন্যান্যকে বিদগ্ধমতি, সংগীতবিদ্যা এবং ললিত কলাদ্বারা লজ্জা দিতেন; যিনি বিদ্বজ্জনের উপজীবিকার উপযোগী অনেক কবিতা রচনা করিয়া 'কবিরাজ' উপাধি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; যাহার অনেক উদার ও অদ্ভুত চরিত সুচিরকাল স্তুত হইবার যোগ্য।

যিনি লৌকিক ক্রিয়াবিধানে মাত্র মনুষ্য (নতুবা) পৃথিবীবাসী দেবতা ছিলেন; যিনি মহারাজ শ্রীগুপ্তের প্রপৌত্র, মহারাজ শ্রীঘটোৎকচ গুপ্তের পৌত্র, মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তের পুত্র, লিচ্ছবিদৌহিত্র এবং মহাদেবী কুমারীদেবীর গর্ভজাত ছিলেন।

যাহার যশ, প্রদান, ভুজবিক্রম, প্রসম, শাস্ত্রবাক্য পাঠের বিকাশবশতঃ উচ্চ হইতে উচ্চে উত্থিত হইয়া অনেক মার্গে পরিভ্রমণ করিয়া মুক্তি লাভান্তে দ্রুতগতি প্রবাহমান পশুপতির জটাবদ্ধ 'পাণ্ডু-গঙ্গাজলের ন্যায় ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছে।

সেই মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্র-গুপ্তের নিখিল অবনী-তলব্যাপ্ত সর্ব্ব পৃথিবী বিজয়জনিত এবং তাঁহার ত্রিদশপতির ভবন গমন-লব্ধ ললিত সুখপ্রাপ্ত কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্য এই উচ্চ স্তম্ভ পৃথিবীর বাহুর ন্যায় উত্থিত হইয়াছে। যিনি খাদ্যোত পাকিক মহাদণ্ড নায়ক ধ্রুবভূতির পুত্র; সন্ধি-বিগ্রহিক এবং কুমারামাত্য মহাদণ্ড নায়ক হরিষেণ এবং যিনি ভট্টারকের পদদাস, যাহার মন তাহার সমীপে সর্ব্বদা-গমন-সুলভ অনুগ্রহ বশতঃ উন্মীলিত হয় (তাহার বিরচিত) এই বাক্য দ্বারা সর্ব্বভূতের হিত ও সুখ হউক।

এবং পরম ভট্টারকের পদের অনুধ্যানকারী মহাদণ্ড নায়ক তিলভট্টক কর্ত্তৃক এই বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে।'

আমরা হরিষেণের প্রশস্তির যথানুবাদ প্রদান করিলাম, কেবল যে যে অংশ অসম্পূর্ণ তাহার অনুবাদ প্রদান করিতে অসমর্থ হইলাম। প্রশস্তিতে পুষ্প নামক নগরের উল্লেখ আছে। এতৎ প্রসঙ্গে ফ্লিটসাহেব লিখিয়াছেন, পুষ্পপুর, পুষ্পপুরী এবং কুসুমপুর একার্থ বোধক এবং পাটলিপুত্র নগরীর অন্য নাম। দশকুমার চরিত গ্রন্থে পাটলিপুত্রের পুষ্পপুর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। হিউএনথ-সঙ লিখিয়াছেন কুসুমপুর নামই প্রাচীন। অতএব নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, পাটলিপুত্রনগরী মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে তিনটি বিষয় বিবেচনা করিতে

(১) Narad is regarded as inventor of Vina-flute.

C

হইবে। (১) সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গুপ্ত নরপতির উৎকীর্ণলিপি পাটলিপুত্রের নিকটস্থ স্থানে পাওয়া যায় নাই। (২) চন্দ্রগুপ্তের দুইখানি লিপিতে পাটলিপুত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহা রাজধানীরূপে বর্ণিত হয় নাই। (৩) কান্যকুব্জ বা কনৌজের প্রাচীন নাম কুসুমপুর ছিল বলিয়া হিউ-এন্‌থসঙের গ্রন্থে দেখা যায়। ফলতঃ পাটলিপুত্র অথবা কনৌজ গুপ্তবংশের রাজধানী ছিল, তাহা তর্কের বিষয়। ভিনসেণ্ট-এ-স্মিথ সাহেবের মতে ভারত-ললাম-ভূতা অযোধ্যানগরী গুপ্তবংশের রাজধানী ছিল।

হরিষেণের প্রশস্তির উপসংহারে লিখিত হইয়াছে যে, পরম ভট্টারকের পদ অনুধ্যানকারী মহাদণ্ডনায়ক তিল-ভট্টক কর্ত্তৃক তৎসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরম ভট্টারক ছিলেন। ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বলকারী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পরলোকগত হইলে তদীয় পুত্র পরমভট্টারক চন্দ্রগুপ্ত শাসনকার্য্যে ব্রতী হন এবং পিতার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার অভিপ্রায়ে হরিষেণের প্রশস্তি প্রচারিত করেন। মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত পিতার তুল্য যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পর কুমারগুপ্ত রাজ্যাধিকারী হন। তাঁহার একখানি উৎকীর্ণ লিপিতে পিতা চন্দ্রগুপ্তের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি রাজ-মহাদেবী দত্তদেবীর গর্ভজাত পিতা সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক যৌবরাজ্যে পরিগৃহীত এবং অপ্রতিরথ ছিলেন। *

বস্তুতঃ সমুদ্রগুপ্ত অতি উপযুক্ত পাত্রকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ৩৭৫ খৃঃ অব্দে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহন পূর্ব্বক অসাধারণ শাসনদক্ষতা ও বলবীর্য্য দ্বারা সুদীর্ঘকাল গুপ্ত বংশের যশঃ ও প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখেন।

সমুদ্রগুপ্ত যে সকল প্রদেশের বিরুদ্ধে অভিযান করেন নাই, তাহা চন্দ্রগুপ্তের দৃষ্টিতে পতিত হয়; তিনি মালব ও (গুজরাট) সুরাট পর্য্যন্ত আপন শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন।* এই সকল ধনধান্য-পূর্ণ দেশ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ভুক্ত হওয়াতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল; আরব সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত অধিকার স্থাপিত হওয়াতে তিনি জলপথসিদ্ধ ইউরোপীয় বাণিজ্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং তৎফলে তদ্দেশীয় সভ্যতা কর্ত্তৃক সপৃষ্ট হন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সুদীর্ঘ ৪৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আচার ব্যবহার, স্বভাব চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। তবে এই মাত্র নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, তিনি দৃঢ়চিত্ত এবং কার্য্যদক্ষ উদ্যমশীল শাসন-কর্ত্তা ছিলেন এবং শৌর্য্য-বীর্য্যজ্ঞাপক ধ্বন্যাত্মক উপাধি ভাল বাসিতেন। তাঁহার বিক্রমাদিত্য, পরম ভট্টারক উপাধি ছিল।

পুরাকালে যে সকল নরপতি আপনাদের গৌরব ঘোষণার্থ বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রেণীতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে সিংহের নির্ঘাতকরূপে বর্ণিত করিতে ভাল বাসিতেন।†

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং আপনার পর্য্যটনের বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধশাস্ত্র, বৌদ্ধ কাহিনী ও বৌদ্ধকীর্ত্তির কথায় পূর্ণ; তাহা হইলেও আমরা সে সমস্ত পাঠ করিয়া মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে ভারতবর্ষের সভ্যতা,

---

*গুজরাট (সুরাট) গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে তথায় শক জাতীয় ক্ষত্রপ উপাধিধারীদের শাসন বিদ্যমান ছিল। মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক শেষ ক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের বিনাশের যে বিবরণ হর্ষ-চরিত নামক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা কাওয়েল সাহেব কৃত হর্ষ-চরিতের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

In his enemy's city the king of the Cakas, while courting another man's wife was butchered by Chandra Gupta concealed in his mistress' dress.

Cowell's Harsa-charit.
Page 194.

*Gupta kings (Fleet)

† Early History of India (V. A. S.)

শাসনপ্রণালী এবং জনপুঞ্জের অবস্থা কীদৃশ ছিল, তাহার আভাস প্রাপ্ত হই।

কনৌজ অথবা পাটলীপুত্র গুপ্ত-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, এজন্য প্রথমেই আমরা এই দুই নগরের ফাহিয়ান কৃত বিবরণ পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

কনৌজ,—এই নগর গঙ্গার তীরে অবস্থিত। কনৌজে দুইটি মাত্র সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। সেখানে হীনযান মতাবলম্বী শ্রমণগণ বাস করেন। কনৌজের অনতিদূরে পশ্চিম দিকে একটি স্থানে বুদ্ধদেবের শুভাগমন হইয়াছিল। তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া শিষ্যবৃন্দের হিতকল্পে মানব জীবনের নশ্বরতা ও দুঃখ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তদীয় শিষ্যগণ এই ঘটনার স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। এই স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান আছে।

পাটলিপুত্র,— পাটলিপুত্র মহারাজ অশোকের রাজধানী ছিল। পাটলিপুত্র মগধের প্রধান নগর। অশোকের আদেশ ক্রমে অধিদেবতাবর্গ প্রস্তর রাশি সংগ্রহ করিয়া পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; ইহার প্রাচীর, তোরণ, মর্ম্মর মূর্ত্তি কিছুই মানব হস্ত নির্ম্মিত নহে। অশোকের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। মহারাজ অশোকের স্তূপের পার্শ্বেই মহাযান সম্প্রদায়ের একটি সঙ্ঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়; এই সঙ্ঘরাম সুদৃশ্য ও মনোরম। পাটলিপুত্রে হীনযান সম্প্রদায়ের বিহারও প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দুই বিহারে ছয় সাত শত শ্রমণ বাস করেন; তাহাদের আচার ব্যবহার শীলতাপূর্ণ ও সুব্যবস্থিত। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সৌগতগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন, জ্ঞানান্বেষী শ্রমণ ও ছাত্রগণ অত্রত্য বিহারে শিক্ষার্থীর বেশে উপনীত হন। মধ্য-ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা মগধের নগর সমূহই বৃহৎ। জনসাধারণ ধনী ও উন্নতিশীল; তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ ও ন্যায়বাদী। প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক মঞ্জুশ্রী এই নগরের মহাযান সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারামে বাস করিতেছেন। শ্রমণ ও ভিক্ষুমাত্রেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করেন। প্রতিবৎসর অষ্টম দিবসে দেবমূর্ত্তির অভিযান হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে নগরবাসীরা বংশদণ্ডদ্বারা চতুশ্চক্র পঞ্চতল রথ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা বিচিত্র-বর্ণ-বস্ত্রে সজ্জিত করে। তাহার পর তাহারা নানাপ্রকার দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য ও স্ফটিক আভরণে ভূষিত করিয়া, রথের অভ্যন্তরে কারুকার্য্য খচিত চন্দ্রাতপতলে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং রথের চারিকোণে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বৌদ্ধদেবের মূর্ত্তি উপবিষ্টভাবে স্থাপিত করে। অন্যূন বিশ খানি রথ এই প্রণালীতে নির্ম্মিত ও নানাভাবে সজ্জিত হইয়া থাকে। অভিযানের দিন বিপুল জন সমাগম হয়; শ্রমণ ও গৃহস্থ সকলেই উৎসবে যোগদান করে। নানাপ্রকার ক্রীড়া ও সঙ্গীত দ্বারা সমাগত জনমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় গন্ধ, পুষ্প ও ধূপ অর্পণ করিবার নিয়ম আছে। ব্রহ্মচারিগণ নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আগমন করেন। অতঃপর রথসমূহ নগর মধ্যে আনীত হয়। নগরবাসীরা সমস্ত রাত্রি স্ব স্ব গৃহ দীপমালায় উজ্জ্বল রাখে এবং ক্রীড়া-কৌতুক, পানবাদ্য ও ধর্ম্মকার্য্যে নিশা যাপন করে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও গৃহস্থগণ পাটলিপুত্র নগরে, স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সকল চিকিৎসালয়ে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দরিদ্র, অনাথ, বিকলাঙ্গ ও রুগ্নলোক সমূহ আশ্রয় লাভ করে, তাহারা এখানে বিনাব্যয়ে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসকগণ সবিশেষ মনোযোগ সহকারে তাহাদের ব্যাধি পরীক্ষা করিয়া আবশ্যকমত ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন। তাহারা আরোগ্য লাভ করিয়া আপনাদের সুবিধামত যথাস্থানে প্রস্থান করে।*

আমরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী অথবা প্রধান নগরী কনৌজ ও পাটলি পুত্রের বিবরণ প্রদান করিলাম। এখন গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যতম প্রদেশ মধ্যদেশ অর্থাৎ

* ভিনসেণ্টস্মিথ বলেন,—২৩৬—৩১ খৃঃ পূঃ অব্দে অশোকের রাজত্ব কালে ভারতবর্ষে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত ছিল; কিন্তু প্রতীচ্য জগতের প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্যারী নগরে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার নাম দেব গৃহ (Maison Dieu) -রাখালবাবুর ইতিহাস।

মালবের বিবরণ প্রদান করিতেছি। ফাহিয়ান লিখিয়াছেন, মথুরার দক্ষিণে মধ্যদেশ। মধ্যদেশ রামবাস উষ্ণ প্রধান; এখানে বরফ বা তুষার দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতি-পুঞ্জের অবস্থা স্বচ্ছল; তাহাদিগকে লোক-সংখ্যানুযায়ী কর দিতে হয় ভূমিকর দিতে হয় না; কেবল যাহারা রাজভূমি কর্ষণ করে, তাহাদিগকে লাভের কিয়দংশ প্রদান করিতে হয়। গমনাগমন সম্বন্ধে প্রকৃতি পুঞ্জের স্বাধীনতা আছে। কোন অপরাধীকেই শারীরিক শাস্তি ভোগ করিতে হয় না; রাজন্যবৃন্দ অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অল্পাধিক অর্থদণ্ড করিয়া থাকেন। এমন কি, কেহ পুনঃ পুনঃ রাজদ্রোহী হইলেও কেবল তাহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলা হয়। রাজরক্ষীরা নির্দ্দিষ্টহারে বেতন পাইয়া থাকে। এই দেশে প্রাণিহত্যা নাই। লোক সমূহ মদ্য, মাংস অথবা পেঁয়াজ রশুন ব্যবহার করে না। কেবল চণ্ডালেরা এই সকল দ্রব্যে অভ্যস্ত। চণ্ডালদের অন্য নাম 'বদলোক'। তাহারা নগরের বহির্ভাগে বাস করে। যদি তাহারা কখনও নগরে বা বাজারে প্রবেশ করে তবে সঙ্গে একখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া যায়। এই হেতু জন-সাধারণ তাহাদিগকে দেখিয়াই চণ্ডাল বলিয়া চিনিতে পারে এবং তাহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকে। এই দেশের লোকে হাঁস অথবা মুরগী পালন করে না। তাহাদের মধ্যে গরুর ব্যবসাও প্রচলিত নাই। হাট বাজারে কষাই খানা বা মদের দোকান দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল চণ্ডালেরা মৃগয়ালিপ্ত হয় এবং মাংস বিক্রয় করে। আদান প্রদান কালে কড়ি ব্যবহৃত হয়। এই দেশের রাজন্যবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকল ও নাগরিকগণ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর হইতেই শ্রমণবর্গের জন্য বিহার নির্ম্মাণ ও তাহাদের ভরণ পোষণের জন্য ভূমি, গৃহ ও উদ্যান দান করিয়া আসিতেছেন। এক রাজার পর এক রাজা তজ্জন্য তাম্রলিপি প্রদান করিয়া থাকেন; এই কারণে কেহ সে সমুদয় বাজেয়াপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুবর্গ নিরুপদ্রবে ঐ সমস্ত ভোগ করিয়া আসিতেছেন। বিহার সমূহে প্রত্যেক শ্রমণের স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে, এই সকল স্থানে তাঁহারা লোকহিত সাধন, শাস্ত্র পাঠ ও ধ্যানে নিরত থাকেন।

ফাহিয়ানের এই বর্ণনা পাঠ করিয়া তৎকালে মালব দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া আমরা জানিতে পারি। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে আরও অনেক স্থানের বৌদ্ধ প্রভাবের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ফাহিয়ান সিন্ধুনদের তীর হইতে মথুরায় পার্শ্ববাহিনী যমুনা পর্য্যন্ত ৫ শত মাইল পথ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি সুবিস্তীর্ণ প্রদেশে ক্রমাগত বৌদ্ধ মঠ ও বিহার দর্শন করেন. এই সকল স্থানে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। মথুরা এবং তাহার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী স্থানেই অন্যূন বিংশতি সংখ্যক সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তৎসমুদয়ে তিন সহস্র শ্রমণ বাস করিতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঈদৃশ প্রভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকিলেও তৎকালে উহার অধোগতি হইয়াছিল। ইহা ফাহিয়ান, কপিলবাস্তু, বুদ্ধগয়া, শ্রাবস্তী এবং কুশীনগর প্রভৃতি প্রধান বৌদ্ধ তীর্থের যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই প্রতিভাত হইবে। আমরা সে বিবরণ সংকলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

কপিলবাস্তু,—এই নগরে রাজা বা প্রজা কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সমগ্র নগর একটি মরুস্থলীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এখানে এক দল শ্রমণ বাস করিতেছেন, তদ্ব্যতীত দশ ঘর গৃহস্থ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

বুধগয়া,—গয়ার অবস্থা শোচনীয়; সমস্ত নগর লোক-পরিত্যক্ত মরুস্থলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। গয়া হইতে দক্ষিণ দিকে সাড়ে তিন মাইল দূরে বুধগয়া। এই স্থান অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি,পূর্ণ, কিন্তু চতুর্দ্দিক জঙ্গল পরিবেষ্টিত।

শ্রাবস্তী,—শ্রাবস্তী কোশল রাজ্যের রাজধানী। এই চিরখ্যাত নগরীর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে লোকসংখ্যা নগণ্য; সর্ব্বসাকল্যে দুই শত পরিবার মাত্র বাস করিতেছে।

কুশীনগর,—কপিলবাস্তুর ন্যায় কুশীনগরের জনসংখ্যাও অত্যল্প। এখানে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা শ্রমণ সম্প্রদায়ের সহিত সংসৃষ্ট।

বস্তুতঃ তৎকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত ও বৌদ্ধধর্ম্মের অধোগতি উপস্থিত হইয়াছিল। ফাহিয়ান বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন তজ্জন্য ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল বাস করিয়াও বৌদ্ধধর্ম্মের অধোগতি অনুধাবন ও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

ফাহিয়ান ভারতবর্ষে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহই তাঁহার ভারত প্রবাসের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি স্বগ্রন্থ প্রণয়ন কালে বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধকথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই এরূপ তদ্গত চিত্ত ছিলেন যে, তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নাম উল্লেখ করিবার অবসরও তাঁহার হয় নাই। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তদীয় বিবরণ হইতে আমরা চন্দ্রগুপ্তের সুশৃঙ্খলা ও সুশাসনের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ফাহিয়ান ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও দস্যু তস্করের হস্তে পতিত হন নাই। একারণ রাজপথ সমূহ নিরুপদ্রব ছিল বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ তিনি ভারতবর্ষে সহায়শূন্য বিদেশী ছিলেন, কিন্তু ছয় বৎসর কাল মধ্যে কোন অসুবিধা ভোগ করেন নাই, অথবা কোন প্রকার লাঞ্ছিত বা উৎপীড়িত হন নাই। ইহা আভ্যন্তরীণ শান্তির লক্ষণ।*

আমরা ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করিলাম। তাঁহার প্রদর্শিত চিত্র মনোরম, তাহাতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের নরপতির সুশাসন এবং অধিবাসীদের শান্তি ও স্বচ্ছলতা অঙ্কিত রহিয়াছে।

ভারত-ধন্য সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরলোকগত হইলে তদীয় পুত্র মহেন্দ্র উপাধিধারী কুমার গুপ্ত ৪১৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল শাসন দণ্ড পরিচালন করেন। তাঁহার শাসনকালের বিস্তৃত বিবরণ অদ্যাবধি লিখিত হইতে পারে নাই। তবে তাঁহার বহু উৎকীর্ণ লিপি এবং মুদ্রা নানা স্থানে আবিষ্কৃত হওয়াতে অনুমিত হয় যে, তাঁহার সময়ে বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল; অপিচ তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবল প্রতাপ এবং বর্দ্ধমান সৌভাগ্যের আর একটি প্রমাণ আছে। কুমার গুপ্তও পিতামহ সমুদ্র গুপ্তের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ফলতঃ কুমার গুপ্তও পিতামহ এবং পিতার ন্যায় উজ্জ্বল রাজশ্রীমণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালের শেষভাগে পরাক্রমশালী শত্রুর তাণ্ডব আরম্ভ হয় এবং রাজশ্রী মলিন হইয়া পড়ে।

প্রথমতঃ পুষ্যমিত্রনামক একটি ভারতীয় জাতি গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। কুমারগুপ্ত শত্রুকুলকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য বিপুল সৈন্য প্রেরণ করেন। রাজসৈন্য শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আইসে, এই পরাজয় ফলে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল কম্পিত হইয়া উঠে। অবশেষে রাজকুমার স্কন্দগুপ্ত বিপুল উদ্যম ও শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া পিতার সাম্রাজ্য আপদমুক্ত করেন। তিনি এই যুদ্ধকালে ঘোর কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন; তাঁহার কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্থলে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি একরাত্রি ভূমি-শয্যায় যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।*

পুষ্যমিত্রের দল বিতাড়িত হইলে আর এক নূতন শত্রু আস হস্তে উপনীত হয়। এই শত্রুর নাম ছিল হুন। হুনজাতি এসিয়ার মরুভূমিবাসী ছিল। তাহারা আহার্য্যের অন্বেষণে স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এই সময় তাহারা দুই দলে বিভক্ত হয়; এক দল অক্সাস নদীর অভিমুখে যাত্রা করে, আর এক দল ভল্গা নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল।

শেষোক্তদল পূর্ব্ব ইউরোপে দৈব বিপদের ন্যায় পতিত হইয়াছিল। তাহারা গথদিগকে দানুব নদীর দক্ষিণদিকে তাড়াইয়া দেয়। ৩৭৫ খৃঃ অব্দে তাহাদের প্রথম অভ্যুদয় হয়। ইহার পর অল্প দিনেই তাহারা দানুব এবং ভলগা নদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। শক্তিশালী নেতার অভাব এবং স্বভাবসিদ্ধ অনৈক্য বশতঃ হুনজাতি আপনাদের এই

*Travels of the Buddhist Pilgrims (S. Beal)

*Early History of India (V. A. S.)

আধিপত্য দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারে নাই। আতিলা নামক একজন শক্তিশালী নেতার সময়ই তাহাদের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ৪৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হুণ সাম্রাজ্য আত্মকলহের ফলে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ইহার পর বিংশতি বৎসর মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ঐতিহাসিক কুলতিলক গিবন হুণ জাতির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি। 'হুণ জাতির সংখ্যা, শারীরিক শক্তি, দ্রুতগতি এবং অদম্য নৃশংসতা সর্ব্বত্র অনুভূত হইত। গথেরা তাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য এবং আচার ব্যবহার দর্শনে বিস্মিত এবং ভীতিত্রস্ত হইয়া পড়ে ও তাহাদের সম্বন্ধে অতিরঞ্জন করিতে আরম্ভ করে। হুণেরা আপনাদের অধিকৃত স্থান সমূহের গৃহ এবং শস্যক্ষেত্র ভস্মীভূত করিয়াছিল এবং নির্ব্বিচারে নরহত্যা করিয়া তৎসমুদয় পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সকল প্রভুত ভীতির কারণ ছিল। হুণদের কর্কশ কণ্ঠস্বর এবং কুৎসিৎ গঠন বিস্ময় ও ঘৃণার কারণ হইয়াছিল। প্রশস্ত স্কন্ধদেশ, স্থূল নাসিকা এবং সুগভীর কৃষ্ণতার ক্ষুদ্র চক্ষু দেখিলেই তাহাদিগকে অন্যান্য জাতি হইতে বিভিন্ন বলিয়া চিনিতে পারা যাইত। তাহারা গুম্ফ ও শ্মশ্রু বিবর্জ্জিত ছিল। এজন্য তাহাদের অবয়বে যৌবনের পুরুষত্ব ব্যঞ্জক শ্রী অথবা বার্দ্ধক্যের সম্মানকর গাম্ভীর্য্য, কিছুই পরিদৃষ্ট হইত না।*

পূর্ব্ব ইউরোপের অধিবাসীরা তাদৃশ নৃশংস এবং কুৎসিৎ জাতির হস্ত হইতে দেড়শত বৎসর মধ্যেই অব্যাহতি লাভ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিল। ইউরোপে হুণ জাতির আধিপত্য ও দৌরাত্ম্য এইরূপ অল্পকাল স্থায়ী হইলেও এসিয়া তাহাদের তাণ্ডবে দীর্ঘকাল প্রপীড়িত হইয়াছিল। হুণ জাতির যে দল অক্সাস নদীর উপকূলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের সহিত পারসীকদের দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পারসীক জাতি প্রায় দুই শত বৎসর তাহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। হুণজাতি পারস্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে কাবুল রাজ্য আক্রমণ করে এবং তার পর কুমারগুপ্তের সময় ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হয়।*

হুনজাতি ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়া প্রবল পরাক্রমে গুপ্ত-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল, এরূপ দুঃসময়ে সম্রাট কুমারগুপ্ত পরলোকগত হইলেন এবং তদীয় পুত্র বীরকুলবরেণ্য স্কন্দগুপ্ত ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃ-পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। (১) তাঁহার পরাক্রমে হুণজাতি পরাজিত হয় এবং ভারতবর্ষের শস্যশ্যামল প্রান্তর এবং জনপূর্ণ নগরমালা তাহাদের নির্দ্দয় হস্ত হইতে রক্ষা পায়। অতঃপর স্কন্দগুপ্ত পিতার পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় স্তম্ভ স্থাপিত করিয়া তাহার শীর্ষে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্তম্ভগাত্রে তদীয় বিজয়কাহিনী উৎকীর্ণ হইয়াছিল। আমরা তাহার অনুবাদ প্রদান করিতেছি। †

'যিনি সমস্ত রাজ্যের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, যিনি পৃথিবীতে অপ্রতিরথ ছিলেন; যাহার যশ চতুঃসাগরের জল আস্বাদ করিয়াছে; যিনি ধনদ, বরুণ, ইন্দ্র ও অন্তকের তুল্য ছিলেন; যিনি কৃতান্তের পরশু ছিলেন, যিনি ন্যায়াগত অনেক কোটি স্বর্ণ ও গো-দান করিয়াছিলেন, যিনি চিরোৎসন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যিনি মহারাজ শ্রীগুপ্তের বংশধর, মহারাজ শ্রীঘটোৎকচ গুপ্তের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র, মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তের প্রপৌত্র, লিচ্ছবি দৌহিত্র, মহাদেবী

*Decline and fall of the Roman Empire, Chapter XXVI.

*Early History of India (V. A. S.).

(১) কুমার গুপ্তের একাধিক বিবাহ ছিল। তাঁহার স্বর্ণ মুদ্রায় দুইজন পট্টমহিষীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রত্নতত্ত্ব-বিদগণ অনুমান করেন যে, কুমারগুপ্ত বৃদ্ধ বয়সে কোন তরুণীর পাণি গ্রহণ করিয়া তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে প্রথম পট্টমহিষীর জীবন কালেই নব-বিবাহিতা মহাদেবীকে পট্টমহাদেবী রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। অনুমিত হয় যে, স্কন্দগুপ্ত প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত। কুমার গুপ্তের দ্বিতীয়া মহিষীর নাম অনন্তদেবী। তাঁহার প্রথমা মহিষীর নাম অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। অনন্তদেবীর গর্ভজাত পুত্র পুরগুপ্ত স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

রাখালদাস বাবুর ইতিহাস

† Bhitari Lat Inscription (Fleet's Gupta Kings).

কুমারদেবীর গর্ভজাত মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্র গুপ্তের পৌত্র এবং (পিতা কর্তৃক) যৌবরাজ্যে পরিগৃহীত, পরম ভাগবত, অপ্রতিরথ ও দত্তদেবীর গর্ভজাত মহারাজাধিরাজ (দ্বিতীয়) শ্রীচন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজাধিরাজ এবং পরমভাগবত ছিলেন। যিনি পিতার পদ অনুধ্যান করিতেন এবং মহাদেবী ধ্রুবদেবীর গর্ভজাত ছিলেন।

যিনি প্রবল মানসিক শক্তির জন্য প্রথিত ছিলেন, যাহার যশ বিস্তৃত ছিল। সেই মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমার গুপ্তের পুত্র বর্ত্তমান রাজা স্কন্দ গুপ্ত। যিনি সাতিশয় শ্রীশালী, যিনি পিতার পরিণত পাদপদ্মবর্ত্তী ছিলেন, যাহার যশ প্রথিত, যিনি পৃথিবীতে ভুজবল সম্পন্ন; যিনি গুপ্তবংশের বীর; যাহার বিপুল প্রভাব প্রথিত; যিনি বিমল আত্মা।

যিনি বিচলিতা কুললক্ষ্মীকে দৃঢ়ীকরণে উদ্যত হইয়া এক নিশীথে ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়াছিলেন, যিনি বীর্য্য ও ধনবলে সমুদিত পুষ্যমিত্রদিগকে বিজিত করিয়া তাহাদের রাজরূপ চরণপীঠে বামপদ স্থাপিত করিয়াছিলেন;

যিনি, পিতা স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে অচিরে ভুজবলে বিজিত করিয়া বিপ্লুতবংশ লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ যেমন রিপুর হত্যা করিয়া দেবকীর নিকট গমন করেন, সেইভাবে জয় লাভ হইয়াছে বলিয়া আনন্দাশ্রুনেত্রা মাতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যিনি সৈন্যবলে প্রচলায়িত বংশ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন এবং বাহুবলে অবনী বিজিত করিয়াছিলেন; যিনি বিজিত আর্ত্তজনকে দয়া প্রদর্শন করিতেন এবং প্রতিদিন সবর্দ্ধমান দ্যুতিসত্বেও উদ্ধত ও গর্ব্বিত হন নাই। যাহার খ্যাতি-বন্দক-বৃন্দ স্তুতি ও গীতিদ্বারা উথিত করে;

যাহার বিভুজ, ভীম আবর্ত্তকারী হূণদের সহিত সমরে লিপ্ত হইয়া ধরা কম্পিত করিয়াছিল; যাহার শর (শব্দ) শত্রুগণের কর্ণে গর্জ্জাধ্বনির ন্যায় (প্রতীত হইয়াছিল);

যিনি কোন প্রকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা (কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছিলেন);

সেই প্রথিত যশা, যাবচ্চন্দ্র তারকা তাবৎ স্থায়ী এই (শার্ঙ্গী) বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন (নরপতি) পিতার পুণ্য বৃদ্ধির জন্য এই গ্রাম দান করিলেন।

অতএব অত্র সংস্থিত ভগবৎ মূর্ত্তি ও গ্রাম,—উভয়ই পুণ্যার্থী (নরপতি) পিতার পুণ্যার্থ নির্দ্দিষ্ট করিলেন।'*

মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত স্ব-সাম্রাজ্য আপদমুক্ত করিয়া হৃষ্ট মনে পিতার নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি উৎসর্গ পূর্ব্বক পিতৃভক্তি প্রদর্শন, নিজের গৌরব বর্ণন ও স্ববংশের কীর্ত্তি খ্যাপন করেন। অতঃপর তিনি শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং সকল প্রদেশে উপযুক্ত গোপ্তা অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। পর্ণদত্ত নামক রাজভারোদ্বহনে সমর্থ ব্যক্তি সুরাষ্ট্রের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তদীয় পুত্র চক্রপালিত পিতার সহকারী ও বিচক্ষণ কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তিনি শতহস্ত দীর্ঘ এবং সপ্ততিহস্ত উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর নির্ম্মিত করিয়া গির্ণার স্থিত ধ্বংস প্রাপ্ত সুদর্শন হ্রদের পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জের হিত সাধন করেন। †

স্কন্দ গুপ্ত ন্যূনাধিক ত্রিশ বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভ পরাক্রমশালী শত্রুর তাণ্ডবে উপদ্রুত হয়, তারপর তিনি স্বীয় শৌর্য্যবীর্য্য বলে সাম্রাজ্য নিঃশত্রু করিয়া দীর্ঘকাল শান্তিতে শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। কিন্তু তাঁহার শান্তিপূর্ণ রাজত্বের শেষভাগ পুনরায় শত্রুকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়াছিল। এবার হূণজাতির আক্রমণ পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়াছিল। তিনি স্ব-সাম্রাজ্য নিঃশত্রু করিবার জন্য অপরিমিত সৈন্য ও অর্থ ক্ষয় করিয়াছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী হূণ যুদ্ধের অপরিমিত ব্যয়-নিবন্ধন রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। স্কন্দগুপ্ত এই ক্ষতি পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে নিকৃষ্ট স্বর্ণের মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ স্কন্দ গুপ্ত "স্বসুখ নিরভিলাষ" হইয়া শত্রু দমন জন্য নিরত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত

* অনুবাদকালে ২।১টী স্থান অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

† Jungarh In cription (Gupta Kings).

সাধনা ব্যর্থ হইয়াছিল। শত্রুর তাণ্ডবে সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। স্কন্দ গুপ্ত স্ব-সাম্রাজ্য স্বাপদমুক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া ভগ্নচিত্তে প্রাণ ত্যাগ করেন। ভিন্‌সেণ্টস্মিথ সাহেবের মতে ৪৮০ খৃষ্টাব্দে স্কন্দ গুপ্ত কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। স্কন্দ গুপ্ত পিতামহ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অনুসরণ করিয়া বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

৪৮০ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাঁহার মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরও তদ্বংশীয়গণ অর্দ্ধ-শতাব্দী মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্ত নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুরগুপ্ত শাসনকার্য্যে অপটু ছিলেন। সেই সঙ্কটকালে সুবিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহ করিবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। এজন্য তিনি অরাজকতা বিধ্বস্ত সাম্রাজ্যের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ববংশের প্রাথমিক অধিকার মগধ এবং তৎসন্নিহিত বঙ্গদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হন; গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পুরগুপ্তের রাজত্ব অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। অতঃপর নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য এবং নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের পর দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত মগধের সিংহাসনাধিকারী হন। দ্বিতীয় কুমার গুপ্তই বিশ্রুত-নামা গুপ্ত, গুপ্তবংশের শেষ নরপতি ছিলেন। *

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

---

* রাখাল বাবুর বঙ্গদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড।

* The title is found on certain silver coins.
Vincent A. Smith.

শিল্পীর প্রতি।

ওগো অসীম পথের যাত্রী
এই বিশ্ব ভুবন অতিথি-শালায়
কাটাও জীবন রাত্রি।
পথের শুষ্ক ধূলায় ধূলায়
তোমার চটুল চরণ তলায়
ফুটে উঠে কত প্রসূন পংক্তি
মধু পরিমল দাত্রী ;
ঐ কহিছে মূক, শিহরে জীবন
জড়ের অঙ্গে অঙ্গে
ক্ষণেকের দেখা প্রাণ আনচান
সাধ যায় যাই সঙ্গে।
হাসিছ খেলিছ ঢেলে দেহ প্রাণ
তবু কেন তব উদাসী নয়ান
তোমার সাধনা তোমার বেদনা
কাহার প্রণয় পাত্রী।
ধূলি মাটী লয়ে প্রাণের যতনে
রচিছ কাহার মূর্ত্তি।
প্রাচী পথপানে চেয়ে চেয়ে তব
নয়ানে অরুণ স্ফূর্ত্তি,
যার লাগি তুমি চলো অভিসারে
সে বুঝি আসিছে বরিতে তোমারে
মিলাইবে তোমা জীবনের পারে
ঊষা মঙ্গল ধাত্রী।

শ্রীকালিদাস রায়।

সাহিত্যিক পত্র

(স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি-আই-ই মহোদয়ের নিকট লিখিত। তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।)

৺ নবীনচন্দ্র সেনের পত্র।

নয়াপাড়া।
২৮।৪।০২।

শ্রদ্ধাস্পদ দাদা মহাশয়,—

আপনার ৮ই বৈশাখের পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। 'বান্ধবের' ২য় সংখ্যা পড়িয়াও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। প্রথম বঙ্গদর্শন ও বান্ধব বঙ্গসাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের কি প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল, বোধ হয় আপনি জানেন। এখন সেরূপ সমালোচনা কোনও মাসিক কি সাপ্তাহিক পত্রে থাকে না। যাহা থাকে তাহার উপর পাঠক সম্প্রদায় বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার ফলে আবার অপকৃষ্ট সাহিত্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। এখন একখানি ভাল বই বাহির হইলে চিনিতে পারি না, কারণ জানিবার উপায় নাই। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের যে কি ক্ষতি হইতেছে তাহাও আপনি জানেন। অতএব যখন আপনার মত একজন মহারথী বঙ্গসাহিত্যের আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ভরসা করি এ ঘোরতর অভাব দূর হইবে। সে দিন অক্ষয় দাদার কি একখানি কাগজে সমালোচনা পড়িয়া বড়ই হাসি পাইল। অক্ষয় দাদাও যদি এ পথের পথিক হন, তবে বঙ্গসাহিত্য আর কাহার দিকে চাহিবে? বঙ্গসাহিত্যে আপনার স্থান বড় উচ্চে, আপনার কথার মূল্য বড় অধিক। অতএব আপনার 'বান্ধবের' উপর motto লিখিবেন—"খাপ্রিয় ন দারস্তু।" তবে সত্য কথা প্রিয় ভাষায়ও বলা যায়। "বঙ্গদর্শন" অপ্রিয় ভাষায় বলিতেন বলিয়া তাঁহার এত শত্রু হইয়াছিল। তবে তাহাতে বড় কাষ হইয়াছিল। আপনাকে বড় শ্রদ্ধা করি। তাই এই কথাগুলিন ও গুরুতর অভাব সম্বন্ধে বড় Confidentially লিখিলাম। * * * *

আপনার আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিলাম। অবতরণিকায় * আমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমি তাহার যোগ্য নহি। এখানে একটি কথা মনে পড়িতেছে। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের plot পড়িয়া বঙ্কিম বাবু ও প্রফুল্ল উভয়ে আমাকে কাব্য লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেবল একমাত্র আপনি লিখিয়াছিলেন—"Conception grand. Execution ও সেরূপ grand হইলে উহা কেবল বঙ্গসাহিত্যে নহে, জগতের সাহিত্যেও একটী অতুলনীয় কাব্য হইবে।" আপনি এ গরিব ভ্রাতার এ তিনখানি বহি পড়িয়াছেন কি? যদি পড়িয়া থাকেন তবে এখন Execution সম্বন্ধে আপনার মত কি তাহা জানিতে পারি কি? রাজকার্য্য ছাড়িয়া এখন সাহিত্য কার্য্যে আবার মন দিয়াছেন বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ বহি তিন খানির ২০০০ করিয়া Edition দুই Edition বিক্রিও হইয়া গিয়াছে। তথাপি আপনার মত জানিতে ইচ্ছা করে। কেন? শুধু প্রশংসা শুনিবার জন্য নহে। ভাবি সংস্করণে ইহাদের কিছু উন্নতি করিতে পারি কি না, তাহা জানিবার জন্যে। "পলাশির যুদ্ধের" এরূপ উন্নতি আপনার সমালোচনার পর যে করিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় জানেন। * * * *

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

৺ চন্দ্রশেখর সেনের পত্র।

ফরক্কাবাদ।
৫।৪।০২।

দাদা!

চরণধূলি দাও, মাথায় করিয়া কৃতার্থ হই। "আপনি" "মহাশয়" লিখিয়া আর দূরে রাখিতে পারি না। তুমি

* নবপর্য্যায়ে বান্ধবের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ।

৺ রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি-আই-ই।

হৃদয়ের ধন, হৃদয়ের ভিতরে রাখিবার সম্পত্তি। দাদা চিরকালটা প্রেমেরই কাঙ্গাল, কিন্তু ভাগ্যদোষে এই বিড়ম্বনা।•

কল্য তোমার "কিশোরগৌরাঙ্গ" পাঠে কতস্থানে রোমাঞ্চ হইয়াছে, কত স্থানে অশ্রুবিসর্জন করিয়াছি। অদ্য প্রাতে হঠাৎ তোমার মধুমাখা দয়াপূর্ণ পত্র প্রাপ্তে যে কত বল পাইলাম তাহা প্রকাশ করিবার নয়। এ হতভাগা দীনদুঃখী ছোট ভাইকে আর "আপনি" "মহাশয়" বলিয়া লজ্জা দিও না।

আমাকে যখন তুমি ছোট ভাই বিবেচনা করিয়া এ ভাবে অযাচিত করুণা প্রকাশের ইচ্ছা জানাইয়াছ তখন আমার অবস্থা অকপট অসঙ্কোচভাবে তোমাকে জানাইতে দ্বিধা করিলে আমার নরক হইবে। তোমার পত্রখানি পড়িতে পড়িতে ভগবানের চরণে যে কত অশ্রু

চালিয়াছি তাহা কি বলিব; দুইবার পড়িলাম দুইবারই কাঁদিতে হইল। আমার সমস্ত কথা কোন প্রকার লজ্জাসরম আবরণ না রাখিয়া জানাইতেছি। দীনদুঃখীর আবার লজ্জাসরম কি?

আমি যেরূপ অকূলপাথারে ভাসিতেছি তাহা হইতে যে উদ্ধার হইতে পারিব এমন উপায় না দেখিয়া আজ কয়দিন দিবারাত্রি সাশ্রুনয়নে দয়াময় হরির চরণে প্রার্থনা করিতেছি। তদ্ভিন্ন ত আর কোন গতি দেখি না। খুব বিশ্বাস করি তাহারই ফলে তোমার দয়ার্দ্রহৃদয়ে আমার প্রতি এই করুণা সঞ্চার হইয়াছে।

পূর্ব্বে আদৌ বুঝিতে পারি নাই, দূর হইতে বুঝিবার শক্তিও আমাদের মত ক্ষুদ্র মানবের নাই। মনে করিয়াছিলাম, যদিও ওকালতী ব্যবসায়ে অনেক প্রকার অসত্য ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু ব্যারিষ্টারিতে ততটা করিতে হয় না, বোধ হয় বেশী অসত্যের আশ্রয় না করিয়া ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া ইহাতে এমন দুপয়সা আসিতে পারে যাহাতে মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলা যায়। অল্পবিত্তর উপার্জ্জন করিয়া জ্ঞান ধর্ম্ম সাহিত্যের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে পারিব। কিন্তু প্রবেশান্তে দেখিলাম সাধারণ ওকালতী ও ব্যারিষ্টারিতে কোনই প্রভেদ নাই। যাহাহউক যখন দেখিলাম উহাতে প্রতিপত্তি লাভ করা আমার কাজ নয়, তখন কোন ধনী বন্ধুর সাহায্যে ২০।২২ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায়ে লাগাই। উদ্দেশ্য যে উহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদোষে নানা কারণে সমস্ত নষ্ট হইল; পরে বন্ধুটীও পরলোকগত হইলেন। ················তারপর হইতেই নানা বিপদ, বন্ধুর মৃত্যু, পুত্রের মৃত্যু, অর্থাভাব, নিজের ও গৃহিণীর শারীরিক পীড়া। নাজেহাল হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইল। সেই সময়ে "ভূপ্রদক্ষিণ" কতক অর্দ্ধেক দামে, কতক সিকি দামে, আর বাঁধাগুলি টাকায় তিনখানা দরে গুরুদাসকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হই। সপরিবারে মুঙ্গেরে আসিয়া একবৎসরাধিকাল অবস্থিতি করি। বৃদ্ধ মাতা ও কনিষ্ঠ ভাই কিছুদিন সঙ্গে থাকিয়া ভাইটীর জামালপুর রেলে চাকরী হইয়া কলিকাতায় বদলী হইলে তাঁহারা দুইজন কলিকাতা যান। কেননা মাতা কনিষ্ঠ সন্তানটীর প্রতি বেশী আসক্ত। ১৯০০ আগষ্ট মাসে মুঙ্গেরে প্লেগ ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়, সেই সময় আমার শরীরও কিছু খারাপ হয়, মুঙ্গের ছোট স্থান, তেমন কাজকর্ম্মও ছিল না, পুঁজি ক্রমে ফুরাইয়া আইল। এইরূপ নানা কারণে কোন বন্ধুর পরামর্শে একাকী এখানে আসিয়া ভয়ানক পীড়িত হই, কাজেই পরিবারবর্গকে মুঙ্গের হইতে এখানে আনিতে বাধ্য হই। Cantonment ছাউনিতে একটী পরিষ্কারবাংলাতে থাকিয়া সুস্থ হই। কিন্তু বিদেশ, বিভূঁই, সম্পূর্ণ অপরিচিত বন্ধুহীন অবস্থায় কাজকর্ম্মের সুবিধা ত হয় না। তবে কোন প্রকারে দিন চলিয়া যাইতেছিল। কিছুদিন পরে ভালমন্দে মিশাইয়া শরীর, চলিতে লাগিল। * * * *

দাদা এই পত্র লিখিতেছি আর চক্ষের জল পড়িতেছে। কি করি এমন বিপদে কখন পড়ি নাই, এত কাতর কখন হই নাই। বড় ধৈর্য্য, বড় বীরের বল লইয়া এতকাল কষ্ট বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া আসিয়াছি, কারণ অর্থাভাব এরূপ তীব্রভাবে কখন ভোগ করিতে হয় নাই। ভাবিয়া দেখ দাদা, নিজে রুগ্ন, অর্থাভাবযুক্ত, একঘরে পড়িয়া আছি, অপরকক্ষে ম্লানমুখে গৃহিণী সংশয়াপন্ন পীড়িত শিশুকোলে আমার, তাহার এবং অর্থাভাবের কথা ভাবিতেছেন। এ দৃশ্য অন্য কোথাও দেখিলে আমার হৃদয় কাটিয়া যায়, শুনিলে প্রাণে দারুণ ব্যথা পাই, আর আমি নিজে এই সুদূর দেশে বন্ধুহীন অবস্থায় তাহাই ভোগ করিতেছি। এখানে বা অন্য কোথাও কাহাকেও বলি নাই, বলিবার কথা নহে। আজ তোমাকে বলিয়া যে কতকটা প্রাণ হাল্কা করিবার অবকাশ পাইলাম, ইহাই আমার পক্ষে আপাততঃ যথেষ্ট। * * * * পূর্ব্বে বরাবর ব্রাহ্মসমাজের মতবিশ্বাসেই আস্থাবান ছিলাম। পরে আজ প্রায় তিন বৎসর Theosophist সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া বড় শান্তি লাভ করিয়াছি। এবং তদনুরূপ মতবিশ্বাসে দৃঢ়রূপে স্থির করিয়াছি, সুতরাং সনাতন-ধর্ম্মই এখন

প্রাণের সামগ্রী। এখন সকলই বিশ্বাস করি, সর্ব্বশক্তিমানের রাজ্যে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। অন্ততঃ আমার মনে এই প্রকার বিশ্বাস হইয়াছে। ········· দারিদ্র্যে অনেক জ্ঞানলাভ করা যায়—অনেক উন্নত হওয়া যায়। তবে এখন যদি হঠাৎ বিপুল ধন হাতে আইসে তাহা হইলে সতর্ক হইয়া নিজেকে ঠিকঠাক দীনভাবাপন্ন রাখিয়া সে অর্থ trusteeর মত বোধ হয় ব্যবহার করিতে পারি। এইরূপ ত এখন মনে হইতেছে, কারণ ক্রমাগত এই কয় বৎসর এ প্রশ্ন নিজেকে প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করিয়া এইরূপই উত্তর পাইয়া থাকি। তবে বলা যায় না অর্থদ্বারা পতনও হইতে পারে। যাহাহউক বিপুল অর্থভোগ বিলাসের জন্য চাই না; এতটা স্থির করিতে যেন সক্ষম হইয়াছি। দুইটী কামনা বহুকালের ছিল যাহা আজও পূরণ হইল না, বোধ হয় হইবেও না, তদুপযুক্ত এবার হইত নই। ১মটী বিপুল অর্থলাভ করতঃ অকাতরে দুঃখীর দুঃখ দূর করণার্থ দান করিব। ২য়টী শেষ জীবনটা কিছুদিনের জন্য অর্থ চেষ্টা হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানধর্ম্ম ও ভগবদালোচনায় দিনাতিপাত করিব। প্রথমটী ছাড়িয়া দিয়াছি, শেষটীর আশা আজও ছাড়িতে পারিতেছি না। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল ৪০ বৎসরের অধিক জীবিত থাকিব না, পরে ৪৫ গেল, ৫০ও পার হইলাম। বাল্যাবধি শরীর রুগ্ন বলিয়া ঐরূপ ধারণা ছিল কিন্তু এখন দেখিতেছি রোগীরা রোগ ভোগ করিবার জন্য কর্ম্মফলে বেশীদিন বাঁচে। * * * *

দাদা আজকাল ভগবানের নিকট সর্ব্বদা যে সকল কথা যে ভাবে চক্ষের জলের সহিত নিবেদন করি, অদ্য তোমাকে সেই সব ঠিক সেই ভাবে জানাইলুম। কারণ তুমি তাঁহার প্রিয়সন্তানরূপে আমাকে যেরূপ আশা ও আশ্বাস দিয়াছ এরূপ আজ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই। তাই আমার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে দয়াময়ের হুকুম যে তোমার নিকট সমস্ত খুলিয়া বলিব। তুমিও সে জন্য অসংকোচে সমস্ত লিখিবার অনুমতি দিয়াছ, কাজেই সাহস বাড়িয়াছে। * * * * ব্যারিষ্টারি করিতে আমার আরো ইচ্ছা নাই, কারণ উহাতে নিত্য আধ্যাত্মিক অবনতি অনিবার্য্য। আর দগ্ধোদরের জন্য শেষ বয়সে কেন বেশী পাপ জুড়াই, এই ভয়ে উহা পরিত্যাজ্য। মৃত্যু পর্য্যন্ত খাটিতে প্রস্তুত আছি, যাহাকে honest labour বলে। বিনা পরিশ্রমে কেন সংসারের অন্ন ধ্বংস করিব? তুমি মা জগদম্বার কৃতীসন্তান, ধর্ম্মপ্রাণ জ্যেষ্ঠসহোদরবোধে তোমাকে জানাইতেছি যদি আমাকে কোথাও কোন কাজে লাগাইয়া দিতে পার যাহাতে আমি এই অসহায় জীব কয়টীকে লইয়া নিশ্চিন্তভাবে এক মুষ্টি অন্ন, একখানি বস্ত্র পাই। বাবুগিরি চাই না, তাহা ঢের ভোগ করিয়াছি, সে বিষয়ে পরিতৃপ্ত। যদি ঢাকাতে আমাকে রাখিতে পার, আমি খুব রাজী আছি। যে কাজেই লাগাও তৎসঙ্গে বান্ধবের সেবা করিব। মূলকথা জ্ঞানধর্ম্মের সেবা এবং ভগবানের নামগান হইতে যেন বঞ্চিত না হই। অবশ্য অন্নদাতার ষোল আনা সেবা করিয়া পরে আর যাহা কিছু করিব; যদি সহজ কোন ব্যবস্থা না হয়। অর্থাৎ মনে আশঙ্কা হয় যে এরূপ ভাগ্যবান ত নই যে শুধু জ্ঞানধর্ম্ম ভগবদালোচনাতে দিনাতিপাত করিব, অর্থাৎ পেটের ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইব। এরূপ কি হইবে? তাহা হইলেত আমি পৃথিবীর সম্রাট অপেক্ষাও বড়। যে কোন রকমে হউক service and self sacrifice ত চাই, নইলে করিলাম কি? জ্ঞান ধর্ম্ম দ্বারা সেবা করিলেও ত ভাল serviceই হয়, তাহার পর যতটুকু self sacrifice পাওয়া যায়।

পুস্তকগুলির মধ্যে ভাল ভাল বই আছে। তাহার উপর Century Dictionary আসিতেছে। ওগুলির দ্বারা "বান্ধবের" সেবায় সাহায্য করিতে পারিব। হাঁ পৃথিবীর নানাস্থানে পর্য্যটনকালে যে সকল notes (?) সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, সেগুলিও আছে।

মূলকথা দাদা যদি শেষ জীবনটা ঢাকাতে তোমার চরণপ্রান্তে একটু আশ্রয় দাও এ যাত্রা রক্ষা পাই।

* * * * *

যাহাহউক দেখি দয়ালহরির কি মনে আছে। আমার যেন খুব আশা হইতেছে তোমার চরণতলে একটু আশ্রয় পাইব। কেননা, এদিকে সব রকমে breaking

pointএ ঠেকিয়াছে। আমার শরীর মনে আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। ভূপ্রদক্ষিণ একখানা পাঠাইলাম। চাতকের ন্যায় তোমার উত্তরের প্রত্যাশায় রহিলাম।

তোমার—

হতভাগা ভাই চন্দ্রশেখর।

আশার কুহক।

ওরে আমার আপন ভোলা
পাগলপারা মন!
দিবানিশি কাহার লাগি
আকুল হ'য়ে রহিস্ জাগি—
কাহার মধুর দরশ আশে
ঘুরিস্ অনুক্ষণ।
সাগর-পারে কোন্ সুদূরে—
পাগল-পারা বাঁশির সুরে —
উদাসভাবে হারিয়ে ফেলিস্
আপন গৃহের ধন?
ব্যাকুল করে হৃদয়খানি
ওই বুঝি গো ডাকেন তিনি,
সেথেই কি গো এলেন দিতে
আমায় দরশন।
ওরে পাগল আস্‌বে কেবা
খুঁজিস্ যাঁরে রাত্রি দিবা—
হৃদয়-মাঝে জেগেই তিনি
আছেন অনুক্ষণ।
স্নিগ্ধ করে হৃদয় সারা
চল্‌ছে যে গো প্রেমের ধারা,
সুদূরে কি রইতে পারে—
সে যে আপন জন।

শ্রীভক্তিসুধা রায়।

ভ ফোঁটা

আমায় তোরা শুধুই ডকিস বোন,
খোকায় ছেড়ে কেমন করে যাই,
ভাইফোঁটা সে নিবেই তাহার পণ,
আজকে শুধু কাঁদছে বসে তাই।
কাজে আমার মন লাগে না আর,
বইছি শুধু খোকার হৃদয় ভার
চোখ ফেটে আজ আসছে মোরও জল
কেমন করে সান্ত্বনা তায় দেই,
আজকে আমায় শুধুই ডাকিস বোন,
বুঝিস নে কি শুনতে সময় নেই।

সেই যে কবে মুখুয্যেদের বীণা
ভায়েরে তার করল নিমন্ত্রণ
—"ভাইফোঁটা আজ যাসতো মোদের বাড়ী"
সেই শুনে যে ভাঙল খোকার মন।
শুধায় মোরে—"দিদি কি মোর নেই"?
বলনা তোরা জবাব কি তায় দেই,
মায়ের পরাণ—কেমন করে বলি
এত বড় হতাশ্বাসের কথা
"তোর দিদি যে আজকে হেথায় নেই;
কোমল প্রাণে সইবে কি তার ব্যথা?

অনেক করে চেপে চোখের জল,
খোকায় তখন বলেছিলুম বোন.
"তোর দিদি যে করছে স্বামীর ঘর"
সেই শুনে তার শান্ত হলো মন।
সেই থেকে তার পথের পানে চেয়ে,
কতই না দিন গেছে খোকার বয়ে,
'আড়াল দিয়ে আঁচলে চোখ ঢাকি'
খোকায় দেখে ফেলছি চোখের জল,
আজও যখন আসবে না তার বোন,
কেমন করে বোঝাই তারে বল?

শেষবারের মোর চরণধুলো নিয়ে
খুকী যে দিন চল্লো স্বামীর বাড়ী,
বলেছিল খোকায় চুমো দিয়ে
"ভাইফোঁটাতে আসব আবার ফিরি।"
জানিনিতো এই যাওয়া শেষ যাওয়া,
এরি মাঝে সাঙ্গ নেওয়া দেওয়া.
খবর এল - তিনটি দিনের জ্বরে,
বিনু আমার মুদেছে তার আঁখি'
এত বড় সত্য কথা হায়
বলনা সখি কেমন করে ঢাকি?

এমন বাঁধন - এমন নিবিড় স্নেহ,
সকল বুকের এমন আপন জন,
ভুলতে যে হয় সবাই মরণ-পথে.
হায়রে স্নেহ, হায়রে বিড়ম্বন!
"দিদি তাহার আসবে ফিরে কবে"!
খোকার কথার জবাব কি কেউ দেবে?
কোথায় এমন সৃষ্টিছাড়া দেশ?
হৃদয় যাহার শুধুই ভুলে-যাওয়া?
চুকিয়ে দেনা চলছে যে সে পথে,
তার লাগি'হায় শুধুই যে পথ চাওয়া!

হারায় যাহা যায়না পাওয়া ফিরে,
তবু কেন ঝড়ছে চোখে জল!
জীবন পথে ভুলতে যারে হবে
হায় হতাশের কি-ই বা সেথায় ফল?
বারে বারে এমন ফিরে চাওয়া,
চোখের জলে মিলন-গীতি গাওয়া,
এমন আঘাত—এই বুঝি তার দান!
এরি মাঝে সান্ত্বনা যারে খুঁজি,
বিজন-বাসে এইত মধুর স্মৃতি,
একলা পথের এইত শুধু পুঁজি!

শ্রীশচীন্দ্র নাথ কর।

রেজেষ্টরী করা শঙ্খমার্কা আসল

REGISTERED TRADE MARK

লালমোহন সাহা শঙ্খনিধির পৃথিবী ব্যাপিত

সর্ব্বজ্বর গজসিংহ

৪৮ ঘণ্টায় সর্ব্ববিধ জ্বর, ১ সপ্তাহে প্লীহা যকৃৎ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব।

মূল্য বড় ডিবা ১৸৹ দেড় টাকা, মধ্যম ১৲ এক টাকা, ছোট ৷৵৹ নয় আনা।

ডাকমাশুল ১ হইতে ১২ ডিবা ৵৹ দুই আনা।

জগৎবিখ্যাত।

সর্ব্বদদ্রু হুতাশন

২৪ ঘণ্টায় দাউদাদি চর্ম্মরোগ বিনা ক্লেশে আরোগ্য হয়।

মূল্য ১ ডিবা ।৵৹ ছয় আনা, ডাকমাশুল ১ হইতে ২৪ ডিবা ৵৹ দুই আনা।

সুপ্রসিদ্ধ।

কণ্ডু দাবানল

খোশ পাচড়াদি ক্ষতরোগ অতি শীঘ্র বিনাক্লেশে আরোগ্য হয়।

মূল্য ১ ডিবা ।৵৹ ছয় আনা, ডাকমাশুল ১ হইতে ১২ ডিবা ৵৹ দুই আনা

চিরবিনাত—শ্রীগৌরনিতাই সাহ শঙ্খানাধ।

মেনেজিং—প্রোপ্রাইটার।

ঠিকানা—ঢাকা, বাবুরবাজার, শঙ্খনিধি মেডিকেল হল কিম্বা ভজহরিসাহাষ্ট্রীট।

Printed by P. B. CHAKRAVARTY, at the Sreenath Press, 5, Nayabazar Road, Dacca
and
Published by HARI RAM DHAR B.A. Patuatol Dacca.

VOL. 10. No. 8.

NOVEMBER, 1920.

THE Dacca Review

BANGIYA SAHITYA PARISHAD

CONDUCTED BY
RAI SHAHEB,
BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,
AND
SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) Rs. 5-8-0
Single Copy 0-8-0

REGINUS

(TRIED OVER 30 YEARS.)

Composition-Aswagandha Coco. Munoomica, Damian. Phosphorus, &c.

REGINUS—Universally praised by your physicians as a Brain Food and Tonic.

REGINUS is now prescribed to cure completely Bodily fatigue, Brain Exhaustion, Weakness of every sort, &c., &c.

ASTHMA :—With dry cough, hard breathing periodical fits, palpitation spitting out sticky phlegm Keeping up sleepless nights for fear of Suffocation, &c. Cured radically by our specific remedy. Bottle Rs. 5.

DIABETES and PILES are cured very shortly with our proved Cures. Bottle Rs. 3 each.

Complete list of preparations sent free.

THE RANAGHAT CHEMICAL WORKS.

RANAGHAT. BENGAL.

Branch Sovabazar Street.

Edwards Tonic

The only remedy for **Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.**

Sole Agents :—**B. K. PAUL & CO.,** *7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.*

Cylogen — An Ideal Digestive Tonic Wine
Invaluable in Convalescence from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c.,
Extremely Useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,

INDISPENSABLE AFTER PARTURITION

Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.

B. K. Paul & Co.,
CALCUTTA.

Head office :—7 & 12 Bonfield's Lane Calcutta. The Research Laboratory —18 Sashi Bhuson Sarker's Lane.

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

(১) জহান্-আরা (ঐতিহাসিক চিত্র)। অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ, আই-ই-এস্ লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত। উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য। বহু হাফ্‌টোন চিত্র ও যশস্বী চিত্রশিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত প্রচ্ছদ পট সম্বলিত। ইহাতে আছে 'সেই অতীত যুগের ভ্রাতৃদ্রোহী সমর, স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত, বৃদ্ধ সম্রাট্ শাহ্‌জহানের চেষ্টা পরাভব বিলাপ ও যাতনা, কন্যার মাতৃতুল্য সেবা প্রভৃতির একটি দৃশ্যপটের মত মনোরম, অথচ বর্ণে বর্ণে সত্য ইতিহাস।' মূল্য ১।০

(২) মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা :—কে বলে, মোগল-মহিলাগণ অসার আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসে বিভোর হইয়া অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে তাঁহাদের অশিক্ষিত জীবন যাপন করিতেন? এই গ্রন্থে বাদশাহজাদীগণের সুশিক্ষা, সাহিত্য-প্রতিভা, সুরুচি প্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বহু হাফ্‌টোন চিত্র পরিশোভিত। মূল্য ।৵০

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি-এ বলেন:—"আমরা ইহা পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, অনেক নূতন বিষয় শিখিয়াছি আমরা সকলকেই অসূর্য্যম্পশ্যা মোগল-রমণীদের এই অভিনব চিত্র পড়িতে অনুরোধ করি।" (ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২৬)

(৩) মোগল-বিদুষী :—ইহাতে মোগল-অন্তঃপুরের উজ্জ্বল রত্ন জেব-উন্নিসা ও গুলবদনের জীবনকাহিনী সরল ও সুমধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

সুলেখক শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি-এ বলেন:—"মোগল-বিদুষী পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং কিছু নূতন কথা শিখিলাম। * * যাহাদের সহিত বহুদিন একত্রে বাস করিয়াছি—এবং বহুদিন যাহাদের রাজসভায় চামর ব্যজন করিতে হইয়াছে তাহাদের খোলসটাই কেবল নাড়াচাড়া করিয়া আসিয়াছি; তাহাদের প্রাণ যেখানে স্পন্দিত হইত সেই মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে আমরা অভ্যস্ত হই নাই। ইহাতে আমাদের উদারতার অভাব বলিলেই যথেষ্টরূপে অপরাধ স্বীকার করা হয় না। এই সকল কারণেই 'মোগল-বিদুষী' বিশেষ আগ্রহ সহকারে পড়িয়াছি ও পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।"

প্রাপ্তিস্থান:—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সাহিত্যামোদীর পক্ষে শুভসংবাদ—সর্ব্বজন-প্রশংসিত মাসিকপত্র ও সমালোচনী

বিকাশ

গত আশ্বিন মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, প্রিয়ম্বদা দেবী, মনোজমোহন বসু, মাণিক ভট্টাচার্য্য, জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব, মোহাম্মদ হোসেন প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিক-বৃন্দের রচনায় বিকাশ সুশোভিত।

বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা (ভি পিতে ২৵০ আনা), পত্র মধ্যে চারি আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

কভার প্রতিপৃষ্ঠা ৬৲ ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩।০, সাধারণ প্রতিপৃষ্ঠা ৪৲ অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২।০। বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য। প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

ম্যানাজার—"বিকাশ"
১১০।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পাঠের ও উপহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।

মূক ও বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক
শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন প্রণী

নল-দময়ন্তী

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১॥০ টাকা।

কয়েকখানি বহুবর্ণের চিত্র ভূষিত। বেগুণি রংএর সাটীন কাপড় মনোরম প্যাড্ বাঁধাই—তদুপরি একখানি তিন রংএর চিত্র পরিশোভিত। বাঙ্গালা ভাষায় উপহার দিবার এমন সরল সুন্দর মধুর পুস্তক আর একখানিও নাই।

মালঞ্চ সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত
এম, এ প্রণীত

ভারতনারী

সিল্কের কাপড়ে প্যাড্ বাঁধাই মূল্য ১॥০
সাটীন কাপড়ের শোভনসংস্করণ—মূল্য ২৲
বহু চিত্র ভূষিত আদিত, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সতীসাধ্বী মায়ানারীগণের চিরপূজ্য আদর্শ কাহিনী।
বাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই নিত্য পাঠ্য।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ সম্পাদিত

(বঙ্গদেশের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক স্কুলসমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত এবং কলিকাতা ইউনিভারসিটী কর্ত্তৃক মহিলাদিগের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট)

কাশীদাসী মহাভারত (সচিত্র) মূল্য ৩॥০

কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সচিত্র) মূল্য ২॥০

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চিরসমাদৃত—বাঙ্গালী জীবনের চিরমধুময়—চির নবীন রূপ কথা!

ভূতপূর্ব্ব শিশু সম্পাদক শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ঠাকুরমার ঝোলা বা বাঙ্গালার রূপকথা

যেমন সুন্দর কাগজ—তেমন সুন্দর নির্ভুল ছাপা—তেমনি সুন্দর ঝকঝকে বাঁধা আবার তেমনি সুন্দর সুন্দর রাশি রাশি ছবিতে ভরা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

Amrita Bazar Patrika says, "AN INIMITABLE PRODUCTION."

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয় বলেন—"...ইহাতে আশৈশব পরিচিত সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর কথা, ডাইনী রাক্ষসীর কথা....গেছো পাছের কথা ত আছেই আবার পুষ্পকুমার, শঙ্খরাণী প্রভৃতি সুকোমল নামের ও ততোধিক সুকোমল প্রকৃতির নায়কনায়িকার কথা সরল ভাষায়, সুন্দর ভঙ্গীতে, কল্পনার তুলিকায় কবিত্বের উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে......।"

সত্য বাবুর নূতন পুস্তক—অভিনব শিশু উপন্যাস

মূল্য ৵০] **দগোবার্ট** [মূল্য ৵০

ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লিখিত প্রভুভক্ত কর্ম্মবীরের অলৌকিক কাহিনী। এরূপ ছেলেদের উপন্যাস আর বাহির হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
৬৫নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।

A NEW BOOK—Just published.

A HISTORY OF EDUCATION IN ANCIENT INDIA.

BY

NAGENDRA NATH MAZUMDER, M. A., B. T.

Professor, Dacca Training College

WITH AN INTRODUCTION

BY

E. E. BISS, I. E. S.

Principal, Dacca Training College.

MACMILLAN & Co.

Calcutta.

Price Rc. 1-8-

Sir Gooroodass Banerjea writes:—"The book presents in a well-arranged form and within a short compass much useful information regarding ancient Hindu culture."

Babu Hirendra Nath Dutta, M. A., P. R. S. says:—"I have gone through it (Education in Ancient India) with interest. You have broken new ground and opened up a fruitful and interesting field."

Dr. Brajendra Nath Seal, (George V Professor of Philosophy, Calcutta University) writes:- I have read with great pleasure Mr. Nagendra Nath Majumdar's "History of Education in Ancient India." As a clear and interesting account of the ideals and practices of the Ancient and Mediaeval Hindus in the sphere of Education, it is eminently suited to serve as an introduction to the study of the subject.

ওঁ শ্রীশ্রীঈশ্বরায় নমঃ

শক্তি ঔষধালয়

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা। কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২নং বিডন ষ্ট্রীট। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন্ রোড্ (হাওরা পুলের নিকট শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১৩৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—৭১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—১২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের। দাদ্‌মার—৵০ কৌটা। বহরের ননী—॥০ শিশি।

(এক দিনে দদ্রু নিশ্চয় আরোগ্য)। (নালীঘা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহৌষধ)।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত—৪৲ সের।

দশন সংস্কারচূর্ণ—৶০ কৌটা।

কামদেব ঘৃত—১২৲ সের। (সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ)। অমৃতারিষ্ট—।০ আনা শিশি।

(স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায়। সারিবাদ্যারিষ্ট ৩৲ সের। (ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত ও

ব্রাহ্মীঘৃত—৩৲ সের) (রক্তদুষ্টি বাত বেদনার মহৌষধ)। সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ)

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শক্তি বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ,

হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব হেডমাষ্টার

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Sir Henry Wheeler, K. C. I. E.
" Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M. A.
" Sir N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. Donald, C. I. E., I. C. S.
" Mr. W. W. Hornell, C. I. E., M. A.
" Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
" Mr. J. G. Cumming, C. S. I., C. I. E.
" F. C. French, C.S.I., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
D. G. Davies Esq., I. C. S.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A.
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
" Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
" Rai Kumudini Kanta Bannerji Bahadur M.A.
" Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
" J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
" J. C. Kydd, M. A.
" W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
" T. T. Williams M. A., B. Sc.
" Egerton Smith, M. A.
G. H. Langley, M. A.
" Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc
Debendra Prasad Ghose

Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagpor, K.C.I.E.
The " Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.
The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.
The " Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
The Hon'ble Sir Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
" Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S
" Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
" Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
" Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
" Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
" Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
" Hemendra Prosad Ghose.
" Akshoy Kumar Moitra
" Jagadananda Roy.
" Binoy Kumar Sircar.
" Gouranga Nath Banerjee.
" Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law
Principal, Lahore Law College
Khan Bahadur Syed Abdul Latif.

CONTENTS.

1.	Speech	P. J. Hartog, C. I. E., B. A. B. Sc. (Vice-Chancellor, Dacca University)	i
2.	The World : its Past and Future	Prof. Walter A. Jenkins, M. A.	123
3.	Notes on the Spy System in Ancient India	Narayan Chandra Banerji, M. A.	143
4.	Moon Riders	D. G. D.	153

সূচী

১।	মোগল-সম্রাট আক্‌বর	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১১
২।	হিম-প্রান্তে (কবিতা)	শ্রীযুক্তা ভক্তিসুধা রায়	১১৮
৩।	আমার প্রবন্ধ	শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট্‌ল	১১৯
৪।	স্বপ্ন-কুহক (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ	১২৪
৫।	ভারতে নারীর স্বাধীনতা	শ্রীযুক্তা নীহারকুমারী দেবী	১২৪
৬।	শারদীয়া (কবিতা)	শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়	১২৯
৭।	স্বার্থ ও পরার্থ চেষ্টা	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ, বি-এল্‌	১২৯
৮।	ছিন্ন-বীণা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র দত্ত বি-এ	১৩৩
৯।	সাহিত্যিক পত্র		১৩৩
১০।	চেতনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৩৪

Speech delivered by Mr. P. J. Hartog, C. I. E., M. A., B. Sc. Vice-Chancellor Dacca University at an evening party held under the auspices of the Sahitya Samaj at the garden house of Babu Narendra Narayan Roy Chowdhury on January 7th, 1921.

LADIES AND GENTLEMEN,

I thank you on behalf of my wife and myself for your very kind welcome to-day. Speaking in this place I remember very well the hospitality shown me here on my first arrival in Dacca with my colleagues of the Calcutta University Commission an example of that admirable hospitality which we find in India, from Indian and European hosts alike, and which leaves in us an unforgettable memory.

Ladies and Gentlemen, when I left Dacca after my second visit in 1918, I never thought that I should return. Both on my first and second visits I had spent great deal of time and thought with my colleagues to the project for the foundation of a University of Dacca which was initiated quite apart from the plans of the Commission many years before. And when a year ago in March I think it was the Government of India invited me to accept the Vice-Chancellor ship of the University of Dacca and to put to the test my own ideas and those of my colleagues I felt both temptation and reluctance. Temptation, because I felt then, as I feel now, that there is a very great opportunity in Dacca of doing something which will be an example to the whole of India and perhaps to the wider world : reluctance, because of the strength of the ties to my old University to which I had given many years of work and because I felt it hard, and I am sure you will understand that I felt it hard, to leave friends at home ; my immediate family I have brought with me to enjoy the charm of your hospitality. Well, Ladies and Gentlemen, I fully realize that there has been long delay since the scheme for the Dacca University was originally drawn up, that misunderstandings have arisen, not unnaturally arisen, in the interval. You want to know whether

anything really is going to happen after all and, still more if anything is happening. I can assure you that there is no mystery in the proceedings that have occurred during the last 18 months. Mr. Stapleton was appointed as Special Officer by the Government of Bengal to assist in drawing up the details of the scheme, and in preparing a way for the new Vice-Chancellor whose duty it is "to bring the University into being"; these are the very words of the University Act. I should like to acknowledge at once the great debt that I owe to Mr. Stapleton. He has not only worked admirably from the administrative point of view but I have found in him a man who is in sympathy with myself in regard to the ideas which were set forth by the Committee presided over by Sir Robert Nathan and by the Calcutta University Commisson. He is a man whose interests outside his administrative work are in the history and the nationality of Bengal ; there may be some here who do not know that he is an accomplished Scholar and authority on the antiquities of Eastern Bengal. I therefore hope, that if there is any misunderstanding in regard to what he has done, that there may be an end of that. I can assure you that he wishes, as I wish, to help to found in this historic city a University that shall be worthy of its history and of its future, a University which will not be a Western University only, or an Eastern University only, but like other Universities shall unite in itself many cultures and that in that University there should be counted, amongst the foremost aims, the cultivation of the great traditions of Hinduism and of Muhammadan traditions which some of you are apt to think that those who come from the West are likely undervalue, mainly because of a very foolish sentence written by a very clever man, Macaulay. Even the greatest of men make mistakes.

Ladies and Gentlemen, most of you know the history of this University perhaps better than myself. You know that it was founded as a result of a deputation of Muhammadan gentlemen to Lord Hardinge when the re-partition of Bengal took place. One of the main objects of its foundation was to bring forward the backward Muhammadan Community In Bengal there are about 52 per cent of Muhammadans; in the University institutions of Bengal there are only about 10 per cent of Muhammadan students. That is not a satisfactory state of things from the point of view of education. We shall in Dacca do our best to attract more Muhammadan students to take up University education and to train up members of the Community to take an adequate part in the politics aud in the statesmanship of Bengal. But Lord Hardinge was emphatic on one point. This is not to be a Muhammadan University ; it is not to be a Hindu University : and Lord Hardinge said it is to be open to all ; and it is in that spirit that the University of Dacca will be conducted, so long as I have a ahare in its destinies.

Now to come to smaller details. What are we actually doing at the present time? Well, Ladies and Gentlemen, on the very first day of my arrival—I arrived in Calcutta on December 1st. I had two conferences in Calcutta with regard to students who have begun their course and who might be prevented from taking the ordinary examinations which they would have taken if the University of Dacca had not come into being. We had to solve certain technical difficulties into which I need not go. The Maharaja of Burdwan—the Member for Education,—Mr. Hornell and I met the Vice-Chancellor of Calcutta, Sir Dr. Nilratan Sircar, and Sir Asutosh Mukerjee and they assured us that the Calcutta University would do everything to assist us in the transitional stage. I think the students of the University of Dacca need have no anxisty on that score. One great care of the new University will be that its institution does not inflict any hardship, intentionally or unintetionally, on those who have already begun their course in the two Colleges. After a brief stay in Calcutta I came down to Dacca to become acquainted on the spot with the arrangements and plans for new buildings and with the teaching institutions as they exist at the present day. During my stay we arranged for the first meeting of the Advisory Committee of the New University, provided for under the Dacca University Act to advise by His Excellency the Governor as Chancellor of the University in regard to the first appointments to the teaching staff. Only two members of the Committee are named ex-officio in the Bill—the Vice-Chancellor of the University and the Director of Public Instruction. To those two members Lord Ronaldshay has added two others—the Vice-Chancellor of the University of Calcutta and the Hon'ble Sir Syed Shamsul Huda, the President (designate) of the new Legislative Council of Bengal. I feel sure that you will agree with me in thinking that he could have addod no more efficient or distinguished members to that Advisory Committee. Well, Ladies and Gentlemen, the work we have had to do is very tiresome. We have at least 100 appointments to consider and we have appointments to make in the first instance of 15 or 16 Professors and 18 to 20 Readers. A number of the appointments were advertised in England; all were advertised in India. On my arrival in Dacca I read every one of the two hundred or three hundred applications which we had received. It is on the opinions of the best exprts that we could obtain in England and in Calcutta and myself and on interviews with candidates that the Advisory Committee will base their report to Lord Ronaldshay. I think you may rest assured that every application will receive the most impartial consideration and that we shall not overlook the claims of the present members of the Dacca College or of the Jagannath College; the claims of every one will be considered,

But you will understand that at the present moment I am not in a position to give assurance to any one." The Committee for which I am trying to obtain the expert advice will meet in Calcutta on the 10th instant and I think it unlikely that it will be able to finish operations on that day: we have to negotiate with a certain number of candidates and I think it may well be the end of January before the Committee is able to make its final recommendations to His Excellency in regard to Chairs and Readerships. We shall then proceed to make the necessary appointments to the Lectureships and the junior staff, taking the counsel of gentlemen whom we have appointed as Professors. I am sure that those here will not be impatient in this matter. Some delay is unavoidable if the appointments are to be made with the necessary care and in such a way as will secure for the Dacca University the most competent staff that we could possibly secure at the present juncture. Ladies and Gentlemen, the Dacca University will in a way be placed in a position superior to that of any pre-existing University in India. In accordance with the recommendations of the Calcutta University Commission the Dacca University Act allows the University to deal only with students who have already reached the stage of, and who have passed, the Intermediate Examinations of other Universities or their equivalent. The new University will carry on work only of a really University character. But the claims of the students who would have spent their first two years in the University on the old system will not be neglected. There is to be set up at Dacca a Board of Secondary and Intermediate education. That Board will have under its special care the charge of the students who have hitherto spent their first two years in a University. I hope that the setting up of this Board will both strengthen and widen the scope of Secondary and Intermediate education. The senior students of the Jagannath College will be removed to the new building now being erected on the Ramna and an extension of the Jagannath College has been planned so as, to make it into an efficient Intermediate College. The Dacca College "Intermediate" students have already been removed to a separate building under the very efficient care of my friend Mr. Bottomley. There will be other changes later: a new building will be erected for the Intermediate students and the building now occupied by them will be devoted to a large Physical laboratory.

There is the question of women's education to be considered. I must ask you to excuse me if I do not dwell at length on this point. I fully appreciate its great importance but I wish to study the position in Dacca further before making any statement in regard to it.

Ladies and Gentlemen, I want now to return to one of the aims of the University, only barely sketched by the University Commission. In my dreams

in England I have always seen this University not only a University for the Province, but especially a University for the City, helping the City and being helped by it. Ladies and Gentlemen, I lived in the University of Manchester for 13 years and I wrote a history of that University. It rose from a College founded by the liberality of John Owens, who left a legacy of £ 100,000 with the stipulation that his money should be devoted to teaching not to buildings. The money for buildings was found by other private donations. The buildings were established in the first instance in the very centre of the city, yet after 7 years that College was confessed to be a failure. It was proposed to turn it into a Secondary School. My own teacher, Sir Henry Roscoe, one of the most distinguished of Chemists, had come from a small University where he had been an assistant, to take up the Professorship of Chemistry in Owens College and he saw the solution of the problem; he saw that though the College had been built in the centre of the city it was isolated from it. He secured the interest of citizens of Manchester in the College. He secured large sums of money from them, but not only large sums of money—for money is not everything—but he secured their living interest and their hearty co-operation; and from small beginnings, a University has grown up in Manchester, smaller than many in size, but yielding to none in reputation. Well, Ladies and Gentlemen, it is to that kind of co-operation that I look from you. I want you to feel that the University is going to help your sons to be strong men, men whose individuality will be developed to the utmost for their own sake, for the sake of their city and of this great country.

I come to India at a difficult time, but it is not only a difficult time, it is a time of hope. India has a great future. She has a great future if her men will understand how to work for that future, with the gospel of love and not of mistrust, with the belief that they can help to create a great country—a great self-reliant country—which shall take its place with other foremost countries of the world. It is with that hope that I come to India and to Dacca. I trust you, Ladies and Gentlemen, to give me your confidence and your help. I cannot hide from myself that my task is not an easy one. The difficulties of a commencement are always great. The strain of the horse as it starts to pull the wagon uphill is the greatest strain that it has to bear. Once the wagon is really moving the strain becomes less. In this great task I ask your indulgence and, above all, I ask your help and I feel sure that you will give it (cheers).

After the conclusion of Mr. Hartog's speech the meeting was briefly addressed by Mr. R. K. Doss, Bar-at-Law and Babu Sarat Chandra Chakrabarty, M. A. B. L., Chairman, District Board, Dacca.

Mr. R. K. Doss said :—I thank Mr. and Mrs. Hartog for their presence to-day. We are all thankful to Mr. Hartog in taking up "the Vice-Chancellorship of the Dacca University" I can assure him that there will be no want of co-operation on the part of the people in opening this University. When the Bill was under consideration, those who opposed the establishment of the Dacca University did not oppose it wholesale—what they said was this : "whether it would not be more useful to have some institutions like a Medical College, an Agricultural College, an Engineering College &c., and then to open the University." And I voice the unanimous feeling of the Dacca public that if Mr. Hartog in his term succeeds in giving in the Dacca University these institutions or even if he succeeds in making a beginning of these institutions, the people will be immensely grateful.

Babu Sarat Chandra Chakrabarty said :—I fully endorse what my esteemed friend Mr. Doss has said. I am glad that we have been given this opportunity to discuss things. I can assure you that you will get all the help and co-operation you want from us, only if we are given an opportunity, if we are given to understand that such help and such co operation is needed and the time when they are needed. You have just referred to the Advisory Committee. Let me say how we feel in this matter. We have nothing to say against the personnel of the Committee. But unfortunately there is no one from Dacca on that Committee and we feel that these selections are not made by His Excellency and we fell aggrieved that advice has not been given to His Excellency to have a representative of Dacca on that Advisory Committee. This is one of the examples of how the people of Dacca feel. We hope that you will discuss with the people in every possible way as to what is required and what is beneficial and I can assure that you will get all the support and co-operation of the people of Dacca that you may require.

Mr. P. J. Hartog in reply said :—Mr. Doss and Mr. Chakravarti, I thank you very much for your kind words and I thank you all once more on behalf of my wife and myself. I am grateful to you for your reception. I feel that I should say one word in conclusion of congratulation to the owner of this beautiful garden and of thanks to him at the same time for receiving us in it.

THE DACCA REVIEW.

Vol. X.	NOVEMBER, 1920.	No. 8.

THE WORLD: ITS PAST AND FUTURE.

Ever since man had the power anp time to think, the problem of the life history of the planet on which he dwells has occupied his attention. With but few exceptions all primitive races and all old time civillsations include within their conceptions and speculations, theories as to how the earth came to be. Nor is this to be wondered at for it naturally suggests itself as one of the first problems which thinking man would try to solve. But between the early conceptions of even the highly civilized nations and the scientific theories of to-day there is a vast gulf, the crossing of which has been accomplished, not so much by a laborious transition, as by a sudden leap. For while the cosmological theories of all ancient peoples were indissolubly bound up with their religious conceptions, modern theories of the history of the Universe are based purely and simply upon observation and experiment. To the ancients the world as it existed was suddenly created at the call of a deity or deities—to the modern mind, the present state of the world is the result of evolution and devolution from a state formerly vastly different from its present one. With regard to the ultimate origin of the universe modern science is silent. It neither affirms nor contradicts theories as to primal causes.

The leap across the gulf between ancient and modern theories was taken when men began to base their ideas purely and simply upon observed phenomena and laws, and to divorce theology from its interesting, if not conspicuously harmonious, partnership with natural philosophy. This does not mean that early conceptions were illogical and incompatible with the then observed and known facts. Many of them were, in their age, rational; and almost all of them were undeniably beautiful. Moreover the many ideas that have at different times by different peoples been expressed in order to account for the existence of the world,

possess many common concepts. Many of them imagined that before there was land, air, sky and human-life, water filled the universe. Water was the primordial substance and from this our planet was in different ways created. "Whence sprang this world, who can e'er the truth disclose." Had science no reasons for asserting that the world was once vastly different from what it is now—had astronomical and physical sciences not discovered that there are worlds very similar and yet differing in certain remarkable ways from our own—had the process of the birth, growth and destruction of worlds not been revealed by the skill and laborious research of modern scientists—it is probable that science would have left the problem to its philosophical and theological scholars.

But because, by the application of laws believed to be universally true, the scientist was led to the conclusion that the world in past days was extremely hot, and indeed in a molten condition, he began to try and account for the changes that have taken and are taking place.

What are the reasons which lead him to such conclusions? It is a matter of common experience that during the day-time the sun heats up the portion of the earth upon which it falls, often to a considerable temperature. At night-time, however, when the sun has sunk beneath the horizon the earth begins to radiate out its heat into space. This radiated heat once it has left the earth never returns, it pursues its way through limitless space until intercepted by some other planet or star. We therefore have a process of heating up and cooling down; but when we measure, in the most accurate manner possible, the amount of heat radiated out into space at night-time, we find that it exceeds the amount received from the sun during the day time. The excess is not much but it is far beyond the limits of errors of experiment, and we are therefore led to the conclusion that the earth is slowly losing some of its own heat. Unless therefore the earth has some inexhaustible source of heat supply, we are led to the inevitable conclusion that the earth must gradually get colder and has in fact been cooling down since its creation. No such thing as an inexhaustible supply of energy is known in the scientific world, indeed the creation of heat or energy out of nothing is a direct contradiction of the most fundamental law of science, namely that energy can neither be created nor destroyed.* Recent discoveries of Radio-active substances point to the available energy supply of the earth being far greater than has hitherto been supposed, but it is not inexhaustible; and if during every year of its existence the earth radiates and loses a certain amount of heat we are driven to the conclusion

*See note at end.

that once it was a hot mass. Indeed we can calculate how long ago was the period when, instead of being a solid crusted sphere, our earth was a molten mass of fiery liquid. But there are other indications that once our world was otherwise. For while the surface of the earth is reasonably cold and habitable we know that the inside of the earth is hot.

Volcanic eruptions with their outpourings of molten lava reveal a state of affairs, not very many miles below the surface of the earth, not much different from that of our fiery blazing noon-day sun. As we descend into mines the temperature gradually rises and the sources from which we derive our knowledge of the under surface of our earth such as hot springs geysers, etc., point to the fact that underneath the solid crust there is a sea of molten matter of extremely high temperature. The centre of the earth may be solid, for the extremely high pressure, caused by the contraction of the earth on cooling, may prevent liquefaction in spite of the enormous temperature.

Now this is precisely the state of affairs that would result from the cooling of a rotating mass of molten matter. First the outer part would cool and solidify. This solid crust would protect the central portions from great loss of heat, but gradually the solid crust would thicken, and ultimately we should expect that the tumultuous seas of molten matter would be for ever kept confined within the bowels of the earth. This stage has not been reached. We still have volcanic eruptions, but as time goes on they will gradually become rarer and rarer and ultimately disappear. In days gone by volcanic action was far more frequent than now and lava streams are found in countries at present completely free from volcanic eruptions.

Moreover the actual shape of the earth testifies to its once molten state. It is not a sphere, but an oblate spheroid—, that is, a sphere flattened at the poles and bulging out round the equator. Now a rotating mass of liquid takes exactly this shape, so that it is natural to suppose, that its present shape is due to the fact that in former times it rotated as now—probably a little faster—and that it solidified from a molten state while so rotating. But it is not only the science of physics that indicates a former molten condition of the earth. Geological and biological studies likewise show that the earth reached its present state by a slow evolution from an intensely hot world. In countries now temperate or arctic, traces of former tropical climates are found. From the rates of depositions of certain rocks—from the depths of river beds and channels and in other ways it is possible indeed to calculate the probable age of the earth, and the fact that this age runs into the hundreds of millions of years in no wise makes less improbable the conclusions reached.

The earliest found fossils are those of tree ferns—ferns similar to those now found in tropical climates,—but in former times they showed no predilection for equatorial regions. They are discovered in polar regions and temperate zones, and the most striking fact about them is that they show no annual rings of growth such as are found upon modern specimens. This means, of course, that in all probability there were no seasons in those days, and, if we can trust our deductions at all, probably no day and night as we at present know them. For with a world vastly hotter than our own but still cool enough for water to have condensed and formed the seas, evaporation would take place at such a prodigious rate, that our planet must have been wrapped in a perpetual mist. A mist, thick and impenetrable, shutting out from the earth almost completely the light and heat to which we now owe our seasons and day and night recurrences. That the earliest vegetation forms were of the fern variety supports this conclusion, for ferns as we know dislike bright sunlight and flourish in shady sheltered, moist places. In former days, too, animal life was not as it is now, for many skeletons of Mammoth beasts have been unearthed. Mammoths that dwarf our largest known forms of life, and must have made this world a very much less safe place to live in than at the present time. All our evidence points to the same conclusion. At one time this world, which most of us consider a pleasant place, was much hotter than now—probably it was a seething mass of molten matter surrounded by a curtain of vapours, through which sunlight and heat could hardly penetrate. Then, there were no trees or seas, no hills, valleys or mountains, nothing but a globular rotating mass

So far we have worked backwards; as yet the evidence we have used, we have gathered by investigations of our own world; but immediately we call in the aid of astronomy and astronomical physics our convictions as to the earth's past condition and origin become strengthened. For convenience we will divide the universe into two parts—the Stellar System and our own Planetary System.

The former consists of the inconceivably large stars, seen and unseen, some of which glitter like diamonds in the constellations of the heavens. They are remote from our earth,—remote almost beyond comprehension,—and have little influence upon the progress and life of our planet.

The latter however, is our own family. Revolving round the sun in elliptical orbits are the eight planets Mercury, Venus, The Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Besides these planets there are other smaller ones—notably between Mars and Jupiter—which likewise circle the Sun. The first four named planets are called the terrestrial planets and the last named four

the major planets. That heavenly bodies should revolve round a central body is not strange—it is merely an inevitable result of the ever present attraction which, providing two bodies come close enough to each other, prevents their ever going apart. But when we come to consider in detail the movements and structure of the planets, we are compelled to conclude that the different members of the Sun system are much more intimately connected than by the fact that they yield to the attraction of the same sun. All of them revolve round in the same direction, an anti-clockwise one—moreover this direction is the same as the direction of rotation of almost all the planets upon their axes. Now were the planets mere passing visitors drawn within the region of the sun's influence and compelled to abide there as one of his family, there is no reason why they should revolve round the sun in any one direction more than in another. Moreover the paths of all the planets lie in very approximately the same plane called the ecliptic. The chance that such a state of affairs could have happened by the collection of an unrelated system of worlds drawn into revolution round the sun from the outside universe is so small, as to make it almost certain, that the genesis of all these planets was similar. But the correllated properties do not cease here.

As we pass outwards from the nearest planet Mercury to the outermost one Neptune, we find a gradual increase in the angle which the axes of rotation of the planet makes with the perpendicular to its plane of revolution. Mercury Venus The Earth and Mars revolve counter-clockwise upon an axis making almost a right angle with the plane of their path of revolution round the sun. Jupiter spins round in the same direction but its axis makes an angle of 3° with the perpendicular, Saturn's axis is 24° out of the perpendicular, Uranus's 98°, while Neptune's is 145° showing that it has turned over almost completely and is spinning round almost in a clockwise direction. But this, as well as other facts, becomes far more astonishing and significant when we consider not merely the planetary system as a whole, but each individual planet's family. Jupiter has eight satellites which revolve around it—Saturn has nine—Mars has two,—the Earth one—Uranus four and Neptune one. The satellites of Jupiter and Saturn and indeed of all the planets show exactly the same progression of the angle of tilt as do the planets themselves. Moreover with the exception of the outermost satellites of Jupiter and Saturn all rotate around their primary planet in the same direction as does their planet round its sun, that is counter-clockwise.

Again, just as all the planets revolve in approximately one plane called the ecliptic, and deviation from absolute uniplanor motion is most noticeable in the case of the outermost planets, so

with the satellites. All the near satellites revolve in an equatorial plane and in the case of the outermost ones the deviation increases with the distance away from the parent-planet. Again, all the satellites turn the same face eternally towards their planet. Their period of revolution coincides with their period of axial rotation. This also obtains in the case of Venus and Hercules and as we shall see later will ultimately probably obtain in the case of all the planets

But perhaps the most striking uniformity of all is the similarity which exists between the graphs showing the variation of the mass with distarce from the cental attracting body in the case of the planatary system and each planet's satellete system.

The following table shows some of the characteristics of the planets.

		Distance from sun in millions of miles	Diameter in miles	Density Earth = 1	Mass Earth = 1	Period of Axial Rotation hrs.	mins.	secs.
	The sun		886,400	·25	332,000	25	4	48
Terrestrial Planets.	Mercury	36	3030	·85	·048	*88	0	0
	Venus	67	7700	·89	·820	*226	0	0
	Earth	93	7918	1·00	1·000	23	56	4
	Mars	141	4230	·71	·107	24	57	23
Outer Planets.	Jupiter	483	86,500	·24	317·7	9	55	0
	Saturn	886	73,000	·13	94·8	10	14	0
	Uranus	1782	31,900	·22	14·6	9	30	0
	Neptune	2792	34,800	·20	17·0		?	

* Coincident with their periods of rotation round the sun. Day—hours—minutes.

At first sight it seems that their is little order in the variation of the mass with the distance from the sun. But if we look carefully we see that the masses if plotted against the distance give a curve shaped as follows.

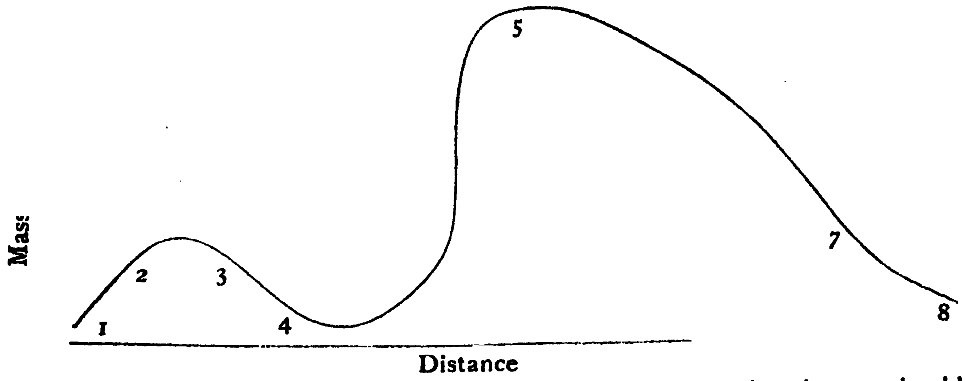

The graph is not drawn to scale but it illustrates the progression. If, now, we draw the graph showing the relationship existing between the masses of the satellites and their distances from their governing planets we get curves exactly similar in shape. In other words the masses of the satellites vary in exactly the same way as the masses of the planets with their distances from the sun.

The table further shows that the outer planets are less dense than the inner ones, and this is exactly what we should expect upon the modern theories of the genesis of the planetary system.

The last column shows the period of the planets upon their axes, and it will be at once seen that, in general, the the times of rotation decrease as we proceed further from the sun. A brief study of the effect of grevitational attraction will show us why this should be so and will lead us to a remarkable conclusion.

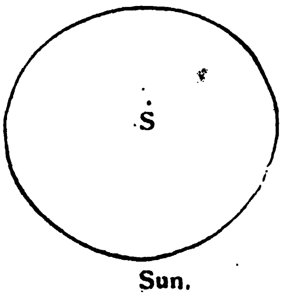

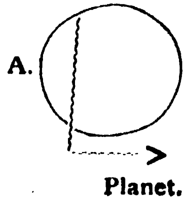

space, then the smallest body will cool down most quickly and the largest one the most slowly. Astronomical physics shows that Jupiter the largest planet is still a mass of vapour with possibly a denser molten core. Saturn, next in size, is likewise a fiery furnace. Uranus and Neptune far away and not so amenable to investigation, cannot be examined with the same accuracy but it is known that their temperatures are high. The earth much smaller than any of the aforementioned planets is at what we call a reasonable temperature, while Venus only a little smaller than the earth is in the peculiar state of having the two halves of itself in vastly different states from each other. The side that faces the sun perpetually is baked and hot while the half that dwells in eternal darkness is cold and frozen. Mars, only about one tenth of the earth in mass, has already become cold and icy. Thus we see that the present temperatures of the planets are exactly what they would be had the planets all been created at the same time from the same mass of vapour. A further characteristic, suggestive of the same origin, is observed. An atmosphere of gases surrounds a planet and is prevented from leaving it by the attraction of the planet itself. If the individual molecules could move with a sufficient velocity they would be enabled to escape from the planet altogether. Thus it is well known that if a body were thrown upwards with a velocity of 6·9 miles per second it would never return to the earth. Its velocity would enable it to travel so far from the earth, that the pull of the earth, which varies inversely as the square of the distance away, would be insufficient to make it return. This velocity is at present beyond the limits of mechanical projection, but it is not greater than the velocity with which some of the molecules of the atmosphere move about. The molecules of the upper strata of the air, which after collision with other molecules start moving directly away from the earth, will therefore journey out into space never to return to the planet they once graced. We arrive at the conclusion therefore, that our atmosphere is slowly losing some of its molecules—becoming rarer and rarer and will probably one day disappear. If such is the case we should expect the smaller planets, where the control of gravitational attraction exercised upon the atmosphere is considerably less, we should expect these planets either to have a much more rarefied atmosphere than ours or to have none at all. With Mercury such is the case. Venus—but little less than the earth exercises a gravitational pull not much less than our own, ·82 to be exact, and she still preserves her atmosphere. Mercury where gravity is only ·43 of what it is here, and Mars where it is ·38 have little if any atmosphere. Moreover the moon and all the satellites of the different planets being small in

size have likewise shed their atmospheres. Thus we see again that the present day state of the planets is exactly what would be expected if we presume them to have been created at the same time.

All our arguments point to the same conclusion, namely that all the planets had a common origin, and that their quondam state was one of excessively high temperature characteristic of vapourised matter. In whatever way the planets were formed—after formation they gave birth in a similar manner to their own satellite systems. This is a startling conclusion, but it is still further supported by the fact that we have evidence which shows that celestial events occur which would give rise to a whirling mass of vapour from which planetary systems could be formed. Suppose we have a whirling mass of vapour rotating with enormous velocity and gradually cooling. As it cools strains are set up and it rotates faster and faster until it bulges out considerably at the equator and sheds a ring of matter. This ring contracts into a globular mass and continues its rotation round its parent, at the same time revolving round its own axis. Further contraction causes a further shedding of a ring and birth of a planet and this continues until a number of planets have been formed. All these planets will revolve round the parent in the same direction and their initial temperature and states will be approximately the same. The less dense materials of which the vapour is composed will be on the outside of the whirling mass and will be shed off from the parent first. Each planet may likewise give birth to its own family of satellites, and the relations between the satellites and the planets will be exactly the same as between the planets and the sun from which they were born. This is hypothetical but that it is also a possible method of formation has been shown by an exceedingly ingenious experiment carried out by a Dutch scientist. A globular mass of oil was suspended in a solution of spirits of wine of exactly the same density as the oil. By a skilful contrivance the oil was made to rotate around a vertical axis. Before rotation its shape was spherical. As its speed of rotation increased it gradually became more and more spheroidal, until after bulging considerably round its equator a ring of oil was split off. This ring gradually coalesced into a globule. On further increasing the speed another ring was shed and another globule formed. A witness of the experiment on seeing the shedding of the rings exclaimed so might the worlds have been made. We therefore see that if a mass of vapour were rotating and its speed were increased it would shed parts of itself which would become its planets. The argument is not vitiated if instead of vapour we postulate a mass of small separated pieces of matter each rotating with great speed

and kept within the group of masses by gravitational attraction. So far we have merely suggested what could give rise to the birth of a planetary system, but when we begin to examine the heavens carefully, we find there phenomena which suggest this very mode of world formation. Besides the stars and planets which adorn the heavens, there are many other forms of matter revealed to the telescope. Even a small telescope will show what are called nebulœ, or bright patches of the heavens, from which diffused light is emitted suggestive of luminous gas or vapour. These nebulœ are vast beyond one's comprehension, being many millions of miles in breadth and length, and the latest spectroscopic research shows them to be probably of two classes. Some of them are probably still in a vapourous condition, while others consist of a gaseous atmosphere in which swarm myriads of meteorites, or small pieces of matter. The velocity with which these meteorites move is probably at least thirty miles a second and as collisions frequently occur, sufficient light is generated to account for the luminosity of the nebulœ. But the most interesting part of the nebulœ is their shape. They are almost invariably spiral shaped. As they are seen in many different planes this is not at first obvious, but careful investigation shows that the shapes of almost all the known nebulœ are spirals seen either full face, end on, or in a plane mid-way between these positions.

This immediately suggests that the spirals are rotating, otherwise the spiral form would be merely a transitional shape, unstable and impossible of continuance. Experimental observations verify their motion as a rotational one, and we thus see that we have existing in the heavens the very nuclei from which planetary systems could be formed. As the speed of rotation increases owing to contraction consequent upon cooling, the outer parts of the cuticles will be shed off first—will agglomerate into rotating masses :—and will, by gravitational attraction, pursue an orbital motion round the centre of the body which gave them birth. But the wonders and information revealed by modern telescopes do not cease here. It is a well known fact that, as well as the countless bright stars that adorn the heavens, there are numbers of dark ones invisible to the telescope and only revealed when crossing the path or contained in a system of some bright star. That such stars should exist we should surmise from theory, for the temperature conditions of the stars are very different : some are extremely hot, others cooler, and immediately a star cools down by radiation to such an extent that it ceases to emit light, it of course becomes invisible. There are at least as many, probably more dark stars than light ones. From time to time new stars or nova as they are called suddenly blaze out in the heavens. The light they emit—the rate of increase

and decrease of their luminosity and their whole observed life-history reveal their genesis. They are dark stars; unseen, unnoticed, that suddenly become luminous either by collision with another dark star or by passing through an enormous stellar atmosphere. In the first case, the energy generated by the impact of two masses moving with a relative velocity of at least forty miles per second, would be sufficient to change the whole of both masses to a condition of luminous vapour. In the second case, the friction encountered by a body moving at the rate of twenty or thirty miles per second through a gaseous atmosphere would melt and vaporise the outside at least of any mass. Probably both classes of nova do occur, but that the catastrophical genesis is the most common we are certain, because the aftermath of the collision is exactly what theory tells us should occur.

The most probable form of any chance collision is not a direct one of centre to centre but a sheering one of partial impact. In this case, the result of a collision would be to melt, vaporise and tear off the parts of the two bodies that actually collide and to form a third body composed of the two shorn vaporised parts. The collision would give an enormous rotational velocity to the mass of vapour, and the two bodies whose velocity has only been partially destroyed by the collision would pursue their way out into space, but before leaving would pull out the part of the vapour mass nearest to them into a cuticle.

Thus two cuticles would be formed each attached to a central portion the points of attachment being at the opposite extremes of a diameter. Such is the case in the observed spiral nebula It is not necessary however that an actual physical collision take place. If two bodies approach one another sufficiently near, the gravitational tidal pull upon one could be sufficiently great to create a specially formed body, whose temperature would be raised by the shearing friction of the deformation. The former method of actual catastrophical collision seems to be the one which would be most likely to give rise to a spiral nebula, and these collisions are by no means infrequent. Every new star that has suddenly blazed forth in the heavens — and one at least outshone in brilliance. Sirius the brightest permanent star of the universe—has been photographed at successive stages of its life. The plates taken reveal the fact that almost invariably after the collision cuticles or wisp-like tentacles are gradually formed at either side of a diameter of the star. The actual nova themselves do not retain their brilliant luminosity for long and the cuticles thus, by contrast, become more and more evident as it develops to its ultimate condition of a spiral nebula. Such a collision could of course take place between two bright stars or between one dark one and

one bright one as well as between two dark ones. Were such the case the resultant temperatures would be enormously higher, and the Nova so formed would remain as a brilliant object in the heavens. The fact, that the appearance of a new star has not been accompanied by the disappearance of a known one, shows that so far all observed collisions have taken place between unchronicled or dark stars. Hence we presume that the number of dark stars in the universe is vastly in excess of the number of bright ones. Moreover if we assume that the two colliding stars are of different densities the resultant spiral nebula, formed by their collision, would have one of its cuticles composed of substances whose average density was very much less than that of the other cuticle. One cuticle might then give rise to the four outer planets and the other to the four inner ones. A reference to the table given shows that the average density of the four outer planets is less than one-quarter that of the inner group. While the different densities of the planets in each group can probably be accounted for by differences of temperature, and the fact that the outermost ones were shed off from the extreme or less dense portion of the cuticle, the great difference between the average density of the inner and outer groups cannot be so accounted for. Another theory postulates a stellar collision as the genesis of the planetary system, but ascribes the existence of the planets to causes other than the disintegration of a spiral nebula. If each of the colliding bodies had a planetary system of its own prior to collision, these planets would, after collision, be bound within the sphere of influence of the new body. If we suppose that each colliding body had four planets and that the four planets of one body became the terrestrial group, while the four planets of the other became the outer group, we should ultimately have a system much like our own. The reason that this theory was advanced was because of the irregularities which exist in the law of order observed in the planetary system. These irregularities though small are not easily accounted for but the abandonment of the shedding hypothesis introduces far greater difficulties than it removes. The present state of the planets being such as would follow were they all created at approximately the same time, it is extremely difficult to see how any theory other than that of a common genesis can account for their being.

We may thus conclude from our study of the heavens that the origin of the planetary system was a collision between two heavenly bodies. The collision may have been an actual one, or it may have been merely the approach of two bodies so near to each other, that gravitational attraction distorted and disrupted one of them. Probably an actual collision took place.

After collision we have the formation of the spiral which gradually cools and sheds off parts of itself, and the shed-off parts, by agglomeration, give rise to the planets of our system. This view is strongly supported by other phenomena that are often observed.

Everyone has watched with interest the rapid transit across the sky of a shooting star. Suddenly growing into brilliance, it shines for a brief second or two, and then dies into oblivion. Not always however is it lost in darkness for occasionally it reaches the earth before extinction proclaiming its arrival by a loud detonation and ultimately burying itself in the earth, to be afterwards dug up and placed in a museum. For shooting stars are now known to be nothing else than meteorites. They become visible about 100 miles above the earth's surface—usually burn themselves out at a height of about 15 miles, and move with a velocity of from 10 to 40 miles per second. Before reaching the atmosphere, they are dark, cold and invisible. Rushing through the air with such an enormous speed, however, the friction they encounter generates sufficient heat to turn them white hot, and ultimately to vapourise them so that they disappear. If their volume be big enough, and their velocity small enough they reach the earth before extinction and are known as meteorites. Recently a huge one fell into one of the Canadian lakes. Formerly these meteorites were supposed to be pieces of matter thrown up from the earth by volcanic action, and descending again perhaps hundreds of miles away from their point of projection. Now their origin is known to be other than terrestrial. Their velocity is too great to be accounted for by an earthly birth, and their manner of coming also reveals their probable genesis. Four classes of small bodies inhabit celestial space. Shooting stars—meteorites—meteor streams and comets. The first two are identical, while meteor streams are disintegrated comets. Meteor streams are showers of shooting stars all travelling in the same direction and having a common radiant. They recur with the periodicity of a comet and indeed more than one comet has been seen to disintegrate and in its path meteor swarms have followed. Comets are members of the solar family, remnants of the collision which gave the planets birth. That meteors are likewise an indication of a former catastrophe seems certain. It is a well known fact that more meteors are visible at sunrise that at sunset. The reason is obvious, for at sunrise we are on the advancing side of the earth while at sunset we are beginning to recede. In other words at sunrise we are rushing away from it. Therefore we get hit oftener in the former case than the latter.

But calculation shows, that if these shooting stars were travelling with the average velocity of the comets and had no particular direction, then we ought to see at least 5·5 times as many in the

early morning as at night. If however the shooting stars are revolving around the sun in the same direction as ourselves, then we ought to see about three times as many at dawn as at sunset. We actually can see three times as many and therefore conclude that meteors like our earth, are part of the solar system—tiny planets or asteriods if one likes to call them so. The meteorites themselves tell part of their own history. They contain the same elements that are most commonly found in the earth. When found their surface is charred and burnt but this is only a recently acquired form, and bespeaks the heat generated by their passage through the air. Inside they are cold, extremely cold. Their shape shows that they are not entities, but fragments broken off some large mass. Their composition reveals the fact that at the time of their formation there was no free oxygen or moisture. They contain large quantities of occluded gas which can be extracted in the laboratory. The latter fact reveals their origin to have been within some extremely hot body under enormous pressure—such pressure as could only be experienced within the mass of a gigantic contracting world. The amount of occluded gas suggests that their parent was a world many times that of the earth, in size and the fact that they were split off as solid pieces, tells us that the body from which they sprang was dark—our dark star. Thus in the meteorites we probably see pieces of matter—older, much older than the earth—which belonged to one of parent bodies which by collision gave rise to our planetary system.

Having now arrived at a probable genesis of our world it will be interesting rapidly to scan over its history from its birth, and see what will probably happen to it in the future. Once separated from the nebula it moved off into space revolving upon its axis, and pursuing an elliptical orbit round the central mass It was then a separate entity, but it differed little from the other newly born planets. It was hot, possibly a molten core surrounded by fiery vapours. Before long its speed of rotation was such, that it could no longer keep in close control the rapidly moving portions of its outer vapourous atmosphere. This portion split off, contracted to globular form, and continued to rotate on its axis and revolve around the earth. This new body was our moon. Then both earth and moon were at the same fiery temperatures, but the moon being much smaller and having proportionately to its mass a much greater radiating surface, cooled down more quickly. Tidal action stopped its rotation—molecular motion robbed it of its atmosphere. Condensation first turned all its vapour to water—continued cooling transformed the water to ice. Possibly before this could take place all the water molecules had escaped into space and it may be that not only is there no air but possibly no ice also on the moon

Meanwhile our earth is cooling and contracting. It is still surrounded by vapours of the different substances but gradually these condense and solidify, and over the molten core of the earth there joins a crust. This crust would at first be flat and symmetrical, or approximately so. Occasionally however, at first very frequently, violent ebullitions of the seething cauldron inside the crust break the outer solid part, and the Earth's surface was scarred and defaced by flowing lava and volcanic chasms. It was still too hot for water vapour to have condensed and the earth must have been without lakes, seas or rivers. Water vapour would have formed however for the temperature would be low enough for the combination of hydrogen and oxygen. The earth must have then been enshrouded in an impenetrable curtain. Day and night did not exist, and the seasons of the year were almost unknown. As yet the sun was without influence upon the temperature state of the planet. For many thousands of years the earth was in this condition, but slowly, inevitably, it was changing. As heat was radiated into space, the temperature fell lower and lower, the earth's crust became thicker and thicker and at last the water vapour of the atmosphere began to condense. To condense only to be evaporated again almost immediately, for the surface of of the earth upon which it fell would be still uncomfortably hot. After a time however, as the earth got still cooler the condensed water was allowed to collect in depressions in the land. Oceans, seas and lakes were formed. Not the oceans seas and lakes as we know them now, for many forces have been at work to alter their shape and positions, but still seas of water, that gave the earth a semblance to its present state. These seas, still hot,allowed water to evaporate so quickly that, as yet, the sun had not penetrated to the surface of the earth. Meanwhile—how we know not—life has manifested itself upon the earth. Tree ferns and kindred plants flourished—plants that needed no light, no seasons and loved a saturated atmosphere of moisture. Their fossils are still found in all parts of the world. One day, however condensation had taken place to such an extent, that a gap opened out in the canopy that shrouded the earth. The sun shone through and a fresh era of the earth's history began. Now as the earth's heat could radiate out freely into space without hindrance from the vapour shroud, it began to cool more quickly. All this time volcanic action had been frequent and universal, all parts of the earth have been subject to it. But as the crust got thicker and thicker volcanic action became less and less frequent and violent, and changes in the configuration of the earth became less marked. Winds must have existed ever since the earth was formed, and once water had condensed rain became frequent. In fact early days must have been a perpetual rainy season. Hence

rivers were formed and chased their channels upon the earth's surface. Earthquakes had probably a later origin than volcanoes, but they too must have taken a great part in moulding the earth's surface. From now onwards the factors at work in delineating the surface of our earth work more slowly, but none the less surely. Winds — rain — rivers — tidal action— volcanic action and earthquakes, these have been constantly at work moulding our world, until eventually we arrive at our present condition. It has not all been plain sailing however. At one period the earth got extremely cold— the ice age as it was called—but the explanation of this is too difficult and complex to enter into here.

The forces at work that have formed the earth are still operating—they will always operate if any reliance can be placed upon scientific laws at all—so that just as surely as the past has been unlike the present, so will the future be vastly different from present day conditions. The other planets have lived and changed as we have changed, and judging from their condition it is not difficult to say what the probable end of the world will be.

The first possibility is a second collision of our solar system with some other heavenly body. The Sun, taking all its planetary family with it, is moving through space with a velocity of 11 miles a second towards a point near the bright star Vega. If, in its path, it meets with some unknown dark star we should have a second catastrophe. But whereas the first gave us birth, the second would annihilate us as a separate world. However, there is no evidence of our being near a dark star, so that for forty or fifty years at any rate, we may rest assured, that this will not happen. The first indication of the approach of such a star would be strange perturbations in the movements and behaviour of the outer planets. No such perturbations have been observed, and from the first noticing of such eccentricities at least 40 years would elapse before the stranger could reach our sun. The probability of this happening is however, extremely remote. Ultimately such a collision almost certainly will happen, but, long before such a calamity takes place, the earth will have changed to a cold inert, almost changeless useless mass.

The earth will become cold owing to two causes. First the sun itself, the chief source of our life-giving heat is cooling down. As the centuries go by it will send to us less and less heat, until at last the quantity that we receive from it will be practically negligible. At the same time the earth's own heat will gradually have been lost. All volcanic eruptions and earthquakes will have ceased, and the earth will be a solid, moistureless, liquidless mass. Seas will be frozen if they have not disappeared, winds will have ceased, and

the earth have been reduced to stagnation. All the time this has been going on a further change will have been taking place. Our day will gradually have lengthened until at last it becomes 365 days in length. As we circuit the sun we shall rotate once, and this one face of the earth will for ever face the sun, while the other faces out into eternal night. If this takes place before the sun has cooled down, our state will be like that of Hercules and Mercury. One hemisphere for ever open to the sun's rays will become baked and hard—all the seas there will lose their water by evaporation—and very shortly all signs of life will disappear. On the other hand, the side remote from the sun will, quickly cool down to a temperature far below freezing. Seas, lakes and rivers will become solid ice, and a situation the reverse of pleasant will exist. The enormous difference in temperature will give rise to winds, compared with which the recent cyclone in this district was a mild, playful, breeze. The hot air over the baked portion will rise owing to diminished density, while the bitterly cold air from the dark cold hemisphere will rush in with incredible speed. Thus, there will be a circulation of cold air from the frozen part of the planet along the ground, while in the higher regions the hot air of the sun-baked portion, will flow to take the place of the displaced cold air from the frozen part of the world. This hot air will, during the preliminary years, be heavily laden with moisture evaporated from the seas, lakes and rivers. On reaching the cold hemisphere, this moisture will fall as rain, snow or hail, and be deposited to remain for ever as ice. Very quickly all the water will be thus transferred to the perpetually dark cold hemisphere, and we should expect this hemisphere to be cooled with ice. There are indications that such was the case with Hercules and Venus. Mars is rapidly approaching that condition, more slowly but just as surely the earth journeys on to the same end.

But the earth as a vital, organic, changing world has meanwhile been dying owing to another cause.

As pointed out in an earlier portion of the paper, owing to the fact that the earth can only retain under its influence, particles whose velocity is less than 6.9 miles per second, we are gradually losing our atmosphere. Some molecules whose velocities exceed this critical velocity will travel out into space never to return, with the inevitable result that ultimately our earth will be without air. Such a state is hundreds of thousands of years hence, but that it is a probable state is supported by the fact that all the satellites are practically devoid of atmosphere. Hercules, the smallest planet, shows no trace of envelopment by a gaseous covering, while Mars possesses a very attenuated and thin gaseous envelope.

Thus, provided that no collision

ends the career of the earth previously, we can foresee a paralysed, cheerless world much akin to Mercury. Day and night as alternating periods will have ceased—seasons of the year bringing their annual round of growth and decay of life will have also ceased. Probably, in place of the sun there will exist a dark unseen star, controlling our path and motion, but giving us no heat or light. No life-giving atmosphere will surround our globe, and it will exist, a moving, changeless, cheerless planet having lost its former beauty and glory. Whether life will exist on such a planet, time alone can show. Adjustability to environment and the inventive genius of man may preserve the possibility of life. It may be that man will, for a time, be able to create his own atmosphere. It may be that some method of preventing the radiation of heat into space may be discovered. Such a possibility seems to transgress modern scientific knowledge, but he would be a bold man who would limit the possibilities of future developments to present known laws and theories. Forces at present beyond the control of man may one day be within his control. But whether life will exist then or not, it will not be life as we know it. The world will have changed—according to present conceptions it will have atrophied into an undesirable place of existence, but it may be that people in the future will look back with compassion upon us,—pitying us because of the high temperature, the weather changes, the volcanic eruptions and earthquake outbreaks. That the future alone can show.

WALTER A. JENKINS.

In the above discussion nothing has been said about the heat available from radioactive changes. Modern work has shown than certain atoms are disintegrating and setting free extremely large quantities of energy, some of which is in the form of heat. This means that part of the heat radiated out into space may be the heat being continuously generated by radioactive changes. The only difference that this makes to the above arguments is that it makes the cooling down of the earth a much slower process. It does not abolish the cooling. Indeed it renders abortive the quarrel which has existed between physicists and geologists as to the age of the earth. For while physical calculations placed the maximum limit of the period during which the earth has been solid at 100 million years, geological transformations, and calculations based thereon demanded a much longer period. Neither side was of course willing to admit that its calculations were erroneous. The slower rate of cooling of the earth brings the calculations into line and the present estimate of the earth's age is a maximum of 100 million years.

NOTE ON THE SPY SYSTEM IN ANCIENT INDIA.

BY

NARAYANA CHANDRA BANERJI.

University Lecture in Ancient Indian History, Calcutta.

According to the evidence of the mass of Hindu literary and political works the spy system existed in Ancient India and it was regarded as a very useful political institution by all the Hindu Writers on Polity. In their opinion the spy was as useful to the King or the State, as the intelligence department is to the army. The spies were regarded as the "eyes of the king" and in some of the works on Polity we meet with the epithet "chara-chakshu" applied to the king (c.p "চার চক্ষুঃ নরেন্দ্র স্যাৎ"—chara-chakshur narendra :yat—Kamandaka XII. 30 - also Bharabi-kiratar.—I. 3.). The Nitivakyamrita puts it very beautifully and says "Cows see by smelling, learned men see with (through) the Vedas, kings see by their spies, while ordinary or vulgar people see with their eyes ("গাবঃ পশ্যন্তি গন্ধেন বেদৈঃ পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ। চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ॥" The Poet, Magha, says that spies are the eyes of king while the duta was his mouth (organ of speech) "চারেক্ষণো দূতমুখঃ পুরুষঃ কোঽপি পার্থিবঃ।" S is'u II, 82).

Throughout the length and breadth of Hindu Literature we find the spy system highly extolled and kings are called upon to employ spies, to gather information about the country, about their enemies and about the good or bad opinion of their subjects. Thus in the Ramayana (see Aranya. XXXIII.10, Laun. XXIX 29—21 and in innumerable places) we find the importance of the employment of spies discussed. In almost all the chapters of the Mahabharat dealing with the art of Government and especially in the Rajadharma parvan of the Santiparva which is an epitome of the political knowledge of the Hindus, we find the necessity of having these spies impressed upon kings, their services to the king enumerated, the method of their employment fully explained (see Adi—Ch 140—kamkani'ti, Subha. ch. V, chapters of the Udyoga. parva. in which Vidura explains royal duty,—Santi parva—Rajadharma—chs. 59, 69, 83, 89, 93, 86 etc.). In the Manu-sanhita (see ch. IX 256—69, 298, 306) in the Dharma sastras of Jagnavalkya, Vishnu, Parasara in the Agni, Vayu, Matsya Puranas the Kamandaka Niti sara (see ch. XII) the Sukraniti (I. 335—40 II. 188 ch.) in the Nitivakyamrita and the Juktikalpataru, we find the same ideas and the same views.

In the Artha sastra of Kautilya, a book composed in the IVth century BC. Kautilya explains the importance of the spy system and devotes several chapters on the selection, employment and the work of spies. (see Kautilya p.p. 18—

26 on the selection and employment of spies—at home and abroad, also p.p. 208—15. on the detection of crimes and arrest of criminals by these spies. In addition several chapters in connection with the putting down of enemies at home and the waging of war).

From a careful study of the works above quoted and especially the Artha sastra where we find a description we can form an idea as to the importance of the spy system. In the vast monarchies ruled over by despots assisted by their minister and courtiers only. There was the necessity of having such an organisation which kept them constantly informed about the opinions and doings of their subjects, of the conduct of their own officials who were ever ready to throw off the royal yoke or to find opportunities of plundering the poor subjects, or to betray their country's interest to some rival princes. Thus their own interests taught these princes to put their trust neither in their officials, servants nor in their subjects. To ensure their own safety, to save themselves from the hands of the assassin, to guard their throne, to preserve the rights of their progeny they had recourse to a policy of universal suspicion and mistrust Grounds for suspicion lurked everywhere—no part of their realm from the inner apartments of the harem, the private dining hall—the secret consultation hall—to the open durbar and assembly hall or the place of tournament or military gathering—appeared in their eyes to be free from the activities of the secret or open enemy, ready to snatch opportunities to put an end to their existence or to their prosperity. Similarly all classes of people appeared to them to be the object of suspicion neither the priest nor the minister—nor the queens nor the officials were above suspicion. The priest or the minister could injure them by allying themselves with foreign enemies or by championing the cause of a rival party or the cause of dissatisfied princes—sons or brothers of these kings. The women of the harem from the highest queen to the meanest concubine could do them mischief by intriguing with rival princes or murdering them either by the help of hired assassins or by poisoning their food. Ministers and officials were also ready to sell their master's interest to rival princes or rival factions in the State.

Good kings too who feared less from their subjects or from their officials, employed the spies. Imbued with the noblest conception of royal duties and actuated by a desire to do paternal service to their subjects these monarchs employed their emissaries to study the opinions of their subjects about the administration of the country—to watch the conduct of their officials and to gather information as to defects in administration or the wants of the people. Thus Rama who will ever be regarded as the ideal of Hindu monarchs

was not ashamed to employ his spies and acquainted through them, of the opinions held by his people as regards the character of his wife, scrupled not to banish her—in order to pacify them. Similarly from the Edicts of the Emperor Asoka we know that he attached a high value to their services, because they were the sole instruments informing him of the various needs of his people, (economic and moral) and thus enabled him to do his duty towards his subjects. The VIth rock Edict incribed at Girner describes how the Emperor. commended his spies (Pativedakas) always to inform him about the needs and requirement of his people and they seem to have been endowed with the privilege of having access to his private appartments or to disturb his hours of rest.

His Majesty seems to have considered their services to be of great account to himself and the country in as much as their reports enabled him to understand the true state of affairs and this helped him in doing his duty towards his subjects and thus enabling him to free himself from the "burden of debt he owed to his people." (VIth Rock Edict Girnara).

According to the evidence of the Arthasastra spies were employed in vast numbers. Their activities were not confined to the dominions of the prince who employed them, but a large number was reputed to live abroad in the realms of rival kings and from the detailed account given in the Arthasastra we know that they were recruited from all classes of people—men of all castes and men of all professions. From the Brahmin student—the ascetic—the wandering merchant—the labourer—females of various description—the Budhist men to the vilest of prostitutes-men and women of all classes were to be found in their ranks. They put on various garbs — some dressed themselves in the robes of a Brahmin student of ready wit and keen intelligence (কাপটিক: ছাত্র:), some wandered about as husbandmen or traders (গৃহপতিক ব্যঞ্জন: বৈদেহিক ব্যঞ্জন:) in distress seeking employment or finding out some opportunities of setting up business anywhere in the country. Some on the other hand covered their bodies with ashes and with shaved heads or braided hairs, wandered about dressed as mendicants belonging to the various religious sects orthodox or heterodox, either singly or with a numerous following. These took up their abode either in the city or in the suburbs, pretending to be capable of living on "a handful of vegetables or meadowgrass" taken once in the interval of a month or two" and through their followers circulated remours about their high supernatural powers and thereby attracted to them men of various classes, who unfolded to them their secrets and desires. (See kan. P.P. 18—25). Others pretending to be endowed with spiritual powers professed to know incantations which would help

thieves, house-breakers or robbers in opening the doors of the house they intended to pillage, or charms which could help in enticing away women or make the inmates of the house fall fast asleep during operation (সিদ্ধব্যঞ্জনা .... প্রলোভয়েয়ুঃ............ দ্বারাপোহমন্ত্রেণ প্রতিরোধকান্ সংবননমন্ত্রেণ পারতল্পিকান্ etc., P. 210) others were trained up by the state in palmistry (অঙ্গ বিদ্যা) legerdemain (জম্ভক বিদ্যা) and in the science of reading omens and auguring (অন্তর চক্র or pretending to be soothsayers, or astrologers, tried to rouse the credulity of various classes of people and thus gained an opportunity of studying their character or doings and detected the criminals. Others in the garbs of physicians pretended to know how to heal fast wounds or to make poisons with deadly effect.

Others professing to be well-versed in the performance of horrible *tantric* rites, which would bring good fortune or destroy enemies. Others appeared as gamblers, magicians, drunkards desperadoes, and professed to be ready accomplices in the perpetration of criminal acts and mixing with men of criminal tendency caught them red-handed. Others wandered about as elephant riders, trainers of wild animals, jugglers, musicians, boxers or actors and mixed with all classes of people while some appeared disguised as lunatics, deaf and dumb persons, blind people, beggars, or homeless travellers. Others opened grogshops or hotels selling cooked rice and meat or kept houses of ill-fame. Others pretended to be jewellers who could make counterfeit coins and detected criminals of the same occupation.

The female spies put on the garb of helpless Brahmin widows, or of nurses or of nuns,and succeeded in having access to the inner appartments of men of position. Others pretended to be messengers in love intrigues ; while low class women or prostitutes roused the confidence of dissolute persons of criminal tendency and entrapped them.

In addition to these the kings employed low class people of various occupations. Thus sauce-makers (সূদ) cooks (আরালিক) bath servants (স্নাপক) shampooer (সংবাহক) toilet makers, bards, singers were all employed to watch over the conduct of people. The worst classes of spies were the fiery spies (তীক্ষ্ণাঃ) and the poisoners (রসদাঃ) men who set fire to houses. These, along with the cooks and menials or men in the guise of physicians mentioned above, were employed to watch the conduct of suspected officials or powerful individuals (মহামাত্র) and if found guilty, despatched them either by poison or with deadly weapons (See. P. 20—22 and 235—239 kan).

Numerous as the species were, they stationed themselves in various places and no part of the country from the royal harem or the assembly hall to the village tavern or grogshop was free from their activities. "Like the rays of

the sun they pervaded all the spheres of human activity and through their activities the king succeeded in watching over the conduct of his people even in his sleep."

Some of these were stationed in the royal palace and in and about the king's harem. Their main business was to save the royal person from the hands of assassins and poisoners (see Arthasastra ch. on নিশান্ত প্রণিধি) who instigated by the enemies of the king were always on the alert to find means of his destruction. These spies acted in concert with the harem guards and a large portion of these was composed of females of various description. Other spies followed the royal person.

Others were stationed in and about the council hall or watched the conduct of ministers and councillors. Others stationed themselves in the various places of popular gathering (সভাহাবাপূগজনসম-বাপেষু) and pretending to be opponents of the king, entered into discussions about political matters. Some were stationed at the city gate or the market place, and mixing freely with various classes of people, detected those who tried to evade payment of tolls and dues to the royal officials. Others were present in village gatherings for sacrificial purposes or for amusement, in fairs, in boxing and theatrical performances, in grogshops, hotels and watched the conduct of men, who seemed to be desperados, spendthrifts, or of criminal tendencies. Others took up their abode near road-crossings or near the border of villages, in ruined temples or gardens, watched over those who entered or left villages at dead of night or in suspicious circumstances. Others at dead of night frequented suspicious places or tracked the haunts of criminals or proposing to be ready accomplices in all criminal undertakings, accompanied robbers, house breakers, enticers of women, or assassins in their undertakings and caught them redhanded.

Some spies were deputed to watch the conduct of officials high and low, others to test the fidelity of ministers or the honesty of judges by pretending to offer them bribes in order to do some favour. Others were deputed to create disscusions among the chiefs of a powerful faction, or the heads of a corporation (see সঙ্ঘবৃত্তম্ kan P. 376) or to destroy the mischievous activities of a prince, by leading him into a career of vice and debauchery (kan. P. on রাজপুত্র-রক্ষণম্). Others were sent out to despatch secretly suspected officials or powerful but discontented individuals. Occasionally they were deputed to raise money on behalf of the king on various pretexts and by various stratagems. (see kan. P. 240-44 on কোষাভিসংহরণম্) ।

Most of the above spies were employed within the territory of the king or were stationed on the borders of the realm. At the head of the various classes of spies were the Samahasta who employed them in connection with the detection and

prevention of crime, the officer or officers at the head of the Kantaka Sodhana department, officials of the various departments for the collection of revenue, the most trusted ministers of the state and lastly the king. The king according to the evidence of the Arthasastra (see P. 38-ch. on রাজপ্রণিধি) held communication with the spy chiefs during the 5th hour of the day. Thus there was spying and counter-spying and some of the spies were out-witted by other members of the same profession. So carefully were they employed that there was hardly any chance of their knowing each other's mission.

From the above description it would appear that spies were employed for the following purposes.

(1) To gather information as regards public opinion, their attitude to the king and the administration, their needs and requirements.

(2) Protection of the royal person, detection of enemies to the state or the king.

(3) To watch over the conduct of officials, ministers and judges.

(4) Detect those who tried to evade payment of dues to the royal treasury.

(5) To detect youths of criminal tendency and to arrest them in the very act.

(6) To gather money by stratagems.

(7) To destroy the enemies of the king.

Spies in foreign countries.

In addition to these spies working at home, others were sent out to the country of neighbouring princes or of rival kings. There too they assumed the various garbs, and pretending to be peaceful subjects of those princes, mixed fully with their subjects or if possible entered into their services. If opportunity offered itself, they took care to spread false rumours about these princes, among his subjects, incited the subjects to rebellion. They duped these princes by giving false information about their real master, e. g. about his weakness or his indolence, created enmity between their princes and their subjects, estranged them from their ministers, tamperd with the fidelity of the army or made the chiefs desert the soldiers.

In the mean time they constantly informed their masters of their doings, while they won over dissatisfied individuals or factions in the land of the rival king. They selected those who were insulted by the rival king, or who owing to injury done to them or to their relations were constantly thinking of revenge, those who had suffered in money or in dignity, those who were impoverished, those who were self-sufficient, fond of honours, those intolerent of rivals, or those with fiery temper, those who were greedy —all these were offered bribes (see kan. P. 24—25) and won over to the side of their master. The royal ambassador too (the দূত) who was the open spy (প্রকাশ চর c.p. প্রকাশোদূতসংজ্ঞক Juktikalpa P. 10) furthered their schemes and himself studied the enemies' strength

and collect information about his defences, fortification and inform his master of it. (kan. R. 30—32).

They thus paved the way for the invasion of these king's state by their master and in times of war they went out in large numbers, poisoned the food and water of the enemy, destroyed his crops, and if opportunity offered, set fire to his camps, circulated false rumours about his defeat, or created havoc in the ranks of soldiers. (see kan in connection with war. P. 362, P. 365—66, see also P. 382—84 on मन्त्रयुद्धम् P. 384—89.) They were also employed ***to assassinate*** the enemies' generals, to mix poison with their food, to destroy the stores, set fire to their camps, or let off wild animals or snakes in the enemy's camps etc. On the other hand a party went in advance of the invading army, won over the rival kings, subjects, either by bribes, or by spreading false news of victory and thus paved the way for the advance of the army.

So much for the description of the spy system and its activities. Next let us come to discuss the period during which it originated and was developed into a system. The existence of the spy may be traced to the earliest period of Hindu political development. Thus many of the hymns of the Rigvedas addressed to the God Varuna seem to refer to the activities of his spies who watched over the conduct of men, detected sinners and brought them to justice.

For the next period we have very little information, but when we come to the 6th century before the birth of Christ, remarkable for its great religious upheaval and remarkable for the vast mass of information supplied to us by the vernacular literature composed in that century, we find not only definite information about the existence of the spy system but a good description of the various guises under which the spies worked. Perhaps it was during that period of struggle for supremacy that the despotic princes striving for universal dominion organised it into a powerful instrument for the furthering of their own ends. Thus the Samyutta Nikaya refers to the story of a dialogue between the Blessed one and the Buddha. During the course of a conversation, the king happened to notice a group of ascetics consisting of Jotilas, Niganthas, Achelas, Ekasataka (having one robe) and Paribrajákas and turning towards them saluted them. Turning towards the Blessed one, he spoke of them (as he pretended to believe) as either *arhats* or men on the way to *arhatship*. The Buddha seeming not to place any reliance in what he had said, explained to him that it was very difficult for a householder like the king to know what an *arhat* was,............... beset as he was with the enjoyments and pleasures of life and concluded by saying that it was possible only for those who associated with the wise and kept the precepts, to

know the conduct of those people and to recognize them properly. The king thus being found out, had to confess that they were his own spies, who were returning from a round of inspection taken into the country (Janapada) and said that it was his custom to send out these spies beforehand and then he undertook a journey of inspection himself. The king further related that on returning home from the round these men would wash off the dirts and having shaved and bathed they would put on new garments and give themselves to the pleasures of life. (Samyutta Nikaya P. 79. Para. 13. here we give the text "etc bhanta mama purisa cara ocaraka janapadam ocarita agacchanti" tehi pathamam ocinnam aham gaccha osapayissami."

Idam to bhante tani rajojallam pavahetva sunhata suvilitta kappitakesa massu odatavattha panchahi kamagunehi samappita samangibputa paricharayissantiti.")

From this story it would appear that the ascetic spies were one of the various classes of spies employed by the king. Coming to the 4th Cen. B. C. we find from the evidence of the Arthasastra and that of the Greek travellers that the spy system was fully developed and was one of the most powerful instruments in the hands of kings, not only of safeguarding their interests but for understanding the needs of their subjects. Thus in the the 3rd cen. B. C. we find an ideal monarch like Asoka employing his spies for the good of his subjects. After Asoka we have not only the views of the writer on Polity quoted above extolling the importance of the spy in the state but ample information is furnished by Hindu Poets and dramatists. Thus Kalidasa, (Raghu Can. XIX. 48), Vana, the author of the Hansha Charita, Bharabi, the author of the Kiratarjuniam, Visabhadatta, the author of the Mudrarakshasa, Magha the author of the Sisupalabadham—all, speak of the importance of the spy system. Readers of Mudrarakshasa know well how much confidence Chanakya placed in his spies (note Chanakya's discourse on the spy P. 49. S. Ray's edition) In the first Act we have the discourse between Chanakya and his spy disguised as a beggar bearing the Yamapata with him. In the course of the conversation we hear of the spies employed by Rakshasa and of these the Kshapanaka Jiva Sidhi (ক্ষপণকোজীবসিদ্ধি) Sakatadasa, the Kayestha and Chandanadasa. Of these Jiva Siddhi the mendicant (probably he was a jivika) was in reality a spy of Chanakya himself though he pretended to be an adherent of his enemy. In the second act Viradha, a spy of Rakshasa dressed as a snake charmer explains to the future minister the failure of all his schemes, through the superior spying and counter-measures of his hated rival. In the third act we have the pretended anger and with-

drawal of Chanakya from the high office. In the 4th and 5th acts, we find the activities of Chanakya's spies and their success in creating estrangement from Malayaketu. Thus in the Mudra Rakshasa we find a beautiful description of the activity, the various guises of spies and their ultimate success.

As to the existence and the employment of spies in various countries we find that we have very little evidence to suppose as to whether the Egyptian Pharaohs made an extensive use of the spy. In the Persian Empire the royal authority was safeguarded by travelling commissioners, "the eyes and ears of the king", who accompanied the governors of province. Hall thinks that "both the office and name was probably borrowed from Egypt." (Hall—An History of the Near East P. 579). In republican Rome or in the small city republics of the Greeks the spy had apparently no place, but with the establishment of the personal sway of the Roman Caesars, the secret spy and the informer came in along with suspicion and court intrigue but the spy system never became a recognized political institution of the country. Some of the khalifs of the Saracen Empire occasionally employed spies and good monarchs undertook tours of inspection through the country to study the conditions of their subjects. In the Middle Ages some of the Eastern and Western potentates made an extensive use of the spy. In India Alla-uddin Khiliji employed a vast number of spies. In Europe the espionage of of the crafty French king Louis XI is known to all readers of history and it was he, who instituted the custom of sending resident ambassadors to the court of other monarchs." His design being to have a chartered spy at the court of his powerful neighbour and he instructed them that "if they lied to them they were to lie still more to them." Hence we find a similarity between the ideas of the ancient Hindus and those Europeans in the Middle Ages.

With the development of popular government and the consequent disappearance of suspicion, intrigue and absolution, the employment of the spy was discarded in European countries, except for the purpose of detecting criminals or gathering information about the enemy. Almost all the nations of the civilized world employ their spies to watch the growing strength of their rivals, to gather information about their military strength. Success in war depends upon the intelligence, ability and the activity of the Intelligence Department of the army. Thus much of the success of Frederick the Great in war against his enemies must be atributed to his efficient spy system and readers of his biography must remember the importance he attached to his spies. The defeat of the French in the Peninsular War must be regarded as being due to

the activity of the Spanish spies working on behalf of the English. The activities of the vast number of German spies working in France before the War of 1870 was unbounded and contributed to the debacle of France. Not only did they procure information about the French border fortification but they fanned popular agitation against the proposed overhauling of the French military system. They subsidised newspapers to create an agitation against the supposed Militarist policy of the French Government, and when war broke out they found France an easy prey. Not only this but they succeeded in isolating France from the rest of Europe and estranged Napoleon III from his only possible ally, the Czar of Russia. The remarkable activity of German spies before and during the war is hardly forgotten. All readers of history who had watched the activity of the German emissaries must probably remember the intrigues of the Germans with the Pan-islamites—with the Irish-Americans, and with the German Americans in the United States of America. These outrages, explosions in munition factories, fires on munition vessels too numerous to relate,in the United States and elsewhere were perpetrated to cut off the enemy's supply from those countries. In the United States their propaganda tried to set up a hostile faction within the Federal republic. In Russia their emissaries took service under the Government and ruined the national cause and when opportunity came, allied themselves with the extreme democrats. supplied them with arms and money, fanned the agitation against the Government and thus paved the way for the already discredited Czardom. For a time their policy succeeded well. Victory followed victory and with success in battle came conquests of nations. But at last their policy was found out. They stood discredited in the eyes of humankind. The hate of natives and the curse of humanity fell upon them, and in her hour of trial Germany stood like one forsaken by all the Parish of civilized mankind. The final crash came, catastrophe came on her and she sank down from her exalted position amidst the curse of her enemies.

MOON-RIDERS.

Out of the desert, moon-entranced,
    Through the blue and silver night
Lo, leading down the caravan
    A camel, tall, milk-white,

And from Damascus, riding proud,
    A Chief of Araby,
And on a silver flute he played
    An Arab melody.

Ah ! sudden from the North and sweet
    It came, and passed, and went.
Jet-black the shadows swayed and swung
    Across my gleaming tent.

And South along the ancient track
    The caravans have traced,
The mellow music faint and far
    Died in the moon-swept waste.

D. G. D.

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

১০ম খণ্ড } ঢাকা—কার্ত্তিক ১৩২৭। { ৭ম, সংখ্যা।

মোগল-সম্রাট্ আক্‌বর

রমণী-পরিচালিত রাজ্য

আক্‌বর এখন আর বালক নহেন; কিন্তু এখনও তাঁহার বাল্যচপলতা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই—মন সর্ব্বদাই ক্রীড়াশক্ত। এখনও তিনি পূর্ব্বের মত হাতীর লড়াই, শিকার, পারাবত পালন প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে রত—রাজকার্য্যে একপ্রকার উদাসীন। বয়রামের আধিপত্য অন্তর্হিত, সম্রাট্ শিথিলপ্রযত্ন,—এই সুযোগে মাহম্ আনগা অল্পে অল্পে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে আমীর-উমরাগণের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তিনিই এখন সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—সম্রাট্ তাঁহার ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র। রাজ্যের প্রায় সকল প্রধান পদে মাহমের আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়পাত্রগণ অধিষ্ঠিত হইতে লাগিল; সুতরাং রাজ্য-শাসনকার্য্যে সর্ব্বত্র যে মাহমের সর্ব্বময় প্রভুত্ব, তাহা ক্রমে প্রজাসাধারণেরও অগোচর রহিল না।

বয়রাম্ খাঁর শাসনের মূলমন্ত্র ছিল—প্রভুর মঙ্গলসাধন এবং সাম্রাজ্যের উন্নতি। মাহমের একমাত্র লক্ষ্য—তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আধম্ খাঁর প্রভুত্ব, প্রতিপত্তির প্রসার। কেবল স্বার্থসাধনই মাহমের সকল চেষ্টার প্রেরণা,—রাজ্যের মঙ্গল বা সুশাসনের উপর তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। প্রভুর কল্যাণকল্পে, বয়রাম্ পাত্রাপাত্র নির্ব্বিচারে নিরপেক্ষভাবে শত্রুর উচ্ছেদ-সাধনে কখন পরাঙ্মুখ হন নাই। মাহম্ এরূপ অপক্ষপাত নীতির সেবিকা ছিলেন না। যে তাঁহার অনুগামী, সে বিশ্বাসহন্তা পামর হইলেও, তাঁহার প্রীতিভাজন হইত; পীর মুহম্মদই তাহার দৃষ্টান্ত। মাহমের আধিপত্য সময়ে সে তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজশক্তির বিরোধী উচ্ছৃঙ্খল প্রভৃতি অপরাধীর প্রতি বয়রামের সুশাসনদণ্ড নিয়ত উদ্যত থাকিত। মাহম্ তাঁহার স্বেচ্ছাচারী পুত্রের উদ্দাম অবাধ্যতার

সর্ব্বদা পোষকতা করিতেন। মাতৃবলে বলীয়ান্ আধম্ নির্ভয়ে নানা অত্যাচার ও দুষ্কার্য্য করিয়া বেড়াইতেন; তাঁহার অসংশয় ধারণা ছিল যে, জননী তাঁহার রক্ষা কবচ। যতদিন সম্রাটের উপর মাহমের অমোঘ প্রভাব থাকিবে, ততদিন আধমের 'সাতখুন মাপ।' সে বিশ্বাস মাহমেরও ছিল এবং এই বিশ্বাস-দুর্গের নিরাপদ প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিষ্ঠুর প্রকৃতি মাহম্ নিরতিশয় নৃশংস আচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

বয়রাম্ খাঁর প্রাধান্যলোপকালে আকবর প্রকৃতপক্ষে সমগ্র হিন্দুস্থানের অধিপতি ছিলেন না। বিন্ধ্যপর্ব্বত-মালার উত্তরে অবস্থিত মালব-প্রদেশ তখন বাজ্‌বহাদুর-সুরের করগত। বাজবহাদুর শাসনকার্য্যে মনোযোগ প্রদান না করিয়া সর্ব্বদা বিলাস-সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। মালবের ন্যায় উর্ব্বর-প্রদেশ করায়ত্ত হইলে যথেষ্ট সুবিধা হইবে ভাবিয়া মোগলরাজ-সরকার বাজ্‌-বহাদুরের বিরুদ্ধে সৈন্যপ্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন।

১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আধম্ খাঁ মালব-অভিযানের সর্ব্বময় কর্তৃপদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে (৯৬৮ হিঃ) বাজ্‌বহাদুর সারংপুরের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন; কিন্তু পলায়নকালে তিনি ভৃত্যবর্গকে আদেশ দিয়া গেলেন, যেন তাহার আত্মীয় আশ্রিতা নারীগণ বিলাস-সহচরীরূপে মোগল-সম্রাটের হারেমে গমন করিবার পূর্ব্বে অন্তকের অন্তঃপুরে প্রেরিত হয়। প্রভুর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনুচরগণ সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল।

বিজয়ী আধম্ খাঁ যখন অনুচরবর্গসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সংহারকার্য্যে বাধা প্রদান করিল, তখন সে পৈশাচিক অভিনয় এক প্রকার শেষ হইয়া গিয়াছে; কেবল সাংঘাতিকরূপে আহতগণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। আধম্ দেখিল, এই হতাহত রমণীগণের মধ্যে এক অনিন্দ্যসুন্দরী রূপজ্যোতিতে সেই ভীষণ শ্মশানভূমি আলোকিত করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে। ইনিই রূপমতী; গায়িকা নর্ত্তকী এবং অনন্যসাধারণ কবিত্বসম্পন্না বলিয়া সমগ্র ভারতে তৎকালে তাঁহার খ্যাতি ছিল। আধম্ এই রমণীরত্নের নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল এবং ইঁহারই সন্ধানে সে সমাগত। রূপমতীকে জীবিতাবস্থায় পাইয়া আধম্ আনন্দোৎসাহে তাঁহার জীবনরক্ষায় তৎপর হইল; কিন্তু মৃত্যু-সঙ্কল্পা রূপমতী তাহার অযাচিত সেবা প্রত্যাখ্যান করিলেন। পাপিষ্ঠ উপায়ান্তর না দেখিয়া আপাততঃ প্রতিশ্রুত হইল যে, রূপমতী নীরোগ এবং চলিতে ফিরিতে সমর্থ হইলে তাঁহাকে তাঁহার প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিবে। রূপমতী এই আশ্বাসবাক্যে আস্থাস্থাপন করিয়া আত্ম-জীবন রক্ষায় স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু অচিরেই তাঁহার সে ভ্রান্তি দূর হইল। রূপমতী আরোগ্য লাভ করিয়া প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য অনুরোধ করিলে আধম্ উত্তর দিল—'তুমি আমার বন্দিনী, আমার ক্রীতদাসী।' রূপমতী তখন বুঝিলেন যে, যে অবশ্যম্ভাবী দুর্গতির আশঙ্কায় তিনি মরণকে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, দুর্ব্বৃত্ত তাহারই নিমিত্ত তাঁহাকে ছলে ভুলাইয়াছে। পাপাত্মার পাপপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি জন্য অচিরাৎ তাঁহাকে তাহার অঙ্কশায়িনী হইতে হইবে। বিষপান ব্যতীত এ ঘৃণিত পরিণাম হইতে নিষ্কৃতির অন্যপথ নাই। সঙ্কল্প স্থির হইবামাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে রূপমতী কালবিলম্ব করিল না। কিয়ৎকাল পরে, নিজ চাতুর্য্যের সাফল্যে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে নীচাশয় আধম্ রূপমতীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে যে অলোকসামান্য রূপরাশি মসিলিপ্ত, সে লাবণ্য-লীলাময় দেহ নিস্পন্দ! প্রভু বাজ্‌বহাদুরের প্রতি রূপবিক্রেতী রূপমতীর প্রগাঢ় প্রণয়ের পরিচয় পাইয়া আত্মপরায়ণ, বিলাসরত আধমের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

মালববিজয় করিয়া আপনাকে স্বাধীন নৃপতি ভাবিয়া, আধম্ একেবারে তথাকার অধীশ্বর হইয়া বসিল; বাজ্‌বহাদুরের প্রাসাদলুণ্ঠিত ধনরাজি, দ্রব্যসম্ভার হতাবশিষ্ট রমণীবৃন্দ, সম্রাট্‌কে বঞ্চিত করিয়া সমস্তই আত্মসাৎ করিল।

আধমের এই কৃতঘ্ন আচরণে সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার শাস্তিবিধানের জন্য দ্রুতগতি সারংপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন (২৭ এপ্রিল, ১৫৬১)।

মাহম্ আনগা সম্রাটের অভিপ্রায় বুঝিয়া পুত্রকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দূত পৌঁছিবার পূর্ব্বে সহসা সম্রাট্‌কে উপস্থিত দেখিয়া নিশ্চিন্ত আধম্ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সম্রাটের ক্রোধ প্রশমনের বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। এদিকে মাহম্‌ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; পরদিন পুত্র সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সম্রাট্‌কে উপহার দিতে পুত্রকে পরামর্শ দিলেন। উপহৃত দ্রব্যাদিও নারীগণের মধ্যে কয়েকটীকে নির্ব্বাচিত করিয়া সম্রাট্ রাজধানী প্রেরণের আদেশ প্রেরণ করিলেন এবং রাজকার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়া আগ্রায় চলিয়া গেলেন (৪ জুন, ১৫৬১)। কিন্তু কুচক্রী আধম্ সম্রাটের এই সহৃদয় ব্যবহারের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে প্রতারণা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। মাহমের সহযোগে সম্রাট্ নির্ব্বাচিত নারীগণের মধ্যে দুইজন শ্রেষ্ঠ বন্দিনীকে আবার আত্মসাৎ করিল। সম্রাট আগ্রা-প্রত্যাবর্ত্তনকালে মধ্যপথে এই সংবাদ অবগত হইয়া, তাহাদিগকে আনয়নার্থ আধমের নিকট লোক পাঠাইলেন; কিন্তু পাছে অকৃতজ্ঞ পুত্রের প্রবঞ্চনা-কাহিনী এই দুইজন রমণীর মুখে সম্রাটের কর্ণ-গোচর হয়, দুষ্ক্রিয়ায় দ্বিধাশূন্য মাহম্ তাহাদিগকে রাজ-অবরোধে উপস্থিত হইবামাত্র হত্যা করাইলেন। 'কাটামুণ্ড কথা কহে না'—আবুল্‌ফজলের উক্তি। (A. N. ii. 221.) আক্‌বর এই নৃশংস ব্যাপার অবগত হইয়াও আপাততঃ শৈশব-ধাত্রীর মুখ চাহিয়া কোন প্রতীকার করিতে পারিলেন না; কিন্তু নীচমনা মাহম্ ও দুর্ব্বৃত্ত আধমের অত্যাচার দিন দিন দুঃসহ হইয়া উঠিল। সম্রাট্ ক্রমে উত্যক্ত হইয়া মাতাপুত্রের অভিশপ্ত কবল হইতে মুক্তির পথ দেখিতে লাগিলেন। অচিরেই ইহাদের প্রতিপত্তির মূলে কুঠারাঘাত হইল। ১৯ বৎসর বয়সে আক্‌বর নৃশংস নারী-আধিপত্য হইতে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া লইলেন।

মাহমের চেষ্টায় কিছুদিনের জন্য খান্-যমান্ আলী কুলী খাঁর অযোগ্য ভ্রাতা ক্রূরপ্রকৃতি বাহাদুর খাঁ প্রধান মন্ত্রীর (উকীল) পদলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু আবুলফজল্ বলেন, মাহম্ আনগাই প্রকৃত মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনিই সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন ও তৎসম্বন্ধে আদেশ প্রচার করিতেন। (A. N. ii. 151.)

১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আক্‌বরের পালক-পিতা শামস্-উদ্দীন্ মুহম্মদ্ খাঁ আট্‌কা পঞ্জাব হইতে রাজ-দরবারে আগমন করিলে, ধাত্রীর প্রভুত্বলোপ অভিপ্রায়ে আক্‌বর তাঁহাকেই অমাত্যপদে বরণ করিয়া, রাজনৈতিক, রাজস্ব ও সমর বিভাগের সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন। (A. N. ii. 230.) শামস্ উদ্দীন্, বৈরামের ন্যায় কার্য্যকুশল বা শিক্ষিত না হইলেও, ন্যায়পরায়ণ, সরল প্রকৃতি ও সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন; বৈরাম্ খাঁ বিদ্রোহী হইলে তিনিই তাঁহাকে পরাস্ত করেন। 'আকবর নামার' দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত, সম্রাট্‌কে লিখিত, একখানি আবেদন পত্রে শামস উদ্দীন্ আপনার কর্ম্মপটুতার কথা নিবেদন করিয়া মাহম আনগার চক্রান্তের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই আবেদনের ফলেই তিনি মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন।

আক্‌বর অতঃপর মালব হইতে আধম্‌কে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ পাঠাইলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে পীর মুহম্মদ্‌কে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, কার্য্যতঃ প্রচার করিলেন যে, এখন হইতে স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করা তাঁহার দৃঢ়-সঙ্কল্প।

শামস্-উদ্দীনের এই পদোন্নতিতে রাজদরবারে তাঁহার বহু শত্রুর উদ্ভব হইল। সম্রাট্ নবমন্ত্রীর সহায়তায় তাঁহার ধাত্রীর সর্ব্বগ্রাসী কবল হইতে ক্রমে ক্রমে আপনাকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইতেছেন বুঝিয়া মাহম্ আনগা শামস-উদ্দীনের ঘোরতর বৈরী হইয়া দাঁড়াইলেন; খান্‌খানান্ মুনিম্ খাঁ মাহমের একজন প্রধান সহায়ক; সুতরাং তিনিও আধম্ খাঁ এবং মাহম্-পক্ষীয় অন্যান্য লোকের দৃষ্টান্তে শামস্-উদ্দীনের শত্রুতা-সাধনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

শামস্-উদ্দীনের এই প্রাধান্যই তাঁহার অতর্কিত জীবননাশের কারণ হইল! ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে যখন তিনি, মুনিম্ খাঁ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ

রাজকর্ম্মচারি পরিবৃত হইয়া রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে রাজকার্য্যে ব্যস্ত, সেই সময়ে আধম্ খাঁ কতিপয় লোকসহ সহসা তথায় প্রবিষ্ট হয় এবং তাহার ইঙ্গিতে দুইজন অনুগত অনুচর শামস্-উদ্দীন্‌কে হত্যা করে।

সম্রাট্ আক্‌বর তখন অন্তঃপুরে নিদ্রামগ্ন; এই নৃশংস হত্যাব্যাপারের গোলমালে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। দুর্ব্বৃত্ত আধম্, শামস্-উদ্দীন্‌কে হত্যা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; নৃপহত্যা-চরম অপরাধের সঙ্কল্প করিয়া দুরাত্মা রাজকক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু সতর্ক দ্বাররক্ষক খোজা তৎক্ষণাৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। প্রহরীর নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া সশস্ত্র আক্‌বর আধমের সম্মুখীন হইলেন। সম্মুখে উদ্যতফণ সর্প দেখিয়া লোকে যেরূপ শিহরিয়া উঠে, আধমেরও সেইরূপ অবস্থা হইল। সম্রাট্ কর্কশস্বরে আধম্‌কে আট্‌কা খাঁর হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আধম্ দোষক্ষালনের চেষ্টা করিল এবং ঔদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সম্রাটের হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিল। আক্‌বর তাহাকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করিলে, দুর্ব্বৃত্ত সম্রাটের তরবারিতে হস্তক্ষেপ করে। ক্রুদ্ধ সম্রাট্ সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন—আধম্ ধরাশায়ী হইল। আক্‌বর অবিলম্বে তাহাকে প্রাসাদ ছাদ হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করিবার জন্য প্রহরী-গণকে আদেশ দিলেন।

মাহম্ আনগা ইতঃপূর্ব্বে অসুস্থ হইয়াছিলেন। প্রিয়পুত্র আধমের শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনিয়া তিনি সেই যে শয্যাগ্রহণ করিলেন, আর উঠিলেন না; হতভাগ্য তনয়ের মৃত্যুর ৪০ দিন পরে মাতাও তাহার অনুগামিনী হইলেন। ধাত্রীমাতার সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া কেবল তাঁহার পূর্ব্ব সেবা ও বিশ্বস্ততার কথা স্মরণ করিয়া মহামনা আক্‌বর তাঁহার পদোচিত সমারোহে সমাধির ব্যবস্থা করিলেন। অদ্যাপি এই সমাধি-ভবন কুতবমীনারের নিকট বিদ্যমান।

এই ঘটনার প্রায় সমসময়ে (১৫৬২ খ্রী) পারো-ক্ষের ভীষণ দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়। বর্ত্তমান-এটোয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত, আগ্রার দক্ষিণ পূর্ব্বে সকীট্ পরগণার ছয়খানি গ্রামের লোকেরা ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতি ভীষণ অত্যাচার করিত। এই অত্যাচার দমনার্থ আকবর স্বয়ং তথায় গমন করেন। এই দুরাচার দমনে তিনি যে বীরত্ব ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বহু গুপ্ত শত্রুর মনে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল। (*A. N.* ii. 251-5.) ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আকবরের শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম, অসমসাহসিকতা ও দুর্দ্দান্ত পশুর উপর প্রভুত্ব করিবার অদ্ভুত দক্ষতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

আকবরের বয়ঃক্রম এক্ষণে বিংশতি বৎসর। এই অল্প বয়স হইতেই রাজ্যের প্রজাবর্গের প্রকৃত অবস্থার কথা জানিবার একটা প্রবল ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে জাগিয়াছিল। সাধু ফকীরের সঙ্গ তাঁহার প্রিয় ছিল, এবং এই সমস্ত লোকের সাহায্যে তিনি প্রজাদিগের অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হইতেন। বালক সম্রাট্, মুসলমানের মুকুটমণি হারুণ অল্ রশিদের দৃষ্টান্তে, রাত্রিকালে রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধ হইতে আকবর রাজ্য-শাসনকার্য্যে কিছু মনঃসংযোগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখনও তিনি একক শাসনকার্য্য পরিচালনে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; অন্ততঃ তাহা হইলে তিনি মুনিম্ খাঁ ও শিহাব্ উদ্দীনের সহায়তালাভের জন্য উৎসুক হইতেন না। শাম্‌স্ উদ্দীনের হত্যাব্যাপারে মুনিম্ ও শিহাব্ যে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন, তাহা মনে হয় না; কারণ তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও শাম্‌স্ উদ্দীনের প্রাণরক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টাই করেন নাই। বরং আধমের শুক্লদণ্ড দর্শনে উভয়েই সভয়ে আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করেন; কিন্তু পরে দুইজনেই ধৃত হইয়া বন্দীভাবে রাজধানীতে নীত হইলে আকবর উদার হৃদয়ে উভয়কেই মার্জ্জনা করিয়া মুনিম্ খাঁকে অমাত্যপদে বরণ করিলেন; পরন্তু আকবরের এই উদারতার মূলে কোন গভীর উদ্দেশ্য নিহিত ছিল বলিয়াই মনে হয়।

আবুল্‌ফজল্ লিখিয়াছেন,—'আধম্ খাঁর হত্যার পর ইহাতে সাজন সাহ সুপভাব'ও লোক চরিত্রে

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করেন।' মাহম্ আনগার শাসনকালে রাজস্ব-বিভাগের অবস্থা অতীব বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল রাজকর্মচারীরা সুবিধা পাইলেই সরকারী রাজস্ব আত্মসাৎ করিত, এজন্য প্রায়ই রাজকোষ শূন্য থাকিত। বায়াজীদ বীয়াৎ লিখিয়াছেন (*J.A.S.B. 1898. P.311*) মাহমের আধিপত্যকালে একবার আকবর ১৮টী মাত্র টাকা চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কোষাধ্যক্ষ তাহাও প্রদান করিতে পারেন নাই। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সংস্কার উদ্দেশ্যে আকবর খুল-মালিক নামক একজন খোজাকে 'ইতিমাদ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানভার অর্পণ করেন; এই ব্যক্তির চেষ্টায় রাজস্বের অবস্থা অনেকটা সুশৃঙ্খলায় আনীত ও রাজস্ব আত্মসাতের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থার সঙ্গে ক্রমে সম্রাটের মনোরাজ্যেও অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল। অবস্থার সংঘর্ষে আকবর শিখিয়াছেন যে, মানুষের উপর প্রত্যয় স্থাপন করা মূঢ়তা; কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, যাহাকেই তিনি প্রত্যয় করিয়াছেন, সেই বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে; এমন কি সুযোগ পাইলে তাহারা তাঁহার প্রাণনাশেও পশ্চাৎপদ নহে। এই মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা আত্মনির্ভরপরায়ণতায় পরিণত হইল। সম্রাট্ আপনার বিশাল দায়িত্ব উপলব্ধি করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে রাজমুকুট, রাজদণ্ড ধারণ কেবল রাজঅঙ্গের শোভাসম্পাদনার্থ নহে। দণ্ডধারণ সুশাসনের নিমিত্ত,' এবং মুকুটের সঙ্গে রাজ্যের গুরুভারও মস্তকে বহন করিতে হয়। সম্রাট্ স্থির সঙ্কল্প হইলেন যে, সে গুরুভার যতই দুর্ব্বহ হউক, ঈশ্বরকৃপায় তিনি একাই তাহা বহন করিবেন,—এখন হইতে আর কাহারও উপদেশপ্রার্থী বা মুখাপেক্ষী হইবেন না; যতই বিঘ্ন-বিপদসঙ্কুল হউক, এখন হইতে তাঁহার গন্তব্যপথে একাই নির্ভীকভাবে অগ্রসর হইবেন। তাই সম্রাট্ বলিতেন, 'খোদার বিশেষ অনুগ্রহ বলিতে হইবে, আমি কোন সুযোগ্য মন্ত্রীলাভ করি নাই; নতুবা লোকে বলিত, আমার কার্য্যপ্রণালী তাহারই উদ্ভাবিত।' Ain iii, 387 আকবরের এই উক্তিকে আত্মদর্পের পরিচায়ক বলিলে তাহার প্রতি অন্যায় করা হইবে; ইহা বরং আত্মশক্তির উপর অবিচলিত বিশ্বাসের অভিব্যক্তি। যাঁহারা এইভাবে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া অকুতোভয়ে অগ্রসর হন, উত্তরজীবনে তাঁহারাই জয়যুক্ত হইয়া থাকেন; এ সত্য ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে আকবর দিল্লীতে শেখ নিজাম্-উদ্দীন্ আউলিয়ার সমাধিস্থল দর্শন করিতে গমন করেন। অধুনাবিলুপ্ত মাহম্ আনগার মাদ্রাসার নিকট দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় উক্ত প্রাসাদের বারান্দা হইতে ফুলাদ্ নামে জনৈক ক্রীতদাস তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী তীর নিক্ষেপ করে। তীর সম্রাটের স্কন্ধদেশ বিদ্ধ করিল। দশদিনের পর আরোগ্য লাভ করিয়া আকবর দিল্লী হইতে আগ্রা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইলেন। ফুলাদের অপরাধ-মূলে গুপ্তভাবে অন্য কোন ব্যক্তি আছে কিনা, রাজ-সভাসদ্‌গণ অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আকবর তাহাতে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেনঃ—'অপরাধীকে অবিলম্বে হত্যা কর; নতুবা তাহার সাক্ষ্যে আমার মনে অন্যান্য রাজকর্মচারীর উপরও সন্দেহ জন্মিতে পারে।" সম্রাট্ আকবর এই সময়ে দ্বিতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইবার চেষ্টায় নিরত ছিলেন। গৃহে গৃহে পাত্রীর সন্ধানে ঘটক ও খোজা ফিরিতেছিল। এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে, বদায়ূনী লিখিয়াছেন,—'সমগ্র দিল্লী সহরে এক ভীষণ আতঙ্কের ছায়া পড়িয়াছিল; তাহার কারণ এই যে, আকবরের অভিলাষ কেবল অভিজাত কুমারীদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না; আব্দুল্ ওয়াসী নামক এক ব্যক্তির পত্নীর অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে আপনার অঙ্কলক্ষ্মী করেন। আততায়ী ফুলাদের শরনিক্ষেপ সম্রাটকে ভবিষ্যতে সতর্ক ও সংযত করিয়াছিল। বদায়ূনী বলেন, 'ফুলাদ্, আকবরের জীবন নাশের চেষ্টা করায়, সম্রাট্ তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিরত হন।' (*Bad.* ii. 60) সম্ভবতঃ প্রজাগণের পরিবার-

বর্গের সম্মানের উপর আক্রমণজনিত অসন্তোষ ও ক্রোধের মূলেই আকবরকে হত্যা করিবার দুরভিসন্ধি নিহিত। উত্তরকালে আকবরও বলিয়াছিলেন ঃ—'অগ্রে ইহা তাদৃশ বুঝিতে পারিলে, আমারই সাম্রাজ্য হইতে গৃহীত কোন স্ত্রীলোককে আমার অন্তঃপুরে স্থান দিতাম না; কারণ প্রজারা সকলেই আমার সন্তান তুল্য।' (*Jarrett.* ii. 398.)

দিল্লীর দুর্ঘটনার অনতিকাল পরেই, আকবর আর একবার বিপদ্‌গ্রস্ত হ'ন। তাঁহার মাতুল খাজা মুয়জ্জম্ অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ও জঘন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন; নানা গুরুতর অপরাধ, এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত পাপে লিপ্ত হইলেও, সম্রাটের আত্মীয় বলিয়া উদ্ধত প্রকৃতি মুয়জ্জম্ কোন দণ্ডের ভয় করিতেন না। স্বীয় পত্নী জহরার সহিত প্রায়ই বাদবিসম্বাদ, এমন কি তাঁহার উপর নানা অত্যাচার উৎপীড়ন পর্য্যন্ত করিতেন। জহ্‌রার মাতা বিবি ফতীমা হুমায়ুনের রাজ্যকালে 'উর্দ্দু (বেগী' হারেমের কর্ত্রী) পদাভিষিক্ত ছিলেন; আকবর তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন (১৫৬৪, মার্চ্চ) ফতীমা আসিয়া সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন যে অত্যাচারীর পক্ষে সম্রাট্-সান্নিধ্য নিরাপদ নহে ভাবিয়া তাঁহার জামাতা জহ্‌রাকে অবিলম্বে নিজ জাগীরে লইয়া গিয়া হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। শীঘ্রই ইহার প্রতিবিধান করিবেন বলিয়া সম্রাট ফতীমাকে আশ্বস্ত করিলেন।

প্রতিশ্রুতি পালনার্থ আকবর কয়েকজন অনুচরসহ শিকারের ছলে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া খাজা মুয়জ্জমের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; এবং খোজাকে তাঁহার আগমন বার্ত্তা জাপনার্থ দুইজন দূত অগ্রে প্রেরণ করিলেন। দূতদ্বয়কে দেখিয়া খাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সম্রাটের অভ্যর্থনা হেতু তিনি একপদ অগ্রসর হইবেন না বলিয়াই অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। জহ্‌রা তখন স্নানাত্তে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন মানসে করিতেছিলেন, সেই সময়ে মুয়জ্জম্ সহসা আসিয়া তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন,' এবং সেই ছিন্নমুণ্ড ও রক্তাক্ত ছুরিকা বাতায়ন পথ হইতে সজোরে আকবর প্রেরিত দূতদ্বয়ের সম্মুখে নিক্ষেপ পূর্ব্বক খাজা চীৎকার করিয়া বলিলেন—'আমি জহ্‌রাকে হত্যা করিয়াছি—যাও, তোমার প্রভুকে জানাইতে পার।' দূতমুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আকবর তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। খাজা তখন সম্রাট্‌কে অস্ত্রাঘাত করিবার জন্য তরবারিতে হস্তার্পণ করিলে, আকবর তীব্রস্বরে বলিলেন,—'সাবধান! এখনই তোমার মস্তকে এমন আঘাত করিব যে মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার ভবলীলা সাঙ্গ হইবে।' মুয়জ্জম্ একথায় নিবৃত্ত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার একজন গুজরাটী ভৃত্য আকবরের উপর অস্ত্র নিক্ষেপের চেষ্টা করিল। আকবরের ইঙ্গিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে দুর্ব্বৃত্তের মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইল। অতঃপর মুয়জ্জম ধৃত ও প্রহারে জর্জ্জরিত হইলে আকবর তাঁহাকে যমুনায় নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করেন; কিন্তু নিমজ্জনে খাজার প্রাণ বিয়োগ হইল না; তিনি গোয়ালিয়রের রাজ কারাগারে প্রেরিত হইলেন। তথায় অল্পদিন পরেই মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় মুয়জ্জম ভীষণ দুর্ব্বৃত্ত হইলেও একজন কবি ছিলেন; বদায়ুনী তাঁহার পুস্তকে কবিগণের তালিকায় তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

মুয়জ্জমের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধানে সর্ব্বসাধারণের সুস্পষ্ট প্রতীতি হইল যে, দুরাচারের দণ্ডবিধানে বাদ্‌শাহের আত্মপর বিচার নাই—অপরাধীকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবার জন্য সম্রাট বজ্রকঠিন করে শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।

নব রাজনীতি।

সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অল্পদিন পরেই আকবরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, হিন্দুস্থানে মোগল-রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কেবল মুসলমানগণের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না; হিন্দু ও মুসলমান্—এই উভয় জাতিরই রাজভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এই ধারণার সূত্রেই মোগল রাজ্য অতঃপর উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়া জগতের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল।

আকবর যে বড় রাজনীতিজ্ঞ বিচক্ষণ বহুদর্শী সম্রাট্ ছিলেন, এই ধারণার সূত্রেই তাহার বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, তিনি কিরূপে তাঁহার ধারণাকে সিদ্ধির পথে আনয়ন করেন, আমরা তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই।

১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারীর শেষভাগে (অর্থাৎ আধমের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে) আক্‌বর রাজপুতনার সাম্ভর নামক স্থানে অম্বর বা জয়পুর অধিপতি রাজা বিহারীমলের কন্যাকে (ইনিই জাহাঙ্গীর জননী—মরিয়ম্ জননী) বিবাহ করেন। উত্তরকালে আকবরের রাজনীতি ও জীবন যাপন প্রণালীর যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার মূলে এই হিন্দু-মহিলাগণের সাহচর্য্যের প্রভাবই যে সমধিক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

মুসলমান নরপতির সহিত হিন্দু রাজকন্যার বিবাহ আকবরই যে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা নহে। দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের অনেকে ইতঃপূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু রাজকুমারগণের সহিত বিবাহে আকবর আরও একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন;—তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হিন্দু কুটুম্বদিগকে রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। হিন্দুর সহিত বিবাহের এই শুভ পরিণাম ফলে আকবর রাজা ভগবান দাস ও মানসিংহের ন্যায় বীরদ্বয়ের চিরসৌহার্দ্দ লাভ করিয়াছিলেন, এবং রাজত্বের অবশিষ্টকাল তিনি এই রাজপুত পরিবারের সহায়তালাভে বঞ্চিত হন নাই। অম্বর, মাড়ওয়ার ও বিকানীর রাজকুমারগণ সমর-বিভাগে বিশিষ্ট পদ এবং বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ শাসন পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সকল হিন্দুনরপতিকে কখনও ইসলাম ধর্ম্ম-গ্রহণে প্ররোচিত করেন নাই।* আকবরের এই নবরাজনীতি জাহাঙ্গীর ও শাহজহানের রাজত্বকালেও সুফলপ্রসূ হইয়াছিল। কিন্তু সম্রাট্ আওরংজীব হিন্দুনরপতি ও কুটুম্বগণের সহিত এই সখ্যতা রক্ষা করিতে পারেন নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণ আকবর অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করিয়া যাঁহাদিগকে সাম্রাজ্যের হিতকামী করিয়াছিলেন, আওরংজীবের অবিশ্বাস ও কূটনীতির প্রভাবে তাঁহারা সম্রাট সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আওরংজীবের এই অপরিণামদর্শিতাই তাহার মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের পতনের একটী বিশেষ কারণ।

১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ মথুরায় ব্যাঘ্রশিকারে গিয়াছিলেন; তথায় অবস্থিতিকালে তিনি শুনিতে পান যে, মথুরা ও অন্যান্য হিন্দুতীর্থে সমাগত যাত্রীদিগের নিকট হইতে, রাজসরকার করগ্রহণ করিয়া থাকেন; আবুল ফজলের মতে ইহার আয়ও বড় কম নহে—লক্ষ লক্ষ টাকা। আকবর কিন্তু তীর্থ-কর গ্রহণ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না; কারণ সৃষ্টি-কর্ত্তাকে পূজার্চ্চনা করিবার জন্য সমাগত তীর্থযাত্রীগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ খোদার অভিপ্রেত হইতে পারে না;—"হিন্দুধর্ম্মের এই বিধান মুসলমানের ধর্ম্মমতের বিরোধী হইলেও সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করিতে দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য।' এই নীতির অনুসরণ করিয়াই সম্রাট্ তাহার রাজ্য হইতে তীর্থ-কর গ্রহণ প্রথার উচ্ছেদসাধন করিলেন।

ফিরুজ শাহ্ তুঘ্‌লকের আমলে যুদ্ধে বন্দীদিগকে "ক্রীতদাস" করা হইত। তদবধি এই প্রথাই চলিয়া আসিতেছিল। আকবর ইহা নীতিবিগর্হিত মনে করিয়া যুদ্ধ বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিলেন এবং এ প্রথা রহিত করিয়া দিলেন।

যে উদ্দেশ্যে আকবরের রাজপুতনার সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন সেই একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে অর্থাগমের যথেষ্ট ক্ষতি-স্বীকার করিয়াও তিনি হিন্দুদিগকে 'জিজিয়া' কর হইতে মুক্তিদান করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে একমাত্র আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়াকলাপ যাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য ছিল, সেই আকবর বাস্তবতঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াও, ২০।২১

* হিন্দু রাজকুমারীগণ মোগল-হারেমে প্রবেশ করিয়া মুসলমানী উপাধি লাভ করিতেন; মৃত্যুর পর তাঁহাদের কবর হইত। তাঁহারা সম্ভবতঃ কতকটা মুসলমানী আচার পদ্ধতি পালন করিতেন; কিন্তু সে যুগের চিত্রাবলী সপ্রমাণ করে (H. F. A. 332) তাঁহারা অন্তঃপুরে নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অনুযায়ী পূজাক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন।

বৎসর বয়ঃক্রমকালে সমধর্ম্মীদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণের পদ্ধতি উল্লঙ্ঘন করিয়া জিজিয়া ও তীর্থকরের উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন,—ইহা তাহার ন্যায় তরুণ সম্রাটে পক্ষে অসাধারণ মানসিক বলের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। রাজত্বের প্রথম হইতেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ব্যবহার বৈষম্য দূর করাই আকবরের রাষ্ট্রনৈতিক মূলমন্ত্র ছিল। ইহা মহামতি আকবরের সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পদ-স্বাধীন চিন্তার শ্রেষ্ঠতম ফল অপর কাহারও উপদেশ বা পরামর্শের উচ্ছিষ্ট বস্তু নহে। * এই অল্প বয়সেই তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে হিন্দুস্থানের রাজদণ্ড কেবল মুসলমানের সাহায্যেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির সমবেত সহানুভূতির উপরই এই বিশাল রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এই কথা ভাবিয়াই তিনি হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকে অপক্ষপাত শাসননীতির সাহায্যে তাহার রাজছত্রতলে সমবেত করেন, এবং এই শাসন-নীতিই তাহাকে অমিত পরাক্রমশালী করিয়াছিল; এই নীতিবলেই তিনি সমগ্র হিন্দুস্থানে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।'

* যাঁহারা মনে করেন, আকবরের এই সব রাজনীতি প্রবর্ত্তনের মূলে আবুল ফজলের প্রভাব ছিল, তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে, 'জিজিয়া' উচ্ছেদের প্রায় দশবৎসর পরে আবুল ফজলের সহিত সম্রাটের পরিচয় হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিম-প্রাতে

কুজ্ঝটিকার আবছায়াতে পূবের আকাশে,
রাঙা রবির রক্তরেখা ফুটল আভাসে।
শিউলি ফুলের গন্ধভরা আকুল পবনে,
আবেশ ভরে বিভোর ছিনু মুগ্ধ স্বপনে।
স্বরগ হতে প্রেমের ধারা ঝরল ভূলোকে,
উঠল কেঁপে হৃদয়খানি গোপন পুলকে।

কোন্ তরুণী নাব্‌ল এসে আলোক ছড়াতে,
আঁচলখানি পড়্‌ল লুটে শ্যামল ধরাতে।
মানস-পটে উঠ্‌ল ফুটে স্মৃতির শতদল,
শিশির-ধোয়া ফুলের মত অশ্রু-ঝলমল।
ভাবের নেশায়, সুখের হাওয়ায় পুরাণ স্মৃতিটুক্,
আজ্‌কে তাহার রঙিন্ আলোয়, রাঙিয়ে দিল বুক্।

এম্‌নি নিবিড় কোয়াসভরা হিমের প্রভাতে—
ঊষারাণীর ঘোমটা-খোলা সলাজ শোভাতে।
পড়ছে মনে এমনি সেদিন বিভোর স্বপনে,
এম্‌নি মধুর হাওয়ার খেলায় পাতার কাঁপনে,
আস্‌তে পথে অর্দ্ধফোটা কুসুম চয়নে,
কি যেন গো দেখেছিলাম মুগ্ধ নয়নে।

মত্ত-সুখের চঞ্চলতায় ভুল্‌তে যাহা চাই,
দেখ্‌ছি আজি সেটুক্ ছাড়া আর যে কিছু নাই।
বুঝিয়ে দিল আমায় আজি সকাল বেলাতে—
সে যে আমার জড়িয়ে আছে জীবন খেলাতে।
এই স্মৃতিটি নিশার সাথে হয় না কভু লীন,
এম্‌নি ঊষায় রঙিন হয়ে ফুটবে চিরদিন।

শ্রীভক্তিসুধা রায়।

[library stamp]

আমার প্রবন্ধ

(কলিকাতা সাহিত্য-সঙ্গতের এক অধিবেশনে আহ্বানকারীর নিবেদন)

আমার মারফতে, সাহিত্য সঙ্গতের আহ্বানে, আজ আপনারা এতগুলি ভদ্রলোক এখানে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন তজ্জন্য আমি পুলকিত—নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি—আমার আয়োজনও যৎসামান্য—কিছুই নাই বলিলেই হয়—সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া, আজ সন্ধ্যার কয়েক ঘণ্টা কাল আপনারা এই সভার শোভাবর্দ্ধন করুন—দেখিয়া আমি চরিতার্থ হই।

যেদিন স্থির হইল এবারকার সাহিত্য সঙ্গত আমি আহ্বান করিব, তাহার পরদিন এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ। ইনি কোনও বেসরকারী কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন —"এবার সাহিত্য সঙ্গত নাকি তুমিই ডাকছ শুনলাম।"

উত্তর করিলাম, "তাইত স্থির হয়েছে"।

বন্ধু বলিলেন—"তোমার একটা প্রবন্ধ পাঠ করতে হবে ত? আহ্বানকারীর নিবেদন?"

আমি বলিলাম "হ্যাঁ—নিয়ম তাই বটে"

বন্ধু বলিলেন—"দেখ, তোমার লেখা গল্প টল্প আমি দুই একটা পড়েছি—বড় হাল্কা জিনিষ।—তোমার জন্যে অনেক সময় আমার দুঃখ হয়। লেখাপড়া শিখেছে—এ বয়স অবধি ঐ সব গল্প আর উপন্যাস লেখাটা কি ভাল দেখায়? ও সব ছাড়। এবার থেকে serious জিনিষ লেখবার একটু একটু চেষ্টা কর। এই তোমার opportunity তোমার প্রবন্ধে এবার প্রমাণ করে দাও দেখি যে তুমিও serious thinking করতে পার।—বেশ একটু ভেবে চিন্তে, পাঁচ খানা বই উল্টে, প্রবন্ধটি লিখবে।"

আমি বলিলাম—"আহ্বানকারীর নিবেদনে, যাঁরা অনুগ্রহ করে উপস্থিত হবেন, তাঁদের অভ্যর্থনা করে দুচার কথা বলা—তার মধ্যে serious thinkingএর পরিচয় দেবার স্থান কোথা?"

বন্ধু বলিলেন—"স্থান নেই? যথেষ্ট স্থান আছে। স্থান করে নিতে জানলেই স্থান হয়।"

আমি বলিলাম—"সে না হয় করে নিলাম। অভ্যর্থনা ছাড়া, আর কি লিখব বলুন দেখি।"

তিনি বলিলেন—"অনেক কথাই লেখা যেতে পারে—সাহিত্য সম্বন্ধেই লেখ যদি, সাহিত্যের দার্শনিক ভিত্তিটে কি এবং কতটুকু, তাই লেখনা—বেশ grand হবে।—লেখবার আগে, খানকতক কেতাব তোমার বেশ করে পড়ে নিতে হবে"—বলিয়া চার পাঁচ খানি ভাল ভাল ইংরাজি পুস্তকের নাম তিনি করিলেন।

আমি বলিলাম—"খুব ভাল কথা বলেছেন। বেশ, তাই লেখা যাবে।"

বাড়ী আসিয়া, বিষয়টি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, বন্ধু ঠিক বলিয়াছেন—আমি কেবল হাল্কা জিনিষই লিখি, ভারি জিনিষ লিখতে পারি না আমার এইরূপ একটা দুর্নাম হইয়া যাইতেছে। তাহা ঠিক নহে। এবার প্রবন্ধটি খুব গুরু গম্ভীর করিয়াই লিখিতে হইবে। বহি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ফেলিলাম।

সন্ধ্যার পর, ট্রামে মানসী আপিসে আসিতেছি অপর এক বন্ধুর সহিত দেখা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সাহিত্য সঙ্গতে তুমিই নাকি এবার আহ্বানকারী হয়েছ?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ।"

"কি কি হবে?"

"প্রথমে আমি একটা প্রবন্ধ পড়ব। তারপর—"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রবন্ধ পড়বে? কি প্রবন্ধ?"

"যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের সংক্ষেপে অভ্যর্থনা করে, তারপর আমি উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিলাম—'সাহিত্যের দার্শনিক ভিত্তি' সম্বন্ধে আলোচনা করব। আসছ ত?—সাড়ে ছ'টায় আরম্ভ।—হতে হতে সাতটাই ধর।"

বন্ধু একটু চিন্তার ভাবে বলিলেন—"তোমার প্রবন্ধ কটার সময় শেষ হবে?"

"এই, সাড়ে ৭টা, কি বড় জোর ৮টা।"

বন্ধু বলিলেন—"তবে ৮টার পরেই আসব

তাঁহার এ কথা শুনিয়া একটু ক্ষুন্ন হইলাম। বলিলাম—"প্রবন্ধ শুনবে না? কেন বল দেখি?"

বন্ধু বলিলেন—"হাই উঠে। ঘুম পায়। ঘুমিয়ে পড়লে আমার আবার নাক ডাকে কিনা—সভার মধ্যে সেটা ঠিক নয় ত।"

যতক্ষণ ট্রামে রহিলাম—আমি আর সে ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিলাম না।

মানসী আপিসে আসিয়া একটি যুবকের সহিত দেখা হইল। সে বলিল—"সাহিত্য সভাতে, 'আহ্বানকারীর নিবেদন' একটা প্রবন্ধ আপনাকে পড়তে হবে ত?"

"হ্যাঁ—তা হবে বৈকি।"

"প্রবন্ধে কি থাকবে?"

আমি বলিলাম—"প্রথম দুই এক প্যারায়, সমাগত সভ্যবৃন্দের অভ্যর্থনার কথা থাকবে—বাকী অংশটায় "সাহিত্যের দার্শনিক ভিত্তি" সম্বন্ধে কিছু বলবার ইচ্ছে আছে

শুনিয়া যুবকটি, অন্য দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া একটু হাসিল, তারপর আমার মুখ পানে চাহিয়া বলিল—"দেখুন, ও সব ভিত্তি টিত্তি ছেড়ে দিয়ে, আপনি কেন একটা নতুন গল্প লিখে আমাদের দিন না!"

যুবকের একথা শুনিয়া আমার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। 'ও সব ভিত্তি টিত্তি ছেড়ে দিয়ে'—কেন, উহারা কি মনে করে, ও শ্রেণীর রচনা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত? ইচ্ছা করিলে, গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক জটিল তত্ত্বালোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ আমি লিখিতে পারি না?—আচ্ছা রবিবার ত বেশী দূরে নহে—পারি কিনা তাহা দেখাইব—প্রমাণ দিব।

বাড়ী গিয়া সেই রাত্রেই প্রবন্ধ লিখিতে বসিলাম। দার্শনিক বন্ধু যে গ্রন্থগুলির কথা বলিয়াছিলেন, সে গুলি—এবং অপর অনেকগুলি গ্রন্থ হইতে ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ বহু পণ্ডিতের মতামত সংগ্রহ করিলাম। তিনটি দিন ধরিয়া সেই সমস্ত মিলাইয়া, মিশাইয়া, ভাজিয়া, চালিয়া—বহু ফুটনোট কণ্টকিত এক বিশাল প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। পাণ্ডুলিপি শেষ করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে২ ভাবিলাম—আমার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে যাহাদের ধারণা যে আমার দৌড় ঐ চুটকি গল্প পর্য্যন্ত—এই প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা কি বলেন দেখা যাইবে! ভাবী আত্মগৌরবে আমার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

দীপ নিবাইয়া শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এ জাতীয় প্রবন্ধ রচনায় আমার এই প্রথম উদ্যম, সভাতে পাঠ করিবার পূর্ব্বে ইহা দুই একজন সমজদার বাবুকে শুনাইয়া তাঁহাদের মতামতটা জানিয়া লওয়া ভাল। তাই পরদিন প্রাতে উঠিয়া শ্যামবাজার যাত্রা করিলাম সেখানে অভয় দাদা থাকেন, লোকটির বেশ পড়াশুনা আছে। গিয়া, সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া পাণ্ডুলিপিটি হাতে লইয়া উল্টিয়া পাল্টিয়া, তিনি কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখ, এখন ত আমার সময় নেই। এক কায কোরো বরং। কাল, বুঝলে, বেলা ৯ টার সময়, এস, প্রবন্ধ শুনব।"

"আচ্ছা তাই আসব"—বলিয়া দাদার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পথে গড়পাড়। গড়পাড়ের হরিশ মিত্রের নাম আপনারা অনেকেই শুনিয়াছেন বোধ হয়। লোকটি প্রবীণ ও বিচক্ষণ। তাঁহার কাছে গিয়া প্রবন্ধটি দেখাইলাম। তিনিও সেটি উল্টিয়া পাল্টিয়া অনেকক্ষণ দেখিলেন। পড়িয়া শুনাইবার প্রস্তাব করিতেই তিনি বলিলেন—দেখ, তুমি প্রবন্ধ লিখেছ, শোনাবে সে ত খুব আহ্লাদেরই কথা। কিন্তু কিছুদিন তোমায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন বলুন দেখি?"

"ডাক্তারের নিষেধ।"

"সে কি?"

"কদিন থেকে আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে। মস্তিষ্কের চর্চ্চা হয় এমন কোনও জিনিষ এখন মাসখানেক আমার পড়া বা শোনা ডাক্তারে নিষেধ করেছে। প্রবন্ধ খুব ভালই হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি। কোন না কোন

কাগজে এটা ছাপা হবে ত—তখন পড়া যাবে। মাথাটা ততদিনে একটু সারুক।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া, একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, ট্রামযোগে আমি বউবাজার যাত্রা করিলাম। সেখানে আমার এক বন্ধু বাস করেন, তিনি ইংরাজি সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রবন্ধ দেখাইলাম। বলিলাম, "এটা—পড়ে একবার শোনাব কি?"

বন্ধু বলিলেন—"ওহে, এখন ত সময় নেই—আমাকে এখনি বেরুতে হবে"—ওরে কে আছিস—শীগ্‌গির গাড়ী যুৎতে বল।"

আমি বলিলাম—"বেশ ত, আমিও তোমার সঙ্গে গাড়ীতে যাই—পড়ে শোনাতে শোনাতে যাব।"

বন্ধু বলিলেন—"বেশী দূরে ত যাচ্ছিনে ভাই,—বড় জোর দশ মিনিটের ড্রাইভ। তা তুমি বরং কাল এস—"

"কখন?"

"বেলা ৭টার সময়। এই খানে এসেই বরং চা খেও। চা টা খেয়ে, প্রবন্ধ শোনা যাবে।"

সেখান হইতে বাহির হইয়া পটলডাঙ্গায় গেলাম। সেখানে আমার পরিচিত একজন গ্রন্থকার বাস করেন। তাঁহার নিকট ঐরূপ প্রস্তাব করিতেই তিনি বলিলেন—"কাল বিকেলে এস। আরও জন কত সাহিত্যসেবী আসবেন, সবাই একসঙ্গে মিলে শোনা যাবে।"

বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। তিন তিন জন সমজদার লোককে শুনাইতে হইবে প্রবন্ধটি সংশোধন করিতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে বাদ দিলাম—আবার মার্জ্জিনে লিখিয়া কিছু কিছু বাড়াইলাম। এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি চারিটা বাজিয়া গেল। তখন দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয়ন করিলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সাড়ে ছয়টা। পরদিন অর্থাৎ গতকল্য সাতটার সময় বউবাজারে engagement. মুখ হাত ধুইয়া রওয়ানা হইলাম। চায়ের একটু বিলম্ব ছিল, কিন্তু অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম সেখানে চা পানের নিমন্ত্রণ ত আছেই! বন্ধু-গৃহে পৌঁছিয়া ভৃত্যকে বলিলাম—"ওরে, বাবুকে খবর দে।"

ভৃত্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আজ্ঞে, বাবু বল্লেন, কাল রাত থেকে বাবুর ভারি পেট কামড়াচ্ছিল, সমস্ত রাত ভাল ঘুম হয়নি এই কতক্ষণ হল একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন তা, কখন জাগবেন তার কিছু ঠিক নেই।"

এই কথা শুনিয়া আমি ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটার মুখের পানে চাহিলাম। শেষে বলিলাম—"আচ্ছা, বাবুকে বল গিয়ে, বেশ ভাল করে ঘুমুন। আমি চল্লাম।"

বন্ধুর এবম্প্রকার আচরণে মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম। গলি হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম, একটা গরম চায়ের দোকান। এক পেয়ালা চায়ের জন্য প্রাণটা কেমন করিতেছিল—সেখানে প্রবেশ করিয়া, চা পান করিতে বসিলাম।

চা পান করিতেছি—আর বসিয়া ভাবিতেছি, বেলা ৯টায় শ্যামবাজার অভয় দাদার সহিত engagement, এখন যাইব কোথায়?—সুতরাং খুব ধীরে ধীরেই চা পান করিতে লাগিলাম। এক পেয়ালা শেষ হইলে আর এক পেয়ালা লওয়া গেল।

দ্বিতীয় পেয়ালা যখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে—হঠাৎ দেখি চায়ের দোকানের সামনে ফুটপাথে, ছাতাহস্তে বন্ধুবর। জিজ্ঞাসা করিলাম "কিহে—পেট কামড়ানিটা সারলো?"

আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বন্ধুবর চমকিয়া উঠিলেন। আমার দিকে চাহিয়া, তাঁহার মুখখানি লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। হাঁ—অনেকটা সেরেছে ঐ ট্রাম এল—বলিয়া তিনি ট্রাম ধরিতে গেলেন।

চায়ের দোকানে বসিয়া২ ক্রমে আমার বিরক্তি ধরিয়া গেল। ভাবিলাম, যদিও অভয় দাদা বেলা ৯টার সময় ডাকিয়াছেন, তথাপি ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেই যাই, কারণ এত বড় প্রবন্ধ পড়িতে সময় লাগিবে এবং পরে কিছু আলোচনাও ত হইবে কিনা। চায়ের দাম মিটাইয়া দিয়া, শ্যামবাজারের ট্রাম ধরিয়া অভয় দাদার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

তথায় পৌঁছিয়া দেখি, দাদার বাড়ীর সম্মুখে এক খানি ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দাদার দুইটি

শিশুপুত্র, সাটিনের জামা গায়ে দিয়া, কোমরে হাওয়ার চাদর বাঁধিয়া, গাড়ীর ভিতর বসিয়া আছে। দাদার বড় ছেলে প্রবোধ, সেও পোষাকী কাপড় জামা পড়িয়া গাড়ীর হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কিহে প্রবোধ, যাচ্ছ কোথা?" বলিতে বলিতেই অভয় দাদা বাহির হইয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়া, চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"তু—তু—তুমি যে!"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ দাদা, আপনি ৯টার সময় আসতে বলেছিলেন—ঘণ্টাখানেক আগেই এসে পড়েছি। চলেছেন কোথা?"

"এই—কি বলে গিয়ে—নৈহাটী। আমার বড় শালার ছেলের আজ অন্নপ্রাশন কিনা।"

আমি মুচকি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"হঠাৎ নেমন্তন্ন হয়েছে বুঝি? কাল ত—"

দাদা, ছেলেদের সাক্ষাতে মিথ্যা কথাটা আর বলিতে পারিলেন না। বলিলেন—"কদিনই হল, নেমন্তন্ন করে গিয়েছে। কালকে, যখন তুমি, এসেছিলে, বুঝেছ ভায়া, —ও কথাটা আমি একবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। আটটা চল্লিশের গাড়ী ধরতে হবে—এখন আসি তবে—গাড়োয়ান জল্‌দি হাঁকাও"—বলিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ঘড় ঘড় শব্দে গাড়ী ছুটিল।

বাড়ী আসিয়া স্নান করিলাম। প্রবন্ধ পুনঃ পাঠ ও সংশোধনে সারাদিনটা কাটিল। বিকালে পটলডাঙ্গায় গ্রন্থকার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া শুনিলাম, ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেই তিনি ভবানীপুর যাত্রা করিয়াছেন—অনেক রাত্রে ফিরিবেন।

বড়ই হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। যাহাকেই প্রবন্ধ শুনাইতে যাই, সেই পলায়ন করে, ইহার কারণ কি?—উহাদের সমজদার বলিয়া মনে করিয়াছিলাম—আমারই ভ্রম। আচ্ছা, রাত কাটুক কল্য সন্ধ্যাবেলায়, সাহিত্য সভাতে বাস্তবিক সমজদার শ্রোতা পাইব—এই যা সান্ত্বনা। আহারাদি সারিয়া ভগ্ন মন লইয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। একে পূর্ব্ব রাত্রে নিদ্রার সময় পাই নাই—তাহার পর, সারাদিন ছুটাছুটি, শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম।

নিদ্রাঘোরে আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলাম। শুধু স্বপ্ন বলিলে ঠিক হয় না, স্বপ্নাদেশ। স্বপ্ন দেখিলাম, যেন বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া আছি—এমন সময় একটি বৃদ্ধলোক, লাঠি ধরিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া যেন পরিচিত বলিয়া মনে হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"মশায়, কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে অস্পষ্টস্বরে লোকটি উত্তর করিল "পরলোক থেকে!"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"পরলোক থেকে? সেকি মশায়! কি বলছেন আপনি? আপনি কি ভূ—"

লোকটি পূর্ব্ববৎ বলিল—হাঁ, পরলোক থেকেই আমি আসছি। তোমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি, আমায় তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমায় চিন্‌তে পারছ না?"

আমি বলিলাম—"কোথায় যেন দেখেছি।"

তিনি বলিলেন—"রবীন্দ্র বাবুর বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকটি পড়েছ?"

বলিলাম—"পড়েছি। তার সঙ্গে কি?"

তিনি বলিলেন—"আমিই সেই বৈকুণ্ঠ। আমারই জীবন চরিত, রবিবাবু নাটিকাকারে লিখেছেন। আমার একখানি মস্ত খাতা ছিল—সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ক গভীর গবেষণা পূর্ণ অনেক প্রবন্ধ তাতে আমি লিখে রেখেছিলাম। যখন বেঁচেছিলাম, লোক ধরে ধরে সেই সকল প্রবন্ধ পড়ে পড়ে আমি শোনাতাম। তার পর, কাল পূর্ণ হলে, আমার মৃত্যু হল—পরলোকে গিয়ে পৌঁছলাম। লোককে ধরে বেঁধে প্রবন্ধ শোনানের পাপে সেখানে আমার কি শাস্তি হয়েছে জান?"

আমি বলিলাম—"আজ্ঞে না।"

"পরলোকে, আর কোন বিষয়েই আমার কষ্ট নেই, কেবল রোজ সকালে বিকালে, এক একজন যমদূত এসে, আমার জিভটে টেনে ধরে' একবার করে তাতে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়ে যায়। দেখনা, জিভের অবস্থাটা হয়েছে কি!"—বলিয়া ৺বৈকুণ্ঠবাবু মুখ ব্যাদান করিলেন।

দেখিলাম, জিহ্বাটি ক্ষতবিক্ষত—রাঙা টক্ টক্

করিতেছে—ফুলিয়া কোলা ব্যাঙের মত হইয়াছে। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

৺বৈকুণ্ঠ বাবু বলিলেন—"জিভের যন্ত্রণায়, ভাল করে কথা কইতে পারিনে। শুধু একটু করে দুধ খাই অন্য কিছু খেতেও পারিনে।"

আমি বলিলাম—"আহাহা! আপনার বড় কষ্টত! তা, হঠাৎ কিজন্যে এখন আগমন?"

পরলোকবাসী বলিল—"বল্‌ছি। তোমার পিতা পিতামহ প্রভৃতি আজ আমায় ডেকে বল্লেন, বৈকুণ্ঠনাথ, শুনেছ? আমাদের অমুক সম্প্রতি একজন প্রবন্ধলেখক হয়ে উঠেছে। তাতেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না—সেই প্রবন্ধ লোককে পড়ে শোনাবার জন্য সে আবার ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কাল রবিবার কলকাতার অনেকগুলি ভদ্রসন্তানকে সন্ধ্যাবেলা সে নিমন্ত্রণ করেছে—তার মৎলব, সেই নিরীহ ভদ্রলোকগুলিকে নিজের প্রবন্ধ পড়ে শোনাবে। সে পাপের যে কি ফল, তা ত সে জানে না—তুমি ত বেশ জান! যাও তাকে সাবধান করে দিয়ে এস। ভবিষ্যতে, সে যখন এখানে আসবে,—রোজ সকালে বিকালে যমদূতেরা এসে তার জিভে ছুঁচ ফুটিয়ে দেবে—সে ত আমরা দেখতে পারব না। তাকে বোলো, প্রবন্ধ লিখতে চায় লিখুক, ছাপতে চায় ছাপুক—যার ইচ্ছা হবে পড়বে—যার হবে না সে পড়বে না—কিন্তু লোক ধরে প্রবন্ধ পড়ে শোনান এমন কার্য্যটি সে কখনও যেন না করে। মানুষের উপর এ অত্যাচার—এত সোজা পাপ নয়। আহা, সে অজ্ঞান, ছেলে মানুষ—যাও তাকে সাবধান করে দিয়ে এস।"

বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া, অনুশোচনায় আমার মস্তক অবনত হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে যখন মাথা তুললাম, তখন ঘরে আর কেহ নাই।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইবা মাত্র স্বপ্নবৃত্তান্তটি স্মরণপথে আসিল। উঠিয়া, আর কালবিলম্ব না করিয়া, প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটি দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম।

অতএব ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের শুনাইবার জন্য কোন প্রবন্ধই আমি আনি নাই। আপনারা নিশ্চিন্ত হউন এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, পরলোকবাসী বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠ কথিত স্বপ্নাদেশ কখনও যেন আমি বিস্মৃত না হই।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্ন-কুহক

ঘুমিয়ে ছিল ভুবন্ খানি
রাতের ছায়ে প্রাণ্ ঢেকে,
ঘুমিয়ে ছিল গোলাপ্ রাণী
দলের বুকে প্রাণ্ রেখে।
শান্ত শীতল দীঘির জলে
ঘুমিয়ে ছিল জ্যোছ্না গো,
নীরব রাতের সব্ মাধুরী
ধরার বুকে অর্পি গো।
একলা শুধু তুহিন্ দেশে
লীলার পরী চাঁদ্ রাণী—
বুনতেছিল আপন্ মনে
স্বপন্ ভরা জাল্ খানি।
নিঝুম্-রাতে কুহকময়ী
বাঁধ্‌ল মোহ-বন্ধনে,
স্বপন্-মাঝে সুখের ছবি
জাগ্‌ল হৃদি নন্দনে।

"মল্লিকারি মোহন্ মালা
পরিয়ে যেন বাঞ্ছিতা—
দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে
প্রণয়-ভীরু শঙ্কিতা।
ভাব্‌ছে বালা তার্ সে মালা
পর্‌ব কি না কণ্ঠেতে,
আদর করে লজ্জিতারে
রাখ্‌ব কি না বক্ষেতে?
তার গলেতে মোর মালাটি
যেই পরামু প্রেম্ ভরে,"—
উষার আলো ঘুমের মাঝে
মার্‌ল উঁকি মোর্ ঘরে।
দূর-প্রবাসী বিধুর-চিতে
একটি শুধু দাগ্ রেখে,
বিদায় নিল স্বপন্ রাণী
কুহেলিকায় মুখ্ ঢেকে।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

ভারতে নারীর স্বাধীনতা

আজ সভ্যতার যুগে মানব তাহার অতীত ইতিহাসের মূল্য বুঝিতে পারিতেছে। তাই জাতীয় জীবনের অতীত ইতিহাস প্রত্যেকেরই অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া তুলিয়াছে। মানব ক্রমোন্নতিবাদের অভ্যুদয়ের মাঝে নিজ আদর্শ চাহিতে গিয়া অতীত ইতিহাসের মহৎ চরিত্রের অনুসন্ধান করিতেছে। তাই এই ভারতের স্ত্রীপরাধীনতা ও স্বাধীনতা, বর্ত্তমান ও অতীত যুগে কি পর্য্যায়ের মাঝ দিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং তাহার পরিমাণ কতখানি ও কিরূপ, ইহা অনুসন্ধানের নিমিত্তই এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

স্বাধীনতা কহিতে হইলে মানবজীবনের সহিত ইহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। এবং ইহার মূলার্থ বুঝিতে হইবে।

মানবজীবনে স্বাধীনতার দুটি দিক আছে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত।

এখন বুঝিতে হইবে সামাজিক স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়? প্রাণী জগতের শ্রেষ্ঠ জীব নারী ও নরের সমুন্নত জীবন প্রবাহেই বর্ত্তমান সমাজ গঠিত হইয়া আসিয়াছে। এই সামাজিক দৃঢ় শৃঙ্খলই অসংখ্য প্রাণীর সুখ দুঃখকে নিজ অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

প্রত্যেক নর ও নারীর সর্ব্বাঙ্গীন সমষ্টিকেই সমাজ বলে। সুতরাং ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, শিক্ষার প্রসার ও তৎসঙ্গে

মানবের মানসিক ও নৈতিক কর্ম্মশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া বাধাহীনরূপে উন্নতির পথে অনুগমনই হইতেছে সামাজিক স্বাধীনতা। প্রত্যেকের চিত্তবৃত্তি ও মানসিক উন্নতির অভ্যুদয় সামাজিক জাতীয় জীবনের উন্নতির মূল।

পুরাকালের ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে প্রাচীন সভ্যদেশ রূপে ভারতের নাম সর্ব্বাগ্রে পাওয়া যাইবে। ভারতের ঋষি রচিত শাস্ত্রোক্ত গ্রন্থ সকল আজিও তাদের গভীর জ্ঞান ও অতুল মনস্বিতার পরিচয় দিয়া আসিতেছে। সুতরাং পুরা সাহিত্য আলোচনা করিলেই সমাজে নারীর অধিকার কতখানি এবং স্বাধীনতা কিরূপ ছিল বুঝিতে পারা যাইবে।

এক এক দেশের স্বাধীনতা দেশ পাত্র সমাজানুসারে গঠিত হয়। এদেশের অতীত যুগ হইতে নারীকে সেবা, শুশ্রূষা যাবতীয় গৃহকার্য্যের সৌকর্য্য বিধান করিয়া গৃহকে স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিবার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এবং নারীও তাহা লিপি-বিধি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যরূপে পালন করিয়া আসিতেছে।

তাই বলিয়া প্রাচীন সমাজ স্ত্রীকে সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতি কার্য্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন নাই। সামাজিক শিক্ষা দীক্ষা বিষয়ে নারীর পূর্ণ অধিকার বিদ্যমান ছিল, দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বকালে যে নারী সমাজ জ্ঞানে, কর্ম্মে, শিল্পে সাহিত্যে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল এবং অভ্যুদয়ের উৎকর্ষে খিকৃত না হইয়া বরণীয়া হইয়াছিল, ইহাই জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধীয় স্ত্রী স্বাধীনতার অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ। একজন লেখক * তাহার পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলিয়াছিলেন যে ভারতের রমণীগণ যে শুধুই সতীত্বে পাতিব্রত্যে ও দাম্পত্যে অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয়া তাহা নহে। বিদ্যাবত্তাতেও তাদের অমর কীর্ত্তি রহিয়া গিয়াছে। বৈদিককাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল যুগেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন আমরা শুনিতে পাই যে বেদ পাঠ বা বেদ শ্রবণে নারীর অধিকার নাই। কিন্তু এই রমণীগণই এককালে বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। যথা:—বিশ্ববারা নাম্নী রমণী ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাদের অষ্টাবিংশ সূক্ত রচনা করেন। তন্মধ্যে মাধুর্য্য ও ভাবসম্পদ পূর্ণ ছয়টি ঋক আছে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের আটটি মন্ত্র রচনা করেন। এই মন্ত্রগুলি দেবীসূক্ত নামে পরিচিত। অপালা ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে ৯১ সূক্তের আটটি ঋক রচনা করেন। লোপামুদ্রা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক সংকলন করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে তখন শুধু বেদ পাঠ কেন বেদ রচনার ক্ষমতা ও অধিকার স্ত্রী পুরুষে সমভাবেই বিদ্যমান ছিল। এবং বেদের রচিত সেই সব অংশ স্ত্রী রচিত বিধায়ে অনাদৃত না হইয়া অন্যান্য অংশের সহিত সমভাবেই আদৃত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তৎকালীন সমাজে শিক্ষা সম্বন্ধীয় স্ত্রী স্বাধীনতা পুরুষের অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন বা অনুন্নত ছিল না। প্রাচীন ভারতের নারীগণ স্বামীর সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান বুদ্ধির সমসঙ্গিনী ছিলেন। তাই আমাদের দেশে এখনও স্ত্রীদিগকে সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া থাকে। তাহারা যে সমাজে কোনরূপ উপেক্ষিতা বা বিচ্ছিন্না ছিলেন না, এবং যাবতীয় গৃহকার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বামীর জ্ঞানে কর্ম্মে সুমভাবে যোগদান করিতে পারিতেন প্রাচীন সাহিত্যই তার অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করিয়া আসিতেছে।

কাব্য, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, অঙ্ক প্রভৃতি প্রত্যেক সাহিত্যেই স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার ছিল।

দর্শন শাস্ত্রের জন্মদাতা কপিলই মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম ভাবসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া সাংখ্য দর্শন প্রণয়ন করেন। তৎজননী দেবহূতিই দর্শন শাস্ত্রের অমূল্য বীজ সে হৃদয়ে অঙ্কুরিত করিয়া দেন। ক্ষুদ্র দৃষ্টি জগতের ব্যাপকতায় প্রসারিত করিয়া সেই অনন্তের পথে চিন্তাস্রোতের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সুতরাং ই

* ভারতীয় বিদুষী রচয়িতা শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রতীয়মান হয় যে দর্শন শাস্ত্র স্ত্রীলোকের অনধিগত বা অনধিকৃত ছিল না।

ঋতধ্বজ রাজার ভক্তিমতী ও জ্ঞানমতী মহিষী মদালসা তিন পুত্রকে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ দিয়া সংসার বিরাগী করিয়া দেন। তৎপরে স্বামীর আদেশে কনিষ্ঠ অলর্ককে রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ দিতে লাগিলেন। সেই রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ সমূহ তাঁহার উক্ত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রাচীন সমাজ নারীকে এ বিষয়েও পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করিয়াছিল।

নিঃসহায়া আত্রেয়ী দুস্তর পথে বিঘ্ন ক্লেশ অতিক্রম করিয়া অদ্ভুত জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; তিনি দূরের পথ অতিক্রমান্তে অনন্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন স্ত্রীলোকের এরূপ কঠোর অধ্যাবসায় ও অপরিসীম জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা নিন্দিত না হইয়া বন্দিত হইয়াছিল। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া যত্নের সহিত শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ মণ্ডন মিশ্রের পত্নী ভারতীদেবীর অদ্ভুত পাণ্ডিত্যে জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্যও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ন্যায়পরায়ণা ভারতী যখন জানিলেন প্রতিশ্রুতি অনুসারে তার গৃহী স্বামীকে সন্ন্যাসী হইতে হইবে, তথাপি তিনি জয়ের বিজয় মাল্য শঙ্করকে পরাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ন্যায়ের অবমাননা করিলেন না। পরাজিত স্বামীর আসনে নিজে অধিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানাধার শঙ্করের মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন। তার সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শিতা স্ত্রীলোকের অতুল বিদ্যাবত্তা ও স্বাধীনতার পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত তখন স্বাধীন প্রকাশ্যভাবে স্ত্রী পুরুষে শাস্ত্রীয় বিচার যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। বচক্রু মুনির কন্যা গার্গী ইহার অন্যতমা। তিনি রাজর্ষি জনকের বিরাট সভা উজ্জ্বল করিতেন। প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি বিদ্যানুরাগী রঘুনাথ ভূপালের সভা উজ্জ্বল করিয়া অসংখ্য পণ্ডিতের পাশে অসংখ্য বিদুষী রমণী শোভা পাইতেন। সরস্বতীসম মধুর বাণী ইহার অন্যতমা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধা খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে অতুল পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহার গভীর বিদ্যাবত্তার বহুল নিদর্শন এখনও মানব মানসে পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে।

ভাস্করাচার্য্য-কন্যা লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে অতুল পারদর্শিনী ছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রাচীন ভারতে স্ত্রী পুরুষের সকল সাহিত্য ও শাস্ত্রেই সমান ও পূর্ণ অধিকার ছিল। ইতিহাস ও জীবন চরিতের অপ্রাধিক্যতা সত্বেও শুধু রচিতসাহিত্য সংকলন করিয়াই এতগুলি নানা বিদ্যাবিশারদা পুরুষোচিত গুণ কর্ম্মের অধিকারিণী রমণীর পরিচয় প্রাপ্তিতে তাদের সর্ব্ববিষয়ক বিদ্যাধিকারের অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

দৈহিক জীবন দ্বারা অনুবীক্ষণ করিলে স্বাধীনতাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করা যায়। ব্যবহারিক এবং মানসিক। প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা করিয়া শুধু এই মানসিক চিন্তা শক্তির অবাধ সমকক্ষতা প্রতীয়মান করা হইয়াছে।

অতি প্রাচীন যুগ ছাড়িয়া কিছু বর্ত্তমানে আসিলে স্ত্রী স্বাধীনতার ক্রমিক হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। মোসলমান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সহিত স্ত্রী অবরোধের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল। কিন্তু তখনও নারী সমাজ একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন নাই। রাণী অহল্যা বাঈ চাঁদ সুলতানা, প্রভৃতি মনস্বিনীগণ তখনও ভারত মাতার অঙ্কদেশ উজ্জ্বল করিয়া ছিলেন। মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ, বোম্বে প্রভৃতি স্থানে স্ত্রী স্বাধীনতার অনেকানেক চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। যে যে স্থানে মোসলমান আধিপত্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সেই সেই প্রদেশে স্ত্রী অবরোধ প্রথা এখনও অনেকাংশে শিথিল। মোসলমান বিলাসিতার অত্যুজ্জ্বল প্রভাই হিন্দু আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া হিন্দুনারীকে অবরোধে পাঠাইয়া ছিল। এবং সেই যুগই হিন্দু নারীর ক্রমাবনতির যুগ বলিয়া কথিত হইতে পারে।

মহামতি টড প্রণীত রাজস্থান ইতিহাস পাঠ করিলে রাজস্থানবাসিনী নারী সমাজের অনেক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। প্রত্যেক যুগে, দেশে, ধর্ম্মে নর ও নারীর আকৃতি প্রকৃতিগত বৈষাদৃশ্যের সহিত কার্য্য

প্রণালীর ও বিভিন্ন পর্য্যায় পরিলক্ষিত হয়। এবং জীবন যাত্রার কার্য্যাবলীকে, শক্তিসাধ্য, সুবিধানুসারে বিভাগিকৃত করিয়াই চিরন্তন যুগ প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে। যতই স্বাধীন এবং বিদুষীনারীই হউক না কেন সন্তান পালন করিতেই হইবে। পুরুষ যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি দৈহিক শক্তির কার্য্যাদি নিজেদের ভিতর ভাগ করিয়া দিয়াছেন। কারণ জাতিগত দুর্ব্বলতা ও সবলতা যে বিধাতারই অমোঘ বিধান। মঙ্গলময় পিতাই তার সন্তানগণের নানা বৈশাদৃশ্য সৃষ্টি করিয়া নিজ নিজ শক্তি অনুরূপ কার্য্য করিবার বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দিয়াছেন।

এখন পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গে উপনীত হইলে দেখা যায় যে, রাজস্থান ইতিহাসে স্ত্রী জাতীর পূর্ণ স্বাধীনতার অভ্যুদয় দেদীপ্যমান। এমন কি তৎকালীন সমাজে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য্যেও নারীর অধিকার দৃষ্ট হয়। অধিকার বলিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় না যে যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে সংলিপ্ত নারীকে হইতেই হইবে। তবে জাতীয় দুর্দ্দিনে স্ত্রীলোক অরাতির বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়া দেশের ও দশের নিকট পূজিতা ও সম্মানিতা হইয়া ছিলেন। সুতরাং স্ত্রীলোক যে জাতীয় জীবনাদর্শে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, শিক্ষায় ও স্বাধীন বৃত্তি সমূহে, যাহা পুরুষের মাঝে পরিস্ফুট ছিল তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন তাহা নহে। ভারতের পুরাশাস্ত্রও যোগ্যা নারীকে তার প্রাপ্য অধিকারে বঞ্চিত করেন নাই। তবে ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র জাতীয় জীবনকে নানা আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্ব স্ব অধিকারের মাঝে নর ও নারীর কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্যেরা পত্নীকে গৃহিণী, সচীব সখীসান প্রিয় শিষ্যা ললিত কলা বিধৌ প্রভৃতি বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন স্ত্রী সমাজ, সমাজের মাঝে নিজ আসন কতখানি সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ইহাতেই অভিব্যক্ত হইতেছে।

স্বাধীনতা বলিতে হইলে নর ও নারীর প্রকাশ্য কাজ পথে নিঃসঙ্কোচ ভ্রমণই শুধু বুঝায় না। দেখিতে হইবে সামাজিক ও ব্যক্তিগত কার্য্যাবলীর মাঝে কাহার কত খানি অধিকার। জাতীয় জীবনের সামাজিক উন্নত সভ্যতা ও স্বাধীনতার মূল হইতেছে শিক্ষা, ধর্ম্মশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি ও সাহিত্য ভাণ্ডার। তাই দেখা যাইতেছে প্রাচীন সমাজ নারীকে ইহা হইতে নিষ্কাসিত করেন নাই। তবে অনধিকারীকে অধিকার দেওয়া কোন শাস্ত্রেই প্রশংসিত নহে। নর ও নারী নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে সমাজে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যে যোগ্যের আদর সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়।

এখন প্রাচীন ঋষিযুগ ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে আসিতে হইবে। আধুনিক যুগে ভারতে নানা ধর্ম্ম, নানা জাতি, ভিন্ন ভিন্ন আচার অনুষ্ঠান রীতি নীতি সম্পন্ন বহু সমাজের অভ্যুদয় হইল। তৎকালেও নারীর অমর্য্যাদা হয় নাই।

এখন কথা হইতেছে রাষ্ট্রীয় অধিকার। ভারতের প্রাচীন সমাজের সর্ব্বস্থানে নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। তবে মোটেই যে ছিল না তাহা নহে। বীর্য্যবান ও পরাক্রমশালী মহারাষ্ট্রীয়েরা স্ত্রীকে গৃহপিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন না। অদ্যাপিও তাহাদের স্বাধীনতা অনেকাংশে বিদ্যমান আছে। উক্ত দেশেই সূর্য্যাবাঈ, তারাবাঈ, অহল্যাবাঈ প্রভৃতি রমণীরা আদর্শ পুরুষের ন্যায়, ন্যায়-ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সাম্রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। রাণী অহল্যাবাঈর চরিত্রে হিন্দু স্ত্রী চরিত্রাদর্শ কতদূর অনুন্নত হইতে তার অভিব্যক্তি তাহা দেখা যায়। তিনি শাস্ত্রামোদিনী, বুদ্ধাচারিণী ধার্ম্মিকা বিধবা, এদিকে তিনি তীক্ষবুদ্ধি সম্পন্না রাজনীতি বিশারদা স্বাধীন চিন্তাশালিনী, উচ্চ হৃদয় সম্পন্না, ক্ষমাশীলা, করুণহৃদয়সম্পন্না নারী। তিনি অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও স্বাধীন সৎবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই হিন্দু কর্ত্তব্য নিষ্ঠাই করিতেন। এক কথায় বলিতে গেলে কোমলে কঠোর, রৌদ্র-করুন এই বিপরীত ভাব সমষ্টির সংমিশ্রণে ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি মহিমাময়ী মহিয়সী নারী।

জাতীয় জীবনের প্রাতঃস্মরণীয়া নারী রাণীভবানীও ন্যায় ধর্ম্ম ঔদার্য্য সহকারে প্রজা পালন করিয়া গিয়াছেন। জনসমাজ সেই দানশীলা দয়াবতী নারীকে জগজ্জননী অন্নপূর্ণার অংশ বিবেচনা করিয়া থাকে। ইহাতেই তাহার দেবী চরিত্রের সম্যক ইতিহাস পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

এখন উপমা ছাড়িয়া সাংসারিক জীবনে ভদ্র স্ত্রী সমাজ কতখানি স্বাধীনতা ও অধিকার পাইয়াছে তাহাই দেখিতে হইবে। ভারতীয় নারী পুরুষের সহকারিণী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে জীবিকার্জ্জন করেন নাই। নানা জাতি ও নানা সমাজ পূর্ণ বৃহৎ ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দু সমাজ নারীকে সর্ব্ব বিষয়ে অধিকার সমান শ্রদ্ধা দিলেও স্বাতন্ত্র্য দিয়াছিলেন না। তাহারা সর্ব্ব বিষয়েই স্ত্রীজাতিকে নিজদের সহকর্ম্মিণী রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের জ্ঞানে, শিক্ষায় ধর্ম্মে অনুন্নত স্ত্রী জাতীয় স্বাতন্ত্র্যহীন সহযোগীতাই প্রাচীন সভ্য জাতীয় দাম্পত্য সুখের মূল উপাদান। হিন্দু ধর্ম্মের বিখ্যাত শাস্ত্রকার মনু স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মীরূপে বন্দিতা পূজিতা করিলেও, বলিয়া গিয়াছেন যে স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যং অর্হতি।

সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সাংসারিক কার্য্যশালায় ভারতীয় নারী স্বতন্ত্র পথবর্ত্তিনী হইয়াছেন। দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যাবলী উভয়কে বিভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়াছিল। উভয়ের কার্য্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকশিত হইয়াছিল। নারী গৃহে থাকিয়া গৃহলক্ষ্মীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জননী, ভগ্নী, দুহিতা, পত্নী প্রভৃতির আসনে বসিয়া স্নেহ, প্রেম, সেবা, যত্নে জীবকে পালন করিয়া আসিতে ছিলেন। নর তাহার কর্ম্মক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত করিয়াছিল। এবং পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্রের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পরিবার পোষণ ও পালন করিয়া আসিতেছিল।

মোসলমান সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানে যদিও হিন্দু-স্ত্রী সমাজে অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল তথাপি সমাজে তার আসন অনুন্নত বা হীন হইয়া পড়ে নাই। মোসলমান স্ত্রীদের বিদ্যাবত্তা ও মনস্বিতা জাতীয় জীবনের ধারাকে নব প্রবাহে প্রবাহিত করিয়া তুলিল।

প্রথর রাজ নীতিজ্ঞা সমসুদ্দিন আলতমাস কন্যা সুলতান রিজিয়া ভারত নক্ষত্রাকাশে ফুটিয়া উঠিল। মোগল প্রথার একান্ত পক্ষপাতী মুসলমান সমাজ তেজস্বিনী রিজিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। তিনি প্রকাশ্য রাজ সভায় রাজ বেশ ধারণ করিয়া বসিতেন। এবং স্বয়ং যাবতীয় প্রধান কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

মোগল বংশের প্রসিদ্ধ রাজ নীতিজ্ঞা বিদুষী নারী চরিত্র ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। জাহাঙ্গীর-মহিষী নুরজাহান রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি অন্যান্য বিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্য শাসন বিষয়েও অনেকটা স্বাধীনতা পাইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজীব-কন্যা বিদুষী কবি জেবুন্নেসা রাজ্য সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে পিতার পরামর্শদাতা ছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ভারতাগত মুসলমান সমাজও এদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া নারীকে শিক্ষা ও রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় অনেকটা অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

তাহা হইলেও নিতান্ত নিম্ন শ্রেণী ব্যতীত কোন ভদ্র স্ত্রী সমাজ, নিজেদের স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলেন নাই। সমাজান্তর্গত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে প্রবেশাধিকার পাইলেও, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি ধনাগমের চেষ্টা এবং নিজ স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পথ ভারতীয় নারীর পক্ষে চিরদিনই রুদ্ধ ছিল এবং আছে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের স্ত্রী স্বাধীনতার মূলগত বৈষম্য এই খানেই। পাশ্চাত্য দেশের নারী, পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে, আপন পায়ে ভর করিয়া সাংসারিক দুঃখ দৈন্যের সাথে সমান ভাবে যুঝিবার সামর্থ্য রাখে। ভারতীয় নারীদিগকে পুরুষের সহিত দৃঢ় বন্ধনে জড়িত করিয়া সপল্লবা লতিকার ন্যায় নিজকে জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম, ভক্তিতে সমুন্নত করিয়া তুলে। নিজের ভিতরের প্রতিভা ফুটাইতে সে অপরের সাহচর্য্যের নিকট ঋণী হইয়া পড়ে।

শ্রীনীহারকুমারী দেবী।

শারদীয়া

দৃষ্টি আমার জড়িয়ে গেছে
ঢেউ খেলানো ধানের ক্ষেতে,
চিত্ত আমার হারিয়ে গেছে
শিউলি ফুলের গন্ধে মেতে।
আজ এ ভোরের রৌদ্র খানি
মর্ম্মে জাগায় কিসের বাণী!
কোন্ আনন্দ সন্দেশে গো
পুলক জাগে চাঁদনি রাতে?
দৃষ্টি আমার জড়িয়ে গেছে
ঢেউ খেলানো ধানের ক্ষেতে।

শিশির ঝরা মখ্‌মলে গো
মায়ের চরণ চিহ্ন রাজে!
দোয়েল তাহার কল্‌কলে গো
নিখিল বুকের হর্ষ বাজে!
দূর নীলিমার স্নিগ্ধ ছায়া
বুলায় প্রাণে বুলায় মায়া।
কার এ স্নেহের স্পর্শ খানি
তপ্ত নিখিল হিয়ার মাঝে!
শিশির ঝরা মখ্‌মলে গো
মায়ের চরণ চিহ্ন রাজে!

আজ আকাশের নীল সাগরে
হংস শ্রেণীর রঙ্গ একি!
দীপ্ত ভুবন পদ্ম'পরে
মায়ের চরণ-পদ্ম দেখি!
হর্ষ-দোদুল সিন্ধু কোলে
দোলেরে আজ কমল দোলে!
স্বর্ণ আলোর ঝর্ণা তলে
কিরণ ধারা অঙ্গে মাখি!'
আজ আকাশের নীল সাগরে
হংস শ্রেণীর রঙ্গ একি!

মায়ের চরণ চন্দনেতে
ওরে আমার জীর্ণ হিয়া!
শিউলি-ফোটা নন্দনেতে
উঠবি নাকি মুঞ্জরিয়া?
ঊষর ও তোর চিত্ত ভরে
ফুটবে কি ফুল থরে থরে?
গন্ধ আকুল মৌমাছিরা
বেড়াবে কি গুঞ্জরিয়া?
মায়ের চরণ চন্দনেতে
ফুটবি ওরে জীর্ণ হিয়া।

শ্রীআশুতোষ রায়।

স্বার্থ ও পরার্থ চেষ্টা

বাগানে সযত্নে আমরা যুঁই গাছটীকে পালন করিয়া তুলিতেছি; চারিদিক হইতে সহস্র জঞ্জাল জাল সতত তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে, মৃত্তিকা বিধাতার মত কতশত অনীপ্সিত গুল্ম প্রসব করিয়া তাহার বাঁচিবার অধিকার খর্ব্ব করিয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছে; মানুষের নিপুণ হস্ত সেইখানে এই অসম সমরে যুথিকার পক্ষ অবলম্বন করিয়া অসংখ্য শত্রুব্যূহ হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া লইতেছে। প্রকৃতিতে বাঁচিবার অধিকার লইয়া এই যে লড়াই হয়, মানুষ যদি বাহির হইতে আপনার পরীক্ষিত, মহত্তর বাহুবল এই ক্ষেত্রে যুথিকার পক্ষে প্রয়োগ না করিত, তাহা হইলে তাহার প্রাণ ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িত। মানুষ যুঁইটীকে ভালবাসে, তাহারই জন্যে মানুষের প্রাণ কাঁদে, তাহাকেই বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য মানুষ আপনার সমস্ত কলকৌশল নিযুক্ত

করিতেছে। ইহার শত্রু বহু; কেবল উদ্ভিদ্‌-জগতেই যে ইহার বিরুদ্ধে চিরন্তন ষড়যন্ত্র চলিতেছে তা নয়; জান্তব-জগতেও ইহার রিপুর অভাব নাই; যেখানটীতে যুথিকা যে ভাবে মাথা উঁচু করিয়া আপনার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছে, প্রকৃতির সমস্ত শক্তি যেন তাহাকে সেই স্থান হইতে চ্যুত করিয়া জীবন পথের কাঙ্গাল করিয়া দিতে চাহিতেছে।

কেবল যুঁই গাছটীর বেলায়ই যে মানুষ ব্যূহ-বদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার রুচিমত সৃষ্টি করিয়া লইতেছে, তা নয়। মানুষ উদ্যান বলিতে যা বুঝে, প্রকৃতিতে কোথাও তা নাই। প্রকৃতিতে বন আছে, অরণ্যানী আছে, কিন্তু বাগান নাই; প্রকৃত জঙ্গল সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু মানুষের সখের নিভৃত পুষ্পোদ্যান মানুষেরই আয়াস-সৃজ্য। মানুষের সৌন্দর্য্য-বোধ, মানুষের আকাঙ্ক্ষা যাহা চায়, মানুষকেই তাহা করিয়া নিতে হয়; এবং এই চেষ্টায় প্রকৃতি তাহার বিমাতা, তাহাকে সহায়তা করা দূরে থাকুক, তাহার প্রতি উদাসীনও থাকে না, বরং অদম্য উদ্যমে সহস্র বাধা ও বিপদের জাল বুনিয়া তাহার পথ দুর্গম করিয়া তুলে।

মানুষের গৃহে পুষ্ট, মানুষের আদরে লালিত, তাহার যত্নে রক্ষিত, বিড়ালীকে যদি তার জাতি বন-বিড়ালীর সঙ্গে একত্র ঘরকন্না করিয়া থাকিতে হইত, তাহা হইলে যে অনিবার্য্য জ্ঞাতি-কলহের সৃষ্টি হইত, আমরা সহজেই বুঝিতে পারি সে যুদ্ধে কার জয়লাভ হইত। বন-বিড়ালীর দেহের শক্তি বেশী, তাহার কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা বেশী, তার নখ ও দন্ত অধিকতর সমর-পটু; সর্ব্ববিধ সামরিক উপায়ে যে সুসম্পন্ন, সমরের বিজয়লক্ষ্মী যে তাহাকেই বরণ করেন, মানুষের ইতিহাসেও তার প্রমাণ আছে। এই খানেও মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে, এই খানেও মানুষ বিশ্ব-শক্তির অভিমত সমর লালসা সংযত করিয়া আনিতেছে, এই খানেও মানুষ এক নূতন সৃষ্টির স্রষ্টা।

কেবল বিড়ালকেই যে মানুষ তার জাতির সহিত সম্পর্ক বিহীন করিয়া এক নূতন ধরণে গড়িয়া তুলিতেছে, তা নয়। অন্য বহুবিধ জন্তুকে মানুষের পরি-পক্ক কৌশল প্রকৃতির সামরিক বিদ্যালয় হইতে উঠাইয়া আনিয়া নিজের রুচিমত সুশীল ও সুবোধ, নিরীহ ও সমর-ভীরু করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। মানুষের এই শাসন যারা মানিতেছে না, মানুষের এই শিক্ষা যারা গ্রহণ করিতেছে না, যে সব জন্তু এখনও রণ-পিপাসু, যারা এখনও আপন শক্তির স্বাধীন ক্রিয়া দ্বারা অন্যের রক্তের স্রোতে নিজের জীবন-বারিধি পূর্ণ করিতে চায়, মানুষের চিরন্তন সমর-চেষ্টা তাদের বিরুদ্ধে ধাবিত হইতেছে। কিছু দিন পর পর গণনা দ্বারা মানুষ নিজের হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব লয়; ইতর প্রাণীদের সেরূপ হিসাব লইবার কেহ নাই। কিন্তু পল্লীতে যাদের বসতি তাঁরা হয় ত জানেন, যে বন্য জন্তুর সংখ্যা বন্য-বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে কি হারে কমিয়া আসিতেছে। বন্য জন্তুকে 'হিংস্র' আখ্যা দিয়া তাহার বিনাশ সাধনে মানুষ নিজের সমর-কৌশলের পরীক্ষা করিয়া থাকে।

বিবর্ত্তন বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে যে প্রকৃতির বিরাট কারখানায় প্রতিনিয়তই এক সমর চলিতেছে; জাতি জাতির বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তি ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই এক তুমুল রণে ব্যাপৃত; বাঘ চাহে গোজাতিকে ধ্বংস করিতে, গরুর ক্রিয়া তৃণ গুল্মের বিনাশ; বিশ্ব রাজ্যে পরস্পরের আহারের এমনই বিধান যে একের একান্ত বিলোপ না হইলে অন্যের গ্রাসাচ্ছাদন হয় না। কেবল তাই নয়, বাঘে বাঘেও লড়াই হয়; এক জাতিরই এক ব্যক্তিকে পরাস্ত করিতে না পারিলে অন্য ব্যক্তির উদর-পূর্ত্তি সম্ভব নয়। এই লড়াই যে আহার্য্য-সংস্থানের বেলায়ই কেবল ঘটে, এমনও নহে। স্ত্রী পুরুষের মিলনের বেলায়ও এই লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি হয়। একই নায়িকার প্রণয়-প্রার্থী যোদ্ধৃদ্বয়ের একজনের বিনাশ না হইলে, অপরের পক্ষে তার করগ্রহণ সম্ভব হয় না। মানুষের ইতিহাসে—মধ্যযুগে ইউরোপে, স্বয়ম্বরের সময়ে ভারতে, যে এরূপ প্রমাণ পাই, সে কেবল প্রাণিজগতের, চির-বিহিত নিয়মের অনুসরণ মাত্র। যুদ্ধে যে বিজেতা তারই ভোগ্যা স্ত্রী জাতি। যৌন মিলনের বেলায়ও প্রকৃতি এই ভাবে বীরকেই বরণ করিয়া থাকে বাঁচিবার অধিকার, পিতৃত্বের অধিকার, বীরের ভাগ্যেই

বিধাতা লিখিয়াছেন। যে শান্তি প্রিয়, যে নিরীহ, যে সমর-ভীরু, বিনাশেই তার মুক্তি, একান্ত লোপই তার দুরপনেয় ভাগ্য-বিধান। সুতরাং কুশলী মানুষের হস্ত যাদের পক্ষে নিযুক্ত হয় নাই, সেই উদ্ভিদ কিম্বা সেই জন্তুকে রণে বিজয়ী হইয়া তবে বাঁচিতে হয় এবং বাঁচিতে পারিলে তবে বৃদ্ধির সুবিধা ঘটে। উদ্ভিদের ইতিহাসে, জন্তুর ইতিহাসে, ব্যক্তির পর ব্যক্তি, জাতির পর জাতি, এই ভাবেই বিলুপ্ত হইয়াছে। সহস্র২ দৃষ্টান্ত হইতে প্রতীচ্যের মনীষীগণ এই সত্যের উদঘাটন করিয়াছেন। যে পরাজিত, বিজেতা অনুকম্পা করিয়া তার জন্য বিশ্বে স্থান করিয়া দেয় না। প্রকৃতি এমনই ভাবে ব্যক্তিদ্বয় কিংবা জাতিদ্বয়কে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া দেয় যে আপোষে উভয়েরই জীবন ধারণ সম্ভব হয় না। একের উপযোগী আহার্য্য দুইয়ের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেওয়ার অর্থই এই যে, একজনকে আহারের অভাব ভোগ করিতেই হইবে। প্রকৃতিরই প্রেরণায় এই স্থলে সবল দুর্ব্বলের ক্ষয় দ্বারা আপনাকে লাভবান্ করিয়া নেয়। আর, যদিই বা এক জাতির সবল ব্যক্তি কেবল আহারের অভাব ঘটাইয়া ঐ জাতির দুর্ব্বল ব্যক্তিকে একেবারে বিনষ্ট করিতে না পারে, যদিই বা দুর্ব্বল, সবলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া আরও দুর্ব্বলতর হইয়া কোনও রকমে মরিয়াও না মরে, তাহা হইলেও যৌন মিলনের বেলায় যে আর একবার নির্ব্বাচন হইবে, সে নির্ব্বাচনে তার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী; সবলের সম্মুখে কোন রমণীই তাহাকে বরণ করিবে না, চাহিলেও পারিবে না; সুতরাং তার বংশ লোপ সুনিশ্চিত। স্ত্রী-নিমিত্ত এবং ভক্ষ্য-নিমিত্ত অবিরত যে আহব চলিতেছে তারই অগ্নি-পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ; সেই বীরবরের জন্যই বসুন্ধরা বরণ-মাল্য গাঁথিয়াছেন; সেই জীবন ধারণ করিতে পারিবে এবং তাহারই সন্ততি ধরার কোলে বিচরণ করিবে।

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের জাতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তারা হয় স্বয়ং বিজেতা কিম্বা বিজেতার বংশধর। সমর এখনও থামে নাই, কিন্তু অতীত যুদ্ধে যারা পরাভূত হইয়াছিল, ধরার পৃষ্ঠে, যেখানে লড়াই হইয়াছিল সেখানে, আর তাদের চিহ্ন নাই; হয় ত বা ধরার কোন গুপ্ত কোণে, সমরাঙ্গনের সীমানার বাহিরে কোন্ দুর্গম দূরদেশে তাদের বংশের নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ জ্বলিতেছে; অথবা, ইতিহাসের এই বিকট সত্য প্রকটিত করিবার জন্যই যেন মৃত্তিকার কোন স্তরে ইহাদের কঙ্কাল প্রোথিত রহিয়াছে।

এখনও চারিদিকে যে সমর চলিতেছে, তাহাতে যে প্রাণী বা উদ্ভিদ জয়লাভ করিবে তাহারই জন্য ভবিষ্যতের পৃথিবী। এবং এখনও যে এই লড়াই চলিতেছে চারিদিকে তার বহুতর প্রমাণ রহিয়াছে। মানুষই এখন প্রধান যোদ্ধা;—মানুষ অরণ্যানীর পর অরণ্যানী নিঃশেষ করিয়া, নিজের প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ, শস্য শ্রেণীর সৃজন করিতেছে; প্রাণীর পর প্রাণীর বংশ লোপ করিয়া নিজের উপযোগী প্রাণীদের পোষণ করিতেছে। মানুষ এই যুদ্ধে প্রবেশ করিয়া অবধি ইহাকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু মানুষকে বাদ দিলেও লড়াইয়ের শেষ নাই। এখনও কাক চাহে কীট বংশ শেষ করিতে, এখনও পশুরাজ চান শশমাংসে রোজ নাশতা করিয়া তাদের বংশ শেষ করিতে, এখনও বড় মাছ চায় ছোট মাছের গোষ্ঠীপাত করিতে: এ লড়াইয়ের শেষ কি কোন দিন হইবে?

কেন যে আদৌ এ লড়াইয়ের সৃষ্টি হইল, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু কেমন করিয়া এই লড়াইয়ে জয়পরাজয়ের বিধান আবির্ভূত হইল, তাহার একটা অনুমান চলে। এখনও দেখা যায়, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই ঘটিতেছে; জল স্থলে কিংবা স্থল জলে পরিণত হইতেছে; উষ্ণ স্থানে উষ্ণতার হ্রাস হইতেছে; যেখানে যা ছিল না, সেখানে তার আবির্ভাব হইতেছে। এই সব অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তুরও জীবনধারা বদলাইতেছে হয়; প্রকৃতি এই সময় তাদের সহায়তা করিয়া থাকে, কিন্তু সকলকে সমানভাবে করে না; এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণিদেহে যে অদল-বদল আবশ্যক হয়, আপনা হইতেই তা হইয়া উঠে, কিন্তু সকলের সমান ভাবে হয় না। তা ছাড়া, ব্যক্তির অবস্থা পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও অনেক সময় দেখা যায়,

কোনও কোনও প্রাণিদেহে আপাততঃ অকারণে কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল; হয় ত বা কাহারও লাঙ্গুলের উদ্ভব হইল, কিংবা কাহারও পৈতৃক লাঙ্গুল খসিয়া পড়িল, কাহারও বা নূতন ধরণের নখ সৃষ্টি হইল, কিংবা কাহারও পুরাতন নখ খসিয়া পড়িল; আপনা হইতেই এই সব পরিবর্ত্তন ঘটে; কাহারও কাহারও মতে আপাততঃ অনাবশ্যক স্থলেও এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে; আবার, কাহারও কাহারও মতে, আবশ্যক স্থলেই উপযোগী পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। আবশ্যক স্থলেই হউক, কিংবা অনাবশ্যক স্থলেই হউক, এই যে পরিবর্ত্তন প্রকৃতি ঘটাইয়া তুলে, তাহা সকলের ভাগ্যে সমান হয় না। সুতরাং যদিই বা ধরিয়া নেওয়া যায় যে গোড়ায় কোন অসমতা ছিল না—যদিই বা অনেকে যেমন মনে করিয়াছেন সেইরূপ মনে করা যায় যে একই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন জীবনের আধার জড় দেহ হইতে এই অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ্ প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি, এই পরিবর্ত্তনের তারতম্য হইতেই অসমতার জন্ম হইল; এবং সেই অবধি সবলের বিজয়ের পন্থা পরিষ্কৃত হইল। যাহার পরিবর্ত্তমান অবস্থায় জীবন ধারণের সুবিধা ও শক্তি বেশী, তাহাকেই এখন হইতে প্রকৃতি নির্ব্বাচন করিয়া নিতে লাগিল।

মানুষের ইতিহাসেও এই জয় পরাজয়ের বিধান রহিয়াছে। মানুষে মানুষেও এইরূপ বহু লড়াই হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। লড়াই গুলি বাদ দিলে মানবের পরিপূর্ণ ইতিহাসে কয়েকটা নাম-বাচক বিশেষ্য ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। রাজায় রাজায়, জাতিতে জাতিতে যে কলহের বৃত্তান্তে আমাদের স্মৃতি ভরিয়া রহিয়াছে, তারই ফলে এক নির্ব্বাচন চলিয়া আসিতেছে। বলবান চিরকালই দুর্ব্বলকে পরাভূত করিয়া, হয় তাহার বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া, তাহার সমর পটুতা খর্ব্ব করিয়া, তাহাকে পোষ মানাইয়া লইতেছে, অথবা জীবন বহন তাহার পক্ষে অসাধ্য করিয়া তুলিয়া তাহার বিলোপ সাধন করিয়া দিতেছে। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে ঢুকিয়া আদিম অধিবাসী অনার্য্যদিগকে দাস করিয়া লইয়াছিলেন; সেই অবধি অনার্য্যদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষমতা গিয়াছে, কারণ সেই অবধিই তারা সমর কৌশলও হারাইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা লুপ্ত প্রায়; যোগ্যতর অধিকতর কৌশলী জাতিদের স্থান করিয়া দিবার জন্য তাদের অন্তর্ধান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে মানুষ যে কেবল ইতর জন্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াই নিজের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতেছে, এবং নিজেকে বড় করিয়া নিজের জাতির বৃদ্ধির সুবিধা করিয়া লইতেছে, এমন নয়; মানুষে মানুষেও প্রচণ্ড রণ অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে যে যা চায়, তাই যদি পাইত,—আহার ও আবাস, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য সকলই যদি ইচ্ছার অতিরিক্ত পাইত, তা হইলে ত লড়াইয়ের কোন কারণ থাকিত না। আমি যা চাই, অন্য এক জনকে বঞ্চিত না করিলে তাহা আমার ভাগ্যে ঘটে না; তাইত আমাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। সুতরাং ইতর প্রাণীর বেলায় যেমন, মানুষের মধ্যেও তেমনই জীবন যাত্রার উপযোগী দ্রব্যের জন্য একটা চিরন্তন কলহ চলিয়া আসিতেছে; এবং মানুষের মধ্যেও তেমনই বিজেতাকেই প্রকৃতি বরণ করিয়া নেয়।

এই যে সমরের কথা আমরা বলিতেছি, ইতর জন্তুর বেলা সেইটা বাস্তবিকই একটা কায়িক যুদ্ধ, কিন্তু মানুষে মানুষে যে লড়াই চলে, তা সব সময় কায়িক ব্যাপারে পরিণত হয় না। বর্ত্তমান সভ্যতার দিনে বিশেষতঃ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে লড়াই কদাচিৎ কায়িক যুদ্ধে পরিণত হয়; জাতি যখন জাতির বিরুদ্ধে যায় তখনও সহসা অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা উত্থিত হয় না। মানুষের বুদ্ধি—এবং হয় ত বা বর্দ্ধমান ভীরুতা—এই সমর ব্যাপারটাকে অনেক রকমে মোলায়েম করিয়া আনিয়াছে, এবং প্রায়শঃই এই হিংসা পরস্পরের পরোক্ষে ক্রিয়া করে। ইউরোপে জাতিতে জাতিতে কলহ, তাহা প্রথমতঃ বাণিজ্যেই প্রায় প্রকাশ পায়; এ চাহে অন্যের ভাত মারিতে,—তার আয়, সুতরাং তার ক্ষমতা কমাইয়া আনিতে; তাহাতেই ত নিজের প্রসার বৃদ্ধি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ছিন্ন-বীণা।

সুরের সাধক বৃদ্ধ গায়ক এমনি কতই সন্ধ্যাতে,
ফিরত রাজার আসর হতে স্নিগ্ধ গ্রামের পথ্যাতে।
তখনও তার সুরের লহর খেলত হৃদয় মল্লীতে,
কতই সাধের রত্ন, বীণায় বইত আপন পল্লীতে।
পর্ণে ছাওয়া জীর্ণ কুটীর বদ্ধ তাহাও থাকত যে,
লক্ষ্মী-প্রিয়াও বক্ষ ভাঙি লুকিয়ে কোথায় রইল যে!
ইন্দ্রসম বঞ্চিত সে হায় গো প্রিয়ার দর্শনে,
হিয়ার বেদন করুণ সুরে জাগত বীণার স্পর্শনে।

ফাগুন রাতের জ্যোছ্‌নাপাতেই প্রাণের আগুন জ্বলল গো,
মর্ম্ম-বেদন্ রণিকে বীণায় প্রিয়ার দেশেই চলল গো।
পল্লীশেষের কুটীরপাশে ছুটতে মলয় সঙ্গীতে—
ক্ষুব্ধ ব্যথায় গুমরে লুটায় নিঠুর বিধির ইঙ্গিতে।
কুঞ্জে নাই সে পুঞ্জ কুসুম, বল্লীবিতান রিক্ত রে,
হৃদ্‌-গগনের শাওন ধারায় মল্লিকা আজ সিক্ত রে,
শূন্য-নীরব জীর্ণ কুটীর স্তব্ধ গহন্ বন্‌টিতে,
কোথায় গায়ক—লুটায় বীণা ভগ্ন-গৃহের কোণ্‌টিতে।

শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত।

[library stamp]

সাহিত্যিক পত্র।

(স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি-আই-ই মহোদয়ের নিকট লিখিত। তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।)

৺নবীনচন্দ্র সেনের পত্র।*

Chittagong
Fancy Hill
14-4-02

শ্রদ্ধাস্পদ দাদা মহাশয়,

আমি রাজকার্য্য হইতে চির-অবসর গ্রহণ করিয়া এখন একজন দরিদ্র পল্লিবাসী সামান্য ভদ্রলোক। কেন এ পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন। শুনিলাম আপনিও জয়দেবপুর রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ....সাহিত্যসেবীর জন্য এ দারুণ বিধি-লিপি কেন? আপনি মনস্বী দার্শনিক। ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন কি?

পল্লিগ্রামস্থ বাটিতে 'বান্ধব' পাইয়াছি। পল্লিগ্রামের শান্তি ছায়ায় বসিয়া উহা পাঠ করিয়া প্রাণে কি যে শান্তি পাইয়াছি বলিতে পারি না। বাঙ্গালার 'মাসিক' শ্রাদ্ধে হাড় জ্বালাতন হইয়াছে। এতকাল পরে যেন বাঙ্গালা পড়িলাম, যাহা পড়িবার যোগ্য, পড়িয়া চিন্তা করিবার যোগ্য তাহা পড়িলাম। আপনার লেখার পূর্ব্ববৎ সেই ওজস্বীতা আছে। এখন যেন অপেক্ষাকৃত সরল ও মধুর হইয়াছে। "আবার এ কাণ্ড কেন"—তাহা আমাকে চক্ষে দেখিয়া বুঝাইবার পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ বুঝিয়াছি।

একবার না জানিয়া উভয় একসঙ্গে 'ক্লিওপেট্রা' লিখিয়াছিলাম। আপনি গদ্যে, আমি পদ্যে। আবার দেখিতেছি দুজনে একপথের পথিক। আপনি শ্রীচৈতন্য-দেবের লীলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমিও ১২ বৎসর যাবত আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তাঁহার ধ্যান করিতেছি। তবে হৃদয়ে এত অশান্তি, মাথার উপর এত বিপদ, যে এতকালেও ত সর্গের অধিক লিখিতে পারি নাই।

এখন মনে করিতেছি পূজনীয় সেজদা (শিশির বাবু) যখন লিখিয়াছেন, আপনি যখন লিখিতেছেন তখন আমার আর লিখিবার কিছু প্রয়োজন নাই। কেবল 'অমিতাভ' শেষ করিবার সময়ে শ্রীভগবানের এই শেষ লীলাও লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া তিনি পত্র লিখিতেছেন, তাই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। তবে আমি শিশির বাবু হইতে ভিন্ন পথের পথিক। কিন্তু অনুমানে বোধ হইতেছে যে, আপনি ও আমি একই পথাবলম্বী। তবে আপনার সেই পাণ্ডিত্য ও উচ্চ মনস্বীতা আমি কোথায় পাইব? তবে আপনি যে পথ কাটিয়া যাইবেন আমি সেই পথে আমার ক্ষুদ্র শকট চালাইতে পারি কি না দেখিব।

খণ্ড কবিতা লিখিতে এখন শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। মন ও শরীরের এরূপ অবস্থা যে এখন কবিতা আমার পঞ্চক্রোশের মধ্যেও পদার্পণ করিতে পারেন না। রোগের কথা আর কি লিখিব? ঘোরতর চক্রীর চক্রে পড়িয়া ময়মনসিংহ বদলি হই, এবং সেখানে একখানি কুঁড়ে ঘরে জলাভূমিতে দারুণ শীত কাটাইয়া যে রোগ লইয়া বাড়ী আসি, এখন যাবত তাহা ভুগিতেছি। ইহার আর আরোগ্য নাই।

ভরসা করি আপনি শারীরিক সুখে আছেন। সত্যকে * আমার আদর বলিবেন। তাহার ওকালতী কেমন চলিতেছে?

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

* ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন ঘোষ।

চেতনা

আজি মাটির খেলনা ভেঙে গেছে বলি
করিতেছি হাহাকার
তুমি তার বিনিময়ে দিয়েছ দেবতা
অমৃতের পারাবার।
আমি নির্ব্বোধ শিশুর মতন
ক্ষণ-ভঙ্গুরে করিয়া যতন
করেছি কি খেলা ভাবিতে এখন
চোখে ঝরে' বারিধার।
দেখিয়া শুনিয়া বুঝিনি যে কথা
মর্ম্মে আঘাতি নিদারুণ ব্যথা
দিয়া তা' দিয়েছ বুঝায়ে দেবতা
স্পষ্ট পরিষ্কার।
বেদনা পরশে চেতনা আমার
ফিরিয়া পেয়েছি হৃদয়ে আবার
সুপ্ত আমায় জাগাতে তোমার
কি করুণা, বারবার।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যা

REGISTERED TRADE MARK

রেজেষ্টরী করা শঙ্খমার্কা আসল

লালমোহন সাহা শঙ্খনিধির পৃথিবী ব্যাপিত

সর্ব্বজ্বর গজসিংহ

৪৮ ঘণ্টায় সর্ব্ববিধ জ্বর, ১ সপ্তাহে প্লীহা যকৃৎ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব
মূল্য বড় ডিবা ১॥০ দেড় টাকা, মধ্যম ১৲ এক টাকা, ছোট ॥৵০ নয় আনা।
ডাকমাশুল ১ হইতে ১২ ডিবা ৵০ দুই আনা।

জগদ্বিখ্যাত।

সর্ব্বদদ্রু হুতাশন

২৪ ঘণ্টায় দাউদাদি চর্ম্মরোগ বিনা ক্লেশে আরোগ্য হয়।
মূল্য ১ ডিবা।৵০ ছয় আনা, ডাকমাশুল ১ হইতে ২৪ ডিবা ৵০ দুই আনা

সুপ্রসিদ্ধ।

কণ্ডু দাবানল

খোশ পাচড়াদি ক্ষতরোগ অতি শীঘ্র বিনাক্লেশে আরোগ্য হয়।
মূল্য ১ ডিবা।৵০ ছয় আনা, ডাকমাশুল ১ হইতে ১২ ডিবা ৵০ দুই আনা

রায় সাহেব শ্রীগৌরনিতাই শাহ শঙ্খনিধি।
" মেনেজিং—প্রোপ্রাইটার।

ঠিকানা—ঢাকা, বাবুরবাজার, শঙ্খনিধি মেডিকেল্ হল কিম্বা ভজহরিসাহাষ্ট্রীট।

Printed by P. B. CHAKRAVARTY, at the Sreenath Press, 5, Nayabazar Road, Dacca.
and
Published by HARI RAM DHAR, B. A. Patuatuly, Dacca.

Regtd. No. C. 902.

VOL. 10. No. 9.

DECEMBER, 1920.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY
RAI SHAHEB,
BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,
AND
SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . Rs. 5-8-0
Single Copy . 0-8-0

REGINUS

To sufferers from bodily fatigue, nervous prostration, loss of memory, energy and manly spirit, constipation, loss of appetite sleeplessness, and other troubles, Reginus acts like magic. Bot. Re. 1 each.

DIABETES—the troublesome symptoms are quickly relieved. Excessive urination with discharges of Saccharine matter, high specific gravity, and all other troubles, are successfully combated. Bot. Rs. 3 each.

ASTHMA—with dry cough, hard breathing, with sticky phlegm, tightness of chest, heavy perspiration, sleepless night, periodical fits, etc. Cured completely with our specific remedy. Bot. Rs. 5 each.

Ranaghat Chemical Works,
Ranaghat, Bengal.

Edwards Tonic

The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.

Sole Agents: **B. K. PAUL & CO.,** *7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.*

B. K. PAUL & CO'S

Gold Sarsaparilla

A SURE AND SAFE AGENT FOR PURIFYING BLOOD. A MARVELLOUS REMEDY FOR ALL SYPHILLITIC AND MERCURIAL DISORDERS.

PRICE-EACH PHIAL Rs. 2/8,

BUTTO KRISTO PAUL & Co,
CHEMISTS & DRUGGISTS,
CALCUTTA.

Cytogen

AN IDEAL DIGESTIVE TONIC WINE

Invaluable in CONVALESCENCE from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c., Extremely Useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,

INDISPENSABLE AFTER PARTURITION

Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.

B. K. Paul & Co.,
CALCUTTA.

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

(১) জহান্‌-আরা (ঐতিহাসিক চিত্র)। অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্‌-এ, আই-ই-এস্‌ লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত। উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য। বহু হাফ্‌টোন চিত্র ও যশস্বী চিত্রশিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত প্রচ্ছদ পট সম্বলিত। ইহাতে আছে 'সেই অতীত যুগের ভ্রাতৃদ্রোহী সমর, স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত, বৃদ্ধ সম্রাট শাহ্‌জহানের চেষ্টা পরাভব বিলাপ ও যাতনা, কন্যার মাতৃতুল্য সেবা প্রভৃতির একটী দৃশ্যপটের মত মনোরম, অথচ বর্ণে বর্ণে সত্য ইতিহাস।' মূল্য ১।০

(২) মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা :—কে বলে, মোগল-মহিলাগণ অসার আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসে বিভোর হইয়া অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে তাঁহাদের অশিক্ষিত জীবন যাপন করিতেন? এই গ্রন্থে বাদশাহ্‌জাদীগণের সুশিক্ষা, সাহিত্য-প্রতিভা, সুরুচি প্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বহু হাফ্‌টোন চিত্র পরিশোভিত। মূল্য ॥৵০

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি-এ বলেন:—"আমরা ইহা পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, অনেক নূতন বিষয় শিখিয়াছি। আমরা সকলকেই অসূর্য্যম্পশ্যা মোগল-রমণীদের এই অভিনব চিত্র পড়িতে অনুরোধ করি।" (ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২৬)

(৩) মোগল-বিদুষী :—ইহাতে মোগল-অন্তঃপুরের উজ্জ্বল রত্ন জেব-উন্নিসা ও গুলবদনের জীবনকাহিনী সরল ও সুমধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

সুলেখক শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি-এ বলেন:—"মোগল-বিদুষী পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং কিছু নূতন কথা শিখিলাম। * * যাহাদের সহিত বহুদিন একত্রে বাস করিয়াছি—এবং বহুদিন যাহাদের রাজসভায় চামর ব্যজন করিতে হইয়াছে তাহাদের খোলসটাই কেবল নাড়াচাড়া করিয়াই আসিয়াছি; তাহাদের প্রাণ যেখানে স্পন্দিত হইত সেই মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে আমরা অভ্যস্ত হই নাই। ইহাতে আমাদের উদারতার অভাব বলিলেই যথেষ্টরূপে অপরাধ স্বীকার করা হয় না। এই সকল কারণেই 'মোগল-বিদুষী' বিশেষ আগ্রহ সহকারে পড়িয়াছি ও পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।"

প্রাপ্তিস্থান:—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সাহিত্যামোদীর পক্ষে শুভসংবাদ—সর্ব্বজন-প্রশংসিত মাসিকপত্র ও সমালোচনী

বিকাশ

গত আশ্বিন মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, প্রিয়ম্বদা দেবী, মনোজমোহন বসু, মাণিক ভট্টাচার্য্য, জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব, মোহাম্মদ হোসেন প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিক-বৃন্দের রচনায় বিকাশ সুশোভিত।

বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা (ভি পিতে ২৵০ আনা), পত্র মধ্যে চারি আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

কভার প্রতিপৃষ্ঠা ৬৲ ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৷০, সাধারণ প্রতিপৃষ্ঠা ৪৲ অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৷০। বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য। প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

ম্যানাজার—"বিকাশ"
১১০।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পাঠের ও উপহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।

মূক ও বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন প্রণীত

নল-দময়ন্তী

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১॥০ টাকা।

কয়েকখানি বহুবর্ণের চিত্র ভূষিত। বেগুণি রংএর সাটীন কাপড় মনোরম প্যাড্ বাঁধাই—তদুপরি একখানি তিন রংএর চিত্র পরিশোভিত। বাঙ্গালা ভাষায় উপহার দিবার এমন সরল সুন্দর মধুর পুস্তক আর একখানিও নাই।

মালঞ্চ সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত

এম, এ প্রণীত

ভারতনারী

সিল্কের কাপড়ে প্যাড্ বাঁধাই মূল্য ১॥০

সাটীন কাপড়ের শোভনরাজসংস্করণ—মূল্য ২৲

বহু চিত্রে ভূষিত অদিতি, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সতীলক্ষ্মী আর্য্যনারীগণের চিরপূজ্য আদর্শ কাহিনী।

বাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই নিত্য পাঠ্য।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ সম্পাদিত

(বঙ্গদেশের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক স্কুলসমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত এবং কলিকাতা ইউনিভারসিটী কর্ত্তৃক মহিলাদিগের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট)

কাশীদাসী মহাভারত (সচিত্র) মূল্য ৩॥০

কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সচিত্র) মূল্য ২॥০

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চিরসমাদৃত—বাঙ্গালী জীবনের চিরমধুময়—চির নবীন রূপ কথা।

ভূতপূর্ব্ব শিশু সম্পাদক শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ঠাকুরমার ঝোলা বা বাঙ্গালীর রূপকথা

যেমন সুন্দর কাগজ—তেমন সুন্দর নির্ভুল ছাপা—তেমনি সুন্দর ঝক্‌ঝকে বাঁধা আবার তেমনি সুন্দর সুন্দর রাশি রাশি ছবিতে ভরা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

Amrita Bazar Patrika says, "AN INIMITABLE PRODUCTION."

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয় বলেন—"...ইহাতে আশৈশব পরিচিত সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর কথা, ডাইনী রাক্ষসীর কথা,...পিঠে গাছের কথা ত আছেই আবার পুষ্পকুমার, শঙ্খরাণী প্রভৃতি সুকোমল নামের ও ততোধিক সুকোমল প্রকৃতির নায়কনায়িকার কথা সরল ভাষায়, সুন্দর ভঙ্গীতে, কল্পনার তুলিকায় কবিত্বের উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে......।"

সত্য বাবুর নূতন পুস্তক—অভিনব শিশু উপন্যাস

মূল্য ৸০] **দগোবার্ট** [মূল্য ৸০

ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লিখিত প্রভুভক্ত কর্ম্মবীরের অলৌকিক কাহিনী। এরূপ ছেলেদের উপন্যাস আর বাহির হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
৬৫নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।

A NEW BOOK—Just published.

A HISTORY OF EDUCATION IN ANCIENT INDIA.

BY

NAGENDRA NATH MAZUMDER, M. A., B. T.

Professor, Dacca Training College

WITH AN INTRODUCTION

BY

E. E. BISS, I. E. S.

Principal, Dacca Training College.

MACMILLAN & Co.

Calcutta.

Price Re. 1-8-

Sir Gooroodass Banerjea writes:—"The book presents in a well-arranged form and within a short compass much useful information regarding ancient Hindu culture."

Babu Hirendra Nath Dutta, M. A., P. R. S. says:—"I have gone through it (Education in Ancient India) with interest. You have broken new ground and opened up a fruitful and interesting field."

Dr. Brajendra Nath Seal, (George V Professor of Philosophy, Calcutta University) writes:-

I have read with great pleasure Mr. Nagendra Nath Majumdar's "History of Education in Ancient India." As a clear and interesting account of the ideals and practices of the Ancient and Mediaeval Hindus in the sphere of Education, it is eminently suited to serve as an introduction to the study of the subject.

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শক্তি ঔষধালয়

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড্। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট্, ঢাকা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—১২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট্। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন্ রোড্ (হাওরা পুলের নিকট
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১৩৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্। (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—
৭১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—১২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের। দাদ্‌মার—৵০ কৌটা। বহরের ননী—৷০ শিশি।
(এক দিনে দক্র নিশ্চয় আরোগ্য)। (নালীঘা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহৌষধ)।
পঞ্চতিক্ত ঘৃত—৪৲ সের

দশন সংস্কারচূর্ণ—৶০ কৌটা।

কামদেব ঘৃত—১২৲ সের। (সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ)। অমৃতারিষ্ট—৷০ আনা শিশি।
(মেধাস্মৃতি বর্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায়। সারিবাদ্যারিষ্ট ৩৲ সের। (ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত ও
ব্রাহ্মীঘৃত—৬৲ সের) (রক্তদুষ্টি বাত বেদনার মহৌষধ)। সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ)

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শক্তি বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি. এ,

হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোযাইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

The Manager, "DACCA REVIEW,"
5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressin our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encourage us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offerin to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr. P. C. Lyon, C.S.I.
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K. C. I. E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C. I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt., C.S.I., M.A.,

The Honble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E I.C.S.
„ Sir Henry Wheeler, K. C. I. E.
„ Mr. R. Nathan, B.A., C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. H. Sharp, C.S.I., C.I.E., M. A.
„ Sir N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. Donald, C. I. E., I. C. S.
„ Mr. W. W. Hornell, C. I. E., M. A.
„ Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
„ Mr. J. G. Cumming, C. S. I., C. I. E.
„ F. C. French, C.S.I., I.C.S.
W. A. Seaton Esq., I. C. S.
D. G. Davies Esq., I. C. S.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A.
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
„ Mr. L. Birley C. I. E., I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Sir. J. C. Bose, C.S.I., C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L.B.
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.)
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C.I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
„ Rai Kumudini Kanta Banneiji Bahadur, M.A.
„ Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M. A.
„ J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
„ J. C. Kydd, M. A.
„ W. Douglas, M. A., B. Phil., B. D.
„ T. T. Williams M. A., B. Sc.
„ Egerton Smith, M. A.
G. H. Langley, M. A.
„ Rai B. N. Das Bahadur, M. A. B.Sc
Debendra Prasad Ghose

Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagpor, K.C.I.E.
The „ Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.
The Hon. Maharaja Bahadur of Nashipur.
The „ Raja Bahadur of Mymensing.
Prof. J. N. Das Gupta. M.A., (Oxon).
The Hon'ble Sir, Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
„ Mr J. H. Kerr, C. S. I., C. I. E., I. C. S
„ Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
„ Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I.C.S.
F. D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C.I.E., I.C.S.
T. O. D. Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S.
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
„ Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate.
„ Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
„ Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
„ Hemendra Prosad Ghose.
„ Akshoy Kumar Moitra.
„ Jagadananda Roy.
„ Binoy Kumar Sircar.
„ Gouranga Nath Banerjee.
„ Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law Principal, Lahore Law College
Khan Bahadur Syed Abdul Latif.

CONTENTS.

The Preservation of ancient Monuments in India... ... ... J. Ph. Vogel, Ph. D. Professor at the University of Leiden ; late Superintendent, Archæological Survey in India... 123
Journal of the East Indian Association

Of Reading... 144

Rock Carvings at Unakoti in Hill Tipperah (Eastern Bengal Notes and Queries) ... H. E. Stapleton, I. E. S., and Captain Williams 153

সূচী

১। ওয়াল্‌টেয়ার ... ... শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌ ১৩৫

২। ডাক (কবিতা) ... ... শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ ১৪১

৩। স্বার্থ ও পরার্থ চেষ্টা ... অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌ ১৪১

৪। ত্যাগী মহারাজ (কবিতা) ... ... শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি-এ ১৪৬

৫। পুস্তক পরিচয় ... ... মধুব্রত ১৪৬

৬। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ ... ... শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৪৬

৭। মধু নদী (কবিতা) ... ... শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম্‌-এ. বি-এল্‌ ... ১৫৯

৮। পথে (কবিতা) ... শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ১৫৯

৯। সাহিত্যিক-পত্র ১৫৯

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

THE DACCA REVIEW.

Vol. X.	DECEMBER, 1920.	No. 9.

THE PRESERVATION OF ANCIENT MONUMENTS IN INDIA*

By J. Ph. Vogel, Ph. D.

Professor at the University of Leiden ; late Superintendent, Archæological Survey of India.

There is, I believe, no sphere of the present Indian Administration in which it enjoys a greater and wider sympathy than in its care of the ancient monuments of the country. It is possible that I am inclined to attach to this branch of service, to which I myself belonged for thirteen years, too great an importance. But let me remind you that the ancient monuments, which lie scattered in such numbers over the wide lands of India, have, with only a few exceptions, this feature in common, that they one and all bear a religious character ; and, if we consider how in India religious consciousness still pervades every thought and action, we cannot but understand how great must be the appreciation which the Government's care of the old temples and topes, mosques and mausoleums, wins amongst the mass of the population, when every religious community sees its own sanctuaries protected and preserved with an impartial care.

The care of the monuments in India undoubtedly has a high political value, and on this account it has surprised me sometimes to find this ignored by officials who, although they might not personally take any interest in old buildings, should at least have perceived that merely from a practical point of view it ought to be promoted. To such people it may at any rate be pointed out that it is the ancient monuments which draw numerous tourists to India every cold season, thus constituting a valuable source of income—an argument which

*An address delivered at a meeting of the Indian Society (Indisch Genootschap) of The Hague, November 14, 1916. Translated from th by Mrs. D. Kuenen-Wicksteed.

cannot fail to make an impression upon those who convert all values into pounds, shillings and pence.

Fortunately, let me hasten to add, amongst the Indian officials such Philistines are exceptional. As a rule the members of the Civil Service fully acknowledge the importance of the preservation of the monuments, not so much from the practical point of view as for its ideal significance. Indeed, in the course of my work in India it was very rarely that I did not find them warmly interested and ready with their assistance. I may add, too, that the Indian Civil Service has produced several distinguished scholars who in the field of Indian archæology have accomplished excellent work. Among such men I need only mention Dr. J. F. Fleet, who takes a prominent place amongst epigraphists, as shown by his standard work on the inscriptions of the Imperial Gupta dynasty, and Mr. Vincent A. Smith who has produced numerous reliable works on the subject of the political and æsthetic history of ancient India.

It is a remarkable fact that in India, where such great respect is felt for everything ancient, the scientific study of the old monuments was first begun by European scholars. The inscriptions of King Asoka and of the Gupta Emperors, which even to the most learned Pandit were an unsolvable riddle, were deciphered by James Prinsep and others. The ancient buildings were first studied and described by James Fergusson. In this way interest was aroused both in India and in Europe, but at that time there was as yet no question of the regular care of monuments.*

In the first half of the previous century it was especially the Asiatic Society, founded in 1784 by Sir William Jones at Calcutta, which led scientific research into archæological channels. At that time such research was not considered to be a matter for the Government. A change, however, came a little later, with the appointment of Colonel (afterwards General) Alexander Cunningham, R. E., who had already distinguished himself as a member of the Asiatic Society, to the post of Archæological Surveyor—that is to say, to control archæological investigation on behalf of the Government. It was in 1862, under the Viceroyalty of Lord Canning, that the institution of the

*There are, however, isolated cases of the restoration of important buildings, amongst others of the celebrated Qutb Minar near Delhi in 1829—that is, during the "rule" of the Great-Mogul Akbar II. (1806—1837). An account of this not very judicious restoration is found in a rare and littleknown publication the *Journal of the Archæological Society of Delhi.* It should also be mentioned that as early as the fourteenth century the enlightened Sultan Firoz Shah Tughlaq (1351—1388) set himself the task of restoring the great buildings of his predecessors—a remarkable and probably unique example of monument preservation in the pre-British period!

Archæological Survey of India took place.*

It would have been difficult to find a better head for this new branch of the public service (for the present he was head and body at the same time). Numbers of ancient sites in Northern India were examined and identified by him. In ancient topography, in particular, he possessed an insight that amounted to positive genius. It was my privilege, more than once in the course of my researches, to be able to demonstrate the correctness of his conclusions, which his critics had called into question. The results of Cunningham's untiring labour in almost every field of Indian archæology—epigraphy, numismatics, architecture and sculpture, chronology and history—are to be found in the imposing row of twenty-three volumes which form the first series of the *Reports of the Archæological Survey of India*, to which Vincent Smith added, as the twenty-fourth volume, an extensive index.

With the preservation of the ancient monuments Sir Alexander Cunningham was not entrusted. In his reports he repeatedly mentions cases of vandalism committed upon old monuments, or the plundering of ancient sites on a large scale, especially in connection with the construction of railways. As an archæologist he must have felt deeply grieved, but he regarded it, perhaps, as a fatality, which it was useless to strive against. I am not aware, at any rate, that he ever suggested any means of combating the natural decay or wilful destruction of the monuments, except so far that sculptures and inscriptions were collected by him in great numbers and presented to the Asiatic Society of Bengal. In this way the nucleus was formed of the magnificent archæological collection preserved in the Indian Museum at Calcutta.*

Among other treasures, Cunningham removed the profusely sculptured railing of the Bharhut Stupa to the Calcutta Museum, after those priceless sculptures had—alas!—received irreparable damage

*According to a note by the architect William Simpson, it was really due to the warm interest of Lady Canning in the ancient art of India that the Archæological Survey of India owes its origin.

After the new Viceroy, Lord Lawrence, had abolished the office of Archæological Surveyor in 1866, in June, 1870, the Archæological Service was reestablished at the special request of the Secretary of State for India, and Cunningham was again appointed chief, with the designation of "Director-General of the Archæological Survey of India."

*There are now museums containing important archæological departments in Bombay, Madras, Lahore, Lucknow, Quetta, Nagpur, and Rangoon, while there are purely archæological museums in Delhi, Agra, Muttra (Mathura), Taxila, Peshawar, Ajmir, Sarnath (near Benares), Faizabad, Bijapur, Poonah, Mandalay, and Pagan, besides those found in various Native States. The museums I have mentioned are in charge of the officers of the Archæological Survey.

at the hands of the neighbouring villagers. But the immovable monuments—that is, the buildings themselves—remained abandoned to their fate. Even those which Cunningham discovered in his excavation usually soon fell a prey to the greed of the villagers, unless they were protected by the sanctity of the spot.

This was the case, for instance, at Kasia, where Cunningham, led by his brilliant power of combination, recognized in a heap of rubbish, overgrown by brushwood, the site of the ancient park of Kusinara, which had witnessed Buddha's Nirvana. His brilliant hypothesis was confirmed when his assistant A. C. L. Carlleyle, at the outset of his excavations on the spot, struck a gigantic image of the dying Buddha—the same image that had been seen there and described by the Chinese pilgrim Hiuen Tsiang in the seventh century. Thus was the Nirvana temple of Kusinara, once one of the four most holy pilgrim shrines of the Buddhists, after centuries of oblivion, again discovered and restored to honour. "Restored" also in the literal sense, for Carlleyle deemed it necessary to repair both the image and the temple in which it was enshrined. Although this restoration is not faultless in all respects, Carlleyle rendered a great service by it to the faithful, who now, as in the days of yore, come from all quarters of the Buddhistic world to do honour to the venerable image of the dying Buddha.

This is, therefore, one of the few cases in which the Archæological Survey, under Cunningham's leadership, occupied itself with restoration work. Another even more important case which deserves mention is that of the Mahabodhi temple at Bodh Gaya, which, according to earliest Buddhist tradition, marks the pre-eminently sacred spot where Sakyamuni experienced the great spiritual awakening which made him "the Awakened," the Buddha.

Beyond these solitary exceptions, Cunningham, as has been said, did not occupy himself with the preservation or restoration of monuments. In fact, it may well be said that the archæological investigations, so vigorously undertaken by him and his assistants, greatly encouraged the hunt for antiquities and the consequent despoiling of ancient structures. Buddhist stupas which for centuries had remained undisturbed, now that it had become known that they often contained gold coins, gems, or other valuables, were opened and ruthlessly despoiled. For the sake of their problematic contents, the sacred monuments were all too often irrevocably damaged, and thereby the most precious of all, the relic that the pious Buddhist, centuries ago, had carefully enshrined in the heart of the structure, not seldom disappeared.*

*Even before Cunningham's time numerous stupas were plundered and destroyed. One of the first cases which has come to our notice is that of the ancient stupa of Sarnath, near

The discovery of so-called Græco-Buddhist sculpture (that is, Buddhist sculpture created under strong Hellenistic influence) in the trans-Indus country—the ancient Gandhara—led to the plundering of the ruined monasteries, in which the Afghan population of the district took an active part. The fanatical Pathans, always so eager for the spoiling and destruction of idols, soon perceived that the unearthing and selling of such "buts" (every old piece of sculpture is in their eyes a "but" or idol !) was in the long run a more profitable occupation.

And it was not only in the outlying frontier districts that neglect and destruction of ancient monuments was the order. In the great centres, Delhi, Agra, Lahore, and Allahabad—once the residences of the art-loving Great-Moguls—another kind of vandalism was practised, which might be called utilitarian. For there the magnificent palaces of Akbar, Jahangir, and Shah-jahan, and even the mausoleums of their Amirs, were used for various highly useful but highly unsuitable purposes.

In Lahore, the capital of the Panjab, we have seen remarkable instances. The Pearl Mosque, or Moti Masjid, in the Citadel was used as a treasury, and another mosque, founded by the foster-mother of Shah-jahan, as an office of the North-Western Railway. Moreover, various sepulchres were misused for practical purposes, amongst others, the tomb of Jahangir's favourite, Anar-Kali, was first used as a church and later as a record room. In the same way the Sleeping Pavilion of Shah-jahan in the Lahore Fort was turned into a church, and the open throne-room of the Great-Moguls into a barrack. It is only fair to add that the abuse of these Muhammadan buildings in the great majority of cases had already been begun by the Sikhs, and that, thanks to the exertions of Lord Curzon, the most important of these edifices have now been vacated and thrown open to the public.

In the same way, after the suppression of the Mutiny in 1857, the palace of the Great-Moguls in Delhi—its ancient glory can still be read of in the pages of Francois Bernier—was consigned to the housing of the British garrison. Only the large buildings, that could serve for the accommodation of officers and men were left standing; the rest was demolished. James Fergusson is bitterly indignant over thisdeed, "a deliberate

Benares, which, in 1794, was demolished for its building material by Jagat Singh, the minister of Raja Chet Singh of Benares. The reliquary was rescued by the British Resident, Mr. Jonathan Duncan, and presented to the Asiatic Society.

Somewhat later the stupas of Afghanistan were systematically "opened" by the English traveller Masson, while in the Panjab it was especially the French and Italian Generals in the service of the Sikh King Ranjit Singh who carried out archæological "investigations" in a manner not exactly scientific.

act of unnecessary vandalism, most discreditable to all concerned in it."

As late as 1886 the distinguished French savant, James Darmesteter,* wrote : "Les debris du fort, ou etincelaient le Trone d'Or et le Trone du Paon, sont transformes en casernes. Le Divan public, ou le Grand-Mogul recevait les ambassades de Jacques I[er] et de Louis XIV., est une cantine, et le mur ou s'appuyait le trone porte le prix des consommations.

"O Aurang-zeb ! vous souvient-il des vers que, il y a deux siecles, au bord de la Joumna, vous traciez en lettres d'or sur le marbre du Divan Hass ?

"Si le paradis est sur terre, c'est ici ! c'est ici !"

At the time when these words were written a better spirit had already arisen It was the Viceroy, Lord Lytton, who took the initiative in 1880 by instituting the office of "Curator of Ancient Monuments," which was held for three years by Major H. H. Cole, R. E. A complete idea of his extensive labour can be gained from his copiously illustrated publications. Special mention should be made of his restoration of the famous Buddhist stupa of Sanchi, with its stone railing and four profusely sculptured gates or "toranas"—next to that at Bharhut, already mentioned, the most ancient structure of its kind. In the beginning of the last century, shortly after the stupa (or "tope") of Sanchi was discovered, English amateurs had damaged the building in such ruthless fashion that the gateway facing the west had completely collapsed. Major Cole set himself the task of closing the disgracefully opened stupa and rebuilding the western torana. The southern gate also called for repair. This restoration was not carried out with the care and knowledge which a work of this kind demands. Some portions of the western gate have been wrongly replaced, others were left behind among the debris. At the same time we should be thankful that this remarkable monument now reigns again in its ancient glory, on the hill of Sanchi, and is preserved from the fate of its sister monument of Bharhut.*

*James Darmesteter, "Lettres sur l'Inde," p. 15. It may parenthetically be noted, that the writer erroneously associates the Persian verse quoted (*Agar firdaus ba ru-e-zamin ast, Hamin ast to, hamin ast to, hamin ast*) with Aurang-zeb. As a matter of fact, the Diwan-i-khas, like the whole palace of Delhi, was built by order of his father, Shah-jahan.

* A Foucher, "La Porte orientale de Sanchi" ("Bibliothéque de Vulgarisation du Muse'e Guimet," tome xxxiv., pp. 5 *et seq.* Paris, 1910). The writer reminds us that in 1867-68 the Muhammedan Queen of Bhopal, in whose kingdom Sánchi is situated, was on the point of sending the whole eastern gate to Paris as a present to the Emperor Napoleon III. This act of vandalism was fortunately prevented by the intervention of the Viceroy, Lord Lawrence, and later, in 1869, complete casts were made of this gate, at the cost of the Indian Government, which may now be seen in London, Edinburgh, Dublin, Paris, and Berlin.

Another important work of restoration executed under the guidance of Major Cole concerned the mausoleum of the Great-Mogul Jahangir, not far from Lahore. Here, too, there is evidence of errors against historical truth and good taste. If the Curator of Ancient Monuments, in addition to his undoubted energy and enthusiasm, had possessed a greater amount of antiquarian knowledge, his work would certainly have gained by it.

This seems to have been felt in Government circles too. At any rate, the newly created post was not renewed, and two years after Major Cole's retirement it was decided to entrust the care of ancient monuments to the Archæological Survey, which, as we saw, had until then devoted itself exclusively to research. The new arrangement was accompanied by important alterations in this branch of the service. In 1885 General Cunningham had retired as head of the Archæological Survey; his successor was Dr. James Burgess, who had for some years carried on archæological investigations in Southern Indai (the Presidencies of Bombay and Madras). The enormous territory over which he was now appointed as Director-General of Archæology for the whole of India was divided into five circles, each including one or more provinces. There were Madras, Bombay, the Punjab (with Sind and Rajputana), the North-West Provinces (with Central India and the Central Provinces), and Bengal (with Assam). For each of the five circles an Archæological Surveyor was to be appointed. As a matter of fact, only three surveyors were appointed —viz., for the Panjab, the North-West Provinces, and Bengal—while Dr. Burgess continued to conduct the researches in Bombay and Madras, with the help of two assistants. He only held the post of Director-General for a few years, till 1889, and during that period he occupied himself almost exclusively with exploration, which appealed most to his scholarly tastes.

After Burgess had gone home in 1889, the office of Director-General was left vacant. There happened to be one of the periodical fits of retrenchment, and of course such a service as the Archæological Survey, which was looked upon by some as "a mere luxury," was the first to suffer. Thus, not only the post of Director-General was left unfilled, but also some of the by no means liberally paid surveyor's places—viz., that in Bengal, Burma, and the Pnnjab. Moreover there still reigned in Government circles the stange idea that the work of the Archæological Survey as regards the care of monuments (which had gradually become the most important part) would only be of a temporary character. The task should be confined to the compiling of lists of monuments for each province separately. In these lists the monuments were to be divided into three classes, and when this were once completed, the conservation of

them could be handed over to the Department of Public Works and the Archæological Survey could be abolished Accordingly, in 1885, it was sanctioned on the new footing for five years, and each time, in 1890 1895, and 1900, it was renewed for five years, as it constaantly appeared that its appointed task had not yet been accomplished.

Of the difficulties encountered during these years I need not go into detail. Let me rather give you the name of the man to whom it is due that better days have dawned. It is Lord Curzon whose undying honour it is, as Viceroy of India, to have firmly established the Archæological Service and to have regulated the preservation of monuments in an efficient manner. A few weeks after he landed in India, February 1. 1899, the Viceroy declared at a meeting of the Asiatic Society that he regarded the promotion of archæological research and the preservation of the ancient monuments as "a part of our Imperial obligation to India." A year later, at the next annual meeting of the same Society, Lord Curzon in a comprehensive address explained with great eloquence how he wished to interpret the task of the Government with regard to the interests above mentioned. I wish that I had space to quote the whole of this brilliant speech. Let me be permitted to quote a few passages.

"I hope" (thus the Viceroy began his address), "that there is nothing inappropriate in my addressing to this Society a few observations upon the duty of Government in respect to ancient buildings in India. The Asiatic Society of Bengal still, I trust, even in these days, when men are said to find no time for scholarship, and when independent study of research seems to have faded out of Indian fashion, retains that interest in archæology, which is so often testified to in its earlier publications, and was promoted by so many of its most illustrious names. Surely here if anywhere, in this house which enshrines the memorials, and has frequently listened to the wisdom of great scholars and renowned students, it is permissible to recall the recollection of the present generation to a subject that so deeply engaged the attention of your early pioneers, and that must still even in a breathless age, appeal to the interest of every thoughtful man.

"In the course of my recent tour, during which I visited some of the most famous sites and beautiful or historic buildings in India, I more than once remarked, in reply to Municipal addresses, that I regarded the conservation of ancient monuments as one of the primary obligations of Government. We have a duty to our forerunners as well as to our contemporaries and to our descendants—nay, our duty to the two latter classes in itself demands the recognition of an obligation to the former, since we are the custodians for our own age of that which has been bequeathed to us by an earlier, and

since posterity will rightly blame us if, owing to our neglect, they fail to reap the same advantages that we have been privileged to enjoy. Moreover, how can we expect at the hands of futurity any consideration for the productions of our own time—if, indeed, any are worthy of such—unless we have ourselves shown a like respect to the handiwork of our predecessor? This obligation, which I assert and accept on behalf of Government, is one of an even more binding character in India than in many European countries.

And a little further:

"If there be any one who says to me that there is no duty devolving upon a Christian Government to preserve the monuments of a pagan art, or the sanctuaries of an alien faith, I cannot pause to argue with such a man. Art, and beauty, and the reverence that is owing all that has evoked human genius, or has inspired human faith, are independent of creeds, and, in so far as they touch the sphere of religion, are embraced by the common religion of mankind.

"To us the relics of Hindu and Mahommedan, of Buddhist, Brahmin, and Jain are, from the antiquarian, the historical, and the artistic point of view, equally interesting and equally sacred. One does not excite a more vivid and the other a weaker emotion. Each fills a chapter in Indian history. Each is a part of the heritage which Providence has committed to the custody of the ruling power."

With regard to the claims of "research" and "preservation" to support from the Government he remarks:

"Epigraphy should not be set behind research any more than research should be set behind conservation. All are ordered parts of any scientific scheme of antiquarian work. I am not one of those who think that Government can afford to patronize the one and ignore the other. It is, in my judgment equally our duty to dig and discover, to classify, reproduce, and describe, to copy and decipher, and to cherish and conserve. Of restoration I cannot, on the present occasion, undertake to speak, since the principles of legitimate and artistic restoration require a more detailed analysis than I have time to bestow upon them this evening. But it will be seen from what I have said that my view of the obligations of Government is not grudging, and that my estimate of the work to be done is ample."

"For my part" (thus Lord Curzon ends his address), "I feel far from clear that Government might not do a good deal more than it is now doing, or than it has hitherto consented to do.

"I certainly cannot look forward to a time at which either the obligations of the State will have become exhausted, or at which archaeological research and conservation in this country can dispense with Government direction and control. I see fruitful fields of labour still unexplored, bad blunders still to be corrected, gaping omissions to be

supplied, plentiful opportunities for patient renovation and scholarly research. In my opinoin, the taxpayers of this country are in the last degree unlikely to resent a somewhat higher expenditure—and, after all, a few thousand rupees go a long way in archaeological work, and the total outlay is exceedingly small—upon objects in which I believe them to be as keenly interested as we are ourselves. I hope to assert more definitely during my time the Imperial responsibility of Government in respect of Indian antiquities, to inaugurate or to persuade a more liberal attitude on the part of those with whom it rests to provide the means, and to be a faithful guardian of the priceless treasure-house of art and learning that has, for a few years at any rate, been committed to my charge."

In accordance with Lord Curzon's views it was agreed that in the Indian Budget a yearly sum of a lakh of Rupees (Rs. 100,000, or £6,666) should be reserved for archaeology. This sum by no means represents the entire amount expended by the Government in archaeological interests. It is moreover, the Provincial Governments principally that must care for these interests and supply them with funds, and of these the amount varies greatly. The lakh yearly devoted by the supreme Government in its Budget serves for the support of all manner of work of special importance, both in British India and in the Native States—for excavation, research journeys, purchases for museums, publications, etc.

A second measure of great importance was the re-establishment of the office of Director-General of Archaeology, which since the retirement of Dr. Burgess, had practically ceased to exist. Before the end of the year 1901, in which the Viceroy had delivered his Calcutta speech, Mr. J. H. Marshall was appointed Director-General for a term of five years. In the early spring of 1902 he landed in India.

The appointment of Mr. Marshall was received with some suspicion, especially on the part of Orientalists. For he was a youthful scholar, who had devoted himself with great distinction to classic archaeology, had studied some some at the British School in Athens, and also taken part in excavations in Crete, but who had never had occasion to occupy himself with the study of Oriental languages.

The objections raised to Marshall's appointment would have been more serious if he had been called upon to devote himself alone and single-handed to scientific research, as had been the case with his great predecessor, Sir Alexander Cunningham, who, as a matter of fact, had also gained his knowledge of ancient India and Indian languages in India itself. The newly-appointed functionary, however, was given the charge, both of research and of the conservation of monuments, and for the present the latter, the shamefully

neglected conservation, was put first. The Director-Generalship was now, therefore, an entirely different thing to what it had been.

The new functionary needed to be not only a scholar, but, above all, a man of judgment and good taste. As adviser to the Indian Government, as head of a Government Department and of an extensive office, he must be, moreover, a man of tact and of prestige, capable of combining the greatly divergent elements, within and without his own department, in harmonious co-operation.

Let me say at once that Sir John Marshall (for he, too, received a knighthood a few years ago) proved to be "the right man in the right place." He reorganized and extended the Archæological Survey, and, what was of particular importance, before Lord Curzon retired from office the service was made permanent.*

The new Director-General succeeded in improving and developing both the conservation of monuments and archæological research. In the first part of his task he showed himself to be a man of good taste and sound judgment; in the second part a man of great intelligence and extensive knowledge. His particular merit is that in his excavations he applied the strict scientific methods that he had acquired in Crete.

The results of the work done by the Archæological Survey under Marshall's guidance are laid down in the stately series of illustrated *Annual Reports*, which, begun by him in 1903, are still continued. Eleven volumes of the series have already appeared. As Government publications they are presented gratis to scientific institutions, not only in India, but throughout the whole world.

In 1910, when I was called to replace Marshall for a year and a half as Director-General, it was proposed to abolish the *Annual* and to publish the results of archæological research in another form. I took this opportunity of asking the opinion of a number of well-known Orientalists, and it was a matter of great gratification that they almost unanimously expressed a high appreciation of Marshall's *Annual*, which was accordingly continued in a slightly modified form.

* In a resolution of April 28, 1906, the Archæological Service was made permanent, and at the same time some improvements were made in the salaries and position of the officers connected with it. They had already received the more imposing title of "Superintendent of the Archæological Survey" in place of that of "Archæological Surveyor."

At present the Archæological Service consists of a Director-General, seven Superintendents, six Assistant Superintendents, and two Epigraphists. Both at the central and provincial offices there are, moreover, native draftsmen, photographers, and clerks. The cosmopolitan nature of this branch of the Service may be gathered from the fact that some years ago amongst the Superintendents were found an American, a Chinese, a German Hungarian, and a Dutchman, while the office of Epigraphist was filled by a Norwegian.

I should also like to call attention to a little book that appeared recently, a Government publication entitled "Indian Archæological Policy, 1915, being a Resolution issued by the Governor-General in Council on October 22, 1915 (Calcutta. Superintendent Government printing, India, 1916. Price six annas, or seven pence)." In this "resolution" (drawn up principally by Sir John Marshall) a clear and business-like account is given of all that has been accomplished by the Indian Archæological Service during the last twelve years in its various branches (conservation, research, museums, publications, etc.)

In this connection it should be mentioned that the task of the archæological officers is purely advisory, while the execution of the work is left in the hands of the Public Works Department. As a rule the procedure is as follows. The archæological officer inspects each year a certain number of the most important monuments in his circle. To visit them all within that time would be out of the question on account of the enormous extent of the district in his charge. At the inspection of important buildings, the district engineer is, as a rule invited to be present, in order to discuss all technical difficulties on the spot. Then the archæological officer embodies his recommendation in a "Conservation Note," in which his recommendations are put down as accurately as possible. These "Notes" are then sent to the Director-General for comfirmation. As most of the monuments are known to him, through his annual tours, he can often extend and improve the suggestions made by the provincial archaeologist. The "Conservation Note" is then printed, and serves as a guide for the execution of the work.

How necessary it is that those who are entrusted with the execution of the work should be furnished with minute instructions I have more than once been able to observe. In the course of an inspection tour I once visited the remarkable ruined brick temple of Bhitargaon, in the district of Cawnpore, which was first described by Cunningham. To my horror I perceived, even from a distance, that the walls were covered with a thick layer of plaster, the spotless whiteness of which constrasted strangely with the subdued colour of the high roof, which (probably owing to lack of funds) had been left in its dilapidated condition. On inquiry it appeared that a subordinate Public Works officer, to whom the conservation of this temple had been entrusted, had conceived the plan of thoroughly doing up the old building, so that it would look fresh and new! Fortunately it was easy in this case to undo such an ill-considered piece of restoration, to remove the layer of plaster, and take more adequate measures for the preservation of the ancient temple.

On another occasion I had made

proposals for the preservation of the coloured tile-decoration on the wall of the Lahore Fort. Many of the panels had badly suffered, party from natural causes of decay and partly in consequence of a bombardment during the years of confusion that immediately preceded the British annexation of the Panjab. My proposal was that the gaps in the tilework should be filled in to prevent further crumbling away. When, however, I went to inspect the work, I saw that the masons, not satisfied with the prescribed measures for preservation, were engaged in touching up the surface, whereby the difference in colour between the vulgar paint used by them and the magnificent colours of the tiles became painfully conspicuous. Fortunately this "restoration" was only just begun, so that no damage of importance had been done.

The fact is that the execution of such work often devolves upon subordinates, who, as the example quoted serves to show, do not understand that in this work the principles and methods are entirely different from those followed in the repairing of a modern building.

What, now, are the leading principles to be followed in the treatment of ancient buiidings? Marshall, not only in his handbook on the subject, but also in his Annual Reports, has repeatedly laid them down. In general it may be said that the object is preservation, and that for this purpose the most important thing is to prevent decay.

"*Preservation before Repair.*—Officers charged with the execution of conservation work should never forget that the reparation of any remnant of ancient architecture, however humble, is a work to be entered upon with totally different feelings from a new work or from the repairs of a modern building. Although there are many ancient buildings whose state of disrepair suggests at first sight a renewal, it should never be forgotten that their historical value is not to renew them, but to preserve them. When, therefore, repairs are carried out, no effort should be spared to save as many parts of the original as possible, since it is to the authenticity of the old parts that practically all the interest attaching to the new will owe itself."

The two great enemies of ancient monuments that must be strenuously combated are water and the growth of plants. It is water which, in the celebrated cave temples of India, has wrought irreparable damage. By the moisture the heavy pillars are often completely eaten away underneath, so that at last the upper part of the column hangs from the ceiling and, instead of supporting the overhanging rock, increases the peril of collapse by its weight. It is distressing to think that very simple measures of drainage, if applied in time, might have prevented a great deal of irremediable damage.

The same is the case with vegetation. It is particularly the pipal (*Ficus religiosa*) which seems to have a special

predilection for ancient masonry, and which, with its huge roots, will slowly but steadily break up an old building. It is especially the luxuriant vegetation peculiar to India which renders periodical inspection so necessary. The Public Works Department is, therefore, obliged to inspect the most important buildings in the district regularly, and yearly to clear them from weeds.

But to prevent the collapse of a more or less ruined structure other measures may be required. Overhanging walls must be supported, cracked arches propped up, and gaps filled in. Here, therefore, new masonry is required, but to most it will be plain at a glance that the new work is not part of the old building, but only serves as support. Naturally it must be the endeavour of the archaeologist to make such additions as little conspicuous and objectionable as possible.

In this kind of conservation work it will, in certain cases, be necessary or desirable to replace old portions of the building that are decayed or fallen away by new work.

Thus we come at last to the vexed question of how far it is permissible to renew portions of an old building on a large scale. Marshall has expressed himself clearly on this point and declared that he cannot agree with those who condemn all restoration (that is, reconstruction)—a principle that was once upheld by the Society for the Protection of Ancient Buildings. This Society has published a manifesto in which it insists on putting "Protection in the place of Restoration, to stave off decay by daily care, to prop a perilous wall and mend a leaky roof by such means as are obviously meant for support or covering, and show no pretence of other art, and otherwise to resist all tampering with either the fabric or ornament of the building as it stands; if it has become inconvenient for its present use, to raise another building rather than alter or enlarge the old one; in fine, to treat our ancient buildings as monuments of a bygone art, created by bygone manners, that modern art cannot meddle with without destroying."

"The attitude of the Department," says Marshall, "in fact, coincides very closely with that of the moderate thinkers at home, who fully recognize the deplorable harm that can be done in the of restoration, but recognise also that there may be religious, social, political, or other considerations to be taken into account which render it impracticable to lay down one law which will be applicable to one and every case."

What would have become, asks Marshall, of the Taj Mahal,* the celebrated mausoleum that the Great-Mogul

*In his speech quoted above Lord Curzon reminds us that in the time of one of his predecessors, Lord William Bentinck, the Taj was on the point of being demolished and the marble converted into money.

Shah-Jahan had built on the shores of the Jamna for his beloved wife? What would have become of it, if this building had always been treated according to the strict rules of this Society?

"Now, let us suppose that this method of dealing with structures had been applied throughout to the most famous and perhaps the most extensively restored of our Indian monuments—the Taj Mahal at Agra. What would have been the state of that priceless tomb to-day? It would have been a ruin, stripped of half its marbles, tied together with bands, propped up with buttresses or scaffoldings, and disfigured by other accretions and eyesores. Instead of that, the counsel of perfection which has prevailed in its restoration has given back to India a gem of unblemished beauty, perfect in itself and perfect in all its surroundings. I cannot think that even the staunchest opponent of restoration, if he viewed the Taj as it is to-day, could wish it back in its old state of dilapidation, or could regret for one instant that the charm that lingered round it in its decay had been replaced by the more abundant loveliness of life. But apart from aesthetic sentiment, which can hardly fail to endorse all that has been done for the Taj, there were other very potent reasons which demanded its restoration. For the Taj is not a 'dead' monument. It is still the resting-place of the Great-Mogul Emperor and Empress for whom it was erected, and as such it deserves to be maintained in all its original splendour. Nor does it appeal to the Indian people as an antiquarian relic. It is to them a national heritage, of which they are justly proud, and which they have a right to expect will be preserved to posterity as something more than an interesting ruin. Indeed I think I may truly say that there is no archaeological work in India that has given more profound gratification to the people than the rescue of this cherished mausoleum from neglect, and the effacement from it of all signs of vandalism committed by earlier generations of Englishmen."

Everyone who reads this eloquent appeal and who has had the good fortune to behold the Taj Mahal with his own eyes will heartily agree. It is impossible to treat all monuments according to one principle, by which all reconstruction is simply forbidden. Each case must be judged on its own merits.

As a matter of fact, the Society for the Protection of Ancient Buildings, on reconsideration, associated itself with Marshall's opinion and declared "that, as regards Indian architecture, it drew a distinction between the older Hiudu and Buddhist edifices on the one hand, and the more modern erections of the Muhammadan invaders on the other; and that in the case of the latter it was of opinion that local conditions might sometimes demand or justify a policy of limited restoration, on the ground

that the art of the builders has not completely died out, as the case of the more ancient Hindu and Buddhist buildings."

Marshall was right in perceiving that in general a distinction should be made between the Muhammadan monuments of the last seven centuries and the Buddhist and Hindu buildings, which for the most part belong to an earlier period. The former, which include the magnificent works of the Great-Muguls at Delhi, Agra, and Lahore, are often in a perfect condition of preservation, whereas the Buddhist and Hindu buildings are usually more or less ruined In many cases they have been wilfully defaced ; for innumerable temples have fallen victims to the fanaticism of Muhammadan iconoclasts. In many cases the restoration of such a building would be out of the question, as they have completely assumed the character of ruins. There is another characteristic difference between these two classes of monuments. Hindu temples are usually covered with sculpture, in which the strange effigies of the gods are mingled with the quaint forms of fantastic beasts. The Law of Islam forbids the imitation of living creatures, and although free-thinking rulers like Akbar, Jahangir, and even Shah-Jahan, often disregarded this rule, yet it can be said in general that the ornamentation of Moslem buildings consists in pure geometric designs or in floral and foliated patterns, which however delicate they may be, do not bear an individual character and can be executed equally well by a modern workman of sufficient skill. It is a craft which has been preserved in unbroken tradition, and therefore there can be no such objection to renewing, when necessity demands it, the stone work of this class of buildings.

On the other hand, no attempt can ever legitimately be made to restore the sculpture of Hindu temples, either by complete renewal or by patching up defaced or worn out images.

In the domain of Muhammadan monuments, of late years, an enormous amount of conservation work has been done, especially at Delhi, Agra, and Lahore, where the magnificent palaces and tombs of the Great-Moguls are found. No trouble or expense has been spared to rescue these buildings from long neglect. The Archæological Department has gradually succeeded in getting the military to evacuate nearly all the buildings. In the palace at Delhi the Great Audience Hall had long ceased to be misused as a canteen, but certain buildings, such as the Rang Mahal, were still employed as officers' quarters. At present the whole archæological area is fenced off and thrown open to the public. A few years ago the palace garden Havat Bakhsh was newly laid out in its own peculiar severe architectural style.

"The old causeways, water-channels, tanks, and fountains," writes Marshall, "which were buried beneath several

feet of soil, have been excavated and restored; structures that had perished have been replaced by shrubberies, and the courtyards they enclosed by grass lawn; and what was formerly a barren waste has now been converted into a pleasing garden."

On the east side, alas! still rises the row of huge barracks of which Fergusson complained so bitterly. As long as the citadel is used to accommodate the garrison, it is to be feared that these will remain indispensable. I must add, however, that the Italian mosaics which decorated the Imperial throne in the Hall of Audience, and which, after having been removed during the Mutiny, finally found their way to the South Kensington Museum, have been, at the instigation of Lord Curzon, restored to their original place, while the rest of the mosaic work, which had been damaged, has been restored by a *mosaicista* brought from Florence.

But it would lead me too far to sum up all that has been done to these remarkable buildings during the last few years. It may produce the impression that rather too much attention has been bestowed upon this class of buildings, which, however attractive they may be for the "globe-trotter," and however suitable for brilliant entertainments, which were given here during the Darbars of 1903 and 1911, are still, from an archæological point of view, almost modern, and products of a foreign art introduced under alien rule.

It must, therefore, be pointed out that constant attention is being paid to the preservation of Buddhist and Hindu monuments, although here, just because it is confined to steps for conservation only, no such large sums are involved.

The number of ancient buildings or groups of buildings in British India that was under repair in the year 1902 was less than 150; in the year 1915 it had risen to nearly 700.

Some of the most important ancient monuments happen to be situated in the territory of Native States. Thus the stupa of Sanchi lies in Bhopal State, which is governed by a Muhammadan dynasty, and, remarkably enough, that dynasty has for a length of time been represented by a woman, the Begum of Bhopal. The celebrated group of cave temples of Ajanta, as well as those of Ellora, lie within the domains of the Nizam of Hyderabad (Deccan).

The Native States may avail themselves of the advice and assistance of the Archæological Survey, and for that purpose they were, in 1901, allotted to the different "circles." To what extent the care of the monuments can really be fruitfully undertaken in such States largely depends upon the attitude of the Darbar concerned. One would expect that in these States, which are ruled by Indian princes, the preservation of ancient monuments would be felt as a national interest. This is by no means always the case. I remember the strange answer given by one of the

first chiefs of Rajputana when it was reported that a tower of great artistic and historical value in his ancient capital was in great danger of collapsing. His answer was: "Kyun na girega? Bahut purana hai." (Why should it not fall in? It is very old.)

Fortunately, there are others amongst the Indian princes who appreciate the importance of archæological research and the care of ancient monuments. I remember with gratitude the enlightened Raja of Chamba, a small hill State in the Western Himalaya, from whom I experienced nothing but sympathy and support in the course of my researches.

In Marshall's "Indian Archæological Policy" (p. 10) the following remarks are made with regard to the Native States:

"The efforts which have been made by Government to rescue from decay and to repair the national monuments of the country have not been confined to British territory alone. In 1901 the Government of India invited the co-operation of the Native States in the task which it was undertaking, and offered to help them with advice or financial assistance if the latter should be needed. This invitation met with an immediate and warm response from the ruling chiefs, and many important measures of conservation have since been carried out by the Darbars of Hyderabad, Udaipur, Bhopal, Dhar, and other States. Several of these Darbars—namely, Hyderabad, Kashmir, and Gwalior—have now gone a step further and have instituted archæological departments of their own, placing them in each case in charge of qualified officers obtained from the Archæological Department of India."

How fruitful these "Archæological services" in Native States may prove to be, time alone will show. Their results must be awaited. The archaeological officer in the South India State of Mysore (which is not mentioned above) publishes a carefully elaborated Annual Report, in which photographic reproduction of buildings, images, and inscriptions are included.

Finally, I want to say a few words about the "Ancient Monuments Act," which—again thanks to Lord Curzon's initiative—India has possessed for the last twelve years. It is not my purpose to discuss this law in all its details: I will confine myself to a few leading features. In general it may be said that it does not enforce any general rules and prohibitions, but confines itself to the means for the preservation of ancient monuments which can be adopted by the local governments.

The Act contains, for instance, no prohibition against the export of antiquities from India, but gives the Governor-General in Council the power to enact such a prohibition, either for all antiquities or for one special kind (§ 17,) while the provincial governments have the right to forbid sculptures, inscrip

tions, etc., from being removed from the place where they are found, except with special permission of the Collector (§ 18). In this way the Government of the United (formerly North-West) Provinces resolved to forbid the exportation of antiquities from the district of Muttra (Mathura).

The most important provision of the Indian Monuments Law is that (§ 3) by which the provincial governments are empowered to declare certain monuments "protected" by announcement in the local Gazette. In itself this would not, of course, be of great significance, but the law contains certain penalties, by which anyone who destroys or defaces a "protected monument" is liable to a fine which may extend to Rs. 50,000, or with imprisonment which may extend to three months, or with both (§ 16). This section of the Act creates a powerful means of punishing, if not preventing, wilful damage to ancient monuments.

Buildings which are private property can also be declared "protected monuments," The Collector (or Deputy Commissioner), with the previous sanction of the local government, then makes an agreement with the owner in which, as a rule, the government undertakes to keep the building in proper repair, whereas the owner promises to leave it undisturbed (§ 5). Thanks to this regulation, it has been possible to save many a monument from neglect and ruin, *e. g.*, the tomb of Tegah Khan—amongst the buildings in the neighbourhood of Delhi one of the few from the reign of Akbar and one of the most beautiful of its kind. It was the property of a Mirza, a descendant of Great-Moguls, who did not possess the means for taking proper care of it.

In special cases Government has the right to acquire a preserved monument which is in danger of being destroyed, injured, or allowed to fall into decay, upon the ground that the preservation of such a monument is to be regarded as "public purpose" (§ 10). Buildings which are periodically used for religious observances are excepted from this regulation.

In this connection it should be pointed out that the term "ancient monument" is taken in a very wide sense by the authors of the law, as in § 2 of the Act it is described as designating "any structure, erection, or monument, or any tumulus or place of internment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical archæological, or artistic interest, or any remains thereof."

It is a matter of extreme importance whether on the grounds of this definition so called "ancient sites" may be regarded as "ancient monuments," to which the regulations of the law are applicable. By an "ancient site" is meant the ground upon which an ancient building or a group of such buildings has stood. The expression includes, therefore, the emplacement of an old fort or town. Such a place may be

recognizable from a rising in the surface of the ground, sometimes hardly perceptible, sometimes sharply defined in the shape of one or more *tumuli*, and by the presence of fragments of antique earthenware, brickbats, and so forth. The remains of regular buildings are, as a rule, entirely hidden beneath the surface. Only too frequently an "ancient site" of this kind is exploited by the neighbouring villagers, as it supplies them with building materials for their dwellings, with manure for their fields, and sometimes even with gods for their temples. If the archæologist subsequently wishes to undertake systematic excavations, he finds, to his distress, that exactly those things that were of primary importance to him have already been removed, or irrevocably destroyed.

It will be readily understood of what importance it is for archæological research that such territories should be preserved. More than once the archæological officers have proposed that an "ancient site" of this kind should be put upon the list of "protected monuments." At first they met occasionally with some opposition from officials who considered that the expression "monument' could not be applied to such territories, but finally the Government has conformed to their opinion. Thus a number of "ancient sites" were placed on the list of protected monuments in the Panjab and the United Provinces of Agra and Oudh, amongst others the site of the city of Taxila (Sanskrit Takshasila), known from Alexander's campaign, which embraces the territory of four villages. In the last few years important excavations have been undertaken there under the guidance of Sir John Marshall.

However gratifying it may be that India possesses an Ancient Monuments Preservation Act, it goes without saying that the best-thought-out and most precisely formulated law is of no use unless it is enforced. And this is sometimes extremely difficult in the case of ancient structures that lie in remote places, and can only seldom be visited by the responsible officer. It is doubly difficult when extensive territories of the kind just described are concerned. Even if the poor villager is caught in the act of digging up old bricks within such a "protected" area, is there not every chance that the district official will be inclined to overlook the offence instead of resorting to the rigour of the law? It must be remembered, too, that what now became an offence had, from time immemorial, been a perfectly legitimate practice, by which practical and industrious persons had been able to provide themselves with cheap building meterial. I remember how, towards the end of excavations carried out by Sir John Marshall and myself at Charsadda in the Peshawar District, an undoubtedly respectable mullah proffered us the request to be allowed to make use of the exposed bits of Buddhist walling for the building of a mosque. In the

eyes of the Afghan population, who now inhabit the ancinnt Gandhara there could naturally be no more fitting use for the not very imposing remains. of the but-khanah ("idol-house") which we had excavated. The request was—certainly to their surprise—politely refused. And yet, after a few years, no traces were to be found of our excavations, although they had been specially recommended to the protection of the headmen of the neighbouring villages.

A still more painful experience was that of my American colleague, Dr. D. B, Spooner, when, at Shahr-i-Bahlol in the same district, he had laid bare a stupa decorated with beautiful stucco-work. Knowing the fanatical nature of the inhabitants, he had taken the precaution of setting a watch while he devised a plan for removing the whole structure to the Peshawar Museum, when, in consequence of a misunderstanding, the watchmen were recalled by the local official, with the immediate result that the delicate ornamentation was completely destroyed.

While in the districts inhabited by Muhammadans it is against destructive fanaticism that the monuments have to be protected, amongst the Hindu inhabitants religious zeal expresses itself in a different way. As soon as an old image comes to light, it is immediately carried off to the village temple, there to be worshipped as a god. Whether it had originally belonged to a heterodox sect is of no consequence: an image of Buddha is worshipped as the goddess Kali or under another familiar name. If th image is once within the sacred walls, the Government will refrain from having it taken to a museum, however great the art value may be, and in spite of the fact that it may be regarded as State property, for the Indian Government scrupulously avoids all interference in matters of religion.

A third factor that should be mentioned is the childish craze for collecting curios of European and American "globetrotters," who, every cold season, visit India in large numbers.

To protect the innumerable monuments of India against these different destructive elements is a task the difficulty of which cannot be exaggerated

Only for the most important monuments lying near the greater centres are special custodians appointed, but almost without exception these are natives, called Chowkidars, not disinclined to increase their small pay of seven or eight rupees a month by the bakhsheesh offered them by well-meaning and perhaps evil-intentioned visitors Generally speaking, the most satisfactory ones are pensioned non-commissioned officers of the Native army, especially if they are decorated with a number a war medals.

The fact is that the safety of India's ancient monuments will only be adequately assured when a true appreciation of their value has penetrated the masses of the population. We have

some grounds for hoping that this appreciation will gradually develope out of reverence for tradition and the religious spirit which is in so high a degree peculiar to the Indian character. To this characteristic it is certainly due that so much has already escaped destruction. Amongst the educated national feeling also plays its part, which, although really foreign to the Indian spirit, has become more and more developed of late years. In addition to the work of the Archæological Survey, it is certainly the learned societies of the different provinces which contribute to the growth of interest in the antiquities of the country, both amongst Europeans and Indians. It is upon public opinion, as Baldwin Brown rightly observes, that the safety of ancient monuments chiefly depends.

OF READING.*

Much has been written in praise of books and the pleasure of reading has been celebrated by mighty pens. The act of reading is a necessity in modern society, and the multitude of habitual readers is continually on the increase as the ripple of literary education—started by what stone prehistorically cast into the still pool of human consciousness?—ever widens its circle. So over mastering has the power of the written word become that there are not wanting those who affect to deplore the invention of writing. Men were happier, they say, and no less wise in the olden days when the bulk of the waking hours was spent in "doing," when every male was sowing or tilling, hunting or fishing, and every woman busied in dairy or kitchen, or with distaff and spindle, from the early morning till eventide. Then, indeed, after they had eaten and drunk their evening meal, it did them no harm to listen to a bard extolling the manly feats of bygone heroes. There were no intellectuals then, like spiders, to entangle men in the webs of their theories, but every man learned by his experience both the ways of nature and of other men.

But this argument will not do. Even in the simplest civilizations a priestly craft arose as the repository of wisdom more subtle than could be gathered by any unlettered father of handiwork, and in this secret store of wisdom lay the great power of a priest-craft. Wisdom acquired by study was their patent, the infringement of which they resented as inevitably as it occurred. In the days when no ordinary man needed to

* "ON THE ART OF READING." By Sir Arthur Cuiller-Coach. (Cambridge University Press. 15s. net.

specialize they were the specialists in wisdom; now, when every man must specialize, some wisdom, only to be acquired by letters is a necessity for everyone. Unfortunately, so facile a medium have letters become that unwisdom as well as wisdom is daily propagated by their means. Nor is that all. Reading, which should be at once a study and a delight, demanding an active and willing co-operation from the mind which it uplifts and strengthens, has now become for so many little better than a drug poured without attention into a flaccid system. A whole narcotic literature now issues from our printing presses, novels that have no more permanent value than an ounce of tobacco, magazines no more precious than a packet of woodbines; all end in smoke, but tobacco makes no higher pretensions, while books, at their best have a permanent value surpassing much fine gold.

The debasemeut of literature which goes on daily around us must be regarded as the price we pay for the wide spread of letters. Over vast tracts of the earth not even the smallest soul is debarred from sharing their utility and their solace; and the little soul, unless it be trained and fortified, demands feeble diet. How amply is it fed! Nevertheless, on summing up the account, the advantage is on the right side. With patience the balance-sheet may be immeasurably improved, as each nation, by more inspired methods of education, raises the tone of its literary digestion till the most ambrosial foods are commonly enjoyed. Every advance in a literary diet is permanent; not that the meat need ever afterwards be strong, but, when the noblest viands can be properly appreciated, sweets and milk puddings take their proper place as occasional cates, not as staples. In this matter there is hope for every man. A physical system, by early bad usage, can be so impaired as to resist all belated attempts at improvement; but a mental system, provided it stay this side of sanity, is never beyond the reach of judicious education. As with the body however, so with the mind, early training is all important; and the standard of reading in this country, at all events, will not greatly improve till the feet of all its children can be firmly set on the road to "humanity."

Sir Arthur Quiller-Couch in his lectures shows that he has the interests of the children and of the young men strongly at heart. His are not the accustomed utterances of the Professor of Literature at an ancient university. They are not in the great style nor, in their form, are they learned. They abound in irrelevances, with a touch of faceliousness that is often tiresome, and occasionally they breathe the unction of the pulpit rather than the gravity of the chair. The twelve lectures, delivered at intervals during the course of three years, were doubtless more effective in their delivery than in their printed form

which make evident that discursiveness and that rather vacillating aim for which their author apologizes. Yet there can be no doubt of his enthusiasm for the proper appreciation of our magnificent English literary heritage, and in his chief aim a wholly admirable one, he looks out beyond the grey walls of his university to the elementary class-rooms of England. As he writes in his introduction :—

The real battle for English lies in our Elementary Schools, and in the rraining of our Elementary Teachers It is there that the foundations of a sound national teaching in English will have to be laid, as it is there that a wrong trend will lead to incurable issues. For the poor child has no choice of schools, and the elementary teacher, whatever his individual gifts, will work under a yoke imposed on him by Whitehall. . . . I foresee, then, these lectures condemned as the utterance of a man who, occupying a chair, has contrived to fall between two stools. My thoughts have too often strayed from my audience in a university theatre away to remote rural class-rooms where the hungry sheep look up and are not fed; to piteous groups of urchins standing at attention and chanting "The Wreck of the Hesperus" in unlson. Yet to these, being tied to the place and the occasion I have brought no real help.

A man has to perform his task as it comes. Bnt I must say this in conclusion. Could I wipe these lectures out and rewrite them in hope to benefit my countrymen in general, I should begin and end on the text to be found in the twelfth and last—that a liberal education is not an appendage to be purchased by the few ; that Humanism, is, rather, a *quality* which can, and should, condition all our teaching; which can, and should, be impressed as a character upon it all, from a poor child's first lesson in reading up to the tutor's last word to his pupils on the eve of a Tripos.

Nobody, we think, will condemn this straying of the professor's gaze, though some will regret. perhaps, that the rewriting of these lectures with a single aim in view was not possible. The coursing of several hares, effective and stimulating as each individual hunt may have been at the time, is distracting when the records are all gathered together. There are passages in which the lecturer went admirably and with gusto to the point. In the second lecture, for instance, after quoting Emerson's remark, "All that Shakespeare says of the king, yonder slip of a boy that reads in the corner feels to be true of himself," he proceeds :—

It is remarkable, as Emerson says; and yet, as we now see, quite simple. A learned man may patronize a less learned one ; but the Kingdom of God cannot patronize the Kingdom of God, the larger the smaller. There *are* large and small. Between these two mysteries of a harmonious universe and the inward

soul are granted to live among us certain men whose minds and souls throw out filaments more delicate than ours, vibrating to far messages which they bring home to report them to us; and these men we call prophets, poets, masters, great arists, and when they write it we call their report literature. But it is by the spark in us that we read it; and not all the fire of God that was in Shakespeare can dare to patronize the little spark in me."

Here he puts in a striking manner his passionate contention that it is to the highest part of the human soul that great literature appeals, not to the practical or the purely intellectual. Again, in an excellent discourse on the use of master-pieces, he makes the point that mere knowledge or enjoyment is not the aim in reading great literature. "The first business of a learner in literature is to get complete hold of some undeniable masterpiece and incorporate it, incarnate it;" or, as he asserts earlier, great literature teaches by apprehension not by comprehension.

All that he says on such topics as these is well worth reading. and must have been immensely stimulating to the young men who listened: it is rather when he bends his gaze upon his university that the matter seems to become less compelling, at least for the general reader. In some of the lectures Sir Arthur was bombarding the enemy's trenches in a battle which, as we gather he and his friends won. The ground in dispute was the Tripos in English literature, and no doubt the victory was beneficial; but to those outside Cambridge the issue is not made at all clear, since they neither know the enemy nor his intentions, and they will hardly be prepared to accept the Professor's petulant fusillade against the faults of the pioneers of English linguistic studies as adding anything of importance to literary thought in general. Then there is a supplementary skirmish to which no fewer than three lectures are devoted, the aim of which is apparently to secure that certain books of the Bible may be set as subjects in the English Tripos. While thoroughly sympathising with all that Sir Arthur Quiller-Couch says in praise of that incomparable jewel in our heritage, the Authorized Version, it seems to us that he hardly appreciates the difficulties of his suggestion, nor, in spite of the large amount of space which he devotes to this particular topic, does he appear to prove anything of moment. Surely the literary qualities of the Authorized Version are undisputed, and there is nothing novel in an appreciation, however well expressed, of the Book of Job as a poem. One would think, from some passages in this book, that nobody had ever read the Bible except as a religious exercise. After all, as things are, there is nothing to prevent young men, at Cambridge or anywhere else, from reading the Bible intelligently and appreciatively, and nothing to prevent judicious teachers

from stimulating them to do so. We grudge the devotion of so much space to the question, especially as these three lectures are in the main simply expatiatory and mark no particular progress in thought, just as the lecture "On reading for examinations" is too largely concerned with quoting at length the statutes of ancient universities which, if entertaining, are hardly apposite.

Sir Arthur Quiller-Couch chose a wide title for this book, and yet, with so much delectable ground to cover, he has dawdled. Whether it is a good title is a question in itself, for, while everyone will admit that there is an art of writing, it is doubtful whether, speaking strictly, there can be such a thing as an " art " of reading, any more than there is an art of listening to music. Neither activity, of course is purely passive, for the reader or listener benefits in direct proportion to the intensity of his own co-operation. A sound method inspired by a truly philosophical aim is, certainly the ideal which the author of these lectures has in view, and we should have been glad if a man of such wide reading and experience had devoted himself single-heartedly to setting it forth. To take one small point, there is a great deal more to be said about reading for examinations. The lecture on this subject is mainly a rather deprecatory defence of examinations as a vile necessity, with some hints, very valuable ones on the proper method of studying English poetry to the best advantage. But little is said that will help a student in framing his own course of reading ; yet that is one of the most valuable exercises which is imposed, at least on the intelligent, by a course at the university. Most boys leave a public school without the slightest idea of systematic reading, however brilliant their capabilities may be. It is not their fault. School hours are so much parcelled out between class work and games, with the weekly tale of compositions to be handed in at specified times that there is no leisure for the boy to spend in any ambitious scheme of regular reading. The school timetable—framed to restrain the natural perversity of the young—supplies the regularity, just as the text-books set for the term prescribe the range of the studies. This is quite inevitable, and much can be done to lessen its evils by the careful stimulation in private of youthful enthusiasms ; nevertheless too many boys, in that joyful spring of life, are content to jog easily along the track so thoughtfully laid out for them, obediently following their pace-makers, but bothering little about getting an eye for country or pondering the problem, which all students have to solve, of mapping out a course for themselves over unknown tracts. Having been accustomed for so long to fix their eyes only on a text book and a few notes, they are apt to be appalled as undergraduates when confronted with a vast prospect and whole

libraries in which to survey it. It is to the credit of our universities that they still can be so appalled, instead of being still further nursed with text books and diagrams, as too often they are in America, till they become convinced that there is no branch of knowledge to which there is not a short cut easily mapped on half a sheet of notepaper. Our schoolboy is appalled and it is good for him; but it is then that he needs encouragement and assistance. Lectures which need to be taken down and remembered verbatim are of no more value than text books; but when a lecturer or a tutor truly surveys a subject, pointing out clearly its difficulties and its problems, making clear the principles upon which it can be illuminated and indicating the most profitable methods of approach to it, there is wisdom to be found. Examinations may deserve little praise, but at least this can be said for the studies which they entail, that it makes all the difference in the world to a student whether he read for them intelligently with an appreciation of their value or dully with his eye only upon the outcome of the final test. It is hardly too much to say of any undergraduate who reads at all that what he reads at the university moulds his mind for the rest of his life, even if he never afterwards return to the particular study. Many nice points arise, therefore; what due should be paid to knowledge alone, what to curiosity, what to entertainments; how far precise scholarship is compatible with a wide survey; and whether historical breadth of view or philosophical depth is the better principle by which to steer a course. Different temperaments will resolve these questions in different ways. Even in a school of literature there is more than one satisfactory way of reading; but there is no doubt that the student should issue armed with a strong critical sense, fortified not only by old friendship with masterpieces, but by a thorough test of all the good and bad, high and low, ancient and modern, that has come within his ambit.

Never has strong critical sense, in every department of social life, been more urgently wanted than now. At every moment, in politics, in social economies, in poetry, in music, in drama, in almost every activity of the intelligence, the woeful results of uncritical thinking are exhibited to the observer. During five years of war the minds of us all have been exposed to an incessant bombardment of partisan propaganda, deliberately framed to carry the uncritical off their feet and to bewilder, if possible, the critical. Few mental equipments have been strong enough to stand this assault without damage, and even now, after more than a year of peace, the bombardment is not over. Nation still cries out against nation, people against people, governments against sections of the governed, black against white, poor against rich and rich against poor, and the minds of many men are

sick and bewildered by this multitude of cries. An intolerable clamour still echoes through civilization, and the calm voice of wisdom is not heard. Moreover, should a nation show a disposition to think clearly for itself, or a man for himself, there are those who will assail the nation or the man fiercely, not in the name of reason, but in the name of passion, of prejudice, of a creed or of a catchword. The hurly-burly is still being stirred and particles of every kind jostle one another in the seething crucible and reason, that sovereign precipitant, has yet to fall among them, reducing the confused components to order in their proper level.

A critical sense in literature, it is true, is not enough to keep the mind on a straight course amid winds so fluky and so boisterous; but, since literature is made up of words and words embody thought, it is no bad guide among cross currents of impassioned advocacy. It is no less valuable than the training in logical scrutiny given by a scientific education; a mind equipped with either need never go very far astray. Criticism embodies experience, and experience comes with years alone; but that strong critical sense which should grow as mind matures must necessarily be sown in youth. Gusto is admirable; it is the first requirement for the proper enjoyment of literature, and none of the words in which Sir Arthur Quiller-Couch encourages a right gusto will be thrown away. To have incorporated in youth great masterpieces is indeed a powerful "prophy-lactic of taste" Neverthless, there is some danger to-day that the value of gusto may be overestimated. There are ill-written books, devoured by a public too feebly-minded to assimilate good criticism, composed upon the principle of ecstatically praising without distinction the work of all authors in which the smallest enjoyment is to be found. The perpetrators of these books seem to consider that the only course for the young and the ignorant—and it is for these that they write—is to work themselves up into a series of Bacchic enthusiasms over each new literary pasture they attack. They will have no tasting or comparing, but will have their pupils revel and grovel, like young pigs at the food trough. And what is the result? Certainly not a mastery of literature nor a critical sense, but an enervated palate only to be stimulated by something new and strongly flavoured. To the old food, with which it was so unwisely satiated, it cannot bear to go-back; and the mind so treated comes more to resemble a wild animal, alternately starving and gorged, instead of a reasonable being with an infinitely varied and well-filled garden of succulent fruits at its disposal, from which it can judiciously select according to its mood and its constitution. To put the mind in possession of such a delectable estate is the true aim of education in literature, and nothing in Sir Arthur Quiller-

Couch's lectures leads us to suppose that he conceives the aim otherwise. But other teachers misconceive it, and their pupils suffer. Every man must win and cultivate his garden with the tool of criticism; this implement should be put into his hands young and he should be encouraged to use it.

What then of the older reader, who has already formed at least the nucleus of his garden? Is there no message for him? If there is an art of reading it is he, surely, who will most intelligently practise it. His enthusiasms, heady enough in their day, have sobered down, but he has that deeper sense of contentment which is founded on reflection; he may regret, sometimes, that he will not again, in all probability, experience the first fine careless rapture, yet in the mellow perspective of letters that spreads before his eyes there is enjoyment enough to last the remainder of his days. No doubt, when a man (or a woman) has got so far he no longer asks books and lecturers to tell him how and what to read; but many attractive questions would arise in some friendly discussion on the subject of reading in maturity, sufficient in themselves to fill a book. The case of the busy man, for instance, who uses his brain all day is a very interesting one. What shall he read for enjoyment in his leisure hours? Equally intelligent men will give extraordinarily divergent answers to such a question. Some will seek relaxation in a return to Homer, some drink refreshment from the deep well of English poetry, some find that biography and travels alone suit their taste, while others—and they are many—would rather bolt a modern detective story whole than any more refined or subtle delicacy. It is, of course, largely a matter of temperament in what direction a man turns for his literary recreations, but it is also a matter of training and environment in early years. The number of elderly people who have almost entirely lost their taste for reading what booksellers call "standard literature" and who simply live from hand to mouth (nearly starving in August) on the provender of the circulating library is amazing. Many of these excellent folk have well-filled libraries, full of poets and essayists and historians, yet, in default of something new from the circulating library, they will miserably complain that they have nothing to read. Too often, we fear, the psycho-analyst would find a complex started far back in childhood or early youth, when what should have been enjoyment was turned into an unpleasant task, because it was dully presented and tediously commented. With a flush of conscious virtue they announce the rare occasion on which they have read a classic, as if it were a voluntary penance. Too often it is a penance, indeed, for the good books make weak minds think, giving them unaccustomed exercise. The habitual potterer puffs on the mountains; and it

may be therefore laid down as one safe general rule that one's reading, whatever it consist of, should keep one's mind in good training, not always tense but always supple.

About this time of year when, sufficiently recreated in body, we look forward to the longer evenings of autumn in the spirit of "How well I know what I mean to do," the annual impulse seizes some of us to map out a programme which shall fill in some of the unaccountable gaps in our literary geography. All of us have these gaps; even the authors and critics among us who can so easily convey, in writing the impression of encyclopaedic, knowledge. But we keep these awful gaps to ourselves in shame. Who would willingly confess that he had never read a word of Spenser's "Faery Queen," or that he had never looked inside the Gibbon whose broad back had been familiar to him since childhood Annually we plan out a cruise among these havens which beckon to us so imperatively, and annually, if we set sail at all, we put back to harbour. If we fail again this year, it will not be for want of an encouraging voice. Though he gives us no sailing directions, Sir Arthur Quiller-Couch would have us put bravely to sea with his benison. His lectures should give us an additional dose of courage. The weakness of most such programmes is that they are too ambitious and would require a winter of assiduous application to carry them out. We should plan, rather, a series of short cruises, returning after each one to familiar creeks, to old friends or to the children of to-day whom we should by no means neglect. Another maxim is not to sail too fast upon these salutary voyages. The habit grows upon us of skimming the books of to-day, for the excitement of their story or because others await us. In their case, perhaps, no very great harm is done. for they, after all, embody contemporary reflection which is also embodied in ourselves. But with an older author this helter-skelter will not do. To enjoy him properly we must penetrate to the levels of his mind and try, in some sort, to reconstitute the common intelligence which he addressed. It is not on a question of reincarnating Hamlet, to take an example given in these lectures, but of summoning before the imagination Shakespeare and all his age, comparing it with our own. Unless we surrender our emotions it is useless to read at all, but if we let our emotions hurry us on too fast we shall return with a blurred memory of an unrecorded voyage. The camera of the mind may be focussed by emotion but understanding is the lens through which the image is impressed on sensitive memory. It is melancholy to turn over our mental albums for half an hour to find how wanting in definition are our pictures of past voyages.

EASTERN BENGAL NOTES AND QUERIES.

New Series: No. IV.

EDITED BY

H. E. STAPLETON, I. E. S.

-:o:—

ROCK CARVINGS AT UNAKOTI IN HILL TIPPERAH.

From the alluvial nature of Eastern Bengal, Rock-Carvings cannot ordinarily be expected to be found. The existence, however, of certain rock-cut images in Tipperah has long been known though the unhealthiness and difficulty of access of the place where they occur has hitherto prevented any examination of them by experts.

In 1919, an attempt was made by Mr. T. Emerson, I. C. S., through Mr. J. Bartley, I. C. S., the then political officer of Hill Tipperah, to induce the Durbar to allow the Curator of the Dacca Museum to make a detailed survey of the site. After some correspondence, the Durbar expressed their unwillingness to bear the expenses of the Survey, but intimated that they had no objection to such a Survey being made, if the expenses could be met from elsewhere.

Dearth of funds prevented the Committee of the Dacca Museum at the time from undertaking the work, but in order that the matter may not be forgotten, I gladly accede to the suggestion of Babu Nalini Kanta Bhattasali that certain notes by Capt. Williams, received through Mr. Bartley at the time, in which the Unakoti carvings were described, should be recorded in print. A perusal of these notes leaves the impression that these rock carvings deserve much more attention than they have hitherto enjoyed: and it seems highly desirable that Unakoti should be visited in the near future by the newly appointed Superintendent of the Eastern Circle of the Archæological Survey.

H. E. S.

Extract from D. O. Letter No. 1266-P., dated 21st December 1913, from Capt. Williams to the Superintendent, Archæological Survey, Eastern Circle, Dacca.

3. The place where the carvings are situated is called UNKOTI and lies in the hills about 7 miles to the North-east of Kailashahar the Head-quarters of the Kailashahar Sub-Division of Hill Tippera. The name Unkoti means, I am told, 75 lakhs (of images of the gods) from "Koti" meaning 100 lakhs, and "Una" less by one quarter.

4. I have made many enquiries as to the history of the carvings but I can elicit no more definite information about them than that they are supposed to have been executed long ago by a man

named Kalu Kamar a Blacksmith. Unkoti is mentioned twice in the Rajmala, the history of Hill Tippera written in Bengali. It is stated that two Rajahs of Tripura visited the place at different times. The visit of one of them, Bejoy Manikya, took place some 250 years ago.

5. Apparently this spot was a favourite resort for pilgrims in times gone by and at the present day a certain number of pilgrims come here from Sylhet annually during January.

6. The collection of carvings is divided into two groups, viz:—

(a) Statues of gods and goddesses on the top of the Unkoti hill.

(b) Giant rock carving in the Unkoti gorge.

7. The figures on the top of the hill appear to be of great age for in most cases the features are so weather-beaten and time-worn that they are almost indistinguishable. They are tumbled about in some confusion but it seems doubtful if they were mutilated by the hand of man. My knowledge of Hindu Mythology was too incomplete for me to make out the identity of the majority, but I noticed fairly well-defined representations of Hanuman and Ganesh while the foot-prints of Vishnu are in an excellent state of preservation.

8. Possibly the latter were more recently carved, or it may be that they have been preserved from the effects of the weather, for there was a rough roofing of thatch to cover them.

9. The brick work foundations of a building can be seen here. Possibly they form the remains of a temple or shrine, but there is no priest or Sanyasi who looks after the idols at the present time.

I am told that the Earthquake of 1897 did much damage both to the idols and the rock carvings.

10. Lower down the hill in the Unkoti Gorge, a place of much natural beauty, where a stream forces its way through a cleft in the rocks and in which is situated a sacred pool where the pilgrims are wont to bathe. At the head of this gorge the rock carving will be found.

11. This particular spot seems to have been devoted to the worship of Shiva for there are several figures of this god here together with three sacred bulls.

12. I made notes of the following Sculptures:—

(1) A rock covered with the following pattern many times repeated.*

(2) The figure of a woman with naked breasts. The figure is about 15 feet high and is much broken. A sort of Crown of three points is on the head. The face is much obliterated. The arms are broken and entangled with roots of creepers.

The legs are broken and are ornamented with a triangular pattern which may be intended for elaborate anklets.

*Possibly the representation of two eyes and a mouth of the deity of the rock

(3) Male figure—only the head and breast are visible. The remainder of the body is covered by a land-slide.

(4) A large figure of (I think) Shiva is in a very good state of preservation. The left nostril is broken away. The right foot is buried in a slide of rock and one of the left arms is rather damaged. I spent some time in examining this carving and cleared away the jungle and large quantities of earth and debris.

The figure is some 15′ high, and represents a man with four arms taking a long stride with the left foot and in the act of shooting an arrow.*

The upper right arm is brandishing a heavy club. The lower right arm grasps the arrow-head and bow string.

The upper left arm flourishes a "Trishul" or trident and the lower left arm is holding the bow.

The face is much the same as the one noticed above, but the carvings are different.

The arrow is of somewhat curious design.

He wears a bracelet, on both right arms. Across his left shoulder is a string of beads. His waist is very small and he wears a sort of Dhotie, [clasped by an elaborately decorated girdle.]

The whole carving is in very bold relief—and in some places is over twelve inches deep.

(5) A rock covered with very rough shallow carvings :—

(a) a man with a bow and arrow, and wearing a sort of feather head dress.

(b) a woman.

(c) Two birds.

(6) In the immediate vicinity of the sacred pool there are

(a) The carving of an enormous head.

(b) Three bulls of Shiva.

(c) Four small heads.

I tried to take some photographs of (4) and (5) but the light was not good and without setting up some sort of scaffolding it would not be possible to take a successful picture of these.

14. The pool is amongst the rocks to the right of the big head as you face the picture.

15. There are no inscriptions any where which would give some clue to the age of these carvings. Their origin appears to be completely shrouded in mystery.

16. In my wanderings in the State I have come across more rock carvings not far from Udaipur on the Goomti river, but owing to the ignorance of the local people I hear that I have missed seeing the finest of them."*

* Babu Nalini Kanta Bhattasali considers that this is undoubtedly an image of the Tripurantaka form of Siva. Ed.

* Babu Nalini Kanta Bhattasali notes that Captain Williams omits to mention the fine rock—carvings at Sonamura and Devatamura, the former about 8 miles east of Comilla. Ed.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

১০ম খণ্ড } ঢাকা—অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩২৭। { ৮ম, ৯ম সংখ্যা।

ওয়াল্‌টেয়ার।

ওয়ালটেয়ার ভারতের একটী প্রধানতম স্বাস্থ্যনিবাস, মান্দ্রাজ বিভাগের অন্তর্গত "বিজাগাপটাম" জিলার অধীন। বহু দূরবাসী সময়২ স্বাস্থ্যরক্ষা বা স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে এখানে আগমন করিয়া থাকেন; এ হেন স্থান দর্শন বহুদিন হইতে মনের প্রবল বাসনা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। আমরা বিগত ১০ই জুন রবিবার রাত্রি ১১ টার গাড়ীতে পূর্ব্ববঙ্গের নোয়াখালী ছাড়িয়া ১১ই তারিখ সোমবার ভোরে চান্দপুরে আসি এবং তথায় বাষ্পীয় পোতাবলম্বনে দিবা ২ ঘটিকার সময় গোয়ালন্দ এবং গোয়ালন্দ হইতে রেলে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কলিকাতা উপস্থিত হই। তথায় এক বন্ধুর গৃহে অতি আদরে অবস্থান করিয়া ১২ই তারিখ অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় বেঙ্গল নাগপুরের মেইল গাড়ীযোগে "হাওড়া" ছাড়ি। গাড়ী ৬টা ১০ মিনিটের সময় প্রবল বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া, রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় "খরগপুর" ষ্টেশনে পৌঁছিল। Bengal Nagpur line মধ্যে "খরগপুর" একটী অতি সুপ্রশস্ত ষ্টেশন। বহু রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বাস। মেদিনীপুর জিলা ভাগ হইয়া এইখানেই একটী জিলা বসিবার প্রস্তাব চলিতেছে। গাড়ী আবার বায়ুবেগে চলিয়া রাত্রি অবসানের পূর্ব্বে "বালেশ্বর" "কটক" ছাড়াইয়া, প্রভাতে খুরদা রোড জাংসনে আসিল। এ সময়ে রথযাত্রা দর্শন জন্য বহু যাত্রি পুরীধামে যাইবার বাসনার্থ গাড়ী বোঝাই করিয়াছিল। খুরদাতে গাড়ী বদল হইয়া যায়। পুরী যাত্রিগণ আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া পুরীর গাড়ীতে চলিয়া যায়, আমরা কথঞ্চিৎ হাফ ছাড়িয়া বাঁচি। আমাদের গাড়ী কিয়ৎক্ষণ খুরদায় বিশ্রাম করিয়া পুনঃ প্রবলবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল, ষ্টেশনের পর বহু ষ্টেশন ছাড়াইয়া এবং ভারত-বিশ্রুত "চিল্কালেক্" পাছে রাখিয়া অপরাহ্ন বেলা চারি ঘটিকার সময় "ওয়ালটায়র" ষ্টেশনে দাঁড়াইল। পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া আমাদের

অনেক বন্ধু ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। আমরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সযত্নে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার বাসায় লইয়া গেলেন। আমরা তথায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে আহার করিয়া, এক রাত্র এবং এক দিবসের উপবাসের পর পরিতৃপ্ত হইলাম। বন্ধুবর একজন বাঙ্গালী, হুগলী জিলা নিবাসী ভাইজেক টাউনে সপরিবারে বৈষয়ীক কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন, তাহার সৌজন্যে ও সদ্ব্যবহারে আমরা পরম সুখী হইয়াছি। ভাইজেক হইতে দুই মাইল দূরে ছোট২ পর্ব্বত সমাকীর্ণ "ওয়ালটীয়ার আপলেণ্ড" অবস্থিত। স্থানটী মনোরম, সম্মুখে বঙ্গোপসাগর, তিনদিকে পাহাড়। Waltair Uplandএ আমাদের ছোট খাটো একখানা বাড়ী আছে। বাড়টী নবনির্ম্মিত। গৃহগুলি বাসোপযোগী, কিন্তু সম্মুখে বাগান এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর গৃহ হইতে আমরা রাত্রি ৯ টার সময় নিজ বাড়ীতে আসিয়াছি এবং এখানেই অবস্থান করিতেছি। "ভাইজিগা পটাম" জিলার নাম, কিন্তু লোকে টাউনটীক ভাইজেগ বলিয়া থাকে। ভাইজেগ অতি পুরাতন বড় সহর। দেশী বিদেশী বহু লোকের বাস। সহরের একদিকে রেলওয়ে লাইন, অন্য দিকে সমুদ্র সহরের পাদদেশ সজোরে ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে। সহরের রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত, সুপরিস্কৃত প্রস্তর কঙ্করে সুদৃঢ়। বর্ষায় কর্দ্দমাক্ত কি অপর ঋতুতে ধূলায় ধূসরিত হইবার আশঙ্কা নাই। রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান পসারির কারবার, মধ্যে ২ স্থায়ী বাসেন্দার নিবাস। গৃহ গুলি কতক ইষ্টক প্রস্তর নির্ম্মিত, কতক খোলা তাল পাতাচ্ছাদিত। প্রায় সমস্তই সুশ্রেণী বদ্ধ। সহর হইতে কিছু দূরে "Government Central Jail" বহু বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্থান স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া এখানে Central Jail স্থাপিত হইয়াছে। বহু কয়েদী এখানে সান্নিবদ্ধ আছে। সমুদ্রতীরে অথচ টাউনের মধ্যে টাউন-হল স্থাপিত। ববিলীর মহারাজ বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে গৃহটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ মহারাজের প্রতিকৃতি দেয়ালের শোভা-বর্দ্ধন করিতেছে। গৃহটী দ্বিতল, নিম্নে পাঠাগার, পুস্তকাগার এবং বিলীয়ার্ড-গৃহ অতি সুপরিস্কৃত ভাবে সজ্জিত। গৃহের পূর্ব্বভাগে "টেনীস" খেলার স্থান। গৃহের উপর তলে সময় ২ গণ্য মাণ্য লোক অভ্যর্থিত হয় এবং বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। গৃহটী বড়ই সুদর্শন, সমুদ্রের কূলে ইহার সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়াছে। এখানে পূর্ব্বাহ্নে অপরাহ্নে বহু লোকের সমাগম হয়। এবং সকলেই বিনা মূল্যে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকাদি পড়িয়া থাকে। টাউন হইতে সামান্য দূরে Reading Room, অল্প দিন হইল সাধারণের চান্দায় নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মাসেক হইল মান্দ্রাজের গবর্ণর বাহাদুর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। গৃহটী দ্বিতল, নিম্নতলে পুস্তকাগার এবং পাঠ গৃহ। উপরি তল খোলা। পূর্ব্বে বলিয়াছি upland অতি মনোরম স্থান, একটি বিস্তৃত পার্ক বিশেষ, স্থানে স্থানে সুপ্রসস্ত সুগঠিত রাস্তা, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড় এবং তদুপরি ইষ্টক প্রস্তর নির্ম্মিত ও খোলাচ্ছাদিত গৃহ, চারিপাশে ঝাউ ও অন্যান্য বৃক্ষরাজি। অধিকাংশ সাহেব সুবা এবং মধ্যে ২ দেশীয় ধনী লোক ঐ সকল গৃহে বাস করিতেছেন। প্রত্যেক বাড়ী সুবিস্তীর্ণ ফলে ফুলে পরিশোভিত বাগানে অলঙ্কৃত। দেখিলে নয়ন মন স্নিগ্ধ হয়। অধিবাসীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান সাহেব মণ্ডলি। দুই এক ঘর ভিন্ন বাঙ্গালী নাই। যদি কখনো কোন বাঙ্গালী আইসেন, সে কেবল স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অল্পকালের তরে। স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে স্থানটী অতি উত্তম সন্দেহ নাই কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে অতি নিভৃত (lonely)। আমরা বাঙ্গালী এই মাত্র নূতন আসিয়াছি, বাঙ্গালী প্রতিবেশী নাই, সুতরাং কথা বলিবার শুনিবার স্থান ও পাত্র অভাবে বড়ই কষ্টানুভব করিতেছি। তাহাতে আবার এ দেশীয় তেলেগু (Telegu) ভাষা জানিনা বুঝিনা। চাকর চাকরাণী সকলেই তেলেগু ভাষী, বিন্দু মাত্র বাঙ্গালা বুঝে না। ফল দাঁড়াইয়াছে আমার কথা চাকর চাকরাণীরা বুঝে না, তাহাদের কথা আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনা, উভয়কেই মুখ চাওয়া চাই করিয়া থাকিতে হয়। ভাগ্যে আমার সঙ্গে অল্প বয়স্ক আমার একটী ভ্রাতুষ্পুত্র রহিয়াছে। সে অনেক দিন তাহার পিতার সঙ্গে

এ প্রদেশে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। তাহার Second language তেলেগু, বিলক্ষণ তেলেগু বলিতে পারে এবং দেশীয় লোকের কথা বোঝে। তাহারই মধ্যতায় চাকর চাকরাণীর দ্বারা কায হাসিল করিয়া লইতে হইতেছে। Upland waltair এ কোন স্কুল নাই, ভাইজেগে আছে তাহাও আমাদের গৃহ হইতে বহু দূরে। এতদূর হাটাহাটি করিয়া স্কুলে যাওয়া অল্প বয়স্ক বালকের পক্ষে অসম্ভব। তাই ভ্রাতুষ্পুত্রটী গোদাবরী জিলার অন্তর্গত কোকনদ স্কুলে পড়ে (এখানে তাহার পিতা অনেক দিন যাবৎ কায করিতেছে)। ছেলেটী শীঘ্রই কোকনদ চলিয়া যাইবে। চলিয়া গেলে, কিভাবে কার্য্য চালাইব ভাবিতেছি। ওয়ালটারে রাস্তার অভাব নাই, কোন রাস্তা নিম্ন হইতে উচ্চে উঠিয়াছে, কোন ২ রাস্তা টাউন বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। কোন কোনটী দেয়ালে সুরক্ষিত। স্থানটী বালুকা ও প্রস্তরময়। বর্ষার জল স্রোত পাছে বসিয়া যায় তন্নিবারণার্থে রাস্তার পার্শ্বে স্থানে ২ দেয়াল নির্ম্মিত হইয়াছে। ওয়ালটারে কোন পুকুর নাই, থাকাও অসম্ভব, কারণ স্থানটী ক্ষুদ্র ২ পর্ব্বত সঙ্কুল, তবে সমুদ্র পাড়ে কোন ২ স্থানে পাত কুয়া আছে, তাহার জল সুস্বাদুময় এবং টাউনবাসী দিগের পক্ষে সে জল ব্যবহার অসম্ভব। পানীয় জলের ব্যবহার করে জলের কল আছে, জল একটী পর্ব্বতের উপর টেঙ্কে সঞ্চিত হয় এবং তথা হইতে পাইপ যোগে স্থানে ২ বিতরিত হইয়া থাকে। জলনিঃসারণস্তম্ভ সংখ্যা সামান্য এবং বহু দূরে দূরে স্থাপিত। সুতরাং সমস্ত অধিবাসীদিগের পক্ষে সে জল ব্যবহার কষ্টপ্রদ; তবু সে জল ব্যবহার ভিন্ন অন্য উপায় নাই। প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজেই সে জল ব্যব হৃত হয়। প্রত্যেক অধিবাসীকে কলের জল সংগ্রহার্থে চাকর চাকরাণী নিযুক্ত করিতে হয়। তাহারা নিয়ত দূরস্থিত কল হইতে জল সংগ্রহ করে। যাহাদের চাকর চাকরাণী রাখিবার সাধ্য নাই, তাহারা নিজেই জলের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অধিবাসীবর্গের সুবিধা বিধানার্থ জলস্তম্ভ সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

আপলণ্ড ওয়ালটেয়ারের ও বাইজেক টাউনে কয়েকটী বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান আছে; তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম English Club—এখানে সাহেব সুবা ও ধনী লোক ভিন্ন অন্য কেহরই প্রবেশাধিকার নাই। English Club সংলগ্ন Meprs Spencer Co's বাড়ী, meprs spencer & Co. ক্লাব সংসৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকেন এবং ক্লাবের তহবিল হইতে মূল্য গ্রহণ করেন। ক্লাব গৃহ ও তৎসংলগ্ন বাগান Compound সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত। গৃহের এক দিকে বিলিয়ার্ড খেলার স্থান, পাশে পাশে দুইখানা টেবিল রহিয়াছে, পুরুষেরা খেলা করেন, অন্যদিকে পিংপংটেবল (Pingpon table) মেয়েরা খেলিয়া থাকে। একটী ঘরে dressing হয়, অন্য ঘরে জলযোগ হয়। ক্লাবে একটী লাইব্রেরী (পুস্তকাগার) আছে, তাহাতে নানাবিধ সুপাঠ্য সুন্দর মলাটাচ্ছাদিত গ্রন্থ রহিয়াছে; তন্মধ্যে ইংরেজী উপন্যাসই অধিক। ক্লাব গৃহের সংলগ্ন একটী ঘরে, তাস, দাবা খেলা হয়। মোট কথা, সভ্যগণ যাহার যেরূপ অভিরুচি, সেরূপ নির্দ্দোষ আমোদে সময় কাটাইতে পারেন। গৃহের এক প্রান্তে সুবিস্তৃত সুপরিষ্কৃত (Ballroom) নাচ গৃহ। সময় ২ সেখানে সাহেব বিবিদিগের নাচ হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় বিদ্যুতালোকে গৃহটী অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। অপরাহ্ন ৫টা হইতে টাউনস্থ সমস্ত সাহেব বিবিরা সমবেত হইয়া সুখ সচ্ছন্দে গৃহটীকে মুখরিত করিয়া তোলেন।

Compound মধ্যে গাড়ী ঘোড়া রাখিবার এবং চাকর বাকরদের অবস্থান করিবার স্থান আছে। তথা হইতে চাকরেরা সমস্ত কার্য্য সরবরাহ করে। ক্লাবের বাহিরে অথচ সংলগ্নে সাহেবদের ভজনালয় রহিয়াছে। সেখানে সাহেবেরা প্রতি রবিবারে সন্ধ্যায় সময় ঈশ্বর ভজনা করেন। ভজনালয়টী সুবৃত্ত এবং ফুলফলের বাগানে পরিবেষ্টিত। ক্লাবের এক ধারে একটী সুন্দর মন্দির আছে। সেখানে সময়২ ব্যাণ্ডের সুললিত বাদ্য হয়। সংক্ষেপতঃ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে সময় কাটাইবার জন্য যাহা ২ প্রয়োজন সমস্তই ক্লাব-গৃহে আছে। প্রতি সোমবার সন্ধ্যায় বেণ্ড বাজিয়া থাকে। বেণ্ড-গৃহ ক্লাবের সংলগ্ন।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য স্থান Turners Choultry বাইজেগ টাউনের মধ্যে। ইহা একটী পান্থ নিবাস, পথিকদিগের সাময়িক অবস্থানের জন্ম অত্রত্য ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর টারণার সাহেবের নামে সাধারণ চান্দার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহটীর মধ্যে অনেকগুলি ঘর রহিয়াছে। তাহার এক একটীর দৈনিক ভাড়া ছয় আনা। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মধ্যে প্রাঙ্গণ। এতদ্ভিন্ন মূল গৃহের দুইদিকে আরো দুইটী বাড়ী আছে। তাহাও পথিকদিগের জন্ম নিয়োজিত। পান্থ নিবাসের তত্ত্বাবধারণ জন্ম লোক নিযুক্ত আছে। কেহ টাকা পয়সার হিসাব রাখেন, এবং অন্যান্যেরা স্থানটীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পাহারা দিতে নিযুক্ত। প্রায়ই গৃহগুলি অভ্যাগত পথিকে পূর্ণ থাকে। এরূপ এক একটী পান্থনিবাস প্রত্যেক জিলায় থাকা উচিত। গৃহের নিকট ক্ষুদ্র বাগান আছে, তদ্দ্বারা গৃহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য স্থল—টাউনহল—সমুদ্র তীরে অবস্থিত। ববিলীর মহারাজের অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত। টাউনহল ও রিডিংরুম সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে, পুনরুক্তি বাহুল্য। বাইজেগ টাউনের পশ্চিমদিকে স্বর্গীয় স্বনামধন্যা ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত পূর্ণ প্রতিকৃতি সহরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। তাহার কিছু দূরে দ্বিতল জজকোর্ট। গৃহটী সাদেকী সৌন্দর্য্যাভাব। এখানকার আইন ব্যবসায়ীগণ এদেশী; আদালতের চলিত ভাষা 'তেলেগু'। বিচার কার্য্য তেলেগুতে ইংরেজিতে সম্পন্ন হয়। অন্যান্য কাছারিগুলি, অর্থাৎ কালেক্টরি, মেজিষ্ট্রেরি, মুন্সেফী ও সবজজকোর্টগুলি জজকোর্ট হইতে দূরদূরান্তরে। জজকোর্টের নিকট European Military Barrack। তাহাতে কয়েকজন ইউরোপীয়ান সৈন্য adjutant general সাহেবের অধীনে অবস্থান করিতেছেন। মিলিটেরি ব্যারিকের নিকট সমুদ্র ধারে Light-house আলোক গৃহ সদর্পে মস্তকোত্তলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গৃহটী অতি উচ্চ নয়। সমুদ্রগামী অর্ণব পোত সমস্তের গতিবিধি নির্দ্ধারণ ইহার উদ্দেশ্য। আলোকগৃহের নিকট উচ্চ ভূমিতে নগর রক্ষাকল্পেই একটী বড় কামান পাতা আছে। স্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের স্মরণার্থ বাইজেগ Edward Market নামে একটী বাজার রহিয়াছে, এখানে ভাল২ দ্রব্য সামগ্রী প্রচুররূপে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন টাউনের অন্যভাগে আর একটী বাজার আছে। তথায় নানাবিধ দেশজাত শাকসব্জি ফলাদির বহুল পরিমাণে আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। ওয়ালটেয়ার আপলেণ্ডের দক্ষিণভাগে খোলাজায়গায় একটী ক্ষুদ্র বাজার বসে। এখানে সামান্য দ্রব্যসামগ্রী মৎস্য মিলে। ওয়ালটায়রবাসী নীচ জাতিগণ এখান হইতে নিত্য আহার্য্য ক্রয় করে।

ওয়ালটেয়ারে ও বাইজেগ টাউনে যতগুলি রাস্তা আছে, তন্মধ্যে সমুদ্র তীরবর্ত্তী "বিচরোড" সর্ব্বপ্রধান। ইহা আপলাণ্ড ও সহরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত বিস্তৃত, কঙ্কর ও বালুকা নির্ম্মিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বহু ভদ্রবিশিষ্ট লোক, কেহ পদব্রজে, কেহ ঘোড়ার গাড়ীতে, কেহ মটরে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সে সময়ে দেশী বিদেশী লোকের দেখা সাক্ষাৎ এবং কেহ কেহর সহিত আলাপ পরিচয় হয়। এখানে দাঁড়াইলে ভগবানের অনন্তলীলা হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে সেই পরম পুরুষের যশকীর্ত্তন করিতেছে। পশ্চাতে উচ্চশির পর্ব্বতশ্রেণী প্রশান্তভাবে তাঁহার গুণগান করিতেছে। বিহঙ্গকুল পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে থেকে থেকে ডেকে ডেকে সুমধুরভাবে উড়িয়া যাইতেছে। এবং ভগবানের অনন্ত লীলা হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দিতেছে। সময়২ মেঘশ্রেণী লীলাময়ের লীলা স্মরণ করিয়া বিন্দু২ অশ্রু বরিষণ করিতেছে। উত্তাল তরঙ্গকুল বেগে সিংহ গর্জ্জনে তীরভূমি চুম্বন করিতেছে। সমুদ্রে অর্ণব পোতাবলী, মধ্যে২ মৎস্য জীবীগণের ক্ষুদ্র২ নৌকা পাইলভরে উড্ডীয়মান বিহঙ্গসমূহের ন্যায় সবেগে চলিয়া যাইতেছে। দেখিলে অতি মূঢ়জনের মনও সেই পরম পুরুষের শ্রীপাদপদ্মলোভী না হইয়া পারে না।

এখানকার স্ত্রীলোকগণ বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদিগের মত মাথায় আবরণ (ঘোমটা) দেয় না এবং পর্দ্দানশীন নয়।

সকলেই অনাচ্ছাদিত মস্তকে অবারিতভাবে রাস্তায় বাহির হয়। বঙ্গের বধূ শীর্ষাচ্ছাদিত এবং অন্তঃপুর সীমা নিবদ্ধ। ভারতক্ষেত্রের ভিন্ন২ স্থানে কেন এই বৈষম্য হইল ভগবান জানেন। বোধ হয় মুসলমান প্রাধান্ত কালে স্থানে২ মুসলমান শক্তির প্রাবল্য, অপ্রাবল্য এই বৈষম্যের মূলীভূত কারণ। ইতর শ্রেণীর মেয়েরা বড়ই পরিশ্রমী ও চতুরা। সংসারের প্রায় যাবতীয় কার্য্য ইহারা সম্পাদন করে। হাটবাজার করে, দ্রব্যসামগ্রী বহন করিয়া বাজারে নেয় এবং তথায় খরিদ বিক্রী করে। শুৎ মেয়েরা অন্তের মোটও বহন করে। ইহারা অর্থে সামর্থ্যে সংসারের প্রধান আশ্রয়। পুরুষগণ স্ত্রীলোকদের ন্যায় তত কর্ম্মঠ নয়। সাহেবসুবা বড়২ লোকের খানসামা পাচক মালীর কার্য্য ইহারাই সম্পাদন করে। ইহারা সর্ব্বদাই পাগড়ী পরে এবং আচ্ছাদনশূন্ত শির শ্রদ্ধার যোগ্য বলিয়া মনে করে না।

এখানকার ফল বড় সুস্বাদু; তন্মধ্যে আম, আনারস, সফেদা শ্রেষ্ঠ। আমগুলি পোকাশূন্ত এবং সুমিষ্ট। আনারস সুমধুর এবং মুখরোচক। সফেদা সুস্বাদু। এখানকার প্রধান আহার্য্য চাউল, গম, ময়দা। আতপ চাউল ভিন্ন সিদ্ধ চাউলের ব্যবহার নাই এবং পাওয়া যায় না। খাদ্য মৎস্য সমস্তই সামুদ্রিক। কৈ, মাগুড়, শোল অপর্য্যা। ধীবরেরা অকুতভয়ে ক্ষুদ্র ২ নৌকা বাহিয়া সমুদ্রে যায় এবং ছোট ছোট জাল ফেলে মৎস্য ধরে এবং তাহাই স্ত্রীলোকেরা বাজারে বিক্রী করিয়া থাকে। রাঠা মাছ ভিন্ন অন্যান্ত মাছ তত সুস্বাদু নয়। এখানে শাক সবজির তত অধিক আমদানী রপ্তানী নাই। যাহা কিছু আমদানী হয় তাহা মুখরোচক নয়। ঝিঙ্গা, সজনার ছড়া সুখাদ্য, বেগুণ তিক্ত। ডালের মধ্যে নিত্য ব্যবহার্য্য বুট, অড়হর ও মুগ। খেশারি কি মটর নাই। এখানকার কলা ভাল ও সুমিষ্ট, প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কলা—চিনিচাঁপা ও সভরি ও কাঁচকলা, অন্ত কলা নাই। দোকানে মিষ্ট দ্রব্য কদর্য্য ধূলি ধূসরিত। ভদ্র লোকের অখাদ্য, এখানকার ঘৃত বিশুদ্ধ, ভদ্র লোকেরা ঘরে মিষ্টি তৈয়ারি করিয়া খায়। দধি অতি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকারক। সকলেই মধ্যাহ্ন ভোজনে দধি পান করে। দুগ্ধ বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না, স্বাদ তৃপ্তিকর নয়। দুগ্ধ প্রতি টাকার ছয় সেরের অধিক পাওয়া যায় না। ময়দা আটা ভাল, জলযোগে ব্যবহৃত হয়, জল জীর্ণকারক। সকলকেই প্রাতে অপরাহ্নে কিছু২ জলযোগ করিতে হয়। অধিবাসীবর্গ কি ছোট কি বড় সকলেই সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ। স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে প্রাতঃভ্রমণ এবং সান্ধ্যভ্রমণ অতি প্রয়োজনীয়।

এখানকার দ্রব্য সামগ্রী অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মূল্য। বাই-জেগে বহু দোকানপশার আছে। একটীমাত্র বাঙ্গালী দোকান ভিন্ন সকলই এদেশবাসীর অধিকৃত। বাঙ্গালী দোকানদারটী হুগলী নিবাসী, কয়েক বৎসর যাবৎ দোকান খুলিয়াছেন এবং কাগজ কলম ইত্যাদি নানাবিধ জিনিষের কারবার চালাইতেছেন।

আপলাণ্ড উয়ালটারে "বার্টন" সাহেবের একটী এবং Sea View Hotel নামে আর একটী হোটেল আছে। অভ্যাগত সাহেবদিগের আহারের সুব্যবস্থা এই দুই স্থানে হইয়া থাকে। কটন হোটেলে মটরগাড়ী ভাড়া মিলে। সহরে দেশী লোকদিগের জন্য কয়েক খানা হোটেল রহিয়াছে। তাহা দেশীদের অধিকৃত।

এখানে কোন ঋতুরই তেমন প্রখরতা নাই। সর্ব্বদাই মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে, গ্রীষ্ম কষ্ট একবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শীতকালে একখানি মোটা চাদর জামা ব্যবহার করিলেই চলে। বর্ষণ অধিক নয়। শরৎ হেমন্ত স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর, বসন্তের ত কথাই নাই।

বাইজেগে কয়েকখানি দেবমন্দির আছে; দেবগ্রহ এদেশী কর্ত্তৃক রক্ষিত। ওয়ালটার হইতে ৯।১০ মাইল দূরে সিংহাচল। সেখানে উচ্চ পর্ব্বতোপরি "নৃসিংহ দেবের" মূর্ত্তি। দেবতার নামানুসারে স্থানের নাম হইয়াছে "সিংহাচল"। বহু লোক দেব দর্শন মানসে তথায় গমন করিয়া থাকে। দেব মন্দির সমীপে উপস্থিত হইতে হইলে বহু সোপান উত্তীর্ণ হইতে হয়। বলিষ্ঠ লোকের পক্ষে সহজ সাধ্য, বৃদ্ধ ও রুগ্নের পক্ষে কষ্টপ্রদ। "সিংহাচলম" প্রসিদ্ধ স্থান। দেবতা প্রতিনিয়ত সেবক-দের সেবা পূজা গ্রহণ করিতেছেন। আপলণ্ডে সাহেব-

মের অতি সুন্দর একখানি আরাধনা গৃহ আছে। তদ্রূপ বাইবেক টাউনে রহিয়াছে। কোনটী রোমান ক্যাথলীক, কোনটী প্রটেষ্টেণ্ট।

শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে এখানে একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ নাম Avian College; তৎসংলগ্ন হাই স্কুল। তদ্ভিন্ন জৈন কুল ও লণ্ডন মিসন হাইস্কুল রহিয়াছে। Guru Training স্কুল গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত, সহরের মধ্য ভাগে অবস্থিত। সাহেবদের দুইটী কবর স্থান; একটী পুরাতন, অন্যটী অধুনাতন। শেষোক্ত কবর স্থান বৃক্ষে সমাচ্ছাদিত, নানা আকার বিশিষ্ট কবরে পূর্ণ। দ্বারদেশে ক্ষুদ্র গৃহ, তথায় দ্বারি দ্বার রক্ষা করিতেছে। তদ্রূপ হিন্দু মুসলমানদিগেরও দেহাবসান স্থান আছে।

এখানকার গমনাগমনের (গরিব লোকদিগের জন্য) উপায় "টেণ্ডর"। কোন ২ টী গো বাহিত, কোন ২ টী পনি (Ponny) চালিত। গাড়ীগুলি দ্বিচক্র পালকী গাড়ীর ন্যায় ছোট আকারে নির্ম্মিত স্প্রিং আছে, চলিতে কষ্ট হয় না। সাহেব লোক ও বড় লোকদিগের জন্য "মটর" ও বড় ২ ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা আছে,—কোনটী একাশ্ব কোন কোনটী দ্বি অশ্ব চালিত।

এস্থলে (chilka lake) চিল্কা হ্রদের কিছু সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। যাহারা ভারতের ভূগোলেতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট এই হ্রদ সুপরিচিত। উড়িষ্যা প্রদেশস্থ "খুরদা" রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনের প্রায় মধ্যভাগ সামান্য কিছু দক্ষিণে চিল্কা অবস্থিত। হ্রদটীকে সাগর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক পার হইতে অন্য পার দৃষ্ট হয় না। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মাইল। পশ্চিম ভাগ বঙ্গোপসাগরের সহিত সংযুক্ত। Bengal Nagpur রেল ইহার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণ মুখে চলিয়াছে এবং ওয়ালটারে আসিয়া শেষ হইয়াছে। ওয়ালটার হইতে দক্ষিণ মুখে Madras & Mahratta Railway আরম্ভ হইয়াছে। হ্রদের মধ্যে ছোট ২ পাহাড় জল গর্ভ হইতে মস্তকোত্তলন করিয়াছে। দূর হইতে দেখিতে বড়ই সুন্দর। এই বিল হইতে জাল ফেলিয়া বহু মৎস্য ধরিয়া থাকে। ভগবানের কি অনন্ত শক্তি, অনন্ত কীর্ত্তি! দেখিলে মন প্রাণ বিমুগ্ধ হয়।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ডাক

এবার আমার ডাক পড়েছে
দূরজগতের সেই দেশে,
লক্ষযুগের দুঃখ যেথায়
মুক্তি লভে এক নিমেষে
গন্ধে-গানে চিত্ত যেথায়
নিত্য বাড়ে মুক্ত হাওয়ায়,
সত্য আলোর দীপ্তি মাঝে
মিথ্যা যেথায় যায় ভেসে.
আজকে আমার ডাক পড়েছে
দূরজগতের সেই দেশে।

চল্ মন তোর আপন আলয়ে
প্রবাস-পান্থশালা ছাড়ি,
হাসি-কান্নার বন্ধন টুটি
মহাসমুদ্রে দে রে পাড়ি।
শত জনমের পাপফলে হায়—
বদ্ধ ছিলি যে অন্ধ-কারায়,
এল এতদিনে মুক্তির বাণী—
ছুটি পেলি আজ অবশেষে,
মনরাখা ওই বনের রাখাল
ডাকে তোরে আজ তার দেশে।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

স্বার্থ ও পরার্থ চেষ্টা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

তোমাতে আমাতে যে একটা লড়াই সর্ব্বদাই চলিতেছে, সব সময় আমরা তার খবর রাখি না; কারণ ইহা পরস্পরের পরোক্ষে চলিতেছে; কিন্তু লড়াই একটা নিঃসন্দেহ চলিতেছে। তুমি চাও ধনবান্, বলবান্, যশস্বী হইতে; আমিও চাই। তুমি চাও বড় চাকরীটা নিতে, তার জন্য কত সুপারিশ যোগাড় কর, কত লোকের কটু কথা শোন, কতজনের নিন্দা কর, কত মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কত সত্য-অসত্যের কত ছলা-কলার আশ্রয় নেও; এই হইল তোমার সমরের সরঞ্জাম। কিন্তু এ সমস্তই তুমি আমার পরোক্ষে প্রয়োগ করিতেছ। আমিও বাঁচিবার জন্য, ভাতের জন্য,—কিম্বা বড় হইবার জন্য, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, ঐ একই চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। তোমার আমার উভয়ের যা হবার নয়, উভয়েই যখন তা চাই, তখন লড়াই ছাড়া উপায় কি? কিন্তু তথাপি তোমাতে আমাতে মুখোমুখি কদাচিৎ হয়। যখন হয়, তখনই হিংসার সুপ্ত বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। তখনই তুমি আমার প্রকাশ্য শত্রু। লড়াইয়ে জয় পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল এখানেও হয়; এখানেও যে বিজেতা সমাজ তাহাকেই নির্ব্বাচন করিয়া নেয়, এবং তাহারই উন্নতি ও বৃদ্ধির সুবিধা হয়; পরাজিতের ক্ষয়—এমন কি অস্তিত্বে লয়, নিশ্চিত।

সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, সব সমাজেরই একটা বিশিষ্ট চরিত্র থাকে—সব সমাজই এক একটা বিশিষ্ট ধরণের লোক গঠন করিয়া তুলে। ইহা একটি নির্ব্বাচন ভিন্ন আর কিছু নয়।

সৃষ্টির-বিধানে কাজেই আমরা দেখিতে পাই যে

যুদ্ধই জীবনের রীতি; যুদ্ধ করিবে, যুদ্ধে জিতিবে, তবে ত বাঁচিবে। সুতরাং যুঁই গাছটীকে যে আমরা লালন করিয়া তুলিতেছি, পোষা বিড়ালটীকে যে আমরা আহার ও আবাসের স্বাচ্ছন্দ্য দিতেছি, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে। ইহাদের উচিত ছিল পারিপার্শ্বিক শক্তি-নিচয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সেই লড়াইয়ে জয় লাভ করিয়া তার জীবন-ধারণ করা। কিন্তু মানুষের-রুচি, তার করুণা, তার স্নেহ এই ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছে; প্রকৃতিতে কোথাও দুর্ব্বলের প্রতি অনুকম্পা নাই, কোথাও পরের জন্য অশ্রুপাত নাই।

কিন্তু মানুষ যে কেবল তাহার উদ্যান ও তাহার জন্তুপোষণের বেলায়ই প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাইতেছে, এমন নয়। তার নিজের সমগ্র চরিত্র-নীতি প্রকৃতির ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে। মানুষ যে নীতির দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করে—যে পদ্ধতিতে ভাল-মন্দ নিরূপণ করে, তাতে অনুকম্পা, পরোপকার, অহিংসা স্বার্থত্যাগ, পরম ধর্ম্ম; কিন্তু প্রকৃতিতে নিষ্ঠুরতা, পরহিংসা, স্বার্থানুসরণই চির-বিহিত নিয়ম। প্রকৃতি বলে, 'নিষ্ঠুর হও, নইলে মরিবে'; মানুষের নীতি বলে, 'দয়া পরমধর্ম্ম'; প্রকৃতি বলে 'দ্বিষো জহি'—শত্রুকে বিনাশ কর; মানুষের নীতি বলে 'ক্ষমা মহৎ গুণ'। মানুষের নীতি বলে 'পরের জন্য দেহ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করা, ধর্ম্মের অনুমোদিত, 'পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ'; নাগানন্দ সর্পকুলের উদ্ধারের জন্য নিজের দেহ পক্ষিরাজকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন; পৃথিবী মাথা পাতিয়া তার চরণধূলি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি হাসিয়া বলে 'এর চেয়ে বেকুবি আর নাই; পশুকে, উদ্ভিদকে বিনাশ করিবে, তার দ্বারা নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে,—তাতেই তোমার ঋদ্ধি, তাতেই তোমার বৃদ্ধি।' মানুষের নীতি বলে কাহারও অনিষ্ট করিও না, শত্রুরও হিতচিন্তা করিও; সকল অত্যাচার, অবিচার ধীরভাবে সহ্য করিও, ডানগালে চড় দিলে বামগাল পাতিয়া দিও,' প্রকৃতি হাসিয়া বলে 'তাতেই তোমার মৃত্যু; বাঁচিতে চাও ত অন্য পন্থা ধর।'

মানুষ যেখানে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে, যেখানে নিজেকে প্রকৃতির চেয়ে বড় মনে করে, যেখানে জ্ঞানের দম্ভ তাহার দৃষ্টির সম্মুখে এক নূতন রাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, সেই খানেই নীতিজ্ঞানী মানুষ মনে করে তাহার আবিষ্কৃত ধর্ম্মের পন্থা প্রকৃতির নির্দ্দেশের চেয়ে বড়; এমন কি মানুষ এই পর্য্যন্ত মনে করিয়াছে যে প্রকৃতির আপাত দৃশ্য দ্বন্দ্ব-কলহের ভিতরেও এক গূঢ় নৈতিক অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; প্রকৃতিও ভিতরে২ এক ধর্ম্মের শাসনে শাসিত হইয়া কোন্ এক দূর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চলিয়াছে। কিন্তু তথাপি মানুষ যাহাকে ধর্ম্ম বলে, যাহাকে ভাল মনে করিতে শিখিয়াছে, প্রকৃতির বিরুদ্ধ-প্রেরণায় প্রায়ই তাহা অনুসরণ করিতে পারে না। পরের জন্য সর্ব্বস্বান্ত ক'জন হয়? পরের জন্য দেহপাত ক'জন করে? পরের স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা করিয়া দিয়া ক'জন নিজে কষ্ট স্বীকার করে? কোন্ জাতি কবে নিজের অধিকার খর্ব্ব করিয়া অন্য জাতির সুবিধা করিয়া দিয়াছে? বরং, মানুষের সমগ্র ইতিহাসের সাক্ষ্য তার বিপরীত। গ্রীসের কোন্ উপকার করিবার জন্য রোম তাকে বিজিত ও অধিকৃত করিয়াছিল? আমরা হয় ত খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি যে ইহার ফলে আমাদের অর্থাৎ বর্ত্তমান পৃথিবীর কিছু লাভই হইয়াছে। কিন্তু নিজের ছাড়া আর কোনও লাভের জন্য রোম্ গ্রীসের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে রক্তপাত করে নাই। আর গ্রীসও যখন বর্ব্বর এসিয়াবাসীদিগকে সমরে পরাজিত করিয়াছিল, তখন নীতির কোন্ ধারা অনুসরণ করিয়াছিল? মধ্য ইউরোপের বর্ব্বর জাতি যখন রোমের বিস্তৃত সাম্রাজ্য চুরমার করিয়া দিতেছিল, তখন কোন্ নীতির প্রেরণা তার অন্তরে জাগিতেছিল? এখন হয় ত নীতির দোহাই কিছু প্রবল হইয়াছে; আগে যে দিগ্বিজয়ে বাহির হইত সে স্পষ্ট বলিত 'জয় করিতেই আমি বাহির হইয়াছি, কাহারও উপকার করা আমার অভিপ্রেত নহে'; এখন সেখানে সেই একই কাজ যিনি করেন তিনি জগতের সামনে সাফাই গাহিয়া বলেন বিজিতের ভালর জন্যেই আমার এই চেষ্টা; আমার অধীনে সে থাকিবে ভাল।' কিন্তু মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, ভিতরে যে প্রকৃতির সনাতন প্রেরণা রহিয়াছে তাহা গোপন করিয়া লাভ

কি? প্রকৃতি জানে, বিজিগীষার বীজ সে-ই চিরকালের জন্য জীবের হৃদয়ে বপন করিয়া রাখিয়াছে; প্রকৃতি জানে, জিঘাংসাতেই প্রাণীর ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি। প্রকৃতির প্রেরণা যেখানে প্রবলতর, সেখানে কেহই কাহারও জন্য কিছু করে না; সকলেই নিজেকে নিয়াই ব্যস্ত।

এই সমস্ত কথা ভাবিয়াই বোধ হয় জর্ম্মাণ-দার্শনিক নীটচে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে মানুষের নীতিশাস্ত্রটাই আগাগোড়া একটা প্রকাণ্ড ভুল। হাজার হাজার বছর ধরিয়া মানুষ যে ভালমন্দ বিচারের একটা প্রণালী ধরিয়া আসিয়াছে, কতকগুলি কাজকে সে ভাল আর কতকগুলিকে যে মন্দ বলিতে শিখিয়াছে, তাহা সমস্তই স্বভাবের শিক্ষার বিরুদ্ধে, এবং সমস্তই তার বর্দ্ধিষ্ণু বলহীনতার নিদর্শন। ইউরোপের মানবমণ্ডলী যে ডান গালে চড় দিলে বাম গালও ফিরাইয়া দেওয়া পরম ধর্ম্ম বলিয়া শিখিয়াছে, ত্যাগ ও বিনয়কে বড় করিয়া দেখা কর্ত্তব্য মনে করে, তার জন্য একটা পতিত, বিনাশোন্মুখ জাতি দায়ী। নিপীড়িত, দেশভ্রষ্ট, রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যতিব্যস্ত, পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী ইহুদী জাতি হইতেই এই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। তিন জন ইহুদী ও এক জন ইহুদী রমণী এই অধঃপতনের প্রধান কারণ। যীশুর মাতা মেরী, সূতপুত্র যীশু স্বয়ং, ধীবর পুত্র যীশুর শিষ্য, পীটর, এবং তাঁতির ছেলে যীশুর অন্যতম শিষ্য পল্—এই কয়জন হইতেই নীট্‌চের মতে মানব জাতির অধঃপাত আরম্ভ হইয়াছে; এই কয়জনের শিক্ষা হইতেই মানুষ এক তথাকথিত, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহুদীদের তাহা নীতি হইতে পারে; পতিত, নির্জ্জীব, রণে অপটু জাতিকে বাঁচিতে হইলে বলবত্তর জাতির পদলেহন করিতেই হইবে। ইহুদীদিগকেও তাহা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তারা দায়ে পড়িয়া এইরূপ করিতেছে এ ভাব কখনও দেখায় নাই। এক সময়ে তারাও বড় ছিল, এক সময়ে তাদেরও রাজত্ব ছিল, তারাও পরের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিল; কাজেই বড়র যে একটা দম্ভ সেটা তাদের পূর্ণমাত্রায়ই ছিল। রোমকদের পদানত হইয়া তাহাদিগকে যে উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সেটাকে সেই জন্যই তারা অত্যন্ত দর্পের সহিত ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতে লাগিল। ক্রমে বিজিত ইহুদী জাতি বলবত্তর বিজেতাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিল; ইহারাও মনে করিতে লাগিল, 'ইহুদীরা যে নম্রতা, যে বশ্যতা, যে সহিষ্ণুতা, যে ত্যাগ দেখাইয়াছে, তাহাই পরম ধর্ম্ম।' সেই হইতেই মানুষের প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ এক নূতন ধর্ম্মজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। অবশ্যই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে ইহুদী জাতি হইতে এই নীতির জন্ম হইয়াছে, তা নয়। কিন্তু সর্ব্বত্রই একটা না একটা বিজিত জাতি ছিল; এবং বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাকেও ঐ নীতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিজেতার বিরুদ্ধে বিজিতের প্রতিহিংসা কখনও আসে নাই; বিজিত চিরকালই চাহিয়াছে বিজেতাকে পরাভূত করিতে, নইলে অন্ততঃ নিজের মত করিয়া ছাড়িতে। বন্দী কখনও নিজের প্রভুর বশ্যতা প্রাণের সহিত স্বীকার করে না। কিন্তু শত চেষ্টায়ও যখন নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না তখন সে ভাবিতে শিখে 'Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of—heaven'—দরিদ্রেরাই ধন্য কারণ তাহাদেরই জন্য স্বর্গের রাজ্য। 'সূঁচের ভিতর দিয়া একটা উট চালাইয়া দেওয়া বরং সম্ভব তথাপি ধনবানের স্বর্গলাভ সম্ভব নয়।' বিজিত, পদদলিত জাতি মনে করিতে শিখে 'আমাকে যে বিশ্বশক্তি এ ভাবে রাখিয়াছেন সে কেবল আমার ভবিষ্যত ভালরই জন্য।' এইরূপে সে বাঁচিয়া থাকিবার একটা নূতন কারণ খুঁজিয়া পায়,—এইরূপে একটা নূতন উৎসাহ, নূতন স্পর্দ্ধা তাকে উদ্দীপিত করিয়া তুলে। সে ক্রমে ভাবিতে আরম্ভ করে, 'আমিই—ত' বড়;—'He chasteneth whom he loveth' ভগবান্ যাকে ভালবাসেন তাকেই কষ্ট দেন, কারণ কষ্টে তার পরীক্ষা।' এই যে নূতন উদ্দীপনা—নূতন তেজ পরাজিতের প্রাণে জাগিয়া উঠে সেটার মূলে সুপ্ত প্রতিহিংসা বহ্নি ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু এই উদ্দীপনা সংক্রামক। বিজেতাকেও ইহার তেজ অধিকার করিয়া ফেলে। ক্রমে বিজেতাও মনে করিতে আরম্ভ করে, পরাজিত যাকে ধর্ম্ম বলে, যাকে মহত্তর কার্য্য বলে,

সেটাই মানুষের কর্ত্তব্য; মানুষমাত্রেরই নীতি। নীটচে মনে করেন, এই করিয়াই মানুষের চারিত্র-নীতি বলিয়া যে একটা শাস্ত্র আছে তা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা একান্তই প্রকৃতি বিরুদ্ধ। প্রকৃতিতে কোথাও একথা বলে নাই যে অহিংসা, শত্রুকেও ভালবাসা প্রভৃতি পরম ধর্ম্ম। এবং এরূপ ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া যারা বিপথ-গামী হয়, প্রকৃতির বিধানে তাদের শাস্তি প্রাণ-দণ্ড।

কিন্তু নীটচে যাহা বলিয়াছেন, সমস্ত মানব মণ্ডলী তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। মানুষ জানে যে ক্ষমা জিঘাংসার চেয়ে বড়, পরোপকার, পরের জন্য স্বার্থত্যাগ একটা ধর্ম্ম; মানুষ বিশ্বাস না করিয়া পারে না যে সত্যের অনুসরণে বিপদও শ্রেয়ঃ, এবং ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া পরম পুণ্য। মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে না যে ধৈর্য্য একটা বুজরুকি, কিম্বা বিনয় ও শান্তিপ্রিয়তা একটা কাপুরুষতার লক্ষণ। ধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকে অধর্ম্ম মনে না করিয়া মানুষ পারে না। এটা মনে করা সহজ নয় যে ধার্ম্মিকতা ভীরুতারই রূপান্তর মাত্র; ধর্ম্মের তেজে মানুষ যে কি করিতে পারে, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

তথাপি, দার্শনিকের বিপদ ঘুচে নাই। মানিলাম আমাদের একটা স্পষ্ট, অবিসংবাদিত জ্ঞান আছে যা দ্বারা আমরা কতকগুলি প্রবৃত্তিকে ভাল, আর কতকগুলিকে মন্দ মনে করি। কিন্তু বহির্জগতের শিক্ষা যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত, ক্রমবিকাশ শাস্ত্র তা আবিষ্কার করিয়াছে। যদি অহিংসাই পরম ধর্ম্ম হয়, তবে জগতে এই হিংসার লীলা কেন? যদি পরোপকারই পরম পুণ্য হয় তবে প্রকৃতির প্রবল প্রেরণা স্বার্থের দিকে কেন? পূর্ব্বে, এ প্রশ্নের উত্তর ছিল, ভগবান মানুষকে এই পৃথিবীতে গড়িয়া নিতে চান, সহস্র বিপরীত প্রেরণা, সহস্র প্রলোভনের ভিতর দিয়া তার চিত্তবৃত্তিকে ধর্ম্মপ্রবণ করিয়া নিতে চান, ঐহিক জীবন মানুষের শিক্ষাগার। কিন্তু এখন আর এ কথা বলিলে চলে না। কারণ, ক্রম-বিকাশ জানে যে, মানুষ যে তার বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, সে অহিংসার ফলে নয়, সে জীবে দয়ার ফলে নয়; কঠোর বিভৎস রণ করিয়া উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎকে জয় করিয়া তবেত মানুষ তার রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে। এখনও যে মানুষ বাচিতে চায় তার ঐপ্রকার রণ করিতেই হইবে। বাঁচিলে পরে ত ধর্ম্মের উন্নতি। সুতরাং মানুষের এই নীতির জ্ঞানের অর্থ কি তার এই ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকের গূঢ় উদ্দেশ্য কি?

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে ক্রমবিকাশ শাস্ত্রের যে আবিষ্কার তাতেই একটা মস্ত প্রমাদ রহিয়াছে। জীব কেবলই আপন জীবনের জন্য লড়াই করে না; অতি নিম্ন স্তরেও পরার্থে ত্যাগের প্রচুর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; কেবল তাই নয়; শুধু আপনাকে লইয়া বিব্রত থাকিলে কেহই বাস্তবিক বাঁচিতেও পারে না। আত্মরক্ষার জন্যেও পরপ্রিয়তা আবশ্যক। বিবর্ত্তন বাদ এই সত্যকে না ধরিয়া একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছে। মাতৃত্ব বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, তাহাকে বাদ দিলে জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয় না। কিন্তু মা যে সন্তানকে ভালবাসে —সন্তানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, সে ত স্বার্থ নহে। এমনও অনেক জীব আছে, যেখানে মা সন্তান প্রসব করিবার বেলায়ই পঞ্চত্ব লাভ করিবে। সেখানেও ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য জীবনোপায়-সংগ্রহ মা করিয়া থাকে। সন্তানের জন্য মা লড়াই করে, প্রাণ-পাত করে; সুতরাং লড়াই যে কেবল নিজের জন্যই হয় এমন নয়। লড়াই যদি আদৌ হয়ই, তবে সে নিজের জন্য যেমন হয়, পরের জন্যও তেমনই হইয়া থাকে। জন্ম মাত্রেই শিশু প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে সমর করিতে পারে না। তাকে প্রথমতঃ অন্যে রক্ষা করে— তার জন্য লড়াই অন্যে করিয়া থাকে। প্রত্যেক জাতি জীবের মধ্যেই কম বেশী এই নিয়ম। অতি নিম্ন জাতির মধ্যে মা-ই এই ক্ষেত্রে সন্তানের পক্ষে একমাত্র যুদ্ধ করে; কিন্তু অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতিদের মধ্যে পিতাও সন্তানের পক্ষে যোদ্ধা। এইরূপে পরার্থে চেষ্টা ও বিবে-চনার একটা প্রণালী। সুতরাং স্বার্থত্যাগ প্রকৃতির-বিরুদ্ধ নয়। কেহ ফাঁকি দিয়া আমাদের মনে এ বিশ্বাস ঢুকাইয়া দেয় নাই। মানুষ জগতের শ্রেষ্ঠ জীব; একটী মানব শিশুকে বর্দ্ধিত করিয়া লইতে বহুশক্তির যুগপৎ ক্রিয়া আবশ্যক। পিতৃত্বে ও মাতৃত্বে মানুষ প্রথম

ত্যাগ ও পরার্থে যত্ন শিক্ষা করে। সমাজের উৎপত্তি তার অর্থ, পারিপার্শ্বিক শক্তিনিচয় হইতে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ ক্রমে সমবেত চেষ্টার আবশ্যকতা বোধ করে। সমাজ রক্ষিত না হইলে কেহই আত্মরক্ষা করিতে পারে না; সুতরাং আত্মরক্ষা করিতে হইলে এ সমাজকে অর্থাৎ পরকে রক্ষা করিতেই হইবে। এই হইতেই আমাদের সর্ব্ববিধ পরার্থ চেষ্টার উৎপত্তি। পরার্থ-চেষ্টা সুতরাং আমাদের জীবনের ধারার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত। মানুষের সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকের মূলে ঐ পরার্থ চেষ্টা রহিয়াছে। আমাদের নীতি-বুদ্ধি কাজেই জগতের সৃষ্টিবিধানেরই অন্তর্ভুক্ত;—তা বিরুদ্ধ নয়।

তা ছাড়া, মানুষ ত ক্রমবিকাশের চরম ফল। যেমন করিয়াই হউক, তার মনে যখনই এই ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেক ঢুকিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে ইহাও ঐ ক্রমবিকাশেরই ফল। ইহাকে একটা ফাঁকি মনে করা চলে না। ইহার মূল্য আছে, আবশ্যকতা আছে, তা না হইলে ইহা আসিল কেন? যদি এমন দেখিতাম যে মানুষের সমাজে যে ধার্ম্মিক তারই ক্ষয় হয়, আর অধার্ম্মিকই জয় লাভ করে, আপাততঃ নয়, অন্তিমে জয় লাভ করে, তা হইলেও না হয় মনে করিতাম মানুষের পক্ষে ধর্ম্ম অনুসরণ না করাই শ্রেয়। কিন্তু আমরা জানি "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়।"

এমনও যদি হয় যে নিম্নজাতীয় জীবে কুত্রাপিও বাস্তবিক পরার্থ চেষ্টা নাই, তথাপি ক্রমবিকাশের শেষ ফল মানুষের মনে যখন ইহা আসিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে এইখান হইতেই নিম্ন জীবের সহিত মানুষের সম্পর্ক চ্ছেদ হইল এইখান হইতেই মানুষের ঊর্দ্ধগতি আরম্ভ হইল, মানুষেতে এক নূতন জীবের আবির্ভাব হইল।

এই যুক্তিতে বাস্তবিক সমস্যার একান্ত সমাধান হইল কি না বিবেচ্য। এ ইতর জীবের কথা না ধরিলেও মানুষের সমাজেই একটা উদ্ভট সত্য রহিয়াছে যে পাপীরও উন্নতি হয়; এমন কি অনেক স্থলে, অনেক কার্য্যে একমাত্র নীতির বিরুদ্ধে যে চলে তারই ফললাভ ঘটে। আর পাপীত সর্ব্বদাই শাস্তিও পায় না। পরকে ঠকাইয়া, পরের সর্ব্বনাশ করিয়া, চিরকাল ছলে বলে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া ধনী সুখে জীবন কাটাইল এবং অন্তিমে কাশীলাভ করিল। কোথায় তাহার শাস্তি? কোথায় তাহার ক্ষয়? হয় ত বা তার মনে অশান্তি ছিল; এরূপও বলা যায় না; কারণ এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যেখানে অধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া মানুষ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না। পরলোকে তার বিচার হইবে, বলিলে অতি ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়; কারণ, এজগৎ যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরলোকও ত তাঁরই সৃষ্টি; পরলোকের জন্য স্বতন্ত্রবিধান রহিয়াছে তার প্রমাণ কি? তথাপি মানুষের প্রবল বিশ্বাস। এ কথা কিন্তু ঠিক যে, যে অত্যাচরিত, যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত যে দুঃখী, সুখের চেষ্টায় যে পরাস্ত, তার ঐ ছাড়া আর আশ্বাস নাই, এ বিশ্বাস হারাইলে তার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে, জীবন অসহ্য হইয়া উঠিবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ত্যাগী মহারাজ*

ওগো রাজঋষি অনঘ মনীষী
জয় হোক তব হে মহামতি,
পুন দেহ ধরে এ মহী মাঝারে
এসেছ কি ফিরে বিদেহ পতি ?
তব একাবলী বক্ষোমালায়
অক্ষের বীজরাজি শোভা পায়,
হেরি তব সুধী রাজ বেশ ভেদি
জাগে নিরবধি গেরুয়া জ্যোতি ॥
তেজঃ পিঙ্গল তপো জটা জাল
মণি উষ্ণীষে গোপনে ঢাকা,
তব কাঞ্চন তনুটি উজলি
বিষয় বিরাগ বিভূতি মাখা।
তোমার প্রাসাদে গৌরীর সাথে
যক্ষেরা সব পূজে ভোলানাথে
জালিয়া, কমলা হেমদীপমালা
করে ভারতীর সন্ধ্যারতি ॥

শ্রীকালিদাস রায়।

পুস্তক-পরিচয়

সন্ধ্যার্ঘ্য—শ্রীযুক্ত প্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা ১৪নং জগন্নাথ দত্তর ষ্ট্রীট হইতে সুবোধ পাবলিশিং সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৯২ পৃষ্ঠা। ছাপা কাগজ মন্দ নহে।

সুকবি শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের কর-কমলে উৎসর্গিত।

ইহা একখানি গল্প-গ্রন্থ। ইহাতে দশটি গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা মাসিক সাহিত্যের খোঁজ খবর রাখেন তাঁহাদের নিকট প্রিয়কান্ত বাবুর নাম নিতান্ত অপরিচিত নহে। তিনি ইতঃপূর্ব্বে 'দীপালী' নামক গল্প-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন; এ পুস্তকেও তাঁহার যশঃ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সহজ ও সরল ভাষায় মানব জীবনের বৈচিত্র্য প্রকাশ করাই যদি গল্পের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে প্রিয়কান্ত বাবুর গল্পগুলি সে আদর্শের অবমাননা করে নাই। তাঁহার ভাষাও গল্পের উপযোগী ঋজু ও মধুর। এই গ্রন্থকারের তুলিতে হাস্য-কৌতুক অপেক্ষা দুঃখ ও দৈন্যের ছবিই যেন অধিকতর সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠে। ফুলের দাম, প্রাপ্তি ও হিসাবের খাতা নামক গল্পত্রয় বড়ই প্রাণস্পর্শী। "কেষ্টলালের বক্তৃতায়" লেখক যেরূপ হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা সেরূপ রুচির পক্ষপাতী নহি।

মধুব্রত।

* ত্যাগবীর মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের অভিনন্দন সঙ্গীত।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ঢাকায় যেবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়, সেবার কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"ঢাকায় দর্শনীয় জিনিষ তিনটী, প্রথমে মা ঢাকেশ্বরী; তারপর কালীপ্রসন্ন বাবু ও দীননাথ বাবু।" সে সময়ে আমাদের কোনও বিশিষ্ট বন্ধু, যিনি সমিতির স্বেচ্ছা সেবক ছিলেন তাঁহার নিকট এ গল্পটি শুনিয়াছিলাম। দেবী ঢাকেশ্বরী ঢাকায় পালয়িত্রীরূপে অনন্ত কাল বিরাজমান থাকিবেন; কিন্তু তাঁহার যাঁহারা গৌরব ছিল সেই দুই আদরের সন্তান তাঁহারি চরণতলে মাথা রাখিয়া কালের কোলে পা ঢালিয়া দিয়াছেন।

সংসারে প্রত্যহ জন্ম ও মৃত্যু ঘটিতেছে। কতজন জন্মিতেছে, কতজন মরিতেছে কে তাহার সন্ধান রাখে? কিন্তু একটা বৈশিষ্ট লইয়া শুভগ্রহে, শুভক্ষণে যে মানব শিশু জন্ম গ্রহণ করে তাহার জন্মক্ষণও যেমন কি জানি কেমন এক আশ্চর্য্য ভাবে অসাধারণত্ব প্রকাশ করে,

তেমনি তাঁহার মৃত্যুও শত সহস্র লোকের প্রাণের তারে একটা বিষাদরাগিণী বাজাইয়া দিয়া কালের বুকে চিরস্থায়ী ছাপ আঁকিয়া যায়, তাঁহারা মরিয়াও মরেন না। এরূপ লোকের কথা জানিতে বা শুনিতে মানব মাত্রেরই চিত্ত ব্যাকুলিত হয়। আমাদের কালীপ্রসন্ন শেষোক্ত শ্রেণীর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। আজ প্রায় দশ বৎসর হইতে চলিল তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দেহ চিতাভস্মে মিশাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি বাঙ্গালী ভুলিতে পারে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন সাহিত্য সংস্কারক কালীপ্রসন্নের নাম চির জাগরূক থাকিবে।

আমি নিজে কালীপ্রসন্নের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ; বড়লোক দেখিবার সাধ যেমন বালক মাত্রেরই থাকে, তাহার চলনভঙ্গী, গতিভঙ্গী, বাক্য-কথনভঙ্গী, শিশুর প্রাণ উৎসুক-নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে চাহে, আমরাও দুই একদিন কালীপ্রসন্নকে যাহা দেখিয়াছি তাহা ঠিক্ ঐরূপ ভাবেই দেখিয়াছি। কোন দিন বা বন্ধুজন সমভিব্যাহারে সহাস্য মুখে সান্ধ্যভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি, কোন দিন বা কচিৎ কোন সভায় বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি, তাহাও ঠিক্ স্মরণ করিয়া বলিবার মত কিছুই নহে, কাজেই ব্যক্তিগত হিসাবে আমি তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিতে পারিব না। সে বিষয়ে তাঁহার সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল, অন্তরঙ্গ ভাবে মিলিতেন ও মিশিতেন তাহারাই অনেক কথা বলিতে পারেন। সে কাহিনী সাধারণের তৃপ্তিপ্রদও হইবে ; কারণ "ক্ষণজন্মা পুরুষদিগের ঘরের কথা জানিবার জন্য মনে স্বভাবতঃই এক বিষম কৌতূহল উপস্থিত হয়। তাঁহারা ছোট বেলায় কিরূপে খেলা করিয়া বেড়াইতেন ; তাঁহারা যৌবনকালে প্রবৃত্তির তরঙ্গে কিরূপ হাবুডুবু খাইতেন, তাঁহারা পরিপক্ক প্রৌঢ় দশায় উপনীত হইয়া, সমাজের অভিনয় ভূমিতে কিরূপে কার্য্য করিতেন এবং যবনিকার অন্তরালেই বা কিরূপে অবস্থিত থাকিতেন, এই সমস্ত কথা বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সবিশেষরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।" আমিও এই মহাজনের উক্তি অনুযায়ী তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। বেশী বলিবার শক্তি আমার নাই, তারপর সে কথা বিস্তারিত ভাবে শুনাইবার স্থানও ইহা নহে। কালীপ্রসন্ন বাবু যখন পরলোকগমন করেন, তখন আমি কলিকাতা থাকিতাম, একদিন প্রত্যুষে খবরের কাগজের টেলীগ্রামে আমরা এ শোক সংবাদটি পাঠ করি। ঢাকাতে কিরূপ হইয়াছিল জানিনা, কিন্তু কলিকাতা সহরে সাহিত্য সেবকগণের মধ্যে একটা রীতিমত শোকের তরঙ্গ ছুটিয়াছিল। ট্রামে, পথে, ঘাটে যখনই যে কোন সাহিত্য সেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তখনি তাঁহার মুখে হাহাকার ধ্বনি শুনিয়াছিলাম। মাসিকের সম্পাদকগণ তাঁহার জীবনী ছাপিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, কাহারও হয়ত শেষ কথা ছাপা হইতেছে, তবুও এই নক্ষত্র পাতের জন্য কাগজ পিছাইয়া দিয়া সচিত্র জীবনী প্রকাশ করিলেন। 'নব্যভারত' সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে আমি উক্ত কাগজের জন্য তাঁহার কথা লিখিয়াছিলাম। সে পুরাণ 'নব্যভারতের' সংখ্যা খানা হারাইয়া ফেলিয়াছি, নচেৎ তাহা হইতে কিছু না কিছু উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। স্বর্গীয় প্রিয়তম সুহৃদ ইন্দুপ্রকাশ,তাঁহার মৃত্যুতে প্রাণ ঢালিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধ 'প্রবাসীতে' ছাপা হইয়াছিল। কলিকাতার সাহিত্য পরিষদ তাঁহার শোক-সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে সে সভার অধিবেশন হইয়াছিল ; পূজ্যপাদ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি অনেকেই সে সভায় বক্তৃতা করেন ; পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের বহু শিক্ষিত সম্প্রদায় সে সভায় উপস্থিত হইয়া মৃত মহাত্মার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে সভায় আমিও কিছু বলিয়াছিলাম ; ঠিক্ সেই কথা যতদূর আমার স্মরণ আছে, তাহা হইতেই আমার এ প্রবন্ধ আরম্ভ করিলাম।

"কালীপ্রসন্ন গিয়াছেন, প্রকৃতির যাহা বিধান তাহাই ঘটিয়াছে, মৃত্যু যখন অনিবার্য্য তখন সে জন্য বিশেষ করিয়া হা হুতাশ করিয়া আমাদের কি লাভ? কেহ

অকালে মরে, কেহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মরে, কেহবা বৃদ্ধ বয়সে পরলোক গমন করে, যাহারা বৃদ্ধ বয়সে সংসারের নানাদিক দেখিয়া শুনিয়া মৃত্যুর শীতল কোলে অঙ্গ এলাইয়া দেন, তাহাদের জন্য দুঃখ করিবার কিছুই থাকে না। কালীপ্রসন্ন তাঁহার জীবনকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায়! আরও কিছুকাল থাকিয়া গেলেন না কেন? হে পশ্চিমবঙ্গবাসি বন্ধুগণ, আপনারা আমাদের এ বেদনা বুঝিবেন না, পিতা বর্ত্তমানে পুত্র যেমন সংসারের কোন ঝড়ঝঞ্ঝাকেই ভয় করেনা, তাহার অঙ্গে সামান্য একটু আঘাতও লাগে না, কিন্তু যখন পিতার অভাব হয় তখন তাহার কাছে দশদিক্ শূন্য বোধ হয়, সংসারের ভীষণত্ব সে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে; আমাদেরও সেই দশা; যতদিন কালীপ্রসন্ন ছিলেন ততদিন আমাদের গৌরব-গর্ব্ব ছিল, আমরা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে পারিতাম, কিন্তু আজ অসহায় পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যসেবকগণ কাহার গর্ব্বে গৌরব অনুভব করিবে? কে তাহাদিগকে আশা ও উৎসাহের বাণী শুনাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করিবে? হে কালীপ্রসন্ন! তোমার সঙ্গে সঙ্গেই যে আমাদের বড় সাধের আশার মন্দির চূর্ণ হইয়া গেল।" দশবৎসর আগে প্রাণের গভীর আবেগে যে কথা বলিয়াছিলাম, আজ তাহারি পুনরুক্তি করিতেছি। কই দশবৎসর চলিয়া গিয়াছে সাহিত্যের সিংহাসন ত পূর্ণ হইল না, মানুষের মত মানুষ, নির্ভীক বিচারবান, ধীর স্থির, সুপণ্ডিত আর কাহাকেও ত দেখিলাম না। কে জানে কোনকালে আবার এরূপ একজন মানুষের মত মানুষ জন্মাইবে কি না। মানুষ আশার দাস, আমরা সে আশা বুকে লইয়াই বাঁচিয়া আছি। সে আশা কোনকালে সফল হইবে কি?

এখানে কালীপ্রসন্নের জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে ১২৫০ সনের শ্রাবণ মাসে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺শিবনাথ ঘোষ। ইঁহারা উচ্চ বংশীয় কুলীন কায়স্থ,—পদ্মনাভের সন্তান বলিয়া বিক্রমপুরে সুপরিচিত।

পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। সেকালে মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা নিষ্পন্ন হইত, কালীপ্রসন্ন কিছুদিন মক্তবে অধ্যয়ন করেন। মুন্সীদের কাছে ফারসী ও কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামক একজন শাস্ত্র-ব্যবসায়ীর কাছে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে বরিশাল লইয়া যান, সেখানে পিতার অনুমতি ক্রমে বরিশালের ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। বরিশাল বেশী দিন ছিলেন না, সেখান হইতে ঢাকা আইসেন, এবং ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হন, কিন্তু নানা প্রতিকূল কারণে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তিনি ইংরেজী শিক্ষার কেন্দ্রস্থল কলিকাতা গমন করিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স পনর বৎসর। কলিকাতা গিয়া তিনি কোন স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন না। নিজের মনের মত বই বাছিয়া বাছিয়া কিনিয়া ঘরে বসিয়া পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি রোজ সতের ঘণ্টা পড়িতেন। তাঁহার অধ্যয়ন প্রণালী অতি সুন্দর ছিল। বইখানা ছোট একখানা কাষ্ঠাসনের উপর রাখিয়া প্রথমে ভক্তিভরে তৎসম্মুখে প্রণাম করিবেন। পরে তাহা উজ্জল দীপালোক-সাহায্যে এই আসনের উপরেই রাখিয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন। বইখানা একবার শেষ হইলে, তাহাই উপর্য্যুপরি আরো তিন চারিবার, কখন কখন তার চেয়েও বেশীবার পড়িতেন। প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার পড়িবার সময়ে পুস্তকের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্যারাগ্রাফ বা পংক্তির ধারে অতি সূক্ষ্মাগ্র পেন্সিল দ্বারা চিহ্ন করিতেন, পরে তৃতীয় বা চতুর্থবার অধ্যয়ন করিয়া সেই চিহ্নগুলি অতি যত্নে মুছিয়া ফেলিতেন। তিনি বই কদর্য্য করা ভালবাসিতেন না।

দীর্ঘকাল কলিকাতায় থাকিয়া দুর্দ্দমনীয় জ্ঞান-পিপাসা কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইলে, দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি ছোট আদালতের হেডক্লার্করূপে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতায় থাকিতেই তিনি

ইংরেজীতে বক্তৃতা অভ্যাস করেন। দুই একটী বক্তৃতায় বেশ প্রশংসা লাভ করেন। ঢাকায় আসিয়া নানা উপলক্ষে অনেকগুলি ইংরেজী বক্তৃতা দিলেন, চারিদিকে প্রশংসা হইতে লাগিল। এই সময়ে ঢাকার প্রায় প্রত্যেক সার্ব্বজনিক ব্যাপারে তিনি ও স্বর্গীয় দীননাথ সেন রাওসাহেব অগ্রণী ছিলেন। কোন এক সাহেবের কথায় তিনি ইংরেজীতে বক্তৃতা দেওয়া পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে অর্থাৎ ১২৮১ সনে ইনি সরকারি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জয়দেবপুরের রাজার মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ করেন, একরূপ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্ম জীবনের ইহাই মোটামুটি ইতিহাস।

বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস বলিতে হইলে স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহনের সময়েই উহার প্রথম সৃষ্টি এবং উক্ত মহাত্মাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী যেমন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত কলেবরা হইয়া সাগরে আত্মসমর্পণ করে, তেমনি আমাদের বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যও রামমোহনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নানারূপ অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। রামমোহন যাহার সৃষ্টির জন্য প্রাণপণ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সর্ব্বসম্পদশালিনী ও সর্ব্বজন মনোহারিণী করিয়া যাইতে পারেন নাই—আজ তাহা নানালঙ্কার ভূষিতা ও সর্ব্বজন চিত্তরঞ্জিনী হইয়াছে। যে সকল সাহিত্য সংস্কারকদের অসাধারণ গবেষণা, অধ্যয়ন ও অনন্য সাধারণ প্রতিভাবলে মা আমাদের বিশ্বসাহিত্যের মন্দিরদ্বারে গৌরবের আসন পাইয়াছেন, সে সকল মহাপুরুষগণের মধ্যে আমাদের কালীপ্রসন্ন অন্যতম। রামমোহনের পরবর্ত্তী সময়ে বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি মনীষিগণই বাঙ্গলা সাহিত্যের নব যৌবন দান করেন। এ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস। তখন সাহিত্যের ভাষা লইয়া গভীর আন্দোলন চলিতেছিল। একদিকে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ বাঙ্গলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাহীন, বঙ্কিমের চিত্রিত দার্শনিক পাণ্ডিতের ন্যায় তাঁহারা দক্ষিণকর্ণ—দেবভাষা সংস্কৃতের কথা শুনিবার জন্য রাখিয়া বামকর্ণকে দীনা মাতৃভাষার অস্তিত্বও মানিয়া লইতে রাজি ছিলেন না, এ হেন দুর্দ্দিনে যাঁহারা লোকরঞ্জন ও লোকগঞ্জনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সর্ব্বজন মনোরঞ্জন করিবার জন্য ভাষা-জননীর অঙ্গ রত্নাভরণে সাজাইতে ছিলেন, তাঁহারাই প্রকৃত মাতৃভক্ত, সাহসী ও কর্ম্মীবীর। কাজেই সাহিত্য-সংস্কারক কালীপ্রসন্নকে বুঝিতে হইলে বা তাঁহার কথা বলিতে হইলে দুই চারিকথায় ইতি শেষ করিয়া দিলে চলিতে পারে না, বা বর্ত্তমান সাহিত্যের পরিবর্ত্তনশীল চঞ্চল ধারার সহিত তাঁহাদের কথার তুলনা করিলেও চলে না।

কালীপ্রসন্ন জন্মাবধি কর্ম্মী ও আত্মনির্ভরশীল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে না পারিয়া তিনি যেমন হাল ছাড়িয়া দেন নাই, ধ্যানপরায়ণ ঋষির মত জ্ঞানার্জ্জনের অদম্য তৃষ্ণা যেমন তাঁহাকে জ্ঞান লাভের জন্য নিয়ত নিযুক্ত রাখিয়াছিল এবং অর্জ্জুনের লক্ষ্য সাধনায় সিদ্ধির মত যৌবনে যেমন লক্ষ্মীকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে নিযুক্ত দেখিয়াছি; তেমনি সাহিত্যসেবায় বা সাহিত্য আলোচনায়ও তাঁহাকে অটল, অচল ও দৃঢ় সংকল্প পরায়ণ দেখিতে পাইয়াছি। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস তাঁহার জীবনের প্রধান মন্ত্র বা সাধনা ছিল।

ইংরেজ শাসন-গুণে আমরা যে সকল অধিকার গৌরব লাভ করিয়াছি, সাহিত্য তাহার প্রধান লাভ। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপরই প্রত্যেক প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতির জন্য মনোযোগ ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন। আর ইংরেজী শিক্ষা আমাদিগকে বিশ্বসাহিত্যের দ্বারের অর্গল খুলিয়া দিয়াছে, নানাদেশের নানা ভাব চিন্তা, শিক্ষা প্রভৃতির সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া আমরা নানারূপে সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ সম্পদে ভূষিত করিতে সমর্থ হইতেছি, ভাবের আদান প্রদানের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি। বাঙ্গলা সাহিত্যের সংস্কারকগণমধ্যে প্রায় সকলেই ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন; পাশ্চাত্য আদর্শকে সমুখে

রাখিয়া লোক শিক্ষা, লোক মত গঠন ও সৎসাহিত্যের প্রচার দ্বারা ভাষার পুষ্টিসাধনের জন্যই এ সকল সংস্কারকগণ ব্রতী ছিলেন। যে সময়ে দেশ ইংরেজী শিক্ষার স্রোতে প্লাবিত, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই দীনবন্ধুর নিমচাঁদের মত I dream in English, I think in Englishএর অবস্থায় ইংরেজীভাবে মসগুল, বাঙ্গলা জানা, বাঙ্গলা বহি পড়াও লজ্জাজনক মনে করিতেন—সে যুগে সে দিনে সে শ্রেণীর বঙ্গীয় শিক্ষিতগণের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যাহারা ভাষাজননীর বিজয় বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সে সকল সাহিত্যরথীগণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্র 'লোক রহস্যে' বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর নামক রঙ্গলীলায় উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু ও তস্য ভার্য্যার কথোপকথনে সে যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বঙ্গসাহিত্য প্রীতির পরিচয় অতি সুন্দরভাবে দিয়াছেন, আমরা এখানে উহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে আমাদের বক্তব্য বিশেষরূপ পরিস্ফুট হইবে।

উচ্চ শিক্ষিত। কি হয়?

ভার্য্যা। পড়ি শুনি।

উচ্চ। কি পড়?

ভার্য্যা। যা পড়িতে জানি। আমি তোমার ইংরেজী জানি না, ফরাসীও জানি না, ভাগ্যে যা আছে তাই পড়ি।

উচ্চ। ছাই ভস্ম বাঙ্গলাগুলো পড় কেন? ওরচেয়ে না পড়া ভাল যে।

ভার্য্যা। কেন?

উচ্চ। ওগুলো সব immoral, obscene, filthy.

ভার্য্যা। সে সব কাকে বলে?

উচ্চ। Immoral কাকে বলে জান,—এই ইয়ে হয় অর্থাৎ যা Morality বিরুদ্ধ।

ভার্য্যা। সেটা কি চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ।

উচ্চ। না না—এই কি জান ওর আর বাঙ্গলা কোথা পাব? এই যা Moralনয়—তাই আর কি?

ভার্য্যা। মরাল কি? রাজহংস?

উচ্চ। ছি! ছি! O Woman! thy name is stupidity!

ভার্য্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। বাঙ্গলা কথায় ত আর অত বুঝান যায় না—তবে আসল কথাটা এই যে, বাঙ্গলা বই পড়া ভাল নয়।

ভার্য্যা। তা এই বইখানা নিতান্ত মন্দ নয়—গল্পটা বেশ।

উচ্চ। এক রাজা আর দুয়ো সুয়ো (দুই) রাণীর গল্প। না নল দময়ন্তীর গল্প?

ভার্য্যা। তা ছাড়া কি আর গল্প হ'তে নেই?

উচ্চ। তা ছাড়া তোমার বাঙ্গালায় আর কিছু আছে নাকি।

এরূপ ভাবব্যস্থার দিনে বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি মাতৃ পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের ভাষাজননীর পদে প্রথম পুষ্পাঞ্জলি নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব শীর্ষক প্রবন্ধ। এ গ্রন্থের সমালোচনায় তৎকালীন 'হিন্দুপেট্রিয়ট' বলিয়াছিলেন যে "মাইকেল যেমন বাঙ্গালা পদ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, ইনিও বাঁচিয়া থাকিলে বাঙ্গালা গদ্যে সেইরূপ নুতন যুগান্তর আনয়ন করিবেন।" এই গ্রন্থ প্রকাশের কিছুদিন পরে মিল্ প্রণীত Subjection of women নামক গ্রন্থ বাহির হয়। উভয় প্রতিভারই মতে ও বাদ-বিচারে এত সাদৃশ্য আছে যে, রায় বাহাদুরের বই (পূর্ব্বে লিখিত হইয়াও) পরে বাহির হইলে তাঁহাকে গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত।" *

সাময়িক ও মাসিক পত্রাদি জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। জ্ঞান বিস্তারের প্রধানতম উপায়। বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্রের নাম 'বেঙ্গল গেজেট' উহা ১২২৩ সালে (ইংরেজী ১৮১৬ অব্দে) প্রকাশিত হয়। আর মাসিক পত্রসমূহের মধ্যে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ শ্রীরামপুর হইতে "দিগ্দর্শন" নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এ সময় হইতে ইংরেজ ও বাঙ্গালী নানাজনে নানাভাবে নানা প্রকার মাসিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রাদি প্রকাশ করেন। এ সকল পত্রাদি দ্বারা দেশের লোকের যে

* প্রদীপ—শ্রাবণ ১৩০৬, পৃষ্ঠা ২৫০।

যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু এ সমুদয় পত্রাদি দ্বারা শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোযোগ তেমন ভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। ১২৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" ও ১২৮১ সালে কালীপ্রসন্নের "বান্ধব" প্রকাশিত হইলে শিক্ষিত বাঙ্গালী ধীরে ধীরে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হইতে থাকেন। পশ্চিম-বঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অসামান্য প্রতিভাবলে বাঙ্গালীকে মেঘমন্দ্রে কর্ম্মানুরাগী, সাহিত্যানুরাগী ও দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, কালীপ্রসন্নও তেমনি একইভাবে একই সুরে একই উদ্দীপনায় সে বাণী সর্ব্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কালীপ্রসন্ন 'বান্ধবের' প্রথম সংখ্যার 'অবতরণিকায়' 'বান্ধব' প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছিলেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। উহা হইতে সে সময়ের বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রকৃতি কতকটা বুঝা যাইবে। মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধির সহিত দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সে বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন, "ইংরেজ জাতির যে ইদানীং এত বৃদ্ধি হইয়াছে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, ইংরেজী ভাষার সমৃদ্ধি উহার এক প্রধান কারণ। জাতিগত উন্নতি যে পরিমাণে ভাষার উন্নতি সাধন করে, ভাষাগত উন্নতিও সেই পরিমাণে জাতীয় উন্নতির নিদান হয়। * * * বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গীয় কৃতবিদ্য সমাজ বুঝিয়াও এতদিন এই সমস্ত কথা বোঝেন নাই। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ভাল বাঙ্গালা জানা, বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মধ্যে একটা কলঙ্কের কথা ছিল; এবং কেহ বাঙ্গালায় বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিলে, সকলে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট বিষয়ে বিরাগী বলিয়াই গণনা করিত। * * * বাঙ্গালা গ্রন্থালয় যে আজও দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, লোকচরিত, সাহিত্য ও নীতি প্রভৃতি নানাশাস্ত্র সমুদ্ভূত রত্নমালায় অলঙ্কৃত হয় নাই—বাঙ্গালা ভাষা আজ পর্য্যন্তও যে জগতে আদরের আসন লাভ করিতে পারে নাই, ইহা কি বাঙ্গালী কৃতবিদ্যদিগেরই অপরাধ নহে? লোকে উপহাস করিয়া বলে, বাঙ্গালায় যাহা কিছু লিখিত হয়, তাহা অকর্ম্মণ্য বালক এবং অলসা কুলবধূ ব্যতীত আর কাহারও ভোগে আসেনা। বাঙ্গালা গ্রন্থ বিলাসীর সরবৎ। উহা না চিন্তা শক্তির উদ্বোধন করে, না হৃদয়ের উদ্দীপক হয়। সংসারে যাঁহার আর কোন কাজ নাই, ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশীয় কোন ভাষায় অধিকার নাই, তিনিই বাঙ্গালা গ্রন্থ লইয়া কালযাপন করেন।"

"বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বঙ্গের যে সকল সুসন্তান, বাঙ্গালার শোভাসম্পাদনে এবং কলেবর বর্দ্ধনের জন্য চিরদিন পরিশ্রম করিয়াছেন—যাঁহারা, নিপুণ কারিকরের ন্যায় নিরন্ত যত্নপর থাকিয়া নিত্য নূতন শব্দ সংকলন এবং ভাব প্রকাশের নিত্য নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা উপহার দি।" "শিক্ষিত সমাজের সহিত দেশের সকল শ্রেণীস্থ লোকের শিক্ষাগত যোগস্থাপন নিমিত্ত যে সকল উপায় কল্পিত হইয়াছে, প্রবন্ধময় সাময়িক পত্র প্রচার তন্মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহা তাঁহাদিগের অধ্যয়ন ও চিন্তার ফল গৃহে গৃহে বিতরণ করে, সকলের সহিত তাঁহাদিগের কথোপকথনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, এবং মাতৃভাষার সেবারূপ মহৎকার্য্যে সকলকেই অনুরক্ত করিয়া তোলে। ইহার আর এক প্রধান উপকারিতা এই, সাহিত্য সমাজ বলিলে যাহা বুঝায়, এইরূপ বহু পত্র দ্বারাই তাহা গঠিত হইয়া থাকে। ইদানীং অনেকে, এই উপায় অবলম্বন করিয়া, বঙ্গদেশের সেবাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। বান্ধবও ঐ পথের পথিক। বান্ধব, কৃতবিদ্যদিগের অনুকম্পায়, আর দশভৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে অতি সামান্য এক ভৃত্যের মত নিযুক্ত হইতে পাইলেই, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিবে।"

"বান্ধবের" সৃষ্টি হইতেই কালীপ্রসন্নের প্রতিভা রবি মধ্যাহ্ন গগনে আরোহণ করিল, দিকে দিকে নানাভাবে নানামূর্ত্তিতে তাহার যশ-প্রভা বিস্তার লাভ করিল। বান্ধবেই একে একে তাঁহার প্রায় সমুদয় 'চিন্তা' রাজি প্রকাশিত হয়। 'বান্ধব' মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে কালীপ্রসন্নের চিন্তাশক্তি কোন্

কোন্ ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি একাধারে প্রবন্ধলেখক, সমালোচক, দেশাত্মবোধের উদ্ভাবক এবং কবি ছিলেন। কতবড় চিন্তাশীল, কতবড় দার্শনিক, কতবড় সমালোচক, কত বড় ভাষাবিদ পণ্ডিত তিনি ছিলেন 'বান্ধবের' প্রবন্ধ নিচয়ে তাহা সুপরিস্ফুট। এই 'বান্ধব' প্রচারের সহিত পূর্ব্ববঙ্গে একদল ক্ষমতাশালী লেখকের সৃষ্টি হইয়াছিল, আজ আমরা তাঁহাদের কথা ভুলিতে বসিয়াছি। 'যমুনা লহরীর' গোবিন্দ রায়, "তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরম-বেদনায়" কবি দীনেশচরণ বসু, "বঙ্গভাষাও সাহিত্য" প্রণেতা দীনেশচন্দ্র সেন, কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লেখকগণের উদ্ভব হয়। পশ্চিম বঙ্গের বহু লেখকও 'বান্ধবের' সাহায্যে উত্তরকালে শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কালীপ্রসন্ন বুঝিয়াছিলেন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পুরাতত্ত্বের প্রতি অনুরাগী না হইলে, দেশ জননীর প্রকৃত অবস্থা না বুঝিলে অতীতের গৌরবময় পুণ্য ইতিহাস; বীরত্ব কাহিনী না জানিলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না, তাই সে যুগে যাহারা ইতিহাসানুশীলন করিতেন তিনি তাহাদিগকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রথম শিক্ষা বাঙ্গলার ইতিহাসের সমালোচনায় তিনি লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গালি বিলাত চলিল এই সংবাদে আমরা যত না সুখী হই, বাঙ্গালি ইতিহাসের চর্চ্চা করিলে এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিলে, আমরা তাহা অপেক্ষাও অধিক সুখী হইয়া থাকি। ঐতিহাসিক জ্ঞান দেশের ভাবী মঙ্গলের ভিত্তিস্বরূপ।" তাঁহার লেখায় ঈদৃশ ভাব বহু স্থলেই দেদীপ্যমান। প্রতি প্রবন্ধে প্রতি কবিতায় তাঁহার দেশ প্রীতি ও ইতিহাসানুরাগ দেখিতে পাই। "ভক্তির জয়" নামক গ্রন্থে তিনি যে নিজেও বিবেকশরূপ ইতিহাসবেত্তা ছিলেম তাহা জানিতে পারি। উক্ত গ্রন্থের দুই তিনটী পরিচ্ছেদ সেন রাজগণের ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মকালীন ইতিহাসে পূর্ণ। 'ভক্তির জয়কেও' এক হিসাবে ঐতিহাসিক পুস্তক বলিতে পারা যায়। কারণ এই গ্রন্থ পরম বৈষ্ণব যোস্লেমকুল সম্ভূত হরিদাসের জীবন-কথায় পরিপূর্ণ। পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কত বড় সাবধানি লেখক এবং বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ অধ্যয়ন ছিল। এই গ্রন্থে তিনি একটী বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। "যবন" শব্দ বহু হিন্দু লেখক, মুসলমান বা মোস্লেম শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করেন, ইহাতে মুসলমান সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, এ বিষয়ে সাহিত্য পত্রাদিতে আলোচনাও অনেক হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন এইরূপ প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"যবন শব্দ সংস্কৃত-মূলক ও জাতিবাচক, বিদ্বেষ-প্রকাশক নহে। পূর্ব্বতন আর্য্যেরা সিন্ধুনদের পশ্চিমবর্ত্তী পারসিক ও আরব প্রভৃতি বহু জাতিকে যবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। মুসলমান ধর্ম্মের প্রচার অবধি যবন আর মুসলমান প্রায় একার্থবোধক শব্দ।

বঙ্কিমচন্দ্রও কালীপ্রসন্নের ন্যায় নিরপেক্ষ, নির্ভীক, সুপণ্ডিত সমালোচক আমাদের দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কথিত আছে কবিবর নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' "বঙ্গদর্শন" সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট প্রেরিত হইলে প্রথম তিনি উহা সমালোচনার অনুপযুক্ত জ্ঞানে waste paper basketএ ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। "বান্ধবে" উক্ত কাব্যের সুবিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইলে পর বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" আফিসে উক্ত কাব্যের খোঁজ করেন ও পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজে 'পলাশীযুদ্ধের' সমালোচনা বাহির করেন। কবিবর হেমচন্দ্র প্রণীত "দশমহাবিদ্যা কাব্যের সমালোচনা যাহারা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়াছেন তাহারা নিশ্চিতই আমার সহিত একবাক্যে বলিবেন যে এইরূপ সমালোচক লাভ কবির পক্ষেও কম সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা করা যে কিরূপ বিপজ্জনক সে বিষয়ে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এখনও প্রণিধানযোগ্য।" গ্রন্থ সমালোচনা করা বড় কঠিন কর্ম্ম; যদি গ্রন্থকার জীবিত থাকেন, তবে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কঠিনকর্ম্ম অল্পই সম্ভবে। * * যদি গ্রন্থকারের সহিত প্রণয় কি পরিচয় থাকে, তবেত বিপদের সীমাই নাই। যিনি

অমৃতের আশায় তৃষিত নয়নে তোমার মুখপানে চাহিয়া থাকেন তাঁহার হৃদয়ে কি বলিয়া গরল ঢালিবে, বল।

"বাঙ্গলা গ্রন্থের সমালোচক এ বিষয়ে বিশেষ দুর্ভাগ্যশালী। কারণ, মন খুলিয়া প্রশংসা করা যায়, বাঙ্গলায় এইরূপ গ্রন্থ অতি অল্পই লিখিত হইয়াছে। আজকাল বাঙ্গলায় সকলেই গ্রন্থকার। যে লেখাপড়া করিয়াছে সেও গ্রন্থকার; যে কখনও কোনরূপ লেখা পড়া করে নাই এক্ষণেও লেখাপড়ার কোন ধার ধারে না, কোনদিন যে লেখাপড়া করিবে এমন লক্ষণও দেখা যায় না, সেও গ্রন্থকার। ইহা ভারতীর কৃপা না অকৃপা বলিতে পারি না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই। শুনিয়াছি অতি প্রাচীনকালে, মুনি কুমারেরা দণ্তোদ্ভেদের পূর্ব্বেই বেদ পাঠ করিতেন। ইদানীং দেখিতেছি, এদেশীয় বালকদিগের মধ্যেও অনেকেই শ্মশ্রূদ্গমের পূর্ব্বে, অর্থাৎ কিছুমাত্র শিক্ষা লাভ না করিয়া, বিবাহ; সমাজ সংস্কার গ্রন্থ রচনা এই তিন কর্ম্ম সারিয়া বসেন।" কালীপ্রসন্নের সমালোচনা এক ঘেয়ে নিন্দা বা প্রশংসায় পূর্ণ থাকিত না, গ্রন্থের দোষ গুণ আলোচিত হইয়া সংশোধনের উপায়ান্ত তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হইত। তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি কি কেবল গ্রন্থ সমালোচনায়ই নিবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। কেমন করিয়া সমাজের ত্রুটী বিচ্যুতি সংশোধিত হয়, সমাজের মধ্যে কি কি দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, দিন দিন আমরা কিরূপে অধঃপতিত হইয়াছি সে সকল বিষয় সরস রসিকতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন, "রসিকতা ও রসের" কথা হইতে এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "পুত্র কন্যা কিংবা ভাই ভগিনীর নাম রাখিতে হইবে,—বাঙ্গালী তখনও রসিক। কারণ, পুত্রের নাম রসরাজ কিংবা রসিকচন্দ্র; কন্যার নাম রসময়ী চৌধুরাণী। ভ্রাতার নাম প্রাণনাথ ও, কিংবা রতিকান্ত রায়; ভগিনীর নাম অনঙ্গমঞ্জরী। নামে এইরূপ অসাধারণ রসিকতা পৃথিবীর আর কোন্ দেশে দৃষ্ট হইয়াছে?'

"দেশবিদেশে নামাবলি পাঠ এক হিসাবে সেই দেশের প্রকৃতি পাঠ। * * * কিন্তু রসিকতার অনুরোধে বাঙ্গালির নামাবলি যে মূর্ত্তী ধারণ করিয়াছে, তাহা পুরুষে শোভা পায় কিনা এবং পুরুষের তাহাতে তৃপ্তিলাভ সম্ভবপর কিনা, ইহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অথবা ইহাতে সংশয় ও বিস্ময়ের কথা কি? যাঁহারা ভারত উদ্ধারের জন্য আড্ডাতালে গীত গাইতে পারেন, এবং তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া নাচনিছন্দের অশ্রাব্য কবিতায় জাতীয় হৃদয়ের মর্ম্মনিহিত শোকবহ্নি উদ্গিরণ করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বীরেন্দ্র কেশরী, সুরসিক ধুরন্ধর পুরুষদিগের নাম কামিনীকান্ত, যামিনীকান্ত, কুমুদিনীকান্ত ও বিরহিনীপ্রান্ত, অথবা রমণীরঞ্জন, সুন্দরীগঞ্জন এবং ভামিনী ভ্রমভঞ্জন ভিন্ন আর কি হইতে পারে?"

প্রাচীন আর্য্যবীরদিগের নাম, ভরত, শত্রুঘ্ন ভীষ্ম, অর্জ্জুন, বলদেব, সাত্যকি, দুর্য্যোধন, ভীম, ঋষিদিগের নাম বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ব্যাস; শাস্ত্রকারদিগের নাম, পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, কণাদ এবং দেশস্থ সাধারণ ভদ্র লোকদিগের নাম শতানন্দ, সুরজিৎ, পুণ্ডরীক ও প্রহ্লাদ। * * * এইক্ষণ বহুদিন পরে, বিলাস-সমুদ্রে ভাসমান, সুশিক্ষিত, সুসভ্য, সুরুচিসম্পন্ন বাঙ্গালীবীরদিগের নাম হইয়াছে, রমনী, কামিনী, মানিনী, ভাবিনী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, অবলা, বিমলা ও কিশোরী। ইহার পর কোনদিন হয়ত, কোন এক সুরসিক বাঙ্গালি, প্রেমবিলাস যাত্রার নূতন রসের নূতন গীত শুনিয়া, আত্মজের নাম রাখিবেন "ললিত-লবঙ্গ-লতা লীলা-বসন্ত-ধ্বজ"—এবং অনুজের নাম রাখিবেন "প্রেমময়ী-পদ-পঙ্কজ-রজ"। তিন কালের ত্রিবিধ রুচি, সুতরাং ত্রিবিধ নাম।

কালীপ্রসন্নের দেশপ্রীতি ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা হইলেও স্থানে স্থানে তাহাও উষ্ণপ্রস্রবণের ন্যায় আকুল আবেগে উৎসারিত হইয়াছে। যৌবনে যখন দেশের সর্ব্বত্র দেশপ্রীতির পুণ্যধারা উথলিয়া উঠিতেছিল, তখন কালীপ্রসন্ন কবি। গানে ও কবিতায় তাঁহার প্রাণের বেদনা উচ্ছসিত উদ্বেলিত ও আন্দোলিত, তাহা শত ভাবে নিঃসারিত। তখন কালীপ্রসন্ন গাহিয়াছিলেন;—

জননী জন্মভূমি স্বর্গ তুমি মহীতলে।
পূজিব পা দু-খানি আজি মোরা অশ্রুজলে।
আমরা অভাজন, জানিনা মা কেমন
তবু মা পালিতেছ অন্নজলে রাখি কোলে।
নাহি মা অঙ্গে বল, সম্বল অশ্রুজল
দিব তাই ভক্তি-ফুলে শ্যামল পদ-কমলে।
হৃদয়ের ছিন্ন তারে, ডাকি আজ মা তোমারে
হৃদয়ে ভাত তুমি ফুল্ল শ্বেত শতদলে।

আবার—গাওরে ভারত সঙ্গীত, সবে প্রাণ ভরে
ভারতীর আরতিতে ভক্তি পূত বীণা করে।
মিলি আজ প্রাণে, প্রাণে, জনম তীর্থ স্থানে
জননীর নাম গানে, ভাস আনন্দ-সাগরে।
কত আর ঘুমে র'বে জাগরে জাগ সবে
ঐ শোন বাজে ভেরি আশার মোহন স্বরে।
সাধনায় সিদ্ধি ফলে, সাধিলে মন্ত্র বলে
একথা কণ্ঠ খুলে, ঘোষ সবে ঘরে ঘরে।
গিরি বিদরে যদি, শুষে যায় সিন্ধু নদী
তথাপি মন্ত্র যোগে, সাধিবে মন্ত্র অন্তরে।
হৃদয়ের আরাধনা, রসনার উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণ মন, শক্তির সোপান পরে।

বঙ্গ ভারতীর দুর্দশা দেখিয়া ভক্ত কালীপ্রসন্ন আবাহন গীতিতে গাহিয়াছিলেন,—

উঠগো বাণি বীণাপানি
উঠগো কল্প-কাননে।
উঠগো বঙ্গ বিনোদিনী আজ,
বীণার মধুর নিঃস্বনে।
আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ,
না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান;
প্রাণময়ি কর প্রাণ দান
পীযুষ-শক্তি সিঞ্চনে।
আছে আঁখি নাহি দেখি তায়,
জীবন্ত না মৃত, হায় কি দায়,
জীবনে জীবনী দেও মাতঃ
তাড়িত তেজ স্ফুরণে।

তাঁহার প্রবন্ধেও এই মর্ম্ম ব্যথা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মর্ম্ম বেদনায় বলিতেছেন "হে প্রেমিক! তুমি কি কখন ও প্রিয়-বিয়োগ-বিধুরার প্রাণের বিলাপ শ্রবণ করিয়াছ? যদি প্রেমময়ীর পীযুষ মধুর কোমল প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া তাদৃশ বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, মথুরা কি বৃন্দাবনের নিকটে, শ্যাম-সলিলা যমুনার তটে, একবার যাইয়া, নৈশ-নিস্তব্ধতার সময়ে উপবেশন কর। তুমি সেখানে যাহা শুনিতে পাইবে, এজগতের আর কোথাও তাহা পরিশ্রুত হইবার নহে। যিনি যমুনার তটে সুখের শৈশব অতিবাহিত করিয়া, যৌবনে এই পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম প্রেম-ভক্তির পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার এবং ধর্ম্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দ্বারা মানব জাতিকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন,— যোগী যাঁহাকে 'যোগেশ্বর', প্রেমিক যাঁহাকে প্রেমের গুরু এবং কাঙ্গাল যাঁহাকে কাঙ্গালের ধন' বলিয়া পূজা করিয়াছিল,— যিনি জ্ঞান ও গুণ গরিমায় পর্ব্বত হইতেও উচ্চ, হৃদয়ের গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র হইতেও গভীর হইয়া জীব-হৃদয়-রঞ্জনে শিশুর ন্যায় মৃদু স্বভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই চিরমনোহর শ্যাম-সুন্দর কৃষ্ণ কত কাল হয় মানব-লীলা সংবরণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। কিন্তু যমুনা তাঁহাকে পাশরিতে পারিয়াছে কি? * * * ভক্তি বিরোধী বৌদ্ধ যমুনার তটে অনন্ত পতাকা উড়াইয়া নিরাশ জ্ঞানের তত্ত্ব-সঙ্গীত গাইয়াছে। যমুনা সে গীতে কর্ণপাত করে নাই। * * যমুনার জল যেমন একটানা, যমুনার প্রাণ ও তেমনই একটানা। যমুনার কাল জলও কোমল প্রাণে কৃষ্ণনাম ভিন্ন আর কিছুই প্রতিধ্বনিত হয় না। যমুনার জলরাশি যখন গভীর নিশীথে কল কল করিয়া বহিয়া যায় তখন প্রকৃতই এইরূপ মনে লয় যে, কেহ যেন শোকের অসহ্য জ্বালায় উন্মাদিত হইয়া 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া বিলাপ করিতেছে এবং ঐ জল যখন বায়ু হিল্লোলে উচ্ছ্বাসিত হইয়া গর্জ্জিতে থাকে, তখন নিশ্চয়ই এই ধারণা জন্মে যে, পাগলিনী আর সহিতে না পারিয়া এক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। হা যমুনে! তুমি কি স্রোতস্বিনী, —না কৃষ্ণ-হৃদয়-বিনোদিনী প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধিকার অশ্রুধারা রূপিনী?

"অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের ক্ষণিক সুখে

অথবা ক্ষণিক দুঃখে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ভারতের ভূত-কীর্ত্তি স্বরূপ চিত্ত-কীর্ত্তনীয় মহাপুরুষদিগকে অনায়াসে ভুলিতে পারিয়াছে ;—যাহাদিগের অপ্রতিম প্রতিভায় ও তেজঃ প্রভায় ভারত-ভূমি দেব ভূমি এবং ভারতবাসীরা আর্য্যজাতি বলিয়া পরিচয় পাইয়াছিল, যাঁহাদিগের অলৌকিক শক্তির অজেয় আকর্ষণে ভারতের সামাজিক ধর্ম্ম, ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ ও করুণার অমৃতরসে রঞ্জিত এবং মহত্ত্ব ও মাধুরীর সহিত পরিমিশ্রিত হইয়া এই পার্থিব জগতে সভ্যতার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিল,— যাঁহাদিগের কবিজনস্পৃহনীয় পৌরুষ-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া কবিতা আপনিই এক সময়ে প্রেমাধীনা দেব-কন্যার ন্যায় ভারতের অনন্তকুঞ্জে কোকিলার মত কণ্ঠে মধুর গীত গাইয়াছিল, ভারত-সন্তান সেই প্রাতঃস্মরণীয় প্রিয় প্রাণারাধ্য পুরুষ-প্রবরদিগকে অকাতর মনে পাসরিয়া রহিয়াছে। কাহারও চক্ষু এক ফোঁটা জল দিয়াও তাঁহাদিগের তর্পণ করে না ; কাহারও হৃদয় তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া সামান্য একটী নিঃশ্বাসেও উত্তপ্ত হয় না ; কেহ দিনান্তেও একবার তাঁহাদিগের নাম করিয়া স্বজাতি বাৎসল্যও স্বজনানুরাগের পরিচয় দেয় না। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যের গৌরব-সহচরী সিন্ধু ও ভাগীরথী, নর্ম্মদা এবং গোদাবরী, আমার ঐ সরযূ ও যমুনা অথবা পুত্র-শোকাতুরা জননী কিংবা পতিশোকবিহ্বলা বিধবার ন্যায়, আজি বিংশতি শতাব্দীর সুদূর ব্যবধানেও ভারত-বীরদিগের নূতন কথা কহিয়া কহিয়া পথ-শ্রান্ত পথিককে শোক ও বিস্ময়ের বিচিত্রভাবে অভিভূত করিতেছে,— তটস্থিত তরুলতা এবং তরুশাখাস্থিত বিহঙ্গনিচয়কেও শোকে সংজ্ঞা শূন্য করিয়া রাখিতেছে ; এবং যাহার শরীরে শোণিতের কিঞ্চিন্মাত্রও সঞ্চার আছে, যাহার হৃদয় যন্ত্র প্রায় নিস্পন্দ ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় এখনও একটুকু একটুকু স্পন্দিত হইতেছে, ঐ মর্ম্মস্পর্শী নৈশবিলাপ তাহাকেও আকুল ও উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। লোকারণ্য প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—ভারতবর্ষ যখন জীবিত ছিল, তখন ভারতবাসীরা লোকারণ্য দর্শন করিয়া আহ্লাদে ঢল ঢল হইত। ইদানীং তাহা হয় না, কারণ ইদানীং ভারতবর্ষ জীবিত নাই। পৃথ্বীরাজের পর হইতেই ভারতবর্ষ প্রাণহীন হইয়া এক ভয়ানক শ্মশানের বেশ ধারণ করিয়াছে ; চাহিয়াও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ভারতবর্ষের ভক্তির স্রোত অদ্যাপি প্রবাহমান রহিয়াছে, এই হেতু, অদ্যাপি তীর্থস্থলে লোকারণ্যের মাহাত্ম্য কিয়দংশে অনুভূত হয়। কিন্তু অন্য কোন এক ভাব, কি কোন এক কথাতেই এদেশীয়েরা এইক্ষণ আর এক হৃদয়বৎ নাচিয়া উঠে না, অথবা একত্র দণ্ডায়মান হয় না। রাজনীতিক্ষেত্রেও কালীপ্রসন্ন অসাধারণ প্রতিভাশালী বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার মত রাজা ও প্রজা শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে,—"আমরা ইহা অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, মানবজাতির চিন্তাস্রোতের গতি আজকাল প্রাকৃত যুগের অনুকূল। মনুষ্যের সামাজিক শক্তি, যাহাতে একের হস্তে ন্যস্ত না থাকিয়া, যথাযথরূপে সকলের মধ্যে বিভক্ত হয়, এই অস্ফুট আকাঙ্খাই বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ লক্ষণ ; পূর্ব্বে রাজারা প্রভু এবং সকল শক্তির আকর ছিলেন, এইক্ষণ প্রজাই সকল দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রভু এবং সকল শক্তির মূলাধার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।" এ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা।

অনেকের মুখে শুনিতে পাই কালীপ্রসন্নের ভাষা ও ভাব জটিল, দার্শনিক ভাবের সমন্বয়। জনসাধারণের বোধগম্য নহে, কাজেই তাঁহার গ্রন্থাবলী সর্ব্বজনাদৃত হয় নাই। একথা অনেকের মুখে অনেকবার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে শুনিতে পাইয়াছি। এমন কি কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে যে স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে একজন মনীষি ব্যক্তিও একথার উল্লেখ করিয়াছিলেন ; তাঁহার গ্রন্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত না হইবার ইহাই অন্যতম কারণ। কালীপ্রসন্ন ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃত ভাষা জননীর স্নেহাঞ্চলে বালিকা বঙ্গভাষা বর্দ্ধিত হয় এ ইচ্ছাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল ; সেজন্য তাঁহারা বিশুদ্ধ ভাব ও ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় যে পরিমাণ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও

কালীপ্রসন্নের ভাষায় তাহা নহে। ভাবের জটিলতা কিংবা দার্শনিক তত্ত্বের সমাবেশের জন্য যাঁহারা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিত তাহারা ক্ষমার যোগ্য। কেবল প্রেমের গান, প্রেমের কবিতা ও গল্প উপন্যাসেই কি ভাষা সৌষ্ঠব শালিনী হয়? যদি ভাবের জটিলতা কিংবা দার্শনিক তত্ত্বানুশীলনের জন্যই তাঁহার গ্রন্থপাঠে সাধারণের আপত্তি থাকে তাহা হইলে ভূদেব, বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কাহারও গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধই অপঠিত এরূপ মানিয়া লইতে পারি। ভাব—ভাষার অনুসারণী। যেখানে ভাব গুরুগম্ভীর—সেখানে ভাষাও তেমনি শব্দসম্পদ পূর্ণ হইবে, নতুবা সামঞ্জস্য থাকিবে কেন? তথাপি আমরা বলিব, গভীর জটিল তত্ত্বের মীমাংসা, যেমন সরল সহজ ও সুন্দরভাবে সরস মধুর ভাষায় করিয়া গিয়াছেন তেমন ভাবে কেহ পারিয়াছেন কি? কালীপ্রসন্নের গদ্য রচনা—গদ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। কবিতার ছন্দ তাল ও গতির ন্যায় তাঁহার গদ্য রচনাও তেমনি নাচিয়া নাচিয়া তালে তালে ছুটিয়াছে। বাক্যের মাধুরী—ভাষার মাধুরী, শব্দচয়নের মাধুরী, ভাবের মাধুরী—একাধারে মিশিয়া ত্রিবেণী সঙ্গমের ন্যায় ভাব—ত্রিবেণীর সম্মিলন দেখিতে পাই। আমাদের উক্তির সমর্থন নিমিত্ত "নিশীথ চিন্তার" "তারা ও ফুল" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"একদিন একটি বৃষ্টিপাত স্ফুটিত যুথিকার বক্ষঃস্থলে এক ফোটা জল দেখিয়াছিলাম। ফুলের মধ্যে যুঁই বড় ছোট। যে জলটুকু যুঁই ফুলের ক্ষুদ্র হৃদয়ে নিবদ্ধ রহিতে পারে, তাহা যে জল-কণার মধ্যে যার পর নাই ছোট, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। অথচ চাহিয়া দেখিলাম যে, শ্যামলনিভ সান্ধ্য কমলের যে অনন্ত বিস্তার আমার মাথার উপর বিলম্বিত, যুথিকালগ্ন জলকণার মধ্যেও তাহাই, আণুবীক্ষণিক পরিমাণে, অপরূপ আভায় প্রতিবিম্বিত। আমি অনন্ত গগনের সেই চিত্রিত প্রতিবিম্ব দেখিয়া তখন মোহিত হইয়াছিলাম মাত্র। কিন্তু আজি যামিনীর এই নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নিরুপম গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আমার উর্দ্ধে ঐ তারার বাগান এবং সম্মুখে এই ফুলের বাগান লইয়া যতই আমি চিন্তা করিতেছি, আমার চিত্ত ততই এক অভিনব ভাবে উচ্ছ্বসিত,—এক অভিনব আলোকে আলোকিত হইতেছে, আর সেই যুঁই ফুল ও তাহার জলকণা এবং সেই জলকণার অভ্যন্তর-প্রতিভাসিত অনন্তের চিত্র আমার নিকট আর একরূপ লাগিতেছে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, প্রকৃতির এই অনন্ত উদ্যানে প্রত্যেক মনুষ্যই অসংখ্য ফুলের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী যুঁই ফুল। যুঁই ফুলের বক্ষঃস্থলে যেমন জল-কণা, মনুষ্যের বক্ষঃস্থলেও সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র একটুকু চৈতন্য-কণা এবং যুথিকাবদ্ধ জলকণার যেমন অনন্ত গগনের অনির্ব্বচনীয় চিত্র, মনুষ্যের এই হৃদয়বদ্ধ চৈতন্যকণারও অনন্ত কাল, অনন্ত দেশ এবং অনন্ত স্বরূপের অনন্ত চিত্র। মনুষ্য কেমন করিয়া তাহার তাদৃশ ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে এই অনন্তের বোঝা অলক্ষিত ভাবে এবং অতি গোপনে বহন করিতেছে, তাহা অধিকাংশ মনুষ্যই জীবনে কখনও ভাবিয়া দেখে না। ভাবিলেও প্রায়শঃ কেহই সে ভাবনায় কূল পায় না। কিন্তু, যে বিরলে বসিয়া ভাবে, তাহার স্বতঃস্ফুরিত গতি যেমন অনন্তের দিকে; যে না ভাবে, তাহারও গতি এবং ক্রমবিকাশ সেইরূপ সেই অনন্তের দিকে। ইহার পরীক্ষা—মনুষ্যের হৃদয়ে ও মনে, প্রমাণ—মনুষ্যের জীবনে।"

জয়দেবপুরের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর কিছুকাল পর্য্যন্ত "বান্ধব" বাচিয়াছিল, তাহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জয়দেবপুরের মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নবপর্য্যায়ে "বান্ধব" প্রকাশ করিয়াছিলেন; সে সময়ে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকতায় "বঙ্গদর্শন" ও পুনঃ প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার "ভক্তির জয়", "নিশীথ চিন্তা", প্রমোদ লহরী, প্রভাত চিন্তা, কবিতা পুস্তক, নিভৃত চিন্তা, ভ্রান্তি বিনোদ, মানা মহাশক্তি, জানকীর অগ্নি পরীক্ষা, ছায়া দর্শন ইত্যাদি সমুদয় গ্রন্থই "বান্ধবে" প্রকাশিত প্রবন্ধবলি হইতে সংকলিত হইয়াছে। বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। 'Self-Government' এর অর্থবোধক 'স্বায়ত্ব শাসন' নামক শব্দ তাঁহারই সৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত Tornedoর বাঙ্গলা ঘূর্ণদ ইত্যাদি বহু শব্দ তিনি বঙ্গ

সাহিত্য ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন, সে সকলের বিস্তৃত তালিকা প্রদানের স্থান এখানে নাই।

তাঁহার মত বাগ্মী বাঙ্গলাদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন "স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের বাঙ্গলা বক্তৃতা কখন শুনি নাই; কিন্তু অনেক প্রবীণলোকের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার কলকণ্ঠ নীরব হইবার পরে রায় বাহাদুরের মত উদ্দীপনাপূর্ণ আলাময়ী বক্তৃতা কেহ দিতে পারেন নাই। তাঁহার বক্তৃতায় ঘন ঘন শরীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে; ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একবার একটী রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছিল তখন বোধ হইয়াছিল যেন তাঁহার রসনাগ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতেছে। শুনিয়াছি ৬ রায় দীনবন্ধু মিত্র একবার ঢাকা অবস্থান কালে রায় বাহাদুরের এক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে তৎক্ষণাৎ সভাস্থলে উপযাচক হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন যাঁহারা মনে করেন বাঙ্গলা ভাষা তাহার মজ্জাগত দোষের জন্যই বাহু উদ্দীপনী বক্তৃতা প্রসব করিতে অসমর্থ তাঁহারা নিশ্চয়ই রায় বাহাদুরের বক্তৃতা শ্রবণ করেন নাই। 'বান্ধবের' পূর্ব্বে তিনি 'শুভসাধিনী' নামক এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহা বেশী দিন জীবিত থাকে নাই। যৌবনে কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ছিলেন সে সময়ে সমাজের বিবিধ দুঃখ দুর্দ্দশার বিষয় দর্শনে তিনি সমাজ শোধিনী নামক পুস্তক প্রকাশ করেন, তৎপ্রণীত 'সমাজ শোধিনী' দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, যদি কাহারও নিকট ঐ গ্রন্থ থাকে তাহা হইলে সে যুগের একটা ইতিহাস এবং সে সময়ে সমাজ সম্বন্ধে কালীপ্রসন্নের মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা জানা যাইতে পারিত।

তাঁহার সঙ্গীত-মঞ্জুরী উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীতে পূর্ণ। সেগুলি ভাবের ছটায় ভাষার ছটায় মধুরে মধুর। একদিকে যেমন তিনি ধীর গম্ভীর সুপণ্ডিত দার্শনিক, অন্যদিকে আবার তেমনি সুরসিক, ও চপল চঞ্চল যুবকের ন্যায় হাস্য পরিহাসে সুনিপুণ। প্রমোদ-লহরীর পাশে প্রভাত চিন্তার প্রবন্ধের তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। তাহার ষট্কারক, স্ত্রী নদীবৎ রসিকতা ও রসের কথা চোর চরিত ইত্যাদি পাঠ করিলেই ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কালী প্রসন্নের ন্যায় গভীর চিন্তাশীল প্রবন্ধ বহু দিন হইল বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে লুপ্ত হইয়াছে। কালী প্রসন্নের ন্যায় প্রতিভাশালী মহাপুরুষের সম্বন্ধে এইরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোন কথা ভাল করিয়া বলা যায় না। আমরা আকাশের তারা দেখাইবার জন্য মাটীর প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়াছি।

তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী ও অসাধারণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। শ্রীনিবাস বাবু লিখিয়াছেন যে কোন্ পুস্তকের মধ্যে কোন্ বিষয় আছে, সেই বই কোন্ আলমারীর কোন্ থাকে আছে, এসব তিনি অতি সহজে নিরক্ষর ভৃত্যকে বলিয়া দিতেন। একবার নিগূঢ় মনো বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম। আজ কয়েক বৎসর হইল ব্রিটেনের নিগূঢ় মনোবিজ্ঞান সভার সভাপতি ক্রোকস সাহেব এক বক্তৃতা দেন, সেই বক্তৃতায় অনেক অংশ তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিলেন অবশেষে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন "আমার অমুক ঘরে অমুক ভাঙ্গা বাক্সে তিনখানা কি চার খানা বই নীচে গাঢ় নীলরঙ্গের কাগজে বাধান একখান বই আছে, তাহা নিয়ে আয়।"

তাঁহার পুস্তকালয় একটী দেখিবার সামগ্রী। যিনি সেই গ্রন্থালয় দেখিবেন তিনিই আমার সহিত একবাক্যে স্বীকার করিবেন, ঢাকাতে ঐ ধরণের পুস্তকালয় একটীও নাই। উহাতে না আছে এমন গ্রন্থ নাই।

শেষ বয়সে তিনি 'কেমন কবিতা' 'বর্ণপাঠ' ও আদর্শ 'সুপ্রভাত' প্রভৃতি কয়েকখানা শিশু পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন। 'সুপ্রভাত' তাঁহার শেষ রচনা। 'সুপ্রভাতের' প্রকাশক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গোপীমোহন দত্ত ঐ গ্রন্থের নিবেদনে লিখিয়াছেন "সুপ্রভাত" বাঙ্গালার অদ্বিতীয় লেখক ও শব্দশিল্পী স্বর্গগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয়ের শেষ রচনা। তিনি ইহার রচনা কার্য্য নিঃশেষে সম্পন্ন করিয়া যষ্ঠ কথা অর্থাৎ গ্রন্থের ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত স্বকীয় তত্ত্বাব-

খানে মুদ্রিত করিয়াছেন। ষষ্ঠ কথা মুদ্রিত হইবার পরই নিদারুণ রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করে। গ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গেই উহার মুদ্রনকার্য্য চলিতেছে। শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে, ষষ্ঠ কথা যন্ত্রস্থ থাকিতে থাকিতেই গ্রন্থের লিপিকার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। ১৩ই শ্রাবন, উষা কালে, তিনি ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন।" জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তিনি সাহিত্য সেবায়ই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

কালীপ্রসন্নের ন্যায় সাহিত্যপ্রাণ, সাহিত্য সেবকের উৎসাহদাতা এবং শিষ্টাচার সম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা তাঁহার সহিত প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন তাঁহরাই তাহার সাক্ষ্য দিবেন। জয়দেবপুরেরর স্বর্গগত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার উপদেশানুযায়ী 'জয়দেবপুর সাহিত্য সমালোচনী সভা' প্রতিষ্ঠা করিয়া দীন গ্রন্থকারের সাহায্য করিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত তাঁহার একখানা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জীবনচরিত মুদ্রিত হইল না। ইহা আমাদের গৌরব কি অগৌরবের বিষয় তাহা আপনারাই বিচার করিবেন। প্রতিবর্ষে তাঁহার স্মরণার্থ সভার নিয়মিত অনুষ্ঠানেও আমাদের ভুল হয়। তারপর তাঁহার আলোক-চিত্র হস্তলিপি ইত্যাদি রক্ষা করিয়া সাহিত্য সমাজ বা সাহিত্য পরিষদ গৃহ অলঙ্কৃত হয় নাই। কলিকাতা 'সাহিত্য পরিষদে' তাঁহার হস্তলিপি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। অকৃতজ্ঞ আমরা এমনি করিয়াই আমাদের দেশ-গৌরব সাহিত্য-গৌরব কালীপ্রসন্নকে ভুলিয়া গিয়াছি। হে কালীপ্রসন্ন! তোমাকে আমরা ভুলিতে পারি সে শক্তি আমাদের কই? 'ঐহিক অমরতা' যে লাভ করিয়াছে তাহাকে স্বার্থান্ধ অজ্ঞ মানব ব্যতীত অন্য কেহ ভুলিতে পারে কি? তোমার শ্মশান-ভস্ম ধুইয়া গিয়াছে, তোমার স্মৃতির মন্দির চিতাভস্মোপরি আজও গড়িয়া ওঠে নাই, তোমার স্মৃতিসভা করিতে আমরা সন তারিখ ভুলিয়া যাই, কিন্তু তোমাকে মনের মন্দিরে যে আমরা নিত্য পূজা করি। প্রভাতে যখন উষার মাধুরী ছটায় পূর্ব্বাকাশ অরুণিমায় ছাইয়া ফেলে, মধুর স্বরে পাখীরা প্রভাতি গায়, নবীন তপনের নবীন কিরণ প্রভাবে চারিদিক নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, তখন তোমার 'প্রভাত চিন্তা' আমাদের চিত্তপটে জাগরিত হয়;— তারপর মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা, নীরবে নিভৃতে যখন আপনাকে পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করি, তখন তখন তোমার 'নিভৃত চিন্তার' চিন্তারাজি অন্তর-দর্পণে প্রতিফলিত হয়। আবার যখন দিনান্তে রজনীর নিভৃত-স্তব্ধতায় চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে, "যখন মনুষ্য নিবাসের আলোকমালা একটি একটী করিয়া নিবিয়া যায়, এবং আকাশ-মণ্ডলের আলোকমালা একটি একটি করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, যখন অদূরে গৃহস্থাশ্রমের কুকুর শব্দ এবং দূরে কোটরস্থ বিহঙ্গ কণ্ঠের বিরলধ্বনি ভিন্ন সকল প্রকার শব্দই একেবারে স্তম্ভিত হয়, যখন স্বকীয় পদধ্বনিও পশ্চাদ্বর্ত্তী দেবতা কি অপদেবতার পদধ্বনি বলিয়া ভয় ও ভ্রান্তি জন্মায়"— তখন তোমার 'মধুবর্ষিনী, মধুরাক্ষরা' নিশীথ চিন্তা চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে। তোমাকে ভুলিব কি? ভুলিতে যাইয়াও যে তোমাকে ভুলিতে পারি না। যখন দেখিতে পাই পুষ্প স্তবকের ন্যায় প্রস্ফুটিত জীবন-পুষ্প আকাশে ঝরিয়া পড়িতেছে, প্রাণ প্রিয়জন-বিরহে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। কোথায় মৃত্যুর শেষ, কোথায় দেহীর পরিণাম তখন তোমার 'ছায়াদর্শনের' অপূর্ব্ব ছায়া চিত্তে সান্ত্বনা ও ধৈর্য্য প্রদান করে! আত্মার অমরত্ব বুঝিতে পারি। চিত্ত তখন 'নদী যেমন সাগরের উদ্দেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করে তেমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমার 'ভক্তির জয়ের' সাগরসঙ্গমে ভক্ত হরিদাসের চরণতলে লোটাইয়া পড়িতে চাহে।

বাল্যে তোমার কবিতা মুখস্থ করিয়াছি, যৌবনে তোমার 'চিন্তা' গ্রন্থ হইতে শিক্ষা লাভ করিতেছি— তোমাকে কি আমরা ভুলিতে পারি?

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মনু নদী। *

অজানা দেশের কোন্ অজ্ঞাত কাহিনী বহি'
এসেছিস্, মনু, তুই শত বাধা বিঘ্ন সহি,—
আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে, বন্ধুর উপলাহতা,
অতিক্রমি' বাঁশবন কণ্টকী বেতসলতা।
এই শীর্ণা, এই পূর্ণা পাহাড়ের ঢল পেয়ে—
বহুরূপী তুই কিগো প্রকৃতির রঙ্গালয়ে?
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই, উর্দ্ধশ্বাসে অবিরাম
আবেগ চঞ্চল বক্ষে চলেছিস্ দিবাযাম।
কা'র তরে এ বারতা, এই কুলু কুলু তান—
বুঝিতে পারি না; তবু ভালবাসি তোর গান!
প্রশান্ত পাষাণবক্ষ মৌন "রঘুনন্দনের"
উচ্ছ্বসিত স্নিগ্ধ ধারা সুগভীর প্রণয়ের—
তুই কি লো ছুটেছিস্ অতি ব্যস্ত অতি দূরে
শীতলিতে সুখস্পর্শে মণিপুরী ললনারে?

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

পথে

যাবার পথে মাঝ মাঠেতে
দেখছি হঠাৎ চেয়ে।
সম্মুখেতে পদ্ম দীঘি
ফুলেই গেছে ছেয়ে।
কতক্ষণ ত আনন্দেতে
অবাক হয়েই থাকি
কালিদাসের উপমাতে
ঠেক্‌লে যেন আঁখি
আপন মনে যতই দেখি
ততই বাড়ে প্রীতি
জীবন পথে যেন মধুর
পুণ্য কাজের স্মৃতি।
পদ্মিনদের আনন্দেতে
নৃত্যকরে মন
সাধুর যেন ধ্যানের মাঝে
গোলক দরশন।
বইল হাওয়া পদ্মপুরীর
পরাগ মাখা তা'তে
লক্ষদ্বিজের চরণ রজ
লাগলো যেন মাথে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

---

* স্বাধীন ত্রিপুরার কৈলাসহর সবডিভিসনের প্রান্তবাহিনী পার্ব্বত্য সরিৎ। রঘুনন্দন পর্ব্বত হইতে ইহার উদ্ভব।

সাহিত্যিক-পত্র।

(স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি-আই-ই মহোদয়ের নিকট লিখিত। তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।)

৺রজনীকান্ত গুপ্তের পত্র।

শ্রীহরিঃ শরণম্—

কলিকাতা
১১ই আশ্বিন, ১৩০১

আত্মীয় বরেষু—

আপনার পত্র ও একখণ্ড "নিভৃত চিন্তা" পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি।

* * * * * আপনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ অবশ্য পাঠাইবেন। আগামী কার্ত্তিক মাসে পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা বাহির হইবে। ৺পূজার অব্যবহিত পরে আপনার প্রবন্ধ পাইলে বাধিত হইব। পত্রিকার সহিত আমাদের কোন স্বার্থ সম্বন্ধ নাই। পরিষদ হইতে উহা প্রকাশিত হইতেছে; পরিষদের

গৌরব বৃদ্ধির জন্য পত্রিকাখানি ভাল করিতে চেষ্টা করা সকলের উচিত। যাঁহারা পরিষদের সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এজন্য নানারূপ চিন্তা করিতেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ বর্ষীয়ান্ রাজনারায়ণ বাবু দেওঘর হইতে এজন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছেন। এখন তাঁহার লিখিবার সামর্থ্য নাই; কিন্তু তিনি সৎপরামর্শ দিতে ক্রটি করিতেছেন না। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ, উৎকৃষ্ট সমালোচনা, পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, রাজনারায়ণ বাবুর ইহাই একান্ত ইচ্ছা। আপনি পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য; সুতরাং আপনাকে পরিষদের গৌরব রক্ষার জন্য বিশিষ্ট মনোযোগ দিতে হইবে। পত্রিকা ইউরোপে সুধী জনের নিকটেও যাইতেছে; ভট্ট মোক্ষমূলর জানাইয়াছেন, তিনি পরিষদের অবস্থা দেখিয়া, উহার সভ্য হইবেন। আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ চিন্তা করিয়া, যাহা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত হয়, তাহাই করিবেন। রমেশ বাবু, গুরুদাস বাবু (হাইকোর্টের বিচারপতি), কৃষ্ণকমল বাবু প্রভৃতি সকলেই পরিষদের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। এখন উৎকৃষ্ট লেখকের প্রয়োজন। পত্রিকার উপরেই পরিষদের অস্তিত্ব ও গৌরব নির্ভর করিতেছে।

আমরা এক প্রকার আছি। আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদে সন্তোষিত করিবেন। ইতি—

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

৺স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র।

শ্রীহরিঃ শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা,
২১এ ফাল্গুন ১৩১৬।

কল্যাণবরেষু—

আপনার গত ১৮ই ফাল্গুনের প্রীতিপূর্ণ পত্র ও যত্নের সহিত প্রেরিত আপনার প্রণীত "ভক্তির জয়" নামক পুস্তকখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনার প্রদত্ত পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। একে ত ইহা ভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ, তাহাতে আবার আপনার গভীর ভাবপূর্ণ সুললিত ভাষায় রচিত। এরূপ গ্রন্থ পাঠ যে পরম আনন্দদায়ক হইবে তাহা বলা বাহুল্য। আপনি কবি, দার্শনিক, এবং ভক্ত। আপনার রচনায় কাব্যের সৌন্দর্য্য, জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য, এবং ভক্তির মাধুর্য্য, এই তিনের অপূর্ব্ব-মিলন লক্ষিত হয়।

আমার সামান্য পুস্তকখানির * কিয়দংশ আপনি এত যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছেন, এবং তাহার অবশিষ্টাংশ পাঠ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার নিকট বিশেষ বাধিত হইলাম। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

* "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক পুস্তক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

REGISTERED
TRADE MARK

রেজেষ্টরী করা শঙ্খমার্কা আসল

লালমোহন সাহা শঙ্খনিধির পৃথিবী ব্যাপিত

সর্ব্বজ্বরগজসিংহ

৪৮ ঘণ্টায় সর্ব্ববিধ জ্বর, ১ সপ্তাহে প্লীহা যকৃৎ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব।
মূল্য বড় ডিবা ১।৷০ দেড় টাকা, মধ্যম ১৲ এক টাকা, ছোট ৷৷৵০ নয় আনা।
ডাকমাশুল ১ হইতে ১২ ডিবা ৵০ দুই আনা।

জগৎবিখ্যাত।

সর্ব্বদদ্রু হুতাশন

২৪ ঘণ্টায় দাউদাদি চর্ম্মরোগ বিনা ক্লেশে আরোগ্য হয়।
মূল্য ১ ডিবা ।৵০ ছয় আনা, ডাকমাশুল ১ হইতে ২৪ ডিবা ৵০ দুই আনা।

সুপ্রসিদ্ধ

কণ্ডু দাবানল

খোশ পাচড়াদি ক্ষতরোগ অতি শীঘ্র বিনাক্লেশে আরোগ্য হয়।
মূল্য ১ ডিবা ।৵০ ছয় আনা, ডাকমাশুল ১ হইতে ১২ ডিবা ৵০ দুই আনা

রায় সাহেব শ্রীগৌরনিতাই শাহ শঙ্খনিধি।
মেনেজিং—প্রোপ্রাইটার।

ঠিকানা—ঢাকা, বাবুরবাজার, শঙ্খনিধি মেডিকেল হল কিম্বা ভজহরিসাহাষ্ট্রীট।

Printed by P. B. CHAKRAVARTY, at the Sreenath Press, 5, Nayabazar Road, Dacca.
and
Published by HARI RAM DHAR, B. A. Patuatuly, Dacca.

Regtd. No. C. 902.

VOL. 10. No. 10.

JANUARY, 1921.

THE Dacca Review

CONDUCTED BY
RAI SHAHEB,
BIDHUBHUSAN GOSWAMI, M.A.,
AND
SATYENDRANATH BHADRA M.A.

Annual Subscription, (inclusive of postage) . Rs. 5-6-0
Single Copy 0-8-0

REGINUS (TRIED OVER 30 YEARS.)

Composition-Aswagandha-Coco. Munoomica, Damian, Phosphorus, &c.

REGINUS—Universally praised by your physicians as a Brain Food and Tonic.

REGINUS is now prescribed to cure completely Bodily fatigue, Brain Exhaustion, Weakness of every sort, &c., &c.

ASTHMA :—With dry cough, hard breathing periodical fits, palpitation spitting out sticky phlegm Keeping up sleepless nights for fear of Suffocation, &c. Cured radically by our specific remedy. Bottle Rs. 5.

DIABETES and PILES are cured very shortly with our proved Cures. Bottle Rs. 3 each.

Complete list of preparations sent free.

THE RANAGHAT CHEMICAL WORKS.

RANAGHAT. BENGAL.

Edwards Tonic

The only remedy for Malaria and all kinds of Fever with Enlargement of Spleen and Liver Swellings of the Abdomen, Etc.

Sole Agents :—**B. K. PAUL & CO.,** *7 & 12, Bonfield's Lane, CALCUTTA.*

Cytogen — AN IDEAL DIGESTIVE TONIC WINE

Invaluable in CONVALESCENCE from Malaria, Typhoid, Diphtheria &c., Extremely useful in Anaemia, Nervous Debility, Loss of Appetite, Indigestion, Acidity &c.,

INDISPENSABLE AFTER PARTURITION

Price Rs. 1-8-0 Per Bottle.

B. K. Paul & Co.,
CALCUTTA.

Branch Sovabazar Street.

Head office :—7 & 12 Bonfield's Lane Calcutta. The Research Laboratory —18 Sashi Bhuson Sarker's Lane

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

(১) জহান্-আরা (ঐতিহাসিক চিত্র)। অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ, আই-ই-এস্ লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত। উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য। বহু হাফ্‌টোন চিত্র ও যশস্বী চিত্রশিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত প্রচ্ছদ পট সম্বলিত। ইহাতে আছে 'সেই অতীত যুগের ভ্রাতৃদ্রোহী সমর, স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত, বৃদ্ধ সম্রাট শাহ্‌জহানের চেষ্টা পরাভব বিলাপ ও যাতনা, কন্যার মাতৃতুল্য সেবা প্রভৃতির একটী দৃশ্যপটের মত মনোরম, অথচ বর্ণে বর্ণে সত্য ইতিহাস।' মূল্য ১৷৹

(২) মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা :—কে বলে, মোগল-মহিলাগণ অসার আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসে বিভোর হইয়া অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে তাঁহাদের অশিক্ষিত জীবন যাপন করিতেন? এই গ্রন্থে বাদশাহ্‌জাদাগণের সুশিক্ষা, সাহিত্য-প্রতিভা, সুরুচি প্রভৃতির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বহু হাফ্‌টোন চিত্র পরিশোভিত। মূল্য ॥৵৹

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বি-এ বলেন:—"আমরা ইহা পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, অনেক নূতন বিষয় শিখিয়াছি। আমরা সকলকেই অসূর্য্যম্পশ্যা মোগল-রমণীদের এই অভিনব চিত্র পড়িতে অনুরোধ করি।" (ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২৬)

(৩) মোগল-বিদুষী :—ইহাতে মোগল-অন্তঃপুরের উজ্জ্বল রত্ন জেব-উন্নিসা ও গুলবদনের জীবনকাহিনী সরল ও সুমধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

সুলেখক শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি-এ বলেন:—"মোগল-বিদুষী পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং কিছু নূতন কথা শিখিলাম। * * যাহাদের সহিত বহুদিন একত্রে বাস করিয়াছি—এবং বহুদিন যাহাদের রাজসভায় চামর ব্যজন করিতে হইয়াছে তাহাদের খোলসটাই কেবল নাড়াচাড়া করিয়া আসিয়াছি; তাহাদের প্রাণ যেখানে স্পন্দিত হইত সেই মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে আমরা অভ্যস্ত হই নাই। ইহাতে আমাদের উদারতার অভাব বলিলেই যথেষ্টরূপে অপরাধ স্বীকার করা হয় না। এই সকল কারণেই 'মোগল-বিদুষী' বিশেষ আগ্রহ সহকারে পড়িয়াছি ও পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।"

প্রাপ্তিস্থান:—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সাহিত্যামোদীর পক্ষে শুভসংবাদ—সর্ব্বজন-প্রশংসিত মাসিকপত্র ও সমালোচনী

বিকাশ

গত আশ্বিন মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, প্রিয়ম্বদা দেবী, মনোজমোহন বসু, মাণিক ভট্টাচার্য্য, জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব, মোহাম্মদ হোসেন প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিক-বৃন্দের রচনায় বিকাশ সুশোভিত।

"বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা (ভি পিতে ২৵৹ আনা), পত্র মধ্যে চারি আনার টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

কভার প্রতিপৃষ্ঠা ৬৲ ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩॥৹, সাধারণ প্রতিপৃষ্ঠা ৪৲ অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২॥৹। বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য। প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

ম্যানাজার—"বিকাশ"
১১০।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পাঠের ও উপহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।

মূক ও বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক
শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন প্রণীত

নল-দময়ন্তী

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কয়েকখানি বহুবর্ণের চিত্রে ভূষিত। বেগুণি রংএর সাটীন কাপড় মনোরম প্যাড্ বাঁধাই—তদুপরি একখানি তিন রংএর চিত্রে পরিশোভিত। বাঙ্গালা ভাষায় উপহার দিবার এমন সরল সুন্দর মধুর পুস্তক আর একখানিও নাই।

মালঞ্চ সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত
এম, এ প্রণীত

ভারতনারী

সিল্কের কাপড়ে প্যাড্ বাঁধাই মূল্য ১৷৷০

সাটীন কাপড়ের শোভনরাজসংস্করণ—মূল্য ২৲

বহু চিত্রে ভূষিত আদিতি, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সতীলক্ষ্মী আর্য্যনারীগণের চিরপূজ্য আদর্শ কাহিনী। বাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই নিত্য পাঠ্য।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ সম্পাদিত

(বঙ্গদেশের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক স্কুলসমূহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত এবং কলিকাতা ইউনিভারসিটী কর্ত্তৃক মহিলাদিগের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট)

কাশীদাসী মহাভারত (সচিত্র) মূল্য ৩৷৷০

কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সচিত্র) মূল্য ২৷৷০

আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চিরসমাদৃত—বাঙ্গালী জীবনের চিরমধুময়—চির নবীন রূপ কথা।

ভূতপূর্ব্ব শিশু সম্পাদক শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ঠাকুরমার ঝোলা বা বাঙ্গালীর রূপকথা

যেমন সুন্দর কাগজ—তেমন সুন্দর নিখুঁৎ ছাপা—তেমনি সুন্দর ঝক্‌ঝকে বাঁধা আবার তেমনি সুন্দর সুন্দর রাশি রাশি ছবিতে ভরা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

Amrita Bazar Patrika says, "AN INIMITABLE PRODUCTION."

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ মহাশয় বলেন—"...ইহাতে আশৈশব পরিচিত সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর কথা, ডাইনী রাক্ষসীর কথা,...পিঠে গাছের কথা ত আছেই আবার পুষ্পকুমার, শঙ্খরাণী প্রভৃতি সুকোমল নামের ও ততোধিক সুকোমল প্রকৃতির নায়কনায়িকার কথা সরল ভাষায়, সুন্দর ভঙ্গীতে, কল্পনার তুলিকায় কবিত্বের উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে......।"

সত্য বাবুর নূতন পুস্তক—অভিনব শিশু উপন্যাস

মূল্য ৸০] **দগোবার্ট** [মূল্য ৸০

ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লিখিত প্রভুভক্ত কর্ম্মবীরের অলৌকিক কাহিনী। এরূপ ছেলেদের উপন্যাস আর বাহির হয় নাই।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
৬৫নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।

A NEW BOOK—Just published.

A HISTORY OF EDUCATION IN ANCIENT INDIA.

BY

N GENDRA NATH MAZUMDER, M. A., B. T.

Professor, Dacca Training College

WITH AN INTRODUCTION

BY

E. E. BISS, I. E. S.

Principal, Dacca Training College.

MACMILLAN & Co.

Calcutta.

Price Re. 1-8-

Sir Gooroodas Banerjea writes :—"The book presents in a well-arranged form and within a short comp ss much useful information regarding ancient Hindu culture."

Babu Hirendra Nath Dutta, M. A., P. R. S. says :—"I have gone through it (Education in Ancient India) with interest. You have broken new ground and opened up a fruitful and interesting field."

Dr. Brajendra Nath Seal, (George V Professor of Philosophy, Calcutta University) writes :-

I have read with great pleasure Mr. Nagendra Nath Majumdar's "History of Education in Ancient India." As a clear and interesting account of the ideals and practices of the Ancient and Mediaeval Hindus in the sphere of Education, it is eminently suited to serve as an introduction to the study of the subject.

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শক্তি ঔষধালয়

শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা—স্বামীবাগ রোড্। হেড আফিস—পাটুয়াটুলী ষ্ট্রীট, ঢাকা।
কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২নং বিডন ষ্ট্রীট। বড়বাজার ব্রাঞ্চ—২২৭নং হেরিসন্ রোড্ (হাওরা পুলের নিকট
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ—১৩৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। (শিয়ালদহের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট) ভবানিপুর ব্রাঞ্চ—
৭১।১ রসারোড কলিকাতা। রঙ্গপুরব্রাঞ্চ—রঙ্গপুর। বেনারস ব্রাঞ্চ—১২ দশাশ্বমেধ ঘাট।

আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—৩৲ সের। দাদ্‌মার—৵০ কৌটা। বহরের ননী—৷৹ শিশি।
(এক দিনে দক্র নিশ্চয় আরোগ্য)। (নালীঘা, পৃষ্ঠঘাত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মহৌষধ)।
পঞ্চতিক্ত ঘৃত—৪৲ সের।
দশন সংস্কারচূর্ণ—৵০ কৌটা।
কামদেব ঘৃত—১২৲ সের। (সর্ব্ববিধ দন্তরোগের মহৌষধ)। অমৃতারিষ্ট—৷৹ আনা শিশি।
মেধাশক্তি বৰ্দ্ধক ও ছাত্রগণের সহায়। সারিবাদ্যারিষ্ট ৩৲ সের। (ম্যালেরিয়া, প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত ও
ব্রাহ্মীঘৃত—৬৲ সের) (রক্তদুষ্টি বাত বেদনার মহৌষধ)। সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ)

পত্র লিখিলেই আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বলিত শক্তি বা কর্ম্মযোগ বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যক্ষ—শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি. এ.

হিন্দুকেমিষ্ট এবং রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার

It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications and all complaints regarding non-delivery of the Magazine should be addressed to—

*The Manager, "*DACCA REVIEW,"

5, Nayabazar Road, Dacca.

N.B.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among other we may mention the names of :—

The Hon'ble Mr P C Lyon, C S.I
The Hon'ble Sir Harcourt Butler, K C I E.
The Hon'ble Nawab Syed Sir Shamshul Huda, K. C I. E., M.A., B.L.
The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Sastra Vachaspati Kt, C.S.I., M.A.,

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C I E., I.C.S.
,, Sir Henry Wheeler, K. C. I. E.
,, Mr. R. Nathan, B A., C.S I., C.I.E., I.C.S
,, Mr. H. Sharp, C.S.I., C I.E., M. A.
,, Sir N. D. Beatson Bell, C.S.I., C.I E., I.C.S.
,, Mr. J. Donald, C. I. E., I. C. S.
,, Mr. W. W. Hornell, C. I. E., M A
,, Mr. W. J. Reid, C.I.E., I.C.S.
,, Mr. J. G. Cumming, C. S I., C I. E
,, F. C. French, C S.I., I.C.S.
W. A. Seaton Esq, I. C. S.
D. G. Davies Esq., I. C. S.
Ven'ble Archdeacon W. K. Firminger, M.A
Sir John Woodroffe.
Sir John Marshall, K.C.I.E., M.A., LITT. D., F.S.A
The Hon'ble Mr. K. C. De, C.I.E., B.A., I.C.S.
,, Mr. L. Birley C. I. E, I. C. S.
H. M. Cowan, Esq. I. C. S.
J. N. Gupta Esq., M.A. I.C.S.
W. L. Scott, Esq., I.C.S.
Sir. J. C. Bose, C.S.I, C.I.E.
W. A. J. Archbold, Esq., M.A., L.L B
H. E. Stapleton Esq., M.A., B.Sc.
Dr. P. K. Roy, D.Sc.
Dr. P. C. Ray, C.I.E. M.A., D.Sc. (London)
B. L. Choudhri, Esq., M.A., D.Sc. (Lond.
Mahamahopadhyaya Pundit Hara Prasad Sastri, C I.E.
Principal Evan E. Biss, M.A.
,, Rai Kumudini Kanta Banerji Bahadur, M A.
,, Rai Lalit Mohan Chatterji Bahadur, M A
,, J. R. Barrow, B. A.
Professor R. B. Ramsbotham M. A., (Oxon).
,, J. C. Kydd, M. A.
,, W. Douglas, M. A., B. Phil., B D.
,, T. T. Williams M. A., B. Sc.
,, Egerton Smith, M. A.
G. H. Langley, M. A.
,, Rai B. N. Das Bahadur, M. A B Sc
Debendra Prasad Ghose

Hon'ble Maharaja Bahadur of Dinagpur, K.C.I.E.
The ,, Maharaja Bahadur of Cassimbazar, K.C.I.E.
The Hon Maharaja Bahadur of Nashipur
The ,, Raja Bahadur of Mymensing.
Prof J. N. Das Gupta, M.A., (Oxon).
The Hon'ble Sir Devaprasad Sarvadhicari M. A. L. L. D. C. I. E.
,, Mr J. H. Kerr, C S. I., C. I. E., I. C. S.
,, Mr. Justice B. B. Newbould, I.C.S.
,, Nawab Syed Nawab Ali Chowdhuri.
Babu Ananda Chandra Roy.
J. T. Rankin Esq. I.C.S.
G. S. Dutt Esq., I.C.S.
S. G. Hart, Esq., M.A., I C S.
F D. Ascoli, Esq., M.A., I.C.S.
J. McSwiney, Esq., M.A., I.C.S.
W. R. Gourlay, Esq., C I.E., I.C.S.
T. O. D Dunn Esq., M.A.
E. N. Blandy Esq., I.C.S.
D. S. Fraser Esqr, I.C.S
Rai Jamini Mohon Mitra Bahadur.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan
Kumar Sures Chandra Sinha.
Babu Chandra Sekhar Kar, Deputy Magistrate.
,, Jatindra Mohan Sinha, Deputy Magistrate
,, Hirendra Nath Dutt, M. A., B.L.
,, Rakhal Das Banerjee, Calcutta Museum.
,, Hemendra Prosad Ghose.
,, Akshoy Kumar Moitra
,, Jagadananda Roy.
,, Binoy Kumar Sircar.
,, Gouranga Nath Banerjee.
,, Ram Pran Gupta.
Dr. D. B. Spooner.
Kunwar Sain Esq., M.A., Bar-at-Law Principal, Lahore Law College
Khan Bahadur Syed Abdul Latif

CONTENTS.

1.	Agricultural Demonstration in Bengal ...	G. Evans, M.A., C.I.E. Director of Agriculture in Bengal ...	157
2.	The Study of Indian Poverty ...	W. H. Moreland, C.I.E. ...	165
3.	Eastern Bengal Notes and Queries ...	Ramesh Chandra Mazumdar, PH. D. Professor, Dacca University	175

সূচী।

১।	চিন্তা ও কর্ম্ম	শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম্-এ, বি-এল্ ...	১৬১
২।	ব্যর্থ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ	১৬৩
৩।	সমস্যা (গল্প)	শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ, বি-টি ...	১৬৩
৪।	শ্মশান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র দত্ত, বি-এ	১৬৮
৫।	শোক (কবিতা)	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৬৯
৬।	পুরাণ রহস্য	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ কর	১৬৯
৭।	ব্যর্থ অভিমান (কবিতা)	শ্রীযুক্তা ভক্তিসুধা রায়	১৭৩
৮।	বরদা (গল্প)	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৭৩
৯।	সাহিত্যিক পত্র	... ...	১৭৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক নং
শ্রেণী নং
কলিকাতা

THE DACCA REVIEW.

VOL. X. JANUARY, 1921. No. 10.

AGRICULTURAL DEMONSTRATION.

I have chosen this subject for my lecture tonight because of its importance. There has been a certain amount of criticism of the department because it is said that our officers are out of touch with the cultivators and do not bring home to them those improvements in agriculture which research work at Dacca and other places have pointed out. Some people have gone so far as to indicate that we should pay less attention to research, quite oblivious of the fact that without careful research in the first place no improvement whatever is possible. Much of the work of the expert engaged on research work is not appreciated as it ought to be. When a new high yielding variety of paddy or jute appears on the scene the general public are rather apt to take it as a matter of course. They are ignorant of the vast amount of toil and the years of skilful research and patient labour which is entailed in the work.

Having emphasized the vital importance of research as the very foundation stone of the edifice of agricultural improvement I will now proceed to mention a few of the practical results that have resulted from the years of patient and skilful work of our expert staff.

Paddy is the staple crop of Bengal and naturally received the attention of Mr. Hector, the Economic Botanist when he first settled down to work in this country. We all know that as a result of his work we have the famous Indrasail paddy which has been proved as a result of many years' field tests to be a heavier yielder than other varieties of *aman* paddy in Eastern Bengal. The average increased yield of this paddy over local varieties works out at not less than three maunds per acre and it is estimated that there are 5,000,000 acres of land in Bengal which are suited to this variety.

Kataktara the well known *aus* paddy is again a much heavier yielder than any other *aus* paddy in Eastern Bengal.

Increases of not less than 25 per cent. having been obtained constantly great progress has already been achieved in introducing the new varieties.

It is not generally known that over 2000 varieties of paddy had to be tested and examined before the Indrasail paddy was discovered or 200 varieties of *aus* before Kataktara was evolved.

It is also not generally realized that both these two paddies are the descendants of a single ear of paddy in each instance. It is an open secret that Mr. Hector has now one or two more paddies which are even better in some respects than Indrasail and Kataktara and it behoves us therefore to overhaul our demonstration machinery so that we may have the means of propagating and spreading these new varieties automatically and rapidly throughout the country.

Jute is another great staple in Bengal and Mr. Finlow's work on this crop is well known to you all. Is he not the foster father of Kakai Bombai that famous jute which for several years past has yielded one maund of fibre more per bigha than local jute? Chinsurah Green a very fine olitorious jute is another of his creations and there are even better jutes coming on which will be ready for the public in a very short time.

There is no finality in agricultural improvement. Other crops such as mati kalai and mustard are receiving the attention of our expert staff and without doubt results equally as striking as the above will be achieved. Groundnuts for instance has been proved by experiment to be admirably suited for certain "char" lands in the Sunderbands and should form a valuable addition to the crops of Bengal. Tanna cane has been proved the best all round sugarcane being not liable to disease or pests and yield 3 or more maunds of gur per acre than local canes, while potatoes and especially the Darjeeling variety have been introduced and are rapidly becoming an important crop. Tobacco is a crop which has received great attention.

I have mentioned only a few of the more obvious improvements which can be effected immediately to the seed. The work of the Entomological Assistant and Mycological Assistant have shown us how to deal with diseases and pests of crops and the chemist and the agriculturist have indicated new and profitable lines of manuring.

We may take the case of the red laterite soils of Dacca and neighbouring parts of Eastern and Northern Bengal. This soil is acid and in order to render it fertile the acidity has to be neutralized by the application of lime, a constituent which is practically non existent in this soil. It is also very short of phosphorus one of the essential

plant foods and this can be corrected by the use of ground bones or bone meal. In the same way jute is a crop which will not grow on these red soils without the addition of lime and soluble potash. The soil on analysis is shown to contain a fair quantity of potash but this is in an insoluble form and is not therefore available to the plant. In our experiments potash was applied in the form of ash obtained by burning water hyacinth. a pest that is so prevalent in Eastern Bengal. All these manures are locally available. In a rotation spreading over six years in which aus paddy and jute were the main crops by the expenditure of Rs. 18 per acre annually on manures the net income was increased by Rs. 72 per acre i. e. a return of about 400 per cent was obtained on the money expended on manures.

Green manuring again with such crops as dhaincha has proved that greatly increased crops can be produced with the expenditure of a little capital and oil cakes are of the greatest value in supplementing the scanty supply of farmyard manure, which is never available to the cultivator in quantities sufficient for his needs.

With regard to machinery and improved implements there is little scope in Bengal because the holdings are so small and there is little chance of introducing them until the cultivators combine. The communal use of a pumping plant for areas requiring irrigation, or a power thresher for paddy to quote two instances only would however, obviously be means of saving much labour and time.

The method of demonstrating these improvements is a difficult one and can only be done by practical demonstration in the field. The question of providing capital to enable the cultivator to purchase the necessary manures or machinery is a matter of organization and the formation of agricultural associations on co-operative basis appears to be a *sine qua non*.

PRESENT STAFF AND SYSTEM OF DEMONSTRATION.

I will now mention the system that we have at present in Eastern Bengal for demonstrating these improvements and for persuading the cultivator to adopt them.

We have the experimental station at Manipur near Dacca. Experiments and research are carried out here and a certain amount of pure seed of new varieties is available for distribution. There is also a small dairy. An Agricultural School has also been started.

In each district there is or will be a farm at headquarters which will serve not only as the centre for all agricultural improvement in the district, but will test new varieties and will propagate seed of approved kinds for distribution to the public. This farm is in charge of a dristrict Agricultural Officer who in addition to managing the farm has to organise agricultural associations in

the district, superintend the distribution of seed, make crop cutting experiments and carry out a good many other duties as well.

Under the District Agricultural Officers are subordinate officers termed demonstrators who carry out this programme under the orders of the District Agricultural Officer. It was originally laid down that there should be one trained demonstrator for each thana. Owing to financial reasons it has been impossible as yet to carry this scheme into effect.

At present we have in Eastern Bengal 10 District Agricultural Officers who are trained men and 45 demonstrators or 55 in all. The population of Eastern Bengal which is almost entirely agricultural is about 17½ millions and the cultivated area over 8 millions. That is to say we have one trained officer for every 800,000 acres of cultivation and every one and three quarter million persons.

It cannot be admitted that this staff is adequate. I have sometimes privately compared an agricultural officer in Eastern Bengal to a fly in a bottle of treacle. Both are willing but both are confronted by a task of considerable magnitude!

So far as I have been able to ascertain I can hold out no immediate hopes for any great increase in our staff. The financial situation is most unfortunate coming at the present time because as I have shown above the Agricultural Department is now in a position to recommend definite improvements and with something like a proper demonstration staff the effect on the agriculture of Bengal would in all probability be most remarkable. We must hope that financial conditions will improve and that our Gevernment will be able to provide funds in the near future so that the Agricultural Department in Bengal may be at least as well equipped as those of other major Provinces in India. At present it is badly handicapped in this respect.

I have told you the actual facts of the case. If we are not to come to a standstill we must obtain assistance from non official sources for our work, and I have every reason to hope that the public will co-operate.

I shall now indicate a scheme for agricultural demonstration and indicate in what way, unofficial bodies can cooperate with the officers of the Department in putting it into effect.

You will have judged from my preliminary remarks that one of the easiest and most obvious ways of improving the agriculture of the country is by the introduction of better yielding varieties. This has been found to be the case all over India and is especially the case in Bengal where the holdings are so small and the individual cultivator has not the capital to invest in improved machinery or artificial manures to any great extent. If, however, by simply substituting departmental seed for his

own local seed he can get one maund of paddy or jute *more* per bigha, the benefits are obvious. The cultivator sees that he is involved in no extra expenditure and no change of methods but gets a considerably better crop. The Bengal ryot has not proved himself conservative in this respect and as a result the demand for departmental seed is enormous and far greater than the visible supply. As an instance I might mention that from Dacca Division alone we have registered orders for more than 5000 maunds of Kakai Bombai jute seed, while the supply with the Department is only 1000 maunds to meet the demands of the whole of Bengal ! The remedy for this state of affairs is obvious. we must get some sort of organization going whereby the supply of seed is increased immediately as if the cultivator cannot get the seed he wants he naturally becomes disheartened. Already a disquieting state of affairs has arisen. Several cases have been brought to my notice where unscrupulous dealers have advertised inferior jute seed as "sarkari seed" and have sold it to the unsuspecting cultivators at very high prices. When the latter finds that his crop is inferior he is naturally disappointed and this brings wholly unfair discredit on the Agricultural Department and tends to lessen the confidence of the public. It is difficult to prosecute these rascals and the real way to combat the evil is to arrange for a bigger supply of seed of guaranteed quality and race.

This can best be done by the formation of private seed farms, a method which is meeting with great success in other parts of India.

If such seed farms were established they would take pure seed from the Departmental Farm and would propagate it for a further stage under the supervision of the officers of the Department who would see that it was kept pure and would be able to give some sort of guarantee of quality.

If deterioration sets in, the seed would be replaced by pure seed from the Government Farm again.

At present the Department is dealing with individual cultivators, with the result that it is impossible to keep a check on the seed once it has been distributed, so that a vast quantity of it is lost and rapidly deteriorates though admixture with other inferior varieties.

Round these seed farms agricultural associations of intelligent cultivators would be organized, which would take over the seed from the seed farm with the result that in a few years there would be compact areas growing one particular variety of approved quality. The growers when this stage has been reached would probably get a premium on the crops they had to dispose of, on account of the improved quallty. This system of seed farms and village agricultural associations which I have so briefly described would afford an easy

and rapid way of introducing without difficulty any new variety which the experts of the department are prepared to place before the public in future. Incidentally they would be admirable places in which to demonstrate the value of suitable manures and would also prove a centre for agricultural education.

Seed and Demonstration farms could be established by various agencies.

The Khas Mahals in some cases are beginning to establish them and are distributing the seed so produced to their tenants.

The Court of Wards (Bhowal estate) has provided two seed stores which are excellent institutions in their way. They ought to have seed farms attached to them however, as it is no use having a seed store unless you have the seed to fill it.

In other parts of India the zamindars have realized the importance of good seed and have established seed farms from which they issue seeds to their tenants. They are wise enough to see that on the prosperity of their tenants depends their own prosperity. This system has now been adopted in Rajshahi district, where three of the prominent zamindars have equipped seed and demonstration farms, and these in close co-operation with the officers of the Department, are doing much to solve the problems there.

I regret to say that in Eastern Bengal this movement has not yet started, but I am coufident that this will not long remain the case.

There is however another and most promising development. The villagers themselves are beginning to realise the needs of the situation and are organizing village agricultural associations and in some cases they are contemplating the opening of farms for the propagation of departmeutal seeds to meet the wants of their members.

This is the case at Kaliganj where the members have applied for a large quantity of sugar cane setts of the Yellow Tanna variety. It was impossible to meet their demands, as the seed rate for cane (12000 setts per acre) is very heavy and there is much loss in transit if seed is distributed to individuals. Several prominent members have therefore arranged a seed farm for Yellow Tanna cane and will grow the Departmental seed this year for distribution to the members next year.

Other associations are coming forward with the idea of producing jute and other seeds for their members. Faridpur district depends on its jute seed from outside and considerable difficulty has been experienced in meeting their demands for departmental varieties as the Department has not nearly sufficient seed. An interesting experiment has been started whereby certain associations in Mymensingh are arranging to supply seed of Kakai Bombai jute to sister associations in Faridpur. This is a matter that will require careful

organization and it is too early as yet to state how it will work but it is at any rate encouraging.

In other cases associations are arranging to grow jute seed for their own members.

At Durgapur there is an agricultural association of a slightly different kind. This centres round a higher English School to which is attached a farm of about 15 bighas. Here in addition to the production of seed for its members, practical demonstrations are carried out and the students of the school have an opportunity of learning practical agriculture at first hand.

The financial aspect of these associations and their seed farms is one of some difficulty. In a few cases individual members arrange to let their land for seed growing purposes to the association, in others arrangements are being made to purchase the land or to rent it on long lease.

It will probably be found most satisfactory to register a group of agricultural associations as an agricultural society under the Co-operative Act. This will mean that such an association will have to raise a certain amount of share capital from its members on the strength of which it will be able to borrow money at reasonable rates of interest and start its seed farm. The advantage of such a system would be that an association so organized would have its accounts properly audited and would be compelled to keep a reserve fund. Experience has shown in the past that finance has been the rock on which societies of this sort have come to grief. It is is absolutely essential that an outside audit and a reserve fund should be insisted on if they are to become permanent in structure and financially sound.

An Agricultural Society of this sort would also eventually engage in the more complicated forms of agricultural improvement, such as the purchase of manures in bulk and of machinery and the joint sale of produce, all of which are not possible in a country of small holdings such as Bengal unless the cultivators co-operate.

The Ganja co-operative society at Naogaon has decided to start a seed farm on the lines I am anxious to see developed. It is a rich society with about 3000 members and has now decided to start a seed and demonstration farm of 100 bighas for the benefit of its members. The circumstances there are of course somewhat exceptional but something of the same sort on more modest lines might very well be developed in parts of Eastern Bengal.

In conclusion I hope I have shown that there is a very great need for unofficial assistance in helping the Department of Agriculture in its great work of improving the agriculture of Bengal. Many people as I have shown are working on slightly different lines to this end and are only waiting for a lead. I have been giving the matter

much study during the last few months and have had the opportunity during my recent tours with Mr. McLean, the Deputy Director of discussing ways and means with many practical gentlemen who are just as anxious as I am to see things started on a sound basis.

I have endeavoured during the course of this brief lecture to indicate a definite line of progress and I believe that the system outlined will be the means of bringing the excellent results achieved by the expert officers of the department within reach of the individual cultivator of Eastern Bengal. We must remember that if we are to make rapid progress in introducing the many agricultural improvements which are now ready to be adopted we must have demonstration areas. A demonstration farm is the best form of Agricultural Education. Theoretical Agricultural Education by itself is practically useless and must be combined with practical demonstrations on the land.

Appendix.

Seed Distribution Scheme.

Government Experimental station.

|

V

Government District Farms.

unofficial seed farms

V Khas Mahal

V Court of Wards

V Zamindars

V Co-operative Agricultural Societies

To the cultivator.

G. EVANS.

THE STUDY OF INDIAN POVERTY.

BY W. H. MORELAND, C. S. I, C. I. E.

I come before you to-day as an economist, and consequently under something of a cloud, for there is no use pretending that economists are generally popular. I believe it is largely our own fault; we have been in the habit of defining our science as the study of wealth, and that definition is eminently fitting to provoke prejudice, especially among people who do not happen to be wealthy. It would probably have been much wiser to adopt from the outset another definition, which really means the same thing, and say that our science is the study of poverty; we should then have had all the philanthropists on our side instead of only the money spinners, and in worldly matters philanthropy is an invaluable support. However that may be, it is certainly true that when an economist finds himself in India, the subject of his study is not wealth, but poverty. By poverty I do not mean merely that many individuals are poor. I mean that the national income is insufficient to meet the reasonable needs of the nation as a whole; distribute that income in any way you choose, there is not enough to go round, and even though you were to abolish the rich altogether, the masses of the people would still be poor. Perhaps it will be well for me to make it clear at once that when I speak of poverty I do not mean either to assert or to deny that India is getting poorer. I shall come to that important question before I close; for the present, my point is simply that India is poor, and the fact is so notorious that I shall not weary you by going into the evidence on which it rests. The philanthropists, whom I have mentioned as possible allies, will doubtless agree that this notorious fact is worthy of study merely as such, but I want to put before you some considerations leading to the conclusion that the study of Indian poverty is of particular importance at the present time. India is sometimes a slow starter but she has now started in earnest on the long road leading in the direction of complete national selfdevelopment; and, to carry on the metaphor, we must think seriously about her expenses on this long and costly journey. Now complete national self-development would mean that each individual member of the nation should make the best possible use of every faculty he possesses. That ideal stands, but it will be realized in Utopia, not in India, and for practical purposes we must be content with the more limited objective that each individual shall have a reasonable chance of making good. The chance will often be missed in India as elsewhere; but we must not be satisfied until it is offered. It is certainly not offered in India to-day; the proportion of Indians who have a reasonable chance is miserably small,

and this result is due more to the national poverty than to any other single cause. Take for instance the avoidable infant mortality. I shall not give you the figures—they are too horrible—but we all know that every year many thousands of lives are needlessly lost to the country ; and, for all we know, any one of these wasted lives may have carried the capacities of a Saiyyid Ahmad or a Tata, of a Tulsi Das or a Kabir. They are wasted simply for want of medical and sanitary care, mainly want of doctors and nurses whom India cannot yet afford. It would make no diffrence whether the cost were to be charged to grants or to fees, to public funds or private charity ; in the last analysis, doctors and nurses must be provided out of the national income, and this income is, as I have said, insufficient to go round. Then consider the children who survive, and look at the recognized defects of the educational system. Every-one knows that India stands in urgent neen of more and better colleges, of many more, and much better, secondary schools, and of what almost amounts to an entirely new system of primary education ; till needs are met Indians will not have a reasonable chance of making good. Without going into detailed figures, I suggest that India must aim at spending crores where she now spends lakhs, and even that will not be the end ; the cost of saving, and of making, the next generation is certain to increase, and failure to meet it will be disloyalty to the future of the nation.

Education and sanitation are by no means the only heads under which a large and progressive increase in the national expenditure is essential. The new political institutions are going to be costly in many ways ; the productive departments—agriculture, forestry, indus tries, and the rest—need far more money than they get ; in fact, nearly every head of the budget-hydra has its mouth wide open gaping for larger grants ; and it seems impossible for India to go forward without a large and rapid increase in the national income. In order to spend more, you must earn more ; and in order to earn more, you must find out why you are now earning so little. That is what I mean by the study of Indian poverty. You must work from the symptoms to the causes, and ascertain why the national income is not greater than it is ; only by doing that can you be certain of laying the foundations of that progressive increase in material wealth, which is desirable, not for itself, but as the necessary condition precedent to realization of the national ideals.

The study of which I speak has a past as well as a future. Until the early years of this century the national poverty had but little interest for Indians, and apart from official publications, I do not think I could name half a dozen books of the period which really threw light on its causes. The

subject was not indeed ignored, but it was treated chiefly by writers who, in the old Hebrew phrase, darkened counsel by words without knowledge ; and, on balance, I have little doubt that the unofficial literature of the past has done more harm than good. On the other hand, large quantities of valuable data were gathered during this period by official agency, but when they had been gathered they were usually put away in the blue books and there they stayed. The official habit of burying precious information is just as bad as that other Indian habit of burying the precious metals ; facts, like gold and silver, are of little use till they are put into active circulation, and the active circulation of blue books is limited indeed. The characteristics of the past were thus on the one hand a large accumulation of valuable but inaccessible data, and on the other a mass of highly imaginative literature, having very little relation to the facts of Indian life.

We need not linger on that past, for it is dead, though it has left us some rather inconvenient legacies. At the present time conditions are much more hopeful. Economies, which, as I have said, in India means the study of poverty, is now one of the most popular branches of the curriculum of Indian universities, and year by year large numbers of young men are being sent out into the world with at least an elementary knowledge of the subject. More important than this, the universities, poverty-stricken though they are, have managed to provide the foundations for more advanced study ; and economists of established reputation are now to be found in India, engaged in original research and training students in the practice of that difficult art. Already some of the hoards of buried knowledge are being brought to light, a body of responsible and informed opinion is coming rapidly into existence, and we may be confident that the young Indian statesmen and publicists of the near future will be much better equipped for handling economic questions than the majority of their predecessors are to-day. The importance of such equipment is obvious : production, as you know, is to be one of the principal interests of the ministers to be appointed in the near future, and there is no branch of statecraft in which ignorance might lead more quickly to disaster. The universities cannot, single-handed, make the nation rich, but they are already doing something, and they can do much more, to save it from wild-cat schemes which could result only in impoverishment, and to enable it to form a sound judgment on the projects which are put before it.

The movement of which I have spoken is thus a matter for profound satisfaction, but it would be a great mistake to suppose that nothing remains to be done. The main reason why I bring the subject before you to-day is to urge that

the very success hitherto attained makes a new move forward inevitable ; it is a great gain that Indian poverty should be studied seriously in Indian universities, but we ought not to be satisfied until the level of study has been brought up to the highest university standard—that is to say, until the subject can be viewed in all its relations, and effects can be traced back to their ultimate causes. To do this, you must work over a long period of time, and the proposition which I wish to put before you is that a well-organized course of Indian economic history has become an urgent need in every Indian university. When your study of the problems of poverty is confined to the present, to the last few years, or the last few decades, you can do little more than recognize and classify the symptoms ; you can say, for example, that Indian poverty is due largely to the scarcity of capital, to the inefficiency of labour, and to various other rubrics which are now becoming familiar ; but you can not give a final answer to the questions : Why is capital scarce ? or, Why is labour inefficient ? To answer those questions you must go much further back, and trace the influences which have operated through the centuries, until you have made quite sure of the psychological elements of the problem, the motives and the memories by which the Indian producer is swayed. When you have got so far you can proceed to operate on those motives, strengthening some and counteracting others, so as to hasten the desired result, but until you know their genesis and history your treatment can only be empirical.

My contention, then, is that the study of Indian economic history is an essential part of the fight against poverty on which India is now entering in earnest. To establish that contention completely would require an analysis of the whole economic complex in the light of past records, much too great an undertaking to be attempted in the time at my disposal. All that I can hope to do is to put before you a few examples, some of them quite trivial, showing how a knowledge of the past will help to explain the present, will ensure a proper perspective, and will. at the very least, save worthy people from falling into some of the pitfalls by which the subject is beset. It would be only too easy to gather examples from the irresponsible writings of the last few years, but it is more profitable to choose them from serious contributions to economics or kindred subjects, and to begin with, I will take one, a very little one, from the Report of the Indian Industrial Commission. In Appendix D to that Report you will find the conjectural statement that before the leather industry came under the influence of Western methods, "tanneries of considerable size must have existed to supply the harness and saddlery for the enormous numbers of troops and retainers who were kept under arms by

by the numerous rajas, zamindars, and petty chieftains." Now history justifies the statement that very large mounted forces were formely maintained; but did they use equipmeut made of leather? I know of no authority in support of that view, and in the north at least it is tolerably certain that they used no latter at all. Saddles were made of cloth stretched on wooden frames, bridles and halters were made of rope, leather belts and gaiters were not generally worn, and I fear those "considerable tanneries" existed only in somebody's imagination.

My next illustration is taken from Mr. Ramsay Macdonald's recent book on the Government of India, a book which seems to me an honest and serious attempt to deal fairly with very complex subjects. Mr. Macdonald accepts without question the old assertion that the salaries of British officials are far in excess of Indian standards, and preaches an eloquent sermon on the text it furnishes. His strictures would be justified if the asseition were true; but what are the facts? A lieutenant-governor draws a lakh a year; allowing for changes in the value of money, one of Akbar's governors might draw the equivalent of a lakh a month. That is quite apart from what he might reasonably expect to make from bribes, presents, the grant of monopolies, preferential trading, and all the other attractions of office in those days; but taking the salary by itself, you cannot say that the standard has been raised. The truth is that the salaries allowed in the early Mogul Empire were far in excess of present scales, and, as you know, they attracted hordes of foreign adventurers, who poured into India from half Asia, and secured the great majority of the high appointments; to the foreigner at least, service in India is by no means what it was.

I take another illustration from the common idea, apparently accepted by Mr. Ramsay Macdonald, that Western influences are responsible for all the occasional failures of modern Indian taste You know how critics rave about the mirrors and chandeliers which in their eyes disfigure Indian palaces; their views may be right or wrong, but in any case we need not blame ourselves in the matter, for contemporary records show that what may be called the "looking-glass habit" was firmly established when we first reached India. In a note on trade prospects drawn up in the year 1609, when English merchants had been scarcely a year in the country, we read that "of new drinking glasses, trenches for sweatmeets, but especially looking-glasses of all sorts and different prices (but not small baubles), some reasonable quantity would be sold to good profit"; and the writer continues: "I verily suppose that some fair large looking-glass would be highly accepted of this king, for he affects not the value of anything, but rarity in everything, insomuch that some pretty new-fangled

toys would give him high content though their value were small." There is ample evidence to show that these last words are an accurate description of the taste of India at the outset of the seventeenth century. The officials who ruled and set the fashion, enjoying, as they did, the enormous salaries of which I have just spoken, had plenty of everything they really needed, and sought only novelties and rarities, "new-fangled toys," "the greatest looking-glasses that may be got," "any figures of birds, beasts, or other similes," "rich cabinets with a glass," pictures, dogs, organs, roasting-jacks, silk stockings, beaver hats—anything that would give a momentary stimulus to jaded tastes. This appetite for novelties was specially characteristic of the Mogul Court, but it prevailed also in the Moslem kingdoms of the Deccan, and there are some grounds for thinking that it existed also in the Hindu south; the missionaries who travelled through the Vijoyanagar territory in the sixteenth century show us the titular Emperor and the great Hindu nobles delighted by their modest but novel gifts, a glass box, a tortoise-shell cup, a heart worked in silver, and similar "toys." In view of such facts as these it is quite unhistorical to suppose that at this peripd India's taste was as pure as that of her modern critics; the classes who had money to spend sought for novelty more than beauty, and I think most of them would have been absolutely at home in Regent Street to-day.

I turn to an illustration of more serious economic significance. It is common knowledge that Indian workmen are very apt to spoil modern tools and machines, and the obvious explanation is that metals have been, and still are, very scarce in the villages, so that boys do not acquire the knowledge of cutting-edges, nuts and bolts, or other simple mechanical contrivances, which in this country comes naturally to nearly all working-class children. But why are metals scarce? Why is India only now entering on the Iron Age? The answer to this question is not doubtful: it is the inefficiency of the indigenous iron industry. In the sixteenth century, and for long before, India produced iron and steel of good quality, but at a prohibitive price, and that meant that nothing could be wasted in experiments; peasants and workmen had to be content with the bare minimum of metal, invention and progress were rendered practically impossible, the country as a whole was tied to the stick-and-string regime from which it is only now beginning to emerge. I know that much sentiment has been expended over the closing of the old furnaces, but iron-founding is a primary key-industry, and we have learned in the last few years that to cherish an inefficient key-industry is sentiment wasted. Now that the Tatas and the Mukherjees have brought an efficient industry into being, it is surely

time for India to stop worrying over a mythical past, and look forward with pride and confidence to the future.

I will give only a single instance of the injury which India suffered in those days from the high cost of iron. In the sixteenth century she had a great advantage in ship-building owing to the abundance of teak along the western coast, but the Indian ships of that period were not really seaworthy, and the reason was that far too little iron was used in their construction; they were quite serviceable in fair weather, but in heavy seas they simply went to pieces. The result was to cripple the shipping industry. Ships had to keep inside the area where they could count on fine weather at the proper seasons; they dared not go beyond Malacca into the China seas, and their voyages to Africa were limited on the south to the ports sheltered by Madagascar. But for that limitation there is no reason to doubt that they would have rounded the Cape of Good Hope, possibly before Vasco da Gama accomplished that feat; but, as it was, they had to remain in smooth waters until Portuguese ship-builders remedied the fundamental defect in their constrnction.

My last illustration of the value of economic history relates to the habit of absorbing gold and silver, to which I have already alluded. No economist doubts that for a poor country this is a bad habit: its existence is proved beyond possibility of dispute by the returns of Indian trade, and the student of these is usually satisfied to attribute it to the effects of a long period of insecurity. That is probably true in a general way, but if you want to attack the habit effectively, you must study its origin in more detail; what were the dangers which induced people to prize most those kinds of property which could be most easily concealed? So far as the Mogul period is concerned, that question can be readily answered. The burglar's industry does not seem to have been more importaut than now; highway robbers were certainly more numerous and dangerous, but they did not threaten the great majority who stayed at home; while I have found comparatively few complaints of the looting of villages which characterized the eighteenth century. The real threat to property came from the Administration; extortion was much more to be feared than robbery, and it threatened producers in every grade. It would be superfluous to quote authorities in support of this statement, for you find the facts wherever you dip into the literature of the period. The English merchants made a proverb of it before they had been ten years in the country; the people of India, they said, "live as fishes do in the sea — the great ones eat up the little. For first the farmer robs the peasant, the gentleman robs the farmer, the greater robs the lesser, and the King robs all." It is easy to verify that proverb by the experiences

of Europeans at the various seaports on both sides of India. The local officials could do almost as they pleased; they could allow or prohibit trade; they could engross or monopolize any staple; and if you wanted to do business at all, you must either be strong enough to bully them, or you must pay whatever they chose to exact. Such facts help us to understand Tavernier's statement that gold was popular because it takes up little room and is easily hidden; but it is important to realize that the demand for gold came from small people as well as great, and an English commercial report of the year 1627 lays stress on the profit to be made by sending gold to the east coast, where it was specially popular with the weavers, "being easily hidden and concealed from their governors." At this period, then, the insistent demand for the precious metals was due very largely to the prevalence of administrative exploitation, Later on, this motive was for a time reinforced by the dangers of anarchy; but in order to understand the present situation, it is essential to realize that something besides anarchy is at the back of the people's minds. The habit of putting surplus wealth into the precious metals is not to any great extent based on conscious reasoning, but it has been drilled into the people during the prolonged periods when officers of government were ordinarily beasts of prey; the eradication of that instinct is one of the great tasks before the Indian ministers of the near future.

If the illustrations I have given satisfy you that the economic history of India may be worthy of study, you will perhaps ask where that history is to be found. The answer to that question is as follows: Up to the end of the fifteenth century much of the history is missing, and unless a mass of new literature should happily come to light, we must be content for the earlier period with occasional glimpses, interesting and instructive in themselves, but probably too rare to serve as the basis of a connected narrative. It is, however, possible to form a good general idea of the economic life of India in the sixteenth century, and thenceforward the stream of knowledge broadens as the years go on, so that we can hope to reconstruct the story of at least three centuries. For the purposes I have indicated, those three centuries are much the most important in the whole of Indian history; they cover the transformation from the old India to the new and the claim can fairly be made that almost every outstanding feature of the existing situation can be adequately explained by the forces which have operated in the interval since Akbar ascended the throne. The present difficulty is to find a description of their operation within a moderate compass. The literature of the period is copious, but to the economist it is very dilute. The

Portuguese historians, for instance, have left us somewhere about 25,000 pages relating to the sixteenth century alone, but the economic information they give us could probably be condensed into a book of moderate size. The India Office contains about 48,000 volumes of records prior to the year 1858; scarcely one of those volumes can be altogether neglected by the economic historian, but it will be readily admitted that extraction and condensation are needed before their contents can be assimilated by the ordinary Indian undergraduate. Of the volume of relevant literature in Persian and the various Indian vernaculars, I cannot even offer an estimate, but all of it has to be ransacked; and there still remain the records of the Dutch and some other European merchants, and a considerable mass of unofficial publications. In order, therefore, to meet the needs of the ordinary undergraduate, India wants a few men of the type of Thorold Rogers or the late Archdeacon Cunningham, men of voracious appetite and unimpaired digestion, who will reduce this mass of material to manageable bulk, and trace out the main lines on which Indian economic activities have developed during the last three centuries. The more advanced student is at present much better off, beacuse he has already access to the English records for the greater part of the seventeenth century. As yet the world scarcely realizes the extent of its debt to the India Office, and in particular to Mr. William Foster, the Registrar and Superintendent of Records, for the "Court Minutes" and the "English Factories," the two series of publications which suffice, if carefully studied, to bring nearly the whole economic life of the period within our grasp. Speaking for myself, my gratitude for these publications is such that I am emboldened to ask for more. Must we wait for the eighteenth century until the seventeenth is complete? Will not the Secretary of State take the needs of students into consideration, and enlarge his operations, so that his whole treasure-house may be opened to the world within a reasonable time? The sooner the work is done, the better will India be equipped for the years which lie ahead. Happily, however, the serious student is not condemned to inaction in the meantime. The records already published suffice to give a clue to almost the whole history, and with their aid the other sources I have mentioned can be profitably explored, and the necessary spade-work of accumulating and classifying facts can go steadily forward. Hitherto the subject has too often been approached from a theoretical, or even a biassed, starting-point; what is needed now is such a presentation of facts that theories may become unnecessary, and bias may be corrected, or, at the least, exposed.

Here I might fitly close this disquisition on the study of Indian poverty,

but I have promised to say something on the important question whether India is getting richer or poorer, and I will offer you a very brief summary of my own experience of the diet of facts which I have just prescribed for others. If we agree to measure poverty by the average income of the country, calculated not in terms of the fluctuating rupee, but in terms of commodities such as food, then I think the facts justify the conclusion that at the end of the sixteenth century India was at any rate not much richer than in the years immediately before the war: more probably she was a little poorer, but the evidence I have examined does not establish any large difference. The distribution of the national income was, however, very unequal at this period: the rich took a relatively much larger share than now, and the masses of the people were definitely worse off.

The question naturally arises why so many Indians look back to this period as a Golden Age. The explanation is that it was followed by even harder times. The seventeenth century must be classed as a period of impoverishment. So far I have studied only a portion of the evidence bearing on it, but all I have examined points to the conclusion that the activities of the people were increasingly dominated by what I have described as administrative exploitation. The productive classes were learning by bitter experience that it was better to exploit than produce, better to be a peon than a peasant: the best energies of the villages were drifting to the towns, the camps, or the jungles, and production was falling into the hands of those who were fit for nothing else. It is true that foreign trade was expanding during much of this period, but its volume was trifling relatively to the country as a whole, and on balance I have no doubt that India was substantially poorer under Aurangzeb than under Akbar.

Of the eighteenth century I have little claim to speak. It was, as you know, a period of disorganization and reconstruction proceeding side by side. I guess that the loss was somewhat greater than the gain, but I have not yet been able to do more than glance at the evidence, and, so far as I am concerned, the question whether the utmost depth of poverty was reached about 1750 or about 1800 remains entirely open. It is certain, however, that India entered on the nineteenth century desperately poor, and the evidence of an increase in wealth during that period is overwhelming. The question of real importance is. why the increase was not greater: why did the national income not respond more quickly to the stimulns furnished by the restoration of security, and the progressive restriction of administrative exploitation; why in a word, is India still poor? The answer to that question alone would require a snbstantial volume, and I will merely suggest that

a clue is to be found in the belief in the sovereign virtues of individual freedom, which dominated the last century. Experience has shown that it was not enough to make India economically free : the mischief was too deeply seated for that, and liberation required to be supplemented by a policy of active stimulation. That is the note of to-day ; agricultural reform, co-operation, development of industries, all these great movements are in essence stimuli to the productive energies of the people, and their ultimate result will depend less on the material facilities which they offer, important as these are, than on the psychological influences which they bring to bear. There we have in a nutshell the reason why the economic history of India requires study ; the dead hand of the past still rests heavily on the masses of producers, and what I have tried to show to-day is that the past must be studied, in order that it may serve its true function as a guide to better things.

"*Journal of the East Indian Association.*"

EASTERN BENGAL NOTES AND QUERIES.

New Series : No. V.

EDITED BY

H. E. STAPLETON, I. E. S.

THE MATH INSCRIPTION OF RAJA MAHENDRA.

BY

RAMESH CHANDRA MAZUMDAR, PH. D.

(Professor-Elect of Indian History. Dacca University).

Eastern Bengal Notes and Queries No III, publishedin the September and October, 1920, number of the "Dacca Review, contains a series of interesting papers on Sabhar and its traditional Raja, Harishchandra. Among other things, prominent place is justly given to the transcript of an inscription which was in the possession of the late Kaviraj Amritananda Gupta of Matta. Mr. N. K. Bhattasali, who has edited this inscription, describes in minute detail, how, thanks to the indefatigable zeal of Mr Rankin, the Divisional Commissioner, the transcript was at last found among the papers of the deceased Kaviraj. As the sequel of this paper will show, these facts seem to me to be of great help in elucidating the record.

The inscription gives an account of a royal dynasty which settled in the '*Bhavalina*' province (apparently a sanskritised form of the modern 'Bhawál') under Dhimantasena. He was the son of King Bhimasena of the Lunar race, but was looked down upon by his brothers for his attachment to the Buddhist

religion, and found a secure retreat in Bhawāl which he conquered from the Kiratas. Ranadhirasena, the son of Dhimantasena, extended his conquests up to the Himalayas and fixed his abode at '*Sambara*' which is no doubt the old name of Sabhara. His son Harishchandra was a *Rajarshi* and spent his time in lonely Buddhist temples and monasteries, Harishchandra's son Mahendra established the monastery on which the inscription was engraved.

It must be apparent, even to a superficial reader, that the inscription is one of great importance for the history of Eastern Bengal. It is, however, equally apparent that the crucial point is the date of the record—without which the valuable data furnished by it cannot be utilised for purposes of history. This question has therefore to be discussed in full before we proceed to other matters of historical importance.

Mr. Bhattasali found the clue of the record in verse 8 which runs as follows:—

হরিশ্চন্দ্রস্য পুত্রেণ মহেন্দ্রেণাপ্যয়ং মঠঃ ।
মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতো দত্তঃ কপণং চৈব মহেশ্বরং ॥

He took the expression 'মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতো' to mean "in the current year (indicated by) Fish, Figures and Hill," and interpreted it as the year 791. As the word "*Sakabda*" occurs at the end of the record, he naturally referred the date to the Saka era and obtained the year 869 A. D. (p. 185). His view was supported by Mr. Rankin (p. 116), but Rai Saheb Dinesh Chandra Sen suggested that the date might be read as *Saka* 1297 (p. 106). Mr. Stapleton, without expressing any opinion on the technical expression, referred the inscription, on other grounds, to the 16th Century A. D. or thereabouts (p. 106).

It is needless to discuss the question whether মীনাঙ্কাদ্রি is to be interpreted as 791 or 1297, for I believe the expression মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতো, has nothing to do with any date. It is an adjective to the word '*Matha*' and indicates that this was situated on a hill called *Minanka*. Under ordinary circumstances no further discussion on this point would have been necessary but the respect which I entertain for Rai Saheb Dinesh Chandra Sen and Mr. N. K. Bhattasali make it incumbent upon me to offer a few remarks in support of my contention.

In the first place the expressson is clearly মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতো but has been emended as মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতৌ. Such emendation is necessary only when the expression that actually occurs offers no suitable meaning. This is certainly not the case here as any sanskritist would readily explain মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতো as a qualifying pharase to the word '*matha*' that immediately precedes it. But even conceding that the expression is really মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতৌ it can hardly be taken to mean "in the current year (indicated by) Fish, Figures and Hill" such as is proposed by Mr. Bhattasali. For স্থিতি *sthiti* has never been used in the sense of the current year, and this meaning is unknown to the Sanskrit Lexicon,

Mr. Bhattasali, in offering this explanation, had probably in view, expressions such as (গণস্থিত্যা) *ganasthitya* (গণস্থিতি বশাৎ) *ganasthitivasat*, occurring in connection with dates in the Malava era, or *gananaya sthapayitum* (গণণয়া স্থাপয়িতুং) in the sense of reckoning traced by Dr. Kielhorn in manuscripts. It is to be observed, however, that in these and analogous phrases, the word *sthiti* (স্থিতি) or other derivative of the root *stha* (স্থা) do not, by themselves, imply dates, but qualify other words in the ordinary sense, and the compound expression thus formed indicates a mode of reckoning. মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতো cannot therefore be taken to refer to date in any case.

The word *Sakabda* at the end of the record shows that there was a date, probably expressed by numerical figures Unfortunately it was not copied in the transcript and we are thus left without any sure guide as to the time when the record was composed. Fortunately, the circumstances leading to the discovery of the inscription which have been recorded in detail in Mr. Bhattasali's paper, help us to a great extent in this respect. The transcript was evidently made by the deceased Kaviraj himself or one belonging to the same class, i. e. an ordinary Indian Pandit. For if it was done by any scholar having special training in palaeography, he was sure to have noticed it in some antiquarian Journal and the contents of it would not have remained hidden from the learned world. Now it is a matter of common knowledge that an average Indian Pandit is not familiar with characters that prevailed in Bengal and Assam, say before the 12th or 13th Century A.D. This can be easily verified by a perusal of the transcript of the Madhainagar Copper-plate of Lakshmanasena prepared by Kaviraj Gopal Chandra Sen of Sirajganj who was specially entrusted with the task. The transcript is hopeless, and hardly any sense can be made out of it. Mr. Bhattasali, in assigning the record to the eighth century A.D. entirely lost sight of the fact that a record of so early a date would be absolutely unintelligible to an ordinary Indian Pandit. He may satisfy himself by asking one of his acquaintances to read for example, the Khalimpur Copper-plate of Dharmapala. On the whole, therefore, in the absence of more definite evidence, it may be held as a provisional hypothesis that the inscription under review could not have been earlier than the 13th Century A. D.

For a limit on the other side, we may profitably turn to Lama Taranath's History of Buddhism. The Lama tells us that 'four Kings ruled after Turushka's conquest of Magadh, *viz*, Lavasena, his son Buddhasena, his son Haritasena and his son Pratitasena. These were not very powerful as they had to obey the orders of the Turushka King, and they showed scant respect to Buddhism.

But about hundred years after the death of Pratitasena there was in the country Bhangala, the energetic 'Tschangala-radscha' who made himself master of the Hindus and attacked the Turushkas of Delhi. Although a Hindu, he was converted by his Buddhist queen. He performed a great sacrifice at Vajrasana, repaired the temples, and rebuilt the nine-storied Gandhola which was destroyed by the Turushkas. This King lived long and about 150 years have passed since his death.' The Lama concludes : 'I have not heard of any King of Magadha after him who was respectful to the Buddhist religion...... Later on flourished King Mukundadeva in Orissa......who erected Buddhist temples.........Thirty eight years have passed since the death of this King"[1].

According to the statement of Taranatha the four Kings beginning with Lavasena ruled in the 13th century A. D. and then, after an interval of about 100 years, flourished Tschangalaradscha in Bhangala who died about 1445 A.D, (160 years before 1605 A D. when Taranatha wrote his book). As this King is said to have lived long, his rule may be held to have covered the first half of the 15th century A. D Bhangala is the same as Eastern and southern Bengal, for Taranatha elsewhere distinguishes it from Varendra and states that Pundravardhana was situated between Magadha and Bhangala. The name of the King according to ordinary rules of transliteration would be Changala Raja.

Now it is a well-known fact that Taranatha is not an accurate historian and it would be hazardous to rely too much upon the details recorded by him. But as he was a Buddhist himself his statement that Changala Raja was the last Buddhist King in Bengal may not be dismissed as altogether unworthy of credit. If there had been a powerful dynasty of Buddhist Kings in Bhawāl or its neighbourhood within 150 years of Taranath's arrival in this country he could hardly fail to have taken note of it ; for he even mentions Mukundadeva, the Buddhist King of Orissa. The Kings mentioned in our inscription can therefore be hardly placed later than the end of the 14th century A. D. It is of course tempting to identify the Changala Raja mentioned by Taranatha with Raja Harishchandra, but of this there is no definite evidence.

It would follow from what has been said above, that the five generations of Kings, referred to in the inscription under notice, belonged, roughly speaking, to the period 1250-1350 A. D. The only argument that may be advanced against the date are the traditions[2]

1. Chapter 37. The passage is a free rendering from Schiefner's German translation of Lama Taranath's 'History of Buddhism'.

2. প্রতিভা ১৩১৯, ৪০৯, ৫২০ পৃঃ ; প্রবাসী ১৩১৯, ২১১ পৃঃ। Dacca Review and Sammilan Vol. IV, p. 190 ; পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর কৃত।

associated with Harishchandra and a short inscription on a brick which is supposed to have contained his name. As regards the first it is unnecessary to dwell at length upon the totally unreliable character of the current stories for purposes of history. One point alone would suffice. The traditious are unanimous in declaring that Harishchandra, also known as Hari Chandra[3], had no son and was succeeded by his nephew[4], and this forms the basis of the genealogical calculations on the strength of which some writers have placed Harishchandra in the seventh century A. D. The inscription under review, however, clearly refers to his son Mahendra. I may mention in passing that this appears to me to be a strong point in favour of the genuineness of the inscription, for a forger would hardly dare to depart from essential features of the current story[5].

It is to be noted in this connection that Lama Taranatha refers to a Buddhist King Harishchandra of Bhangala, or Eastern and Southern Bengal, who died without issue and was succeeded by his nephew. As the seventh King after him was a contemporary of Pushyamitra this Harishchandra was a contemporary of Asoka, according to Taranatha's chronology. It is not a little interesting to note that even to-day there is a tradition in Sabhar that its King Harishchandra was a feudatory of Asoka[6]. The fact seems to be that there was more than one king of the same name and the popular legends growing up around them have bound themselves up in an inextricable manner. There are traditions about a King Harischandra in Vikrampore, and Babu Jatindra Mohan Ray, the author of the History of Dacca, is inclined to look upon him as a different person from the King of Sabhar.[7] It is also obvious that the tale of the epic King Harishchandra had contributed its share in the rank growth of the legends.[8] It is further interesting to observe that Taranatha mentions King Gopichandra and his queen, and refers to the conversion of the former by a magician (*i. e.* probably a Tantrik) called Jalandhara and Acharya Krishnacharin, thus leaving no doubt about his identity with King Gopichandra or Govindachandra immortalised in Bengali ballads.[9] Taranatha is, however, not only silent about his

3. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৫ ; ঢাকার ইতিহাস পৃঃ ৪৬২—৬৩ ।

4. প্রতিভা—১৩১৯, পৃঃ ৫০২, ৬৭৪, ৪১৯ ;
Dacca Review and Sammilan, Vol. IV., p. 194 ;

5. Mr. Stapleton thinks otherwise (p. 106). But cf. Mr. Rankin's remarks, on p. 116. পূর্ববঙ্গের পালরাজগণ পৃঃ ১৯ ।

6. প্রতিভা ১৩১৯, ৪২০ পৃঃ ।

7. ঢাকার ইতিহাস, ৪৬০ পৃঃ ।

8. ঢাকার ইতিহাস, ৪৬৬ পৃঃ ।

9. Mr. N. K. Bhattasali informs me that Jalandhari was the surname of Gorakshanath, the Guru of Maynamati who was the mother of Gopichandra (*Vide* ময়নামতীর গান and [illegible]).

marriage with the daughters of Harishchandra which now forms the most interesting episode of the romantic story, but, according to the chronological scheme which he has adopted, there was an interval of about one thousand years between the two Kings.

As to the very short inscription which was brought to light by Babu Birendra nath Basu[10] it is obvious that it can hardly be earlier than the 11th or 12th Century A. D. Babu Jatindra Mohan Ray has rightly observed that the characters used in this inscription possess striking resemblance to the current Bengali alphabet[11]. There are certain suspicious circumstances in connection with this inscription, but so far as I can judge from a photograph which alone is available to me, nothing militates against assigning the short record of Harishchandra to the period I have proposed for the King.

As to the locality of the inscription it has been pointed out above that the Minanka was the name of the hillock on which the monastery dedicated by the inscription was situated. It must be looked for in the hilly region between the Himalayas and the Mymensingh district. Local investigations alone can finally solve the point ; but I may offer here a few suggestions for consideration of those who have a competent knowledge of the localities.

1. There are several hillocks in Kamrup district with temples at their top. One of them is called Madan Kamdev Hill and another, simply Kameswar. This latter is said to be sacred to Hindus and Buddhists alike. As *Minanka* may be held to be equivalent to *Minaketana*, a synonym of *Kamadeva*. it may correspond to one of these hills.

2. In the Goalpara district there is a place called *Manikar Char* with hillocks around. *Manikar* is a likely corruption of *Minankadri*. I may note that nearby is a place called Mahendraganj. As Mahendra is the name of the King who built the monastery, a locality named Mahendraganj near the proposed site of the monastery lends colour to the suggestion.

It is to be noted that all these places are in Assam where, according to the informant of Mr. Rankin, the *math* was situated.

As the inscription was apparently affixed to the monastery it is not unlikely that it is still to be found if we can hit upon the right identification of the Minanka hill. Considering the great importance of the inscription it is eminently desirable that some persons having opportunities of investigating the localities should seriously take up the question and make a vigorous search for it.

There are some other important points in connection with the inscription but these cannot be profitably discussed till

10. পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ ৮১ পৃঃ ।
11. ঢাকার ইতিহাস, ৪৫৩ পৃঃ ।

we have come to a satisfactory decision about its date.

Notes on the foregoing Article.

1. I quite agree with Dr. Majumdar that the apparent meaning of the expression মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতো is '(the temple) situated on the hill called Minamka' and that the word স্থিতি by itself never means, 'the current year.' But this word has the sense of of 'currency'—'duration'—'continuance', and the meaning—"In the current year indicated by 'fish', 'figures' and 'hill' "is easily obtained by holding that the word বর্ষে has been omitted after স্থিতে or স্থিতৌ as is often done. The whole expression paraphrased in prose should be taken as মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতে বর্ষে or মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতৌ বর্ষে।

2. We do not know how the transcript came in the Kaviraj's possession and I do not think Dr. Majumdar can safely assume that the transcript was made by the Kaviraj himself *from the original stone.* He might have met it in an incorrect form in a manuscript,—in a *Kulapanjika,* or some book of that sort. He might then have tried to correct the reading and bring out the meaning of the *slokas.* No one knows when these *slokas* were first deciphered and how long they have been handed down from generation to generation.

3. As to the short inscription on the brick containing the name of Harishchandra, the less said, the better. It can hardly be regarded as an unimpeachable historical document.

4. If the expression মীনাঙ্কাদ্রিস্থিতে or স্থিতৌ does not express a date, the date of Harishchandra is to be sought for in an examination of his ruins at Sabhar Any observer would declare these ruins to be older than those at Rampal in Vikramapura. But the strongest proof that Harishchadra belongs to the period of the Later Guptas is furnished by the discovery of numerous Later Gupta-coins on or near the surface of Harishchandra's ruins. I have dealt at length with these coins in my article on The Ghugrahati Plate and connected questions of Later Gupta chronology' (*Vide* "Dacca Review," May-August, 1920.) and I am sorry that Dr. Majumdar has left this aspect of the question entirely out of his discussion. The Dacca Museum has already procured five gold coins of this class from Sabhar and two more will be coming very shortly. Indeed numerous coins of this class have been found from Sabhar and any one who knows how difficult it is to collect gold coins found in old localities will be able to form an idea as to the number of coins actually found, from the collection of five coins, from this limited area, in a single year.

From the information that Harish-Chandra used to live in *Maths* and temples decorated with the figures of the Buddha we can conclude that the bricks found in such numbers at Rajasan, with figures of the Buddha stamped on them (very good samples of these are to be found preserved in

the Dacca Museum) are to be associated with Harishchandra. The discovery of Later Gupta coins in the same strata as these bricks would point to the fact that these coins and Harishchandra were contemporaneous, or separated only by a short period of time.

5. The absolute absence of sculpture in any form in the ruins of Sabhar is remarkable. The ruins of the Sena capital in Vikramapura abound in images and other stones and three-fourths of the collections of the Dacca Museum come from Rampal and its vicinity. The ruins at Sabhar may, on this ground alone, be dated to a period before the rise of schools of sculpture in Bengal, *i. e.* before the Palas and Senas.

6. The fact that the limits of Bhabalina are specifically mentioned in the inscription, appears to show that it was meant for people who did not know the tract and lends colour to Mr. Rankin's information about the inscription being somewhere in Assam. Mahendra may have gone there on pilgrimage, and I consider at least the first of Dr. Majumdar's topographical suggestions worth following up. For, after all, the expression বীনাশাজি-হিতৌ may or may not mean a date and no reasonable clue should be neglected.

N. K. BHATTASALI.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

১০ম খণ্ড | ঢাকা—মাঘ, ১৩২১। | ১০ সংখ্যা

চিন্তা ও কর্ম্ম।

ভাবজগতের সহিত ব্যবহার জগতের যে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ আছে, তাহা নহে। একটা হইতে আর একটাতে যাইবার জন্য মিণ্টনের মত কোনও ব্রিজ তৈয়ারী করিবার দরকার নাই। একটা যেখানে শেষ হইয়াছে আর একটার সূচনা সেখানেই এমন কথাও বলা যায় না। চিন্তা ও কর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়াছে, উভয়ের মধ্যে অবকাশের অনুসন্ধান করা বৃথা। দিন যে কোথায় গিয়া অবসান লাভ করিল এবং রজনী আরম্ভ হইল কোথা হইতে সেই সীমারেখাটি বড় বড় জ্যোতির্বীও আবিষ্কার করিতে পারে নাই তবুও আমরা জানি দিবস আলোকময় এবং নিশা অন্ধকার।

রাত্রি সঞ্চয় করে দিবস প্রকাশ করে। প্রাণ কেবলই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে কর্ম্মের মধ্যে। কিন্তু চিন্তার মধ্যে সে আপনার শক্তি আহরণ করিতেছে উপচয় করিতেছে। কর্ম্মের মধ্যে চাঞ্চল্য আছে আবেগ আছে; কিন্তু স্তব্ধতা এবং গম্ভীরতা চিন্তার মধ্যেই। অর্থাৎ ব্যবহার জগৎ আমাদের প্রতিদিবসের কোলাহলময় কারখানা এবং ভাবজগৎ রূপকথার ঘুমন্ত পুরী—এক নিমেষে জাগিয়া উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হয় আলোকে কিন্তু বীজ কার্য্য করে লোকচক্ষুর অন্তরালে। কর্ম্মের পিছনে থাকে কল্পনা চেষ্টার পিছনে থাকে চিন্তা। অথবা বলা যাইতে পারিত কর্ম্ম অজ্ঞাতবাস করিতেছিল কল্পনারূপে অন্তরের অন্তঃপুরে এবং চেষ্টা সাজিয়াছিল চিন্তা। দোকানের খাতা, ইঞ্জিনের চাকা, মালের গুদাম ক্রাপের কামান এমন কি এরোপ্লেনের পাখা, তড়িৎ বার্ত্তার তার হীনতার মধ্যেই কর্ম্মনিঃশেষে প্রকাশ নহে। সকল কাব্য, সকল গান, সকল চিত্র, সকল কলার মধ্য দিয়াই কর্ম্মের মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে; চিন্তার ছদ্মবেশে সেই যে মানসারণ্যে লুকাইয়াছিল তাহা কি ধরা পড়িতে আজও বাকি থাকে?

মানুষ গুটীপোকার মত; চিন্তার রস যতক্ষণ তাহার ভিতর গুপ্ত থাকে ততক্ষণ তাহার কোনও মূল্য নাই। সেই অনন্ত নিঃসৃত রসধারা যখন সংসারের আলোক ও বাতাসের স্পর্শে রূপান্তরিত হইয়া আপনার চারিদিকে কর্ম্মের সূত্র বয়ন করিয়া চলে তখনই তাহার সার্থকতা। মনঃশক্তি মাত্র লইয়া মানুষ বড় নয়. সেই শক্তি প্রকাশের মধ্যেই তাহার মহত্ব।

মানুষের সভ্যতা ঐখানেই, চিন্তাকে কর্ম্মে অভিব্যক্ত করা; সে চিন্তা নেপোলিয়ানের ব্যূহরচনাতেই ফুটিয়া উঠুক অথবা কালিদাসের কাব্যরচনাতেই ব্যক্ত হউক। কল্পলোকে যে প্রতীক্ষা করিয়াছিল কর্ম্মলোকে তাহাকে চরিতার্থ করিতে হইবে। যাহা চঞ্চল, যাহা ক্ষণিক, যাহা মানস, যাহা অদৃশ্য তাহাকে বহির্জগতে বিধৃত করিয়া চিরন্তন এবং ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের আকাঙ্খা এবং ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে।

এমনি করিয়া, দেখিতে পাই চিন্তা ধীরে ধীরে সাধনার ভিতর দিয়া কর্ম্মরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিন্তাহীন কর্ম্ম অথবা অমূর্ত্ত ভাবের সাক্ষাৎ লাভের সম্ভাবনা এ সংসারে নাই। তবুও কিন্তু আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই ঐ লোকটা কর্ম্মী ঐ লোকটা চিন্তাবীর। এমনটা না বলিলে চলে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই কথাগুলি শুধু আমাদের আলোচনার সুবিধা করিয়া দেয় মাত্র। মূলতঃ ঐ ভাবুকের সহিত ঐ কর্ম্মীর কোনও প্রভেদ নাই। কর্ম্মের অন্তরালে চিন্তা না থাকিলে কর্ম্মী দাঁড়াইত কোথায়? এবং ভাব ও ভাবনা সমূহ কর্ম্মরূপে আত্মপ্রকাশ না করিলে ঐ চিন্তাবীরকে চিনিত কে? নিউটন বা জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক বটে কিন্তু তাঁহারা ভাবুক না কর্ম্মী?

সবলোকই কাম করে তাই বলিয়া ত সকলকেই আর কর্ম্মী বলা চলে না। সংসারের পনেরো আনা তিন পাই লোক না ভাবিয়া খাটিয়া যায়। বাকি এক-পাই তাহাদের জন্ত ভাবিয়া দেয়। এই যে নিতান্ত অল্প কয়েক জন সংসারের অধিকাংশের জন্ত ভাবিয়া দেন, এই চিন্তাসম্বল অল্প সখ্যকের কাহাকেও বলি কর্ম্মী কাহাকেও বলি ভাবুক। তবে এমন হইতে পারে, যে যাহাকে বলি কর্ম্মী তিনি হয় ত সন্তুষ্ট আছেন বর্ত্তমানের ভাবনা লইয়া আর যিনি ভাবুক তাঁহার চিন্তা ব্যাপিয়া আছে অস্ফুট অতীত হইতে অন্ধকার ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত। মোটামুটী ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাঁহার মানস কল্পনা প্রায় অমিশ্র ভাব রূপেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাঁহাকে বলি ভাবুক, যেমন কবি। আর যাঁহার চিন্তার শক্তি বাহিরের সংস্পর্শে রূপান্তরিত হইয়া বাস্তবের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে তাঁহাকে বলি কর্ম্মী।

কর্ম্মের মূলে চিন্তা—এই কথাটি ভুলিয়া যাই বলিয়া ভাবুক ও কর্ম্মীর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া তর্ক করিয়া মরি। সভায় আলোচনা চলিতেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কে? অধিকাংশ সভ্যই তাঁহাদের নাম উত্থাপিত করিলেন যাঁহাদের আমরা কর্ম্মবীর বলি। দেখিলাম ভাবুক অথবা কবিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে সকলেই সঙ্কুচিত। যিনি কর্ম্মী তিনি মহৎ একথা স্বীকার করি। তবুও আমার সন্দেহ হয়, বিচার করিয়া, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সময় আমরা এই স্থূল চর্ম্ম চক্ষু দুটা দিয়াই দেখি, অন্তরের তৃতীয় নেত্রটি বন্ধ থাকে। ভাবুক বা কবিকে শ্রেষ্ঠ বলিতে শিহরিয়া উঠি। আরে ছি ছি যে লোকটার কাজ আমরা হাতের মুঠার মধ্যে ধরিতে পারিলাম না, আঙ্গুলের স্পর্শে ছুঁইতে পারিলাম না, নিশ্বাসে আঘ্রাণ করিতে পারিলাম না, জিহ্বায় যাহার রসের আস্বাদ পাইলাম না, তাহাকে কেমন করিয়া শ্রেষ্ঠ বলি! তৃতীয় নেত্র নিমীলিত করিয়া এমনি অনায়াসেই আমরা বিচার করিয়াছি। কিন্তু ইহাই কি সত্য? চিন্তা স্থূল শরীর পরিগ্রহ করিয়াই কি জিতিয়া যাইবে? সাহিত্যে যে ভাব সমূহের সাক্ষাৎলাভ করি তাহাদের ছুঁইতে পারি না, ধরিতে পারিনা বটে, তাহাদের উপকার প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই সত্য, তাই বলিয়া তাহাদের শক্তিকে,—মানুষের মনোরাজ্যে যে গতিবেগ সঞ্চার করিয়া বিপ্লবের সূচনা করে সেই বেগকে, তুচ্ছ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের যেন না ঘটে। সেই চিন্তার তড়িৎ আমাদের চারিদিকের আকাশে যে স্পন্দন তুলিয়া দিয়া

যার অনন্ত কালেও তাহা আর থামিবার অবসর পায় না। এবং সেই অপ্রত্যক্ষ কম্পনের আঘাতে এই দৃশ্য জগৎ দিনে দিনে বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। তথাপি আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে কর্ম্মী ও ভাবুকের মধ্যে মূলতঃ একটা অসাধারণ পার্থক্য নাই। উভয়ের শক্তি একই ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছে। সেই শক্তির ব্যবহারের প্রকরণে একটা প্রভেদ দেখিতে পাই মাত্র! ফুল হইয়া যাহা বিকশিত হইয়া উঠিল, ফল হইতে তাহার বাধা ছিল না, কেবল অবস্থার সন্নিবেশে ফুল হইল ফুল এবং ফল হইল ফল। কর্ম্মের ফলকেই বড় করিয়া দেখিবার রুচি ও প্রবৃত্তি, কাহারও কাহারও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল হইতে পারে, ফুলকে আদর করিবার লোকের অভাব কিন্তু দেবতা হইতে মানুষের মধ্যে আজও হয় নাই।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

ব্যর্থ।

ফুরিয়ে গেছে ফুলের হাসি,
গন্ধ যে তার বন্ধ গো;
আকুল-করা পাগল বায়ু
মিথ্যা তারে খুঁজছ গো।
বাদল যবে বিদায় লহে—
চাতক-ডাকে ফিরবে কি?
অধীর-পাখী কাঁদছ বৃথা,
বধির-হিয়া শুনবে কি?
বাঁধন ছিঁড়ি যে যায় চলি—
ডাক্ শুনি কি ফিরবে সে?
মিথ্যা শুধু অশ্রু ঢালা,
কাতর-বাণী ব্যর্থ যে!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

সমস্যা।

বন্ধু লিখিয়াছিলেন—"ছুটি কিছুতেই লইলে না। মুখে অনেক বলিয়াছি লাভ হইয়াছে মাত্র মুখের মাংস পেশীগুলার খানিকটা ব্যায়াম। চিঠিও লিখিয়াছি ঢের—লাভ যাহা কিছু হইয়াছে তাহা শুধু ডাকঘরের। আজ এই যে চিঠিখানি লিখিতেছি ইহাই এ সম্বন্ধের শেষ চিঠি। আর তোমার ছুটি লইবার বা হাওয়া বদ্‌লাইতে যাইবার কথা কখন মুখ দিয়া বা কলমের আগা দিয়া কিছুতেই বাহির করিব না।

ব্যবসার মূলধন নষ্ট হইলে ব্যবসা আর চলে? তোমার এই জীবিকার্জ্জনের মূলধন বা একমাত্র উপায় তোমার ওই তালিদেওয়া শরীরটা সেটা তো জান? ওটি যদি একদিন জীর্ণ কাপড়ের মত একেবারে ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া যায়, ভাঙ্গনের মত একদিন ঝুপ করিয়া যদি খসিয়া পড়ে, ভাঙ্গা প্রাচীরের মত বর্ষার ঘায়ে একদিন হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন? মায়ের সেবা তখন কে করিবে? প্রিয়তমার মুখ তখন কে চাহিবে? পুত্রকন্যাদের তখন কে সোহাগ করিবে?

দুদিন একটু বেশী ভক্তি প্রেম ও স্নেহ করিয়া সেই দিনটি আগাইয়া না আনিয়া ঐ সব উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিগুলির কিছুদিন একটু কম চর্চ্চা করিয়া সেই দিনটাকে কিছু পিছাইয়া দিলে ক্ষতি কি?

তোমার উত্তর—একশ টাকায় সংসার মনের মত করিয়া চালাইতে পারি না, পঞ্চাশ টাকায় কি করিয়া চলিবে? জীর্ণ পিঞ্জরের দুয়ার খোলা পাইয়া পাখীটি যখন উধাও হইবে তখন কি হইবে? তখন রাধাকৃষ্ণ বুলি বলিয়া কেই বা ধন্য হইবে আর কেই বা ধন্য করিবে?

সত্য বটে দেখিয়া শেখার চেয়ে ঠেকিয়া শেখারই দাম বেশী। কিন্তু এ জ্ঞানটা ঠেকিয়া শিখিবার পর যে আর প্রয়োগ করা ঘটিয়া উঠে না।

তাই আমার সনির্ব্বন্ধ ও শেষ অনুরোধ আর দিন কয়েক একটু কষ্ট করিয়া বাঁচ। ইহার মধ্যে যা হয় ত অনন্তের পথ ধরিয়া তোমাকে হারাইবার ভয় হইতে উদ্ধার পাইবেন, প্রিয়তমার প্রণয়ের সাধ অনেকটা মিটাইয়া একটু গুছাইয়া উঠিবেন; পুত্রকন্যারাও একটু খুঁটিয়া খাইতে শিখিবে। পুত্রশোকাতুর মাতার মূর্ত্তি সদ্য বিধবার মুখচ্ছবি ও পিতৃহীন অনাথদের ম্লান মুখ খুবই করুণ ও কবিত্বরসপূর্ণ সন্দেহ নাই কিন্তু আপনার মাতা, স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের মধ্য হইতে যদি ঐ রস বাহির হয় তাহা হইলে সেটা যে বড়ই তিক্ত হয় সেটা তো মান?

তাই বলি পত্র পাঠ অর্দ্ধেক মাহিয়ানায় ছুটি লইয়া চলিয়া এস। আমার এখানে একমাস বা দুই-মাস থাকিলে আমি একেবারে গরীব হইব না, তোমারও মান যাইবে না। যদি পরের খাওয়াটা মহা পাপ বলিয়াই মনে কর, সারিয়া উঠিয়া খাওয়ার খরচটা পাঠাইয়া দিও। যদি বল এতদিন তোমার টাকা কয়টা পড়িয়া থাকিবে? না হয় সুদও কিছু ধরিয়া দিও। যা দিবে আমি 'না' বলিব না।

অতএব এস। দয়া করিয়া এস। শীঘ্র এস। তোমার কবিদের ভাষায় বলিতে গেলে—

আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিততচিত্ত—তুমি এস।

আমি এই চিঠির পর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিব। যদি তুমি না আস বা আশাজনক কোন সংবাদ না দাও তাহা হইলে আর কখন তোমার কথা ভাবিব না।

তোমার—

সুহৃদ্"।

এ কথাই কতবার সুহৃদ্ আমাকে কতদিন হইতে বলিয়া আসিতেছে। কোন দিনই সে কথায় কাণ দিই নাই। তবে আজ সেই পুরাতন কথাই একটু নূতন ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আমার মনের উপর কি করিয়া এতটা আধিপত্য বিস্তার করিল, কি করিয়া গৃহকোণপ্রিয় ও চাকুরীঅন্তঃপ্রাণ আমাকে ৩ দিনের মধ্যে ৩ মাসের ছুটি লইতে বাধ্য করিয়া একেবারে দার্জ্জিলিংএর জন্য প্রস্তুত করিয়া পরদিন অপরাহ্ণে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আনিয়া উপস্থিত করিল তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।

সে দিন ট্রেণে ভিড়ও ছিল বেশী, "রসার যাত্রায় টিকেটও করিয়াছিলাম তৃতীয় শ্রেণীর। রেল ছাড়িতে ১৫ মিনিট তখনও দেরী ছিল। মিনিট ১০ ধরিয়া সারা প্লাটফরমখানি বার কয়েক ঘুরিয়া বসিবার মত একটা জায়গাও খুঁজিয়া পাইলাম না, এমন সময় ঢং ঢং করিয়া যাত্রিগণকে সতর্ক করিবার ঘণ্টা বাজিয়া গেল। তখন অতি মাত্র ব্যস্ত হইয়া সম্মুখে যে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িখান দেখিলাম বাচনিক এবং কিঞ্চিৎ শারীরিক বল প্রয়োগ করিয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। উঠিয়া দেখিলাম সম্মুখের দিকে দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ—সাম্‌নে যান্ কর্ত্তা, বেবাক্ খালিগাড়ি পাবেন, কোথায় আস্‌বেন্ মশাই মাথায় বস্‌বার তো নিয়ম নেই ইত্যাদি উপদেশ ও নিষেধ-সূচক যে সব কথা বলিয়াছিলেন তাহা একেবারেই নিরর্থক। কারণ বেঞ্চির উপরে তাহাদের এক একটীর প্রতিভূস্বরূপ চাদর, বিছানা, বা অন্য কোন পুঁটুলি রাখিয়া তাঁহারা কক্ষের দুয়ার রক্ষা করিতেছিলেন। আমি উঠিতেই তাঁহারা শশব্যস্তে আপন আপন চিহ্নিত জাগায় শরীরকে যতদূর বিস্তারিত করা সম্ভব তাহা করিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আমাকে নীরব ভাষায় জানাইয়া দিলেন এখানে দুই একটি তিল ধরিলেও ধরিতে পারে, কিন্তু আপনার মত একটি তাল এখানে আঁটিবে না।

হাতের ব্যাগটা কাঁধে লইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আমার মনে হইল ঠিক এই জিনিষটির অভিনয় পৃথিবীতে আমরা নিত্য করিতেছি ও দেখিতেছি।

এই যে এতগুলি ব্যগ্র আরোহী; ইহাদের মধ্যে কেহ নামিবেন রাণাঘাট, কেহ পোড়াদহ, কেহ বা আরো খানিক দূরে কেহ বা একেবারে শিলিগুড়ি তাদের মধ্যে তো সবাইকেই এ গাড়ী খালি করিয়া যাইতে হইবে। তবু এই সময়টুকুর জন্য একটু আরাম করিয়া বসিবার অভিপ্রায়ে আমাদের কত না আগ্রহ এবং ইহারই জন্য একজনের যদি ষ্টেশনে পড়িয়া অনন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তবুও আমরা

তাহাতে দৃক্‌পাত করি না। পৃথিবীতেও যে কটা দিন থাকি না কেন সেই কয়টাদিন সুবিধায় থাকিবার জন্ত কত না কাণ্ডই আমরা অহরহ করিতেছি।

বেঞ্চির উপরে রাখা একটি মাঝারি বস্তার উপরে হেলান দিয়া এক ভদ্রলোক একটু কাত হইয়া দুইজনের জায়গা লইয়া বসিয়াছিলেন। একটু রুক্ষ সহানুভূতি দেখাইয়া তিনি বলিলেন যান্ না মশাই এই খানটা দিয়ে ওই পাশের কামরাটায় বসবার জায়গা পাবেন এখন। এখানে দাঁড়ায়ে থেকে তো কেবল বাতাস বন্ধ করা।

উপদেষ্টার মিষ্ট উপদেশ অনুসারে পাশের কামরাটায় আসিয়া দাঁড়াইতেই একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে একটিবার মাত্র তাকাইয়া 'এই যে, দাদা এস', বলিয়া আমার হাতের ব্যাগটী লইয়া উপরে রাখিয়া দিলেন ও নিজে জানালার দিকে খুব ঘেঁসিয়া বসিয়া তাঁহার বামদিকে আমাকে বসাইলেন।

একটু পরেই ঢং ঢং করিয়া ঘন্টা বাজিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্লাটফরম ও আচ্ছাদনের বাহিরে আসিতেই খানিকটা আলোক ও বায়ু ভিতরে আসিয়া আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল এবং আমাদের পরস্পরকে ভাল করিয়া দেখিবার ও চিনিবার সুযোগ করিয়া দিল।

সেই কক্ষখানির দুইখানি বেঞ্চে সবশুদ্ধ আমরা ৯ জন বসিয়াছিলাম। আগে ৮ জন ছিল আমি আসাতে একজন বাড়িয়াছিল। আরোহিকয়টির মধ্যে জন ৫ উর্দ্দিপড়া উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী চাপরাসী ছিল তাহারা প্রভুর সহিত মাস কয়েক শৈলাবাসে চলিয়াছিল। বাকী কয়জনের ১ জন সন্ন্যাসী ও আমাকে লইয়া তিন জন বাঙ্গালী।

জ্যৈষ্ঠ মাস, প্রখর গ্রীষ্ম। গাড়ি ছাড়িতেই প্রথমটা মনে হইয়াছিল বুঝি বেশ বাতাসই আসিবে। কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল যে বাতাসটুকু আসিবে তাহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়ায় কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না, এই পর্য্যন্ত। মাত্র দুইখানি বেঞ্চি লইয়া সেই কামরাটি গঠিত সেজন্ত সেখানে অধিক বায়ু প্রবেশের আশা বৃথা।

সেদিনকার ব্যস্ততা কিঞ্চিৎ অধিক পরিশ্রম এই সমস্ত কারণে শরীর একেই দুর্ব্বল ছিল তাহাতে বায়ুর অল্পতায় ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলাম। যে ভদ্রলোকটী আমাকে আগ্রহকরিয়া বসাইয়াছিলেন তিনি মিনিট পনরের মধ্যেই আমি কে কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলিয়াছি কতদিন সেখানে থাকিব ইত্যাদি সমস্ত সংবাদ আত্মীয়ের মত আমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। আমার মুখের পানে খানিকটা তাকাইয়া তিনি বলিলেন—দাদা, তোমার কি কষ্ট হচ্ছে, বলত ভাই?

আমি একটু সংকুচিত হইয়া বলিলাম বাতাস কম পাচ্ছি তাই হাঁফ লাগ্‌ছে বলে মনে হচ্ছে।

"হুঁ, তাই বল্‌তে হয় এতক্ষণ দাদা তুমি এমন বোকা।" বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ জানালার নিকট হইতে উঠিয়া আমাকে সেখানে বসাইলেন ও আমার জায়গাটিতে শরীর যথাসম্ভব সংকুচিত করিয়া বসিয়া পড়িলেন। আপন মনে একবার বলিলেন নেপোলিয়ন বলেছিলেন Thou necessity mine মনে আছে তো,' না সে সব ভুলে গিয়াছ। বলিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিলেন। অন্ত সময় হইলে হয়ত বলিয়া ফেলিতাম বক্তা নেপোলিয়ন নহেন সার্ ফিলিপ্ সিড্‌নি বক্তৃতাতেও দুটি একটা কথা বাদ পড়েছে এবং ব্যাকরণের উপর অযথা অত্যাচার করায় অর্থটা একটু দুর্ব্বোধ্য হয়েছে। অন্ততঃ পক্ষে মুখের কোণে একটু হাসিও ফুটিয়া উঠিত। আজ তাহার কিছুই হইল না। এবং এই কথাটাই ভাল করিয়া মনের মধ্যে অনুভব করিলাম যে, যে মহাপুরুষ রণক্ষেত্রে আহত হইয়া আপনার তৃষ্ণার্ত্ত ওষ্ঠের নিকট হইতে সুধামধুর পানীয়টুকু মুমূর্ষু এক সামান্ত সৈনিকের মুখে ধরিয়াছিলেন তাঁহার সেই সময়কার সমস্ত কথাগুলি নির্ভুল ও যথাযথ ভাবে আমার মানসপটে অঙ্কিত থাকিলেও তাঁহার সেই ত্যাগোজ্জ্বল ভাবটুকু বরং এই ব্যাকরণদোষদুষ্ট অসম্পূর্ণ বচনের বক্তাটি বেশই আয়ত্ত ও কথিত কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন।

জানালার বাহিরে মাথা বাহির করিয়া দিয়া শীতল বাতাস স্পর্শে অনেকটা সুস্থ হইলাম। তখন সেই ভদ্রলোকটিকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তিনি একজন কবিরাজ। অনেকদিন হইতে শাহাজাদে চিকিৎসা

করিতেছেন। তাঁহার দেশ হুগলি জেলার কি একটা গ্রাম। তাঁহার মা শান্তাহারেই ছিলেন। কয়েক মাস দেশের বাড়ীতে থাকার ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহাকে দেশে পৌঁছাইয়া কলিকাতা হইয়া আবার শান্তাহার ফিরিতেছিলেন। ভদ্রলোকটির নাম মুরলীমোহন সেনগুপ্ত।

ট্রেণ রাণাঘাটে থামিতেই মুরলীবাবু বলিলেন রাণাঘাটের কাঁচাগোল্লা খুব ভাল। কিছু কেনা যাক; কি বল দাদা?

বলিয়া 'হাঁ কি না' কোন রকম কিছু জবাব শুনিবার আগেই এক খাবার ওয়ালাকে ডাকিয়া দুই টাকার সন্দেশ চট্ করিয়া কিনিয়া ফেলিলেন। এসবগুলির সদ্ব্যবহার হইতেও দেরী হইল না, কারণ এমনই মুরলীবাবুর নির্বন্ধ যে সেই কামরার একটি আরোহীও সেই মিষ্টান্নের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না, এমনকি সন্ন্যাসী ঠাকুরও নহেন। সকলকে খাওয়াইয়া তিনি নিজে গুটি কয়েক সন্দেশ সবশেষে খাইলেন।

রাণাঘাট হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর সকলেরই যেন একটু গরম মনে হইতে লাগিল। উর্দ্দির বোতাম খোলা হইতে লাগিল, এমন কি সন্ন্যাসী ঠাকুরও আলখাল্লা খানিকটা অংশ খুলিয়া তাঁহার মাংসলগলদেশ ও বলিষ্ঠ রোমবহুল বক্ষে বাতাস লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

মুরলীমোহন চট্ করিয়া দুটি বেঞ্চের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া একখানি পাখা হাতে করিয়া সকলকে বাতাস করিতে লাগিলেন। উর্দ্দিপরা লোকগুলি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর পর্য্যন্ত বলিয়া ফেলিলেন—কেঁও বাবা, "এত্ না তক্‌লিফ্ করতেহেঁ"।

আমার মনে হইল এটা যেন চোরের লক্ষণ। মুরলীমোহন সকলের বিস্ময় কুণ্ঠা সন্দেহ নীরবে পরিপাক করে প্রসন্নমুখে কহিলেন যে তিনি কি একেবারে রাজা মহারাজা নাকি যে একটু বাতাস করিলে শাস্ত্রীয় বিধান গ্রহ বিশেষ অশুদ্ধ হইয়া যাইবে। তিনিও তো বাতাস খাইতেছেন।

ভদ্রলোকটীর বাহাদুরী এই যে গাড়ীসুদ্ধ সকলে বাতাস খাইয়াও শেষটা এ ভাবটা কাহারও মনে হইল না যে একটা অস্বাভাবিক বা অশোভন কিছু হইতেছে।

পোড়াদহে ট্রেণ থামিতে মুরলীমোহন চট্ করিয়া নামিয়া পড়িয়া আমাদের কামরার অপর বাঙ্গালী ভদ্রলোকটীর জন্য এক পেয়ালা চা ও একটি চাপরাসীর জন্য পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিলেন। কথোপকথনের মধ্যে কোন্ সময়ে বাঙ্গালীটি একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হিন্দু চা কোথায় পাওয়া যায় এবং চাপরাসিটি ও বুঝি কোন ফাঁকে একবার পিপাসার আভাস প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল তাহা গাড়ীসুদ্ধ সকলে এমন কি বক্তা ভুলিয়া গেলেও উনি ভুলেন নাই।

লোকটীর উপর আমার একটা বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদয় হইল। ইঁহার অন্তরের মধ্যে এমন কি একটি উদার ভাব আছে যাহার বলে ইনি সকলকে এত অল্প সময়ের মধ্যে এরকম আত্মীয় করিয়া লইতে পারেন ইহা ভাবিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

সে ষ্টেশনটা বুঝি নাটোর। নাটোরে গাড়ী একটু থামিবার পর একজন আম লইয়া আমাদের গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুরলীমোহন আম কিনিতে লাগিয়া গেলেন। খুব কষা মাজা করিয়া দরদস্তুর ঠিক করার পর যেমনি দুইটি আম তুলিয়াছেন অমনি গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়া গেল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি গুটিকয়েক আম স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া গাড়ীর মধ্যে আমার হাতে দিলেন ও নিজের কামিজের খানিকটা অংশ পাতিয়া বাকী আমগুলি লইলেন। গাড়ী ততক্ষণ চলিতে আরম্ভ করায় লোকটিকে কিঞ্চিৎ দৌড় করাইয়া তাহার হাতে দাম দিয়া দিলেন।

তাহার পর স্থির হইয়া বসিয়া কামিজের আমগুলি গণিয়া দেখিলেন ১৫ টি। আমার কাছে যে আমগুলি ছিল গণিয়া দেখিলেন ৬টি।

ক্ষিপ্রহস্তে আমার নিকট হইতে আম কটি লইয়া অনেকটা যেন বিজয়োল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন—লোকটাকে এই কটি আম ঠকিয়েছি।

আমি ত একবারে স্তম্ভিত। যাঁহাকে এতক্ষণ ধরিয়া অনেকখানি উঁচু করিয়া ফেলিয়াছিলাম হঠাৎ তিনি ইচ্ছা করিয়া এক লম্ফে একখানি নীচে নামিয়া আসিলেন।

কাকের বাসা কি করিয়া ভোগে আসিল অর্থাৎ ষ্টেশনের ভেণ্ডারদের জিনিষ কি করিয়া ঠকাইলেন ইহা একজন জিজ্ঞাসা করিতে তিনি অম্লানবদনে বলিলেন—"বেটা তখন বুঝি অন্ত খদ্দেরকে আশ্বাস দিচ্ছিল যে যাবে, সেই ফাঁকে দুবার ৩টা করে ৬টা নিয়েই দাদার হাতে চালান্, তারপর দর হিসাবে ১২টা নেওয়া। দোকানে নিয়ে মিলোবার সময়ে বাছাধন টের পাবেন। তিনি এই কথা বলিয়া খুব একচোট হাসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চাপরাসীওলাও খানিকটা হাসিয়া লইল।

এতক্ষণে আমার কথা কহিবার যেন শক্তি আসিল। আমি বলিলাম—"আহা ও গরীব মানুষ কেন ওদের"—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন—ও কথাটি বোলোনা দাদা। ওরা মহা জুয়োচোর। ওজনে কম দেবে, জিনিষ দেবে খারাপ তারপর কখন কখন ফেরৎ পয়সা দেবে না। রোজ নূতন নূতন খদ্দের তাই না ওদের এত আস্পর্দ্ধা।

সেবার কি হলো জান ? আট আনার খাবার নিয়ে এক টাকা দিয়ে ফেরৎ পয়সা নেবার জন্ত হাত পেতে আছি এমন সময় দিলে গাড়ী ছেড়ে। পকেটে হাত দিয়ে পয়সাই গুণ্‌ছেন বাবু—পয়সা আর যেন হাতেই উঠ্‌ছে না। শেষে লোক দেখান সঙ্গে সঙ্গে একটু ছুটে 'যা গেলো' বলে থমকে দাঁড়ালে। আর আমি একেবারে বেকুব।

আমিও বড় ছাড়্‌বার পাত্র নই, পরের একটা বড় ষ্টেশনে না গিয়ে গাড়ী ছাড়্‌বে ছাড়্‌বে কর্‌ছে এমন সময় বারো আনার খাবার কেনা। গাড়ী তো ছেড়ে দিলে। পকেটে হাত দিয়ে বেশ একটু দেরী করে সিকি একটা প্লাটফরমের উপর ফেলে দিলাম। হেঁট হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে—"আর আট আনা বাবু বলে আমার পানে তাকালে। এ দিকে গাড়ী প্লাটফরম্ পার। 'এই ধর্ম্ম হল'—এই রকম গোছের একটা কথা কাণে গেল। এখন এল ধর্ম্মের কথা। যখন আমার আধুলিটি ফাঁকি দেওয়া হ'য়েছিল তখন ধর্ম্ম কোথায় ছিল ?

বলিয়া মুরলীমোহন রীতিমত আক্রোশ ও কিঞ্চিৎ তৃপ্তির সহিত সকলের মুখের পানে একবার চাহিয়া দেখিলেন।

তারপর সেই আমগুলির যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার। সেই উপরি পাওয়া ছয়টি আমের সহিত আর দুটি পয়সা দেয়া কেনা আম তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীঠাকুরের বৈকালিন জন্ত দেওয়া হইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ভক্তকে প্রচুর আশীর্ব্বাদবর্ষণ করিয়া ফলাহার সমাধা করিতে লাগিলেন। চাপরাসি করজন দুইটি করিয়া ভাগ বসাইল।

বাকী রহিল ৩টি। তাহার মধ্যে দুটি আমার কাছে আনিয়া বলিলেন—এ দুটি দাদা তোমার খেতে হবে।

আমার হাত দিয়া ছয়টি আম লাভ করার পর হইতে আমার মেজাজটা মোটেই প্রসন্ন ছিল না। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম—"মাপ করবেন, আমি আম খাব না।" এত যে ভদ্রলোকের উল্লাস কার্য্য তৎপরতা দমকা বাতাসের ঘায়ে প্রদীপের মত একটি মাত্র কথায় তাহা মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল।

নিতান্ত অপরাধীর মত তিনি বলিলেন—এ কটা তো কেনা আম, তবে খাবে না কেন ?

আমি আর না বলিতে পারিলাম না। তিনি তাঁহার ব্যাগ হইতে একটি প্লেট বাহির করিয়া পরম যত্নে নিজ হস্তে কাটিয়া দিয়া সত্য সত্যই আমাকে সেই দুইটি আম খাওয়াইলেন।

শেষে নিজে খাইলেন একটি।

রাত্রি বসিয়া কাটাইতে হইবেই স্থির করিয়াছিলাম। একটু রাত্রি হইতেই মুরলীমোহন সকলকে একটু একটু সরাইয়া বসাইয়া নিজে নীচে একটি পুঁটলি লইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আমি "রোগা মানুষ" বলিয়া এক প্রকার জোর করিয়াই আমার শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শুইয়া শুইয়া এই অদ্ভুত লোকটিরই পূর্ব্বাপর বিসংবাদী ব্যবহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, এমন সময় খাবাহার, খাবাহার হায়, কুলিদিগের ইত্যাকার বিচিত্র কলরবে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি মুরলীমোহন ব্যাগ ইত্যাদি লইয়া নামিতে উদ্যত হইয়াছেন।

আমাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—, জায়গা ছেড়ে উঠো না দাদা। এবার এক ঘুমে শিলিগুড়ি, এদিকেও ভোর। ব্যস্।

বাবুরা গাড়ী হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন।

একটি বিস্ময়ের উপর আর একটি বিস্ময় বাড়িল। ইঁহার ব্যবহার দেখিয়া মনে হইয়াছিল যাইবার সময় না জানি কত কথাই বলিয়া যাইবেন। অন্ততঃ ফিরিবার সময় তাঁহার এখানে যেন নামি অন্ততঃ এ অনুরোধ ও একবার নিশ্চয়ই করিবেন ইহা ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম তাহার বিপরীত। মরণের সময় জীবাত্মার পরমাত্মীয় যেমন তাহার সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যায়, ইনি ও তেমনি চলিয়া গেলেন। যতক্ষণ গাড়িতে ছিলেন আমরাই যেন সব, যখন গেলেন আমরা যেন কেহই নহি—এমনি ভাব তাঁহার। একি মুক্ত পুরুষের ভাব, না এ সর্ব্বৈব কপটতা?

যতক্ষণ গাড়িতে ছিলাম ইঁহারই কথা কেবল মনে পড়িয়াছে।

দুই টাকার সন্দেশ কিনিয়া তিনি এক দিনের—একদিনেরই বা কেন—এক ঘণ্টার পরিচিত লোকদের ব্যগ্র হইয়া খাওয়াইলেন, কি করিয়া তাঁহার এক আমওয়ালাকে ৬টি আম ফাঁকিদিয়া লইবার প্রবৃত্তি হইল, আবার কেনই বা সেই গুলি এবং নিজের কেনা আমগুলিও অপরকে খাওয়াইলেন তাহা ভাবিয়া আমি কোন কূল কিনারা পাইলাম না।

ইঁহার কোন কথাটি মনে করিয়া ইঁহার বিচার করিব? নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাকে স্থান দিয়া সর্ব্বতোভাবে আমাকে সাহায্য করা, না এক জনের নিকট ঠকিয়া সেই শ্রেণীর একাধিক লোককে ঠকাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা? ইঁহার সহৃদয়তা ও পরোপকারিতা মনে করিয়া ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিব না ইঁহার প্রবঞ্চনা করিয়া তাহা নির্লজ্জ ও নির্ব্বোধের মত প্রকাশ করার জন্য ইঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখিব তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

যে হিসাবে দিন ও রাত্রি আলো ও ছায়া ফুল ও কাঁটা একই জিনিষের বিভিন্ন দুই অংশ, মানব চরিত্রের ভাল মন্দও কি তাই?

এখন পর্য্যন্ত এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলাম না, এমনি করিয়া প্রত্যেক মানুষের ভিতর কি দুইটি করিয়া মানুষ চিরদিন বাস করিয়া আসিতেছে।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

শ্মশান।

নিষ্ঠুর তুমি হে শ্মশান ভূমি মমতার নাহি লেশ,
বিশ্ব মানব নিয়ে কর সব ভস্মের অবশেষ।
অঙ্গার তব অঙ্গ-ভূষণ, অট্ট অনল হাসি,
অঙ্কে তোমার রঙ্গে টানিয়া রেখে দাও ছাই রাশি।
স্বর্ণ কিরীট শিরের ভূষণ সজ্জিত কত রঙ্গে,
পুষ্প কোমল অঙ্গ উজল রক্ষিত কত যত্নে;
দুঃখে দহিয়া দিবস রজনী শান্তি যে নাহি পায়,
ভিক্ষার ঝুড়ি কক্ষে বহিয়া ভিক্ষায় ফিরে যায়;
নির্ম্মম করে নিয়ে সব ক্রোড়ে অনল শিখার মাঝে,
রাজা ও প্রজার সাজাও যতনে অঙ্গার নব সাজে।
ইন্দুবদনা দিব্যললনা উর্ব্বশী কিবা রতি,
মর্ত্ত্যে কামিনী চিত্ত তোষিণী ঈশানীর সম সতী;
টেনে লও তুমি হে শ্মশান ভূমি,—তোমার কালিমা রাশি
রমণীর রূপে নিষ্ঠুর রূপে মেখে দাও খল হাসি।

শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত।

শোক।

হৃৎপিণ্ডটা মুচ্ড়ে ওঠা; বুকের মাঝে অহর্নিশি জালা;
হৃদয়খানি চয় যে এই একটা মেয়ের চলা ফেরা খেলা;
দীর্ঘশ্বাসের প্রবল ঝড় শ্রান্তি কোণের ঈশান হ'তে বয়,—
যার ঢেউয়েতে জীবন খানি অশ্রুরূপে আঁখির পাতে রয়;
নৈরাশ্যের কুয়াসাতে সারাজগৎ শূন্য হয়ে যাওয়া;
বিপুল তৃষার অতৃপ্তিতে বৈরাগ্যটা না চাইতে পাওয়া;
ছোট ছোট কাঁপ-লাগা আর পিঁট-পড়া এক সুতোর নুটির মত
ব্যাকুল নানা চিন্তাগুলোর অনুসরণ করার প্রয়াস যত;
বর্ত্তমানে ঔদাসীন্য; ভবিষ্যকে মেঘাচ্ছন্ন দেখা;
অতীতটির মূর্ত্তি ধরে' চোখের মনের আগে দাঁড়ায় একা;
কি-হারাল, কি ঐশ্বর্য্য গেল যে তার ঠিক ঠিকানা নাই
কিন্তু একটা অতি বড় সর্ব্বনাশ যে হল সেই ভাবনাই;
সান্ত্বনায় ধূলায় লুটায় নিদাঘের শেফালিকার মত;
মাতালের পা-টলার মত ভুলে যাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াসশত;
অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি অতীতের সব স্মৃতির তোলাপাড়ায়;
শিশুর যেমন এক আনন্দ যা পাবে তাই কেবল মুখে পোরায়
বহুদিনের ভুলে যাওয়া ক্ষুদ্র তুচ্ছ কথা কিম্বা কায
গভীর নদীর গর্ভ হঠাৎ চরের মত স্পষ্ট জাগে আজ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

[library stamp]

পুরাণ-রহস্য।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবী যেমন পরমাত্মা ঈশ্বরের কল্পিত মুর্ত্তি, তদ্রূপ তন্ত্র, মন্ত্র, পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্র মুনিঋষি যোগিগণের স্বকপোল কল্পিত নয় বেদ-মূলক গ্রন্থ নিচয়। উহাতে ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগিগণের যোগ রহস্য ও আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহ রূপক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অজ্ঞানতা বশতঃ আমরা উহার গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ উক্ত গ্রন্থ সমূহকে উপন্যাস বলিয়া অবজ্ঞা করি। কেহ কেহ বা ঈশ্বরের অপূর্ব্ব লীলা মনে করিয়া সাদরে শ্রবণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করতঃ প্রেম ও ভক্তিরসে আপ্লুত হই। পুরাণ পাঠে অনেকানেক যুদ্ধ বিবরণ অবগত হওয়া যায়, উহা কি কেবল দেব, দানব, বানর রাক্ষস, ও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ? তাহা কখনই নয়। উহাতে যোগিগণের ক্রিয়াকাণ্ড অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে; পরমাত্ম-জ্ঞান সম্পাদনই গ্রন্থ সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। উক্ত যুদ্ধে নাম সাধন সমর। পরমাত্মার আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণের সহিত অবিরত এ আহবে রত। যুদ্ধের ফল ব্রহ্মরাজ্য লাভ। আদি কবি বাল্মিকী ও মহামুনি বেদ-

ব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থই উহার প্রধান দৃষ্টান্ত। গ্রন্থত্রয়ের আলোচনায় দেখা যায় উহাতে যোগের গূঢ় বিষয় ও পরমতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নাই। অতি সুকৌশলী ও সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন যোগী ঋষিগণ তদ্রচিত গ্রন্থ সকল এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে প্রত্যেক গ্রন্থেই আধ্যাত্মিক (আত্মভাব) আধিদৈবিক (দেব ভাব) ও আধিভৌতিক (জীব ভাব) তিন প্রকারের ভাব বর্ত্তমান আছে। স্ব স্ব অধিকারানুসারে পাঠকগণ তাহার এক এক ভাব গ্রহণ করিয়া সুখী হয়। তত্ত্ববিৎ ব্যতীত উক্ত গ্রন্থ সমূহের প্রকৃত ভাব উদ্ঘাটন করিতে কেহই সক্ষম হয় না এবং প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া গ্রন্থ নিচয়ের নানাস্থলে নানারূপ অনৈক্যতা ও মতভেদ লক্ষ্য করিয়া থাকে।

রামায়ণ।

প্রথমতঃ বাল্মিকী রামায়ণে আধ্যাত্মিক বিষয় ও যোগরহস্য কি আছে তৎপর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে যোগী জীবনের প্রথম অবস্থা হইতে শেষ অর্থাৎ ব্রহ্মরাজ্য লাভ পর্য্যন্ত কবি তাহার আভ্যান্তরিক বিষয়গুলি উদ্ঘাটন করিয়া রূপকভাবে দেখাইয়াছেন। কি উপায়ে নর-জীবন যোগীত্বে পরিবর্ত্তিত হয় এবং কি কি কার্য্যদ্বারা সিদ্ধযোগী হইয়া পরম পদ লাভ করে, সোহং বাক্যের অধিকারী হয় ও নির্ব্বান্ মুক্তি লাভ করে তাহা দেখানই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের এক পক্ষের প্রধান নায়ক রাম, লক্ষ্মণ ও রাজা দশরথ, নায়িকা মন্থরা কৈকেয়ী ও সীতা দেবী। অপর পক্ষের প্রধান নায়ক রাবণ রাজা ও বিভীষণ, নায়িকা সূর্পনখা প্রভৃতি। ব্যাপার রাম রাবণের যুদ্ধ ও কারণ সূর্পনখার নাশাকর্ণচ্ছেদন ও সীতা হরণ। তদনন্তর সীতাদেবীর উদ্ধার ও শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক ইহাই এ প্রস্তাবনার শেষ সীমা বা উপসংহার।

এই গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তা বাল্মিকীমহামুনি ঋষিগণের অগ্রগণ্য ও যোগীরশিরোমণি। যোগিগণ সর্ব্বদা অন্তর্লক্ষ্য পরায়ণ বাহিরের ধার ধারে না। আমরা সর্ব্বদা বহির্লক্ষ্যে রত, বাহিরের বস্তু অর্থাৎ ঘর, বাড়ী, সংসার, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নি পরিবার সহ বাস করি। আমাদের লক্ষ্য পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন ও উদ্দেশ্য তাহাদিগের প্রীতি সাধন। যোগিগণ তাহা করে না, তাঁহারা আভ্যান্তরিক বিষয় নিয়াই সর্ব্বদা মত্ত থাকেন। আত্মা তাহাদের পরম ধন, মন, প্রাণ, চিত্ত জ্ঞান বুদ্ধি তাহাদের অমাত্য বন্ধু ও বান্ধব। কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদি রিপু অর্থাৎ শত্রু, লক্ষ্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং আত্মোন্নতি তাহাদের উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় রামচরিত্রে ও তাহার বনবাসকাণ্ডে অবশ্যই কোন নিগূঢ় ভাব বর্ত্তমান আছে, তাহা কি? চিন্তা করিলে অনুমিত হয় রাম যোগাভিলাষি "বিশুদ্ধমন" যেহেতু রাম শব্দটি রম্ ধাতুর অন্তর্গত; রম্ ধাতুর অর্থ রমণ করা বা রত করান। অতএব পরমাত্মা সহিত রমণ করে বা তাহাতে রত (নিযুক্ত) করান যিনি তিনিই রামশব্দবাচ্য। যোগ শাস্ত্রের অভিপ্রায়ে অবগত হওয়া যায় একমাত্র অকলঙ্ক নিষ্পাপ মনই পরমাত্মা সহিত রমণ বা তাহাতে নিযুক্ত করাইতে সমর্থ, সুতরাং রাম "বিশুদ্ধ মন"। মন্থরা অর্থে মন্দগতি যার "স্থির চিত্ত" তাহাও মনের এক প্রকার অবস্থা, তাহা হইতেই শ্রীরামের যোগেচ্ছা সূচিত হইয়াছিল। মন্থরা কৈকেয়ীকে রাম বনগমনের জন্য উপদেশ দিলেন অর্থাৎ স্থির বুদ্ধি বিশুদ্ধ মনের গৃহ ত্যাগ নিমিত্ত কৈকেয়ীকে অনুরোধ করিলেন। এস্থলে কৈকেয়ী "বিবেক বুদ্ধি" বিবেক বুদ্ধি ইচ্ছা সত্ত্বে ও স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নয় সে কেবল জীবগণকে সংসারের অনিত্যতা দেখাইয়া তৎপ্রতি বীতস্নেহ উৎপাদন করিয়া দেয় কিন্তু প্রতিজ্ঞা ব্যতীত তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না। এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালনে রাজা দশরথকে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত বিবেক বুদ্ধি (কৈকেয়ী) ব্যাকুলা হইলেন। এখন দেখা যাউক দশরথ কে? দশরথ শব্দে দশদিকে রথ (গতি) যাহার "চঞ্চল"। অতএব চঞ্চল মনকে বিবেক বুদ্ধি কৈকেয়ী দৃঢ় করণ মানসে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ করিয়া লইলেন। সে প্রতিজ্ঞা কি! প্রতিজ্ঞা রামের অর্থাৎ যোগাভিলাষি

বিশুদ্ধ মনের বা মুমুক্ষার্থি জীবনের বনে গমন। গৃহ ত্যাগ ব্যতীত যোগাভ্যাস অসম্ভব অতএব রাম পিতৃ প্রতিজ্ঞা পালনার্থে বন গমনে কৃত-সংকল্প হইলেন।

যোগী যখন বনে গমন করেন তখন তিনি নিঃসহায় তাঁহার সাহায্যকারী একমাত্র যোগচিহ্ন আর যোগ শক্তি এতদ্ব্যতীত তাহার সঙ্গে আর কিছু থাকে না। স্বীয়বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হয়, জটা বল্কল ধারণ করে, তাঁহার খাদ্য বনফল, পাত্র বনপত্র ও জলপাত্র কর পত্র ইত্যাদি। যোগী জীবন রামের সহচর "লক্ষ্মণ" অর্থাৎ যোগীর চিহ্ন সকল যথা যম, আসন, প্রাণায়ামাদি অষ্টবিধ লক্ষণ ও সীতা যোগশক্তি শাস্ত্রকারগণ শক্তি স্ত্রীরূপে বর্ণনা করেন তাই রাম "বিশুদ্ধমন" যোগী লক্ষ্মণ বিশিষ্ট হইয়া সাহস শরাসন হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক যোগ শক্তি সহিত (রামায়ণোক্ত লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সঙ্গে) বিপদসঙ্কুল বনে গমন করিলেন। যোগী রাম বনে গমন পূর্ব্বক পাচটীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন সে পাচটি গুরু, জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস এবং প্রেম অবলম্বন করিয়া বসিয়াছিলেন তাই উহা পঞ্চবটী বন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যোগী জীবন রাম পরমাত্মার ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিলে অকস্মাৎ তাহার হৃদয়ে যোগানিষ্টকারী অরাতিগণের উপদ্রব হইতে আরম্ভ করিল। বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে যোগী যখন শ্মশান কি নিভৃতস্থলে যোগ সাধন করিতে উপবেশন করেন তখন যোগের অনিষ্টকারী শত্রুদল তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে অধিকার পূর্ব্বক বহুবিধ উৎপাৎ আরম্ভ করে। যথা ভূত প্রেত পিচাশাদির ভীষণ দর্শন, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদির বিকট শব্দ ও মায়াবিনী রাক্ষসিগণের মায়া বিস্তার ইত্যাদি। উহার তাৎপর্য্য এই যে নির্জ্জনবাসজনিত ভয়ের সঞ্চার হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি রিপুচয়কে ভূত, প্রেত, পিশাচবৎ নিরীক্ষণ করে। পিতা মাতা পত্নী প্রভৃতির আর্ত্তনাদ সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদির কণ্ঠবিদারক বিকট শব্দের ন্যায় স্মৃতি পথারূঢ় হয় এবং মায়াবিনী রমণী মূর্ত্তি রাক্ষসীরূপে দর্শন করিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে যোগীকে গৃহে প্রত্যাগমন করায় ঐরূপ রামের যোগার্থি "বিশুদ্ধ মনের" যোগভঙ্গ জন্য অধিকতর উৎপাৎ আরম্ভ হইল। রূপ, রস, গন্ধ তিনটিই যোগের অরি, প্রথমতঃ যোগীর হৃদয়ে রূপের আবির্ভাব হইয়া রূপ মনোমোহিনী রমণী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক যোগী রামের যোগভ্রষ্ট করিতে উদ্যত হইল সেই "রূপ" অর্থাৎ (মনোমোহিনী রমণী মূর্ত্তিই "সূর্পনখা" নামে অভিহিত হইয়াছে। সূর্পনখার রূপে মুগ্ধ না হইয়া লক্ষ্মণ (যোগী চিহ্ন বা যোগী স্বভাবে) ঐ মনোমোহিনী রমণী মূর্ত্তির ক্ষণভঙ্গুর দেহের পরিণাম চিন্তা দ্বারা তাহার নাশাকর্ণচ্ছেদিত (খণ্ডিত) কুরূপা মনে করিয়া অন্তঃকরণ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। সূর্পনখা রূপিণী "রূপ" এই প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া তদ্ভ্রাতা দশানন নিকট তাহার মনোবেদনা প্রকাশ করিল। এখন দেখা যাউক দশানন কে। দশানন শব্দের অর্থ দশটি আনন অর্থাৎ মুখ যাহার চিন্তা করিলে অনুমান হয় দশেন্দ্রিয়যুক্ত "পাপমতি" মনই দশানন, দশশির বা দশস্কন্ধ রাবণ রাজা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রাবণ রাজা স্বীয় সহোদরা (রূপের) অবমাননায় অবমানিত হইয়া তাহার কৃতকার্য্যের পরিশোধার্থে যোগীর জীবন সর্ব্বস্ব প্রাণ-প্রতিমা সীতাদেবী (যোগশক্তি) কে ছলক্রমে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। সীতাদেবী (যোগশক্তি) অপহৃত হওয়ায় রাম (যোগাভিলাষি বিশুদ্ধ মন) সীতা বিরহে কাতর হইয়া মণিহারা ফণিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া যোগশক্তি উদ্দেশে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাননে আসিয়া অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়াশক্তি ত্যাগ করিয়া রাম চতুর্দ্দিক অন্ধকার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অসহায়ের সহায় একমাত্র সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন কল্যাণপ্রদ ঈশ্বর, কৃপাময়ের অসীম কৃপায় যোগীহৃদয়ে অকস্মাৎ ভক্তির উদয় হইল। আপনাকে আপনি অনুসন্ধান করিয়া ভক্তিরূপ পরম সুহৃদ প্রাপ্ত হইলেন, সেই ভক্তির আদর্শই হনুমান নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা হনুশব্দ হন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়, হন্ ধাতুর অর্থ হনন বা বধকরা, নাশকরা, অতএব সর্ব্ববিষয়ে আশক্তি বিনষ্ট হইয়া পরমাত্মে নিষ্ঠা সংস্থাপিত হয় যদ্বারা তাহাই ভক্তি, শাস্ত্রে কথিত আছে যে (ভক্তি জনয়িত্রী জ্ঞানভক্তিমুক্তি প্রদায়িনী) অর্থাৎ ভক্তি হইতে জ্ঞান

জন্মে এবং জ্ঞানেই মুক্তি প্রদান করে। এই "জ্ঞান"ই বিভীষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে যেহেতু হনুমান হইতেই বিভীষণের সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল। বিভীষণ অর্থে বিগত হয় ভীষণ যন্ত্রণা। যাহাকে পাইলে ভব ভীষণ (যম) তাহার ভয় থাকে না নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় পণ্ডিতগণ তাহাকেই জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই "জ্ঞান ও ভক্তি" সাহায্যে যোগী জীবনরাম "বিশুদ্ধমন" তাহা সীতা বিরহ জনিত শোক সাগরের অপর পারস্থিত সীতাদেবীর (যোগশক্তির) অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন এবং দুষ্ট দশানন (পাপ মতি) কে সবংশে সংহার পূর্ব্বক যোগশক্তি পুনর্লাভে রাম সিদ্ধ যোগী হইয়া ব্রহ্মরাজ্য লাভ করিলেন অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইলেন।

মানব জাতীর মনই সর্ব্ব কর্ত্তা, মন হইতে মনুষ্যের হীনত্ব ও তাহা হইতে দেবত্ব লাভ হয়। মন বহুরূপী, মনই রাজা, প্রজা, ধনী, দীন, দুঃখী, সুখী ইত্যাদি। এই জন্য কবি এক মনকে মন্থরা, কৈকেয়ী, রাম, রাবণ ও দশরথ ইত্যাদি নানা সাজে সাজাইয়া তাঁহার কবিত্বের অসীম শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। রামায়ণের ন্যায় হৃদয়গ্রাহী পরম পবিত্র গ্রন্থ আর দৃষ্টিগোচর হয় না, ইহার আধ্যাত্মিক, আধি দৈবিক ও আধি ভৌতিক তিনটি ভাবই অতি মনোহর তাই ইহা মহাকাব্য নামে পরিচিত।

প্রাগুক্ত মহাকাব্য রচনার পূর্ব্বে এরূপ ত্রিবিধ ভাব পূর্ণ পরম পবিত্র কবিত্বের আবির্ভাব ছিল না, আজকালকের মত নানাবিধ উপন্যাসের ছড়াছড়ি ছিল না তাই গ্রন্থকর্ত্তা বাল্মিকী আদি কবি নামে অভিহিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানকালের কবিগণ যেমন কোন একটা ঘটনা বা ইতিহাস অবলম্বনে তাহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেন, কিন্তু মহাকবি তাহা করেন নাই। রামায়ণ যে কোন ইতিহাসের অন্তর্গত নয় তাহা গ্রন্থ কর্ত্তা তদীয় গ্রন্থেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীরামচন্দ্র জন্মিবার ষষ্টিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে। অতএব আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহ যে রামায়ণ গ্রন্থের মূল ভিত্তি স্বরূপ ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

লঙ্কাকাণ্ড রামায়ণে রাম-রাজ্যাভিষেকপরেও সীতা নির্ব্বাসন ও লক্ষ্মণ বর্জ্জনের কথা উল্লেখ আছে, তাহার গূঢ় বিষয় এই যে যোগীর যোগ সিদ্ধ হইলে তাহার যোগ শক্তির সাহায্য ও যম নিয়ম প্রাণয়োমাদি অষ্টবিধ লক্ষণের আবশ্যক করেনা, সিদ্ধ যোগীর সকলই পরিত্যক্ত হয়।

শ্রীশশিভূষণ কর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ব্যর্থ অভিমান।

নিবিড় ঘন আঁধার মাঝে ছিলাম যবে আমি,
আঘাত দিলে গৃহের দ্বারে-হে মোর জীবন-স্বামী
নিরাশ দুখে এলিয়ে পড়া
জীবন খানি ব্যথায় ভরা—
এক্ নিমেষে উঠ্‌ল হেসে—ঘুচ্‌ল দুখ-জ্বালা,
অশ্রু মুছে কণ্ঠে তোমার পরিয়ে দিনু মালা।

ভেবেছিলাম এবার প্রিয় থাক্‌ব অভিমানে,
ছুটব নাক বরণ লাগি আবেগ-ভরা প্রাণে।
থাক্‌বে পড়ে পূজার থালা,
যত্নে রচা সাধের মালা—
শুষ্ক হয়ে পড়্‌বে ঝরে, লুটবে ধূলার মাঝে,
প্রেম্-পূজকের অর্ঘ্য খানি ব্যর্থ হবে লাজে।

বরণ কভু করব না আর, দিবই ফিরায়ে,
উপেক্ষিয়ে স্নেহের বাণী চল্‌ব এড়ায়ে।
অশ্রু ভরা ব্যাকুল প্রাণে
তুল্‌ব না সুর করুণ তানে,—
জীবন ভরে তার আশেতে থাক্‌বে না আর মন,
চাইনে আমি নিঠুর জনের ক্ষণিক দরশন।

নীরব-রাতে গৃহের দ্বারে যখন তুমি এলে,
হৃদ্-গগনে হঠাৎ একি তড়িৎ গেল খেলে।
সুখের কিরণ উঠ্‌ল ফুটে,
মানের স্বপন পড়্‌ল লুটে,
অন্ধকারে মোহন আলোর মধুর পরশে—
বেদন্ ভুলে পরাণ আমার জাগ্‌ল হরষে।

শ্রীভক্তিসুধা রায়।

বরদা।

(১)

"সই, তুমি এমনটী হয়েছ?—ইস্" 'কে? সই এয়েছো, এসো বসো কখন এলে সই!"

"অমন অতসী ফুলের মত রংটায় কে কালী মেখে দিলে সই?"

"ভগবান দিয়াছেন! তিনিই দিনকে রাত করেন। তুমি কখন এলে?"

"এইত এয়েছি মাত্র। এসে হাত পা ধুয়ে একটু জলযোগ কচ্ছি,—মা বল্লে চারু, শীগ্‌গির একটীবার বরদাকে দেখে আয়, সে বুঝি আর বাঁচে না। অম্‌নি ছুটে এলাম। হায় সই, তোমাকে চেনবার শুধু সেই দীর্ঘ একরাশ চুল আর চোখ্ দুটী আছে। অমন ডাক-সাইটে সুন্দরী তুমি—তোমার সৌন্দর্য্য উবিয়ে গেছে!"

"প্রয়োজন?"

"যাক্ এখন মনটায় জোর বাঁধ দিকিন! দু'দিনে সেরে উঠ্‌বে। আমি তোমায় বাঁচাবো সই!"

"আমায়?"

"হাস্‌লে যে বড়! মানুষ শ্মশানঘাট থেকে ফিরে আসে।"

"তাদের প্রয়োজন থাকে। আমার?"

"প্রয়োজন নাই! এই ত?—তবু তুমি সেরে উঠে দেখ দুনিয়ার কত কি কাজ তোমায় ডাক্‌ছে।"

"সত্যি? না?—"

"তুমি অষুধ খাও অবিশ্যি! চিকিৎসা করেন কে? ডাক্তারী না কব্‌রেজী?"

"তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে এয়েছেন সই?"

"না। উনি জমিদারী দেখ্‌তে গেছেন। আমি দাদার সাথে এসেছি।"

"ইস্—অনেকদিনে এলে। তোমার ছেলে মেয়ে ক'টী?"

"একটী ছেলে। তোমার টেবিলে ত অষুধপত্র দেখ্‌ছি না।"

"ছেলেটী সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন? একটু দেখ্‌তাম। ছেলে হয়েছে তাও শুনিনি। সে কত বড়টী হলো সই?"

"আট বছরের। তুমি কি পথ্য কর্চ্চ?"

"কাল ছেলেটী নিয়ে এসো। দেখ্‌ব। মনে থাক্‌বে?"

"তুমি ক'দিন থেকে বিছানা নিয়েছ?"

"ছেলেটীর নাম কি সই?"

"তুমি ত খালি প্রশ্নই কর্চ্ছ। আমার একটা কথারও উত্তর দিচ্ছনা। বার তেরটী বছর পরে দেশে এলাম; কারো কাছে একটী কথাও শুনিনি—তোমায় জিজ্ঞাস্ কর্চ্ছি তোমার কথা,—কেবলি পাশ কাটাচ্ছ।—"

"চটো না সই। বাজে কথা বক্‌তে পারিনা। অজিত বাবু কবে আস্‌বেন?"

"এত কথা কইতে পার, আর আমার দুটা একটা উত্তর দিতে পার না তুমি!"

"কি বল্‌বে বলমা।"

"তোমার স্বামী কোথায়?"

"হুঁ—"

"একি? তোমার চোখ্‌ দুটো সহসা জলে ভরে এলো কেন? একি পাশ ফিরছ যে।"

"উ—স্"

"কাঁদ্‌ছ সখি! ছিঃ— শুনি সব—তারপর—"

"আজ যাও সই! কাল এসো।"

(২)

"উমেশ বলে একটী ছেলের সাথে ওর বিয়ে হয়। উমেশ নাকি নেহাইত গরীবের ঘরের ছেলে,—ওদের বাড়ী এসে উড়ে পড়ে। আগে চাক্‌রী কর্ত্ত,—তারপর দু'জনে বুঝি ভাব হয়। ছেলেটী দেখ্‌তে ছিল যেন কার্ত্তিক কিনা—তাই। বরদার নেহাৎ পছন্দ হয়ে গেল। তার বাপত চটে লাল। ওর হাতে মেয়ে দিবেন না। মা বল্লেন—হোক্‌না গরীব! একখানা সম্পত্তি লিখে দিলেও বছরে বার হাজার টাকা। ওর হাতেই বরদাকে দাও,—যখন মেয়ের মন ধরেছে। কুমুদবাবু তখন অনিচ্ছায় বিয়েটী দিলেন।"

"বেশত! ভালইত হলো! তবে উমেশবাবু কোথায় এখন?"

"শোন্‌ই আগে। বিয়ের ক'দিন পর—কি জানি কেন,—একদিন উমেশ চলে যায়। কোথা যায় কেউ বল্‌তে পার্লেনা। পাড়ায় কথা উঠল—সেটাই পরে সত্যি বলে জান্‌ছি,—কথা উঠল,—উমেশ আর বরদা কি নিয়ে একটু মন কষাকষি কর্চ্ছিল। তারি দরুণ কুমুদবাবু নিজে—সেই দুপুর রাত্তিরে মেয়ের ঘর থেকে উমেশকে দু'কাণ ধরে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে একেবারে বৈঠকখানায়। তারপর তাকে কত গালাগাল। ছোটলোক, ইতর, পাথর, কুকুর—আরো কত কি? শেষটা বল্লেন—আর যদি কখনো ন'পার পা দিস্ তোর মাথা মুড়া'ব। আমার মেয়ে বিধবা হয়ে থাকুক্—সেও ভাল—বেরো হারামজাদা আমার বাড়ী হতে। তার পর উমেশ সেই এক কাপড়ে কোথা গেল কেউ বল্‌তে পারে না।"

"হাঁ মা, এতদূর? কুমুদ বাবু, এতখানি কর্লেন,—একটী বার মেয়ের দিকে চাইলেন না!"

"লোকে ছিঃ ছিঃ করতে লাগ্‌ল।"

"উমেশেরই বা দোষ কি? মানুষ আর কত সৈবে? গায়ে যা'র রক্ত আছে, সে কি সৈতে পারে? আচ্ছা মা, উমেশের কোনওই খোঁজ নাই? সে গেছে—আজ কত দিন?"

"আট নয় বছর।"

"এত দিন খোঁজ খবর নেই? সই ত একেবারে আধমরা হয়ে গেছে। ও যে বাঁচ্‌বে তেমন ত বোধ হয় না।"

"তোর বিয়ে হয় দশ বছরে—ওর হয় চৌদ্দ পনর বছর বয়সে। মেয়েটা প্রথম প্রথম কেবল কাঁদ্‌ত।

ওরা প্রবোধ দিতেন—সে আস্‌বে—চেষ্টা কর্চ্ছি—লোক পাঠাচ্ছি ইত্যাদি। তার পর আজ তিন বছর এক প্রকার আহার নিদ্রা ছেড়েই দিয়েছে। এখন ত অথন তথন অবস্থা।"

(৩)

"আচ্ছা সই কি করে কি হলো সব খুলে বল না। আজ কদিন থেকে তোমায় এত অনুরোধ কর্চ্ছি। কেবলি আজ না কাল কর্চ্ছ। আজ বল্‌তেই হবে।"

"সই! শোন তবে—আমি অযোগ্যকে বরণ করি নি। তার ধন দৌলত ছিল না কিন্তু সারা দুনিয়ার ধন দৌলতের চাইতে ওজনে বেশী একটা হৃদয় ছিল। একদিন দেখ্‌লাম অতিথিশালার দুয়ারে এক ছেঁড়া ব্যাগ হাতে।

তারপর দেখ্‌লাম উনি সেরেস্তায় মুহুরী। শুন্‌লাম ওঁর লেখাটেখা দেখে বাবা ওঁকে আশ্রয় দিয়েছেন। মা বাপ নাকি কেউ নাই। যেমন দশবিশজন আমলা তেমনি উনি। কেউ তাঁকে বিশেষ করে জান্তনা। কিন্তু ক্রমে তাঁর গুণ, তাঁর মহত্ব বের হয়ে পড়্‌ল। ডোমদের পাড়ায় একবার মা'রী লেগে গ্রাম শুদ্ধ উচ্ছন্ন হবার যোগাড়।—তখন এই মানুষটুকু সেখানে গিয়ে কাউকে অষুদ, কাউকে পথ্য, কাউকে, সান্ত্বনা কাউকে সংকার করে এলেন। দু'হপ্তা ধরে ডোম পাড়ায় পড়ে রইলেন। মারী কমে গেলে দেশ শুদ্ধ ওঁর নাম-ডাক পড়ে গেল। তখন একদিন ভালকরে জানালা খুলে দেখ্‌লাম হাঁ সই দেখ্‌বার মত বটে। দাও একটু বেদানার রস।"

"তার পর—তারপর সই?"

"শোন। সে বছর ম্যানেজারের বাসায় আগুন লাগে। ম্যানেজারের একবছরের শিশু ঘরে ঘুমে। সব তাঁরা বাইরে কেবল আকুলি বিকুলি কর্চ্ছেন, আর চেঁচাচ্ছেন: উনি ছুটে সেই জলন্ত ঘরে ঢুকে ছেলেটাকে পিঠে বেঁধে লাফিয়ে বাইরে এলেন। পা দুটা, হাতের খানিকটা ঝল্‌সে গেল। সবাই ধন্যি ধন্যি করে উঠ্‌লেন।

তার পর ১৩০৪ সালের ভূকম্পে যখন আমাদের সব দালান চৌচির। মা তখন বাতে অচল। দোতালা কাটিয়া হাঁ করিয়া গেছে। তাতে মা যে কোঠায় সে কোঠা আস্ত থাক্‌লেও কেউ মা কে নামাবার সাহস কর্‌লে না। সবাই নীচে দাঁড়িয়ে হা হুতোশ্মি কর্ত্তে লাগ্‌ল। বাবা ত সারা জমিদারী বখ্‌শিশ দিতে প্রস্তুত হলেন। সে সময় সবাই বিস্মিত হয়ে দেখ্‌ল—ঐ এক ফোঁটা মানুষ মাকে নিয়ে যেন যমের বাড়ী থেকে ফিরে এলো। হাজার মানুষ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। আমি ছুটে মায়ের কাছে গেলাম। আর ভক্তিতে ঐ মানুষটীকে একটা প্রণাম করে বস্‌লাম।"

"মানুষের মত মানুষ বটে সই।"

"সই! শুন্‌তাম পাড়ায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উৎপাতে ওঁর বাসায় টেঁকা দায় হতো। কেউ ফুল, কেউ পেয়ারা, কেউ এটা কেউ সেটা করে তাঁকে জ্বালাতন কর্চ্ছে। কেউ ঘাড়ে উঠেছে—কেউ কোলে চড়ে বসে আছে। এমনিকরে পাড়ায়ও তাঁর নাম পড়ে গেল। স্কুলের ছেলেদের যত আব্‌দার ওঁর কাছে,—যেন তিনি একটা বড় মাষ্টার। একটা সামান্য মুহুরীর অতবড় নাম ডাক টা কেউ কেউ অপছন্দ কর্ত্তেন। তিনি ওসব গ্রাহ্যও কর্ত্তেন না।"

"যাদের প্রাণে বল থাকে, তারা সাধারণের সমালোচনাকে থোড়াই হিসাব করে।"

"শোন সখি আরো মজা আছে। বাসন্তী পূজার দিন সকাল বেলা বাবা এসে ম্লান মুখে হাজির। শুন্‌লাম সেদিন সকালে পুরুত ঠাকুরদের অশৌচ হয়ে গেছে। এখন উপায়? অন্ততঃ একজন এমন মানুষ চাই, যে মা'র পূজাও কর্ত্তে পারে চণ্ডী পাঠও চলে। বাবা একে একে সকল কর্ম্মচারী, মাষ্টার পণ্ডিত—যাঁরা ছিলেন সবাইকে জিজ্ঞাসা কর্লেন। কেউ সাহস কর্লে না। আমি মাকে বল্লাম—মা আমি ত রোজই জানালায় বসে দেখি যে একজন মুহুরী আছেন, উনি স্নান আহ্নিক করে, কি জানি কত কি সুন্দর স্তোত্র পাঠ করে চলে আসেন, হয়ত উনি পূজা কর্ত্তে সমর্থ হবেন। এই শুনে মা বাবাকে বল্লেন। খানিক পরে

বাবা এসে খুসী হয়ে বলে গেলেন—'হাঁ উমেশও বলেছে, সে পারবে।' তার পর নাকি ওঁর চণ্ডীপাঠ শুনে আমাদের পুরুত ঠাকুর পর্য্যন্ত খুসী হয়ে ছিলেন। এতগুলি গুণ দেখে আমি তাঁর বড় অনুরাগিণী হলাম। যত সম্বন্ধ এল—আমার ধাইকে দিয়ে মার কাছে সব মানা কর্ত্তে লাগ্‌লাম। শেষটা মাকে জানান গেল—'এর সাথে আমায় জুড়ে দাও।' অনেক আপত্তির পর বাবা খুব বিরক্ত হয়ে রাজী হলেন। তখন আমার বয়স চৌদ্দ, ওর বাইশ তেইশ। ওরা বংশে ভাল ছিলেন—তাই নাকি বাবার রাজী হবার একমাত্র কারণ।"

"গণ্ডগোলটা হলো কি নিয়ে সই" ?

"অভাগীর কর্ম্মদোষে। আমরা যখন বড় সুখের সাগরে পাল তুলে যাচ্ছিলাম, তখন প্রায়ই দু জনে কৃত্রিম ঝগড়া হতো। কোনো কোনো দিন মান অভিমানের অভিনয়ে রাত কেটে যেতো। এত সুখের বোঝা অভাগী বইতে পার্‌লাম না। একদিন তিনি বল্লেন—'বরদা বেশ করে এক কল্কে তামাক সাজো।'

সে দিন আমার মেজাজ কি জানি কেন রুক্ষ ছিল। আমি কড়া কথায় বল্লাম—'তিন টাকা মাইনের মুহুরীর তামাক সাজবে দেশের মালীক কুমুদ বাবুর মেয়ে ?'

'নিশ্চয়—সে আমার দাসী। 'নিশ্চয় না—আমি তার মনিবের কন্যা—তারও প্রায় মনিবই বটে।'

'সে দিন গেছে— এখন আমি তার মালীক—'

"এমন প্রায় হতো; কিন্তু সেদিন হঠাৎ একটা বেফাস কথা মুখ দিয়া বেরিয়ে পড়্‌ল। বলে ফেল্লাম—"ইস্ কাঙালের পুত্তের নাম মিঞা খাঁ" তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল—তিনি ভয়ানক রেগে 'কি বাপ তুলিস্' এই বলে ঠাস্ করে আমার গালে এক চড় মার্লেন— আমি 'মা গো— মেরে ফেল্লে—' বলে বসে পড়লাম; বাবা বুঝি তা শুনলেন—তার পর যা ঘটেছিল, দেশের লোক তা নিয়ে কত কি বল্‌চে।"

"তুমি তাকে ফিরালে না কেন ?" "বাবা তাকে নিয়ে যাওয়ার পরই আমার অনুতাপ এল। ছুটে গিয়ে কাছারী ঘরের পেছনে দাঁড়ায়ে বাবার নিষ্ঠুর আদেশ শুনলাম। তারপর দেখলাম তিনি দুবর দরজা পার হয়ে যাচ্ছেন। সেই গভীর রাত্রিতে আমি ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলাম। সেখানে আর কেউ ছিল না। চার দিকে জমাট অন্ধকার। তাঁর পা ধরে কাঁদলাম। শেষটা তিনি আমায় ক্ষমা করে বল্লেন— "তোমার বাপকে আমি ক্ষমা কর্ব্ব না। তোমার কথাটা মাত্র আমি ক্ষমা কর্‌লাম। যদি দিন পাই, তোমায় নিয়ে যাব। এখন ঘরে যাও।"—হায় আমি অভাগী কেন তখন তাঁর সাথে গেলাম না।"

"আর তার কোনো খোঁজ পাও নি ?"

"অনেক দিন পাই নি। প্রায় বার বছর পরে আমাদের এক চাকর এসে আমাকে এক চিঠি দিলে। চিঠি খানা ওর নামেই লিখিত। তাতে আমার কথা।"

"তিনি কোথায় আছেন ?"

"ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যে। তিনি আজও আমায় ভুলেন নি। অপমানও ভুলেন নি।

'ওখানে গেলে না কেন ?'

'সে কোথায়— কি করে যাব ?'

'বাপকে বল্লেই হতো।'

'কখ্‌খনো না। তাঁর স্মৃতি বুকে রেখে মর্ত্তে বসেছি —মর্ব্ব।'

(৪)

"সত্যি বল্‌ছ সই ?"

"হাঁ সত্যি।"

"তিনি জবাব দিয়েছেন ?"

"এখনো আসে নি।"

"তিনি আসবেন না ?"

"বড় অভিমানী সে আমার। ভাতের কথা, বাপ মার দারিদ্র্যের খোঁটা, মানুষ ভোলে না। সে আমার দর্পী—সে মানুষ সে আসবে না সই !"

"কুমুদ বাবু ক্ষমা ভিক্ষা করে দীর্ঘ টেলিগ্রাম করেছেন। তোমার বর্ত্তমান অবস্থা লিখেছেন। তিনি আসবেন।"

"হয়নি সখি। তার হাতে টাকা আছে কিনা কে জানে? সে বহু দূর দেশ, আসতে ঢের টাকা খরচ লাগে। তারপর অন্ততঃ একথা লিখলে হয়ত—সে জানতো যে তোমাকে উপযুক্ত সম্পত্তি দিয়ে পৃথক বাড়ী করে দেওয়া যাবে—' নৈলে এ বাড়ীতে সে এসে চখারীর মত আবার উঠ্‌বে—আমার বিশ্বাস হয় না।"

"আমি যাচ্ছি কুমুদ বাবুর নিকট। তিনি আজ দিন সব কাজ ছেড়ে তোমার জন্য দিন রাত কাঁদছেন।"

"হায়, হতভাগিনী কন্যা।"

(৫)

"বাবা মা কেঁদে উঠে গেলেন কেন সই? ডাক্তার কি বল্লেন?"

"একটু বেদানার রস খাও-- আর এই অসুদটা—তার পর বল্‌ব—"

"টেলি এয়েছে আজ ক দিন?"

"ন দিন।"

"ক দিনে আসা যায়?"

"আজ এসে পৌঁছবেন।"

"তবে বাবা মার চক্ষে জল কেন?"

"তাঁরা তোমার—"

"বড় ভালবাসেন— না?"

"তুমি তাঁদের একমাত্র কন্যা।"

"মেয়ে মাত্র। অপদার্থ সন্তান-—"

"তবু সন্তান—"

"এই মাত্র। মেয়ে হওয়ার চেয়ে—একটু বেদানা—ডাক্তার কি বল্লে—"

"বল্লে তুমি সেরে উঠ্‌বে"

"মূর্খ—ডাক্তার।"

"অত বড় ডাক্তার— সে বলেছে—"

"ডাক্তার বলে নি—টাকা বলেছে—বাবা মার মুখ চেয়ে—"

"হাসৃছ কেন ওরা—বিজ্ঞ"।

"যাক্ দেখত কটা বাজল—"

"বারটা।"

"ববে বেল— একটু বেদানার—"

"সই এমন কর্চ্ছ কেন?"—

"বুকটা চেপে ধর—আট বছর—"

"অমন কর্লে উমেশ বাবুকে তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে দেওয়া হবে না— সক্ হবে।

"তুমি কি বুঝবে— তৃষ্ণা—"

"তবে কিন্তু সব গোল করে দিবে।"

"চুপ—ঐ ষ্টেসনে ঘণ্টা পড়ল বুঝি। বারান্দায়—দাঁড়াও—ট্রেণ—"

"মালগাড়ী—যাচ্ছে ওটা—"

"ঘড়ি রোজ ঠিক চলে না। সে হয় ত ষ্টেসনে এসে বসে আছে। অভিমানী আসবে না—"

"কুমুদ বাবু নিজে ষ্টেসনে গেছেন।"

"তুমি বারান্দায় দাঁড়াও—ঘরটার দোর জানালা খুলে দাও আর—কতকগুলি ভাল ফুল—"

"চুপকর কথা কয়ো না—"

"কিন্তু ভিতরে টগবগ করে ফুট্‌ছে।"

"কি?"

"আনন্দ—আর কি জানি কি?"

"খবর কি সই?"

"তিনি এয়েছেন?"

"কৈ?—কোথায়—কোথায়—এখনো এলো না—কৈ কৈ সে আমার?"

"উঠো না— আহা—শুয়ে পড়—এত আকুল হলে দেখা হবে না বলছি।"

"সরে যাও এখন ভাল লাগেনা কোনো কথা—আজ আট বছর— উঃ —"

"শুয়ে পড়— হায় হায় আপনারা কেউ আসুন—বরদার মূর্চ্ছা হয়ে গেছে।"

(৬)

'বরদা'

'কি'

'এই খড়েরঘর—এই সংসার— এই কাজকর্ম—পারবে—'

'হাঁ পার্‌ব—'

'হায় লক্ষ্মী তোমায় হারাতে বসে ছিলাম— তোমার সই—তোমায় ফিরিয়ে দিলে—'

"আমার পাপের ফল।"

"আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।"

"বাবা তোমাকে সম্পত্তি লিখে দিয়েছেন বুঝি।"

"আমি ও চাই নে। আমার সম্পদ তুমি। আর কেউ নয়। পরের দেওয়া ভিক্ষা এক মুঠো আর দু মুঠো—"

'চল তবে এই ঐশ্বর্য্যের ছায়া ছেড়ে তোমার পল্লী কুটীরে যাই।'

'হাঁ বরদা একটু সেরে ওঠো।'

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্যিক পত্র।

(স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি, আই, ই, মহোদয়ের নিকট লিখিত। তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।)

পণ্ডিত শিবচন্দ্র দেবশর্ম্মার পত্র।

ভাটপাড়া
২৪শে শ্রাবণ ১৩১৬।

অসীমাশীর্ব্বাদপুরঃসরবিজ্ঞাপ্তিরিয়ম্—

মহোদয় বিদ্যাসাগর, আপনার প্রেরিত 'জানকীর অগ্নিপরীক্ষা' ও 'নিশীথ চিন্তা' নামক দুই খানি পুস্তক যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তক দুই খানি পাঠ করিয়া প্রাপ্ত সংবাদ লিখিব, এই ইচ্ছায় তৎকালে পত্রাদি লিখি নাই।

'জানকীর অগ্নিপরীক্ষা' পুস্তকখানিই অগ্রে পাঠ করিয়াছি, পাঠ করিয়া এরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি যে দ্বিতীয় খানির পাঠ করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া অগ্রেই আপনাকে ধন্যবাদ সহ আন্তরিক অসীম আনন্দ জানাইতে বাধ্য হইলাম।

গ্রন্থখানির নাম অগ্নি পরীক্ষা, অগ্নিপরীক্ষাতে শৈত্য লাভ করা অসম্ভব, কিন্তু আপনার অগ্নিপরীক্ষার কি বিজাতীয় শক্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে যদ্দারা পাঠকের অন্তর্ব্বহির্ভাগ সুশীতল হইয়া যায়। জানকীর অগ্নি পরীক্ষা পাঠ করিবার সময়ে আমি দিব্যসুখ অনুভব করিয়াছি; কি ভাষার গাম্ভীর্য্য, কি অপূর্ব্বচিন্তাশীলতা; অধিক কি আপনাকে বাঙ্গালাভাষার ভবভূতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনার অগ্নিপরীক্ষার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়া হৃদয়কে সুশীতল করিয়াছে। বাহ্যহৃদয় শীতল করিবার জন্য পুস্তক খানি বক্ষঃস্থলে সন্নিবেশিত করিতে ইচ্ছা হয়। আমি অতিশয়োক্তি করিতেছি না, বঙ্গদেশের কল্পিত কবিগুরু ৺বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক পাঠ করিয়া চমৎকারিত্ব লাভ করিতে পারি নাই।

* * * আপনাকে অদ্বিতীয় বাঙ্গালা কবি বলিয়া আমি স্বীকার করিলাম।

* * * *

সততাশীর্ব্বাদক—
শ্রীশিবচন্দ্র দেব শর্ম্মনঃ।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু –

আপনার দুইখানি স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছি, অনেক কথা বলিবার, কৈফিয়ৎ দিবার আছে, তাই একখানি দীর্ঘপত্র লি জন্য কয়েকদিন অবসরের জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম সাংসারিক ও বৈষয়িক উভয় কার্য্যে আমি এত হইয়া পড়িয়াছি,—পরিবার মধ্যে ও সম্প্রদায় পীড়িতগণের তত্ত্বাবধানে এত বিব্রত যে আমি হইয়া ক্ষণকাল বসিবার সাবকাশ পাইতেছিনা, অনুগ্ করুন ত্বরায় সাক্ষাতে সমস্ত নিবেদন করিব। * এক্ষণে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে আমি আমার ব্যবসায়কে—সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিব, অপরে কেন সম্মান করিবে? জগদীশ্বরের অপ করুণায় আমার অটল বিশ্বাস আছে, তাঁহারি কৃপা আপনার ন্যায় সাহিত্যগগনের প্রভাকরকে সুহৃদরূপে আমার জীবনে আলোকপ্রদানের জন্য লাভ করিয়াছি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি বিশুদ্ধ থাকিয়া ষ্টা থিয়েটারের নাম হইতে থিয়েটারী কলঙ্ক মোচন করিতে সমর্থ হই। গোঁড়ারদল বা থিয়েটারকে ঘৃণা দেখা যাঁহাদের স্বার্থের সহিত জড়িত, তাঁহারা ভিন্ন অপ সমস্ত উচ্চ সম্প্রদায়ের নিকট ষ্টার থিয়েটার এক সাধারণ থিয়েটার অপেক্ষা সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত নাট্যশালা বলিয়া সাদরে পরিচিত হইয়াছে বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে, আমি প্রাতঃকাল হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বসিয়াছি। এখনও স্নানাহ্নিক হ নাই; অনুমতি হয়তো এক্ষণে এইখানেই ইতি করি।

স্নেহাভিলাষী—
অমৃতলাল

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।